মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মূলকথা

।। দ্বিতীয় ভাগ ।।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

মনীষা
কলিকাতা

প্রকাশ ঃ ১৯৬৫

বঙ্গানুবাদ ঃ গীতা মুখোপাধ্যায়
সুকুমার গুপ্ত

প্রকাশক ঃ মনি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪বি, হরি ঘোষ স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক ঃ ফ্রেন্ডশিপ প্রিন্টার্স
২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান হিসাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈষয়িক উৎপাদন সমাজ-জীবনের ভিত্তি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ঐক্য ও বৈচিত্র্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রেণীগুলি ও শ্রেণীসংগ্রাম

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানব গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক রূপসমূহ : ট্রাইব, অধিজাতি, জাতি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমাজ বিপ্লব

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ

নবম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান, সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানের স্থান ও ভূমিকা

দশম পরিচ্ছেদ

সমাজ ও ব্যক্তি

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিহাসে জনগণ ও ব্যক্তির ভূমিকা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের অগ্রগতি

সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শন ও সমাজতন্ত্রের সমালোচনা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শন

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান হিসাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু হল মানব সমাজের বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ বিধানগুলি। সাধারণ সমাজতত্ত্বগত একটা তত্ত্ব হিসাবে, কমিউনিজম-এর বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসাবে এই বিষয়বস্তু আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন। আবার সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ।

১. ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অভ্যুদয়

প্রাক-মার্কসবাদী বস্তুবাদ ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এই বস্তুবাদ সামাজিক জীবন ও ইতিহাসের অধ্যয়নে দার্শনিক বস্তুবাদের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করতে অক্ষম ছিল এবং এই ক্ষেত্রে ভাববাদী মতবাদে আচ্ছন্ন ছিল।

বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মহান অবদান এই যে তাঁরা বস্তুবাদের অর্ধ-নির্মিত সৌধকে সমাপ্ত করেছিলেন, তাকে সমাজের অনুশীলনে বিস্তারিত করেছিলেন। তারই কল্যাণে বস্তুবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি সর্বপ্রথম সামগ্রিক এবং পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অভ্যুদয়ের জন্য কিছু সামাজিক ও তত্ত্বগত পূর্বশর্তের প্রয়োজন ছিল। প্রগতিশীল সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার যুক্তিযুক্ত বিকাশই একে নিয়ে এসেছিল। তবে সমাজ-জীবনের বিধানগুলির আবিষ্কারের সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটিত করায় সামাজিক পরিস্থিতিরও ভূমিকা ছিল।

সামাজিক বিকাশের দ্রুত লয়, ইংরেজ ও বিশেষ করে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পরবর্তী বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী, ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ সাল, শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষের চরম বৃদ্ধি, ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব—সাধারণভাবে এইগুলিই ছিল সেই সব পূর্বশর্ত যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আবির্ভাবকে সুগম করেছিল।

যখন ঐতিহাসিক প্রগতি অত্যন্ত মন্থর ছিল, যেমন সামন্ততন্ত্রের যুগে, তখন একটা সামাজিক রূপের জায়গায় আর একটা সামাজিক রূপের স্থান গ্রহণ বোঝার পক্ষে প্রগতিশীল সামাজিক বিকাশের কোনও বিশেষ বিধান-সমূহ অনুভব করা কঠিন ছিল। এই সব সময়ে আধিবিদ্যক (metaphysical) মতামত সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটল তা দেখিয়ে দিল যে সমাজ কোনও মতেই একটা একশীল বস্তু নয়, বরং একটা জীবন্ত সামাজিক দেহযন্ত্র। তার পরিবর্তন হয় এবং নিজের অস্তিত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্রে সে কতকগুলি বস্তুনিষ্ঠ বিধান মেনে চলে, যা মানুষের ইচ্ছা ও চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়।

হেগেল এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন—যেমন তাঁর ইতিহাসের দর্শনে। ভাববাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ সত্ত্বেও হেগেল বিশ্ব ইতিহাসকে তার বিকাশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। সামাজিক বিকাশের বিধি-শাসিত চরিত্র সম্পর্কে এবং সামাজিক জীবনে স্বাধীনতা ও প্রয়োজনের আন্তঃ-সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি চমৎকার অনুমান করেছিলেন।

ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম পেটি, অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর অনুশীলন ও সামাজিক বিকাশের বিধানসমূহ আবিষ্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁরা যে শ্রমকে সম্পদের উৎস মনে করতেন এবং শ্রমের মূল্যের তত্ত্বে তাঁর-তাঁদের অবদান রেখেছিলেন তা এই প্রস্তুতির সহায়ক ছিল। মার্কস বলেছিলেন যে ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা আমাদের শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক শারীর-কাঠামো সম্বন্ধীয় বিদ্যা যুগিয়েছিলেন, যদিও তাঁরা বুর্জোয়া। সমাজের তিনটি প্রধান শ্রেণীর (ভূস্বামী, বুর্জোয়া ও সর্বহারা) অস্তিত্বের ভিত্তি দেখেছিলেন তাদের আয়ের বিভিন্ন উৎসের (ভূমির খাজনা, মুনাফা ও মজুরি) মধ্যে, অর্থাৎ বণ্টনের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে নয়, তবু তাঁদের মত সামাজিক চিন্তার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্র-পদক্ষেপ ছিল।

রেস্টোরেশন (পুনঃপ্রতিষ্ঠা) যুগের ফরাসী ইতিহাসবিদ অগাস্তিন থিয়েরি, ফ্রাঙ্কোয়া মিগনে ও ফ্রাঙ্কোয়া গিজো (এবং এর আগে মহান

ফরাসী কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী সেন্ট সিমোন) নতুন যুগে বিপ্লবের চালিকা শক্তি হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকা সম্পর্কে যে আবিষ্কার করেছিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পথ সুগম করার দিক থেকে তার বিরাট গুরুত্ব ছিল। প্রাক-মার্কসবাদী বস্তুবাদীদেরও এই প্রক্রিয়ায় অবদান আছে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যা সাধারণত ভাববাদী অবস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ কেউ চমৎকার অনুমান করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদী হেলভেতিউস সামাজিক মতামত ও মানবিক নীতিবোধ গঠনে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন খারাপ নীতিবোধ খারাপ পারিপার্শ্বিকের ফল। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন যে খারাপ মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে হলে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন করতেই হবে। কিন্তু এ কাজ কিভাবে করতে হবে তার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নি। তাঁর মতে নতুন ও উন্নততর আইন-কানুনের ভিতর দিয়েই সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে হবে, আর তার প্রবর্তন করতে পারেন কেবল আলোকসামান্য প্রতিভাধর কোনও শাসক। এখানে তিনি ভাববাদী অবস্থান আঁকড়ে আছেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাফল্যও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জন্মের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এমন একটি সমাজতত্ত্ব তৈরি করার জোরাল প্রচেষ্টা হয়েছিল যা কড়াকাড়ভাবে একটা সামাজিক বিজ্ঞান হবে, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধাঁচে হবে। এই প্রয়াসগুলি ভুলপথে পরিচালিত ছিল এই দিক থেকে যে সমাজকে প্রকৃতিবাদী হিসাবে (naturalistically) বিচার করা হয়েছিল, বিকাশের নিজস্ব বিশেষ অন্তর্নিহিত বিধানসহ একটা সামাজিক সংগঠন হিসাবে সমাজের নির্দিষ্ট চরিত্রকে বিচার করা হয়নি।

মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম সমাজ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থিত করলেন। সমাজের ব্যাখ্যায় দার্শনিক বস্তুবাদকে এবং বস্তুবাদী দিক থেকে সংশোধিত ডায়লেকটিকসকে নিয়োগ করে এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে এগুলিকে প্রয়োগ করে তাঁরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

সৃষ্টি করেছিলেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সাধারণ দার্শনিক বস্তুবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত, অবিচ্ছেদ্য সংযোগকে তুলে ধরে লেনিন লিখেছিলেন: "মার্কস দার্শনিক বস্তুবাদকে গভীরে নিয়ে গিয়েছিলেন ও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করেছিলেন এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিতর মানব সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে তাকে প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় এক বিরাট সাফল্য। ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে মতামতের ক্ষেত্রে আগে যে সব বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচার চলছিল তার পরিবর্তে উল্লেখযোগ্যভাবে অখণ্ড ও সুসমঞ্জস এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রবর্তিত হল, যা দেখিয়ে দিল কিভাবে উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নয়নের ফলে সমাজ-জীবনের এক ব্যবস্থা থেকে আর একটি উচ্চতর ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে ওঠে…।"(১)

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কর্তৃক আবিষ্কৃত সবচেয়ে সাধারণ বিধানগুলি সমাজে চালু থাকে, কিন্তু এখানে সেগুলি একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয়। আমরা যদি মানব সমাজের বিকাশের বিধানগুলি জানতে চাই তাহলে দার্শনিক বস্তুবাদের সাধারণ নীতিসমূহ ও ডায়লেকটিকস-এর বিধানগুলি জানাই যথেষ্ট নয়, তাদের ক্রিয়ার বিশেষ রূপগুলিকেও অবশ্যই জানতে হবে। বিরোধ-সংকুল (antagonistic) কাঠামোযুক্ত সমাজেই কেবল বিপরীতের ঐক্যের ও সংগ্রামের বিধান শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেয়। আর নানাবিধ ঐতিহাসিক যুগে শ্রেণীসংগ্রাম কত না বিচিত্র রূপে, ধরনে ও ঝোঁকে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সমাজে প্রযুক্ত দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতি মূলত একই ধারণা। সমাজে প্রযুক্ত হলে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। তার মানে হল সাধারণ দার্শনিক কোটীবিভাগগুলি (category) ছাড়াও আমাদের নিছক সমাজতত্ত্বগত কোটীবিভাগও পেতে হবে, যেমন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন, উৎপাদিকা শক্তিগুলি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলি, উৎপাদন পদ্ধতি, ভিত্তি ও সৌধ, সামাজিক শ্রেণীসমূহ, জাতিসমূহ ইত্যাদি। এই সমস্ত সামাজিক সত্তার ও সামাজিক-ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রধান প্রধান বিধানগুলির ও মানব সমাজের বিকাশের বিধানসমূহের সার সংকলন করে।

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৯, পৃষ্ঠা ২৫

১৮৪০-এর দশকে ইকনমিক অ্যান্ড ফিলজফিক ম্যানুস্ক্রিপটস অব এইটিনফরটিফোর, দা হোলি ফ্যামিলি, দা জার্মান ইডিওলজি, এবং বিশেষত আরও পরিণত রূপে দা পভার্টি অব ফিলজফি এবং ম্যানিফেস্টো অব দা কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি রচনায় মার্কস ও এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক প্রতিজ্ঞাগুলিকে সূত্রায়িত করেন। ইতিহাস ও সমাজবিকাশ সম্বন্ধে এই নতুন মত গোড়ায় ছিল কেবল একটি প্রকল্প (hypothesis) ও পদ্ধতি। কিন্তু এ এমন একটা প্রকল্প ও পদ্ধতি ছিল যা সর্বপ্রথম ইতিহাস সম্বন্ধে একটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবপর করেছিল। লেনিনের ভাষায় এগুলি সমাজতত্ত্বকে একটা বিজ্ঞানে পরিণত করেছিল; কারণ এগুলি সামাজিক সম্পর্কের বিকাশে পৌনঃপুন্য ও নিয়মানুবর্তিতা উদ্ভাবন সম্ভবপর করেছিল, বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থাগুলিকে সামান্যীকরণ করে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ধারণা তুলে ধরেছিল, সাধারণ বস্তু যে সেগুলিকে একত্ব দেয় আবার সেই সঙ্গে তাদের বিকাশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির দরুন সহজাত পার্থক্যও থাকে তা স্পষ্ট করে তুলেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে মার্কস অত্যন্ত জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন অর্থাৎ ধনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মহৎ অনুশীলন শুরু করেছিলেন। ক্যাপিটাল গ্রন্থে তিনি এই গঠনটির উদ্ভব, গতি বিকাশকে দেখিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন এই ধনতন্ত্রের ভিতরে কিভাবে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের উদ্ভব হয়, কিভাবে বৈষয়িক উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে সেই অনুযায়ী একটা রাজনৈতিক সৌধ গড়ে ওঠে, কিভাবে বিভিন্ন ভাব, নীতিবোধ, গার্হস্থ্য ও দৈনন্দিন সম্পর্কের উদ্ভব হয়। ক্যাপিটাল রচনার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি সুপ্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বগত তত্ত্ব হয়ে উঠল।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের তত্ত্বকে "সমাজতত্ত্ব" আখ্যা দেননি, কারণ তখনকার দিনে এই আখ্যাটি বিভিন্ন ভাববাদী পজিটিভিস্ট চিন্তাধারায় ব্যবহৃত হত। সে সব চিন্তাধারার সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত একটা বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস যে তত্ত্ব সৃষ্টি করলেন সেটাই হল বাস্তবে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, কারণ এই-ই কেবল সামাজিক বিকাশের বাস্তব বিধানগুলি ও চালিকা

শক্তিগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান যোগাল। "ঠিক যেমন ডারউইন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি (species) অসম্পর্কিত ও আকস্মিক, 'ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট' ও অপরিবর্তনীয় এই ধারণার অবসান ঘটালেন এবং বিভিন্ন প্রজাতির পরিবর্তনীয়তা ও পরম্পরা প্রমাণ করে জীববিদ্যাকে সর্বপ্রথম পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করলেন, তেমনি মার্কস এ ধারণার অবসান ঘটালেন যে সমাজ কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের যান্ত্রিক সমষ্টি যাতে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় (অথবা ইচ্ছা করলে এও বলতে পারেন যে সমাজের বা সরকারের ইচ্ছায়) খুশিমত নানারকম অদলবদল চলে এবং যা কার্যকারণবিহীনভাবে উদ্ভূত হয় ও পরিবর্তিত হয়। আর নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের মোট যোগফল হিসাবে অর্থনৈতিক গঠনের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে, এইরকম গঠনগুলির বিকাশ যে প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটা প্রক্রিয়া—এ সত্যকে প্রমাণ করে মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজতত্ত্বকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন।"(১)

২. *ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিষয়বস্তু*

মানব সমাজ সারমর্ম ও কাঠামোর দিক থেকে বস্তুর অস্তিত্বের সবচেয়ে জটিল রূপ। এটি প্রকৃতির একটা নির্দিষ্ট ও গুণগতভাবে অনন্য অংশ, কিছু কিছু অর্থে প্রকৃতির বাকি অংশের বিরুদ্ধে। সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ভাববাদ ও অধিবিদ্যক বস্তুবাদ উভয় থেকেই মৌলিকভাবে পৃথক করে তোলে। ভাববাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ ও প্রকৃতিকে পাল্টাপাল্টি দাঁড় করায় এবং অধিবিদ্যক বস্তুবাদ এ দুইয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্যকে স্বীকার করে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালিয় দার্শনিক গিয়োভান্নি ভিকো লিখেছিলেন সমাজের ইতিহাস প্রকৃতির ইতিহাস থেকে এই দিক দিয়ে পৃথক যে তা মানুষের দ্বারা এবং কেবল মানুষের দ্বারাই তৈরি হয়, প্রকৃতিতে কিন্তু অন্ধ, নৈর্ব্যক্তিক ও স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিসমূহের ফলে ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলি আপনা থেকেই ঘটে। সমাজ যে মন ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষদের ক্রিয়াক্ষেত্র। যে মানুষেরা আবার নিজেদের সামনে কিছু লক্ষ্য স্থির করে এবং তা পূরণের

১। ভি, আই, লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৪২।

জন্য সংগ্রাম করে—এই কথাটা অতীত কালে এবং আমাদের কালেও প্রায়ই সেই সব সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ যারা সামাজিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলীর মৌলিক কারণ ও সারমর্ম বোঝার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে একটা মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নির্দিষ্ট চরিত্রকে অনপেক্ষ করে তুলে আধিবিদ্যকভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-গুলির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগুলিকে দাঁড় করায়। (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-গুলির কাজ পৌনঃপুনিক ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলির অনুশীলন, আর ঐতিহাসিক বিজ্ঞান তথাকথিতভাবে কেবল ব্যক্তি ও অনন্য নিয়ে কারবার করে।) যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির একটি নয়া-কান্টপন্থী চিন্তাধারার লোকেরা (এইচ. রিকের্ট, ডব্লিউ, ভিণ্ডেলবাণ্ড) বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞানের দু রকম এমনকি দুটি পরস্পর-বিরোধী পদ্ধতি অবশ্যই থাকা দরকার: একটি হল তথাকথিত আইনের দ্বারা পরিমাপ করার (nomometric) অথবা সামান্যী-করণের পদ্ধতি—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি যার প্রয়োগ করে, অন্যটি ভাবের প্রতীক দিয়ে (ideographic) পরিমাপের অর্থাৎ বিশিষ্টকরণের (indive-dualising) পদ্ধতি (কেবল পৃথক পৃথক ও অনন্য ঘটনাগুলি নিয়ে কারবার) —যা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিকে আধিবিদ্যকভাবে সমাজের বিজ্ঞানগুলির বিপরীতে দাঁড় করানটা কষ্টকল্পিত ও ন্যায্যতাবিহীন। দুটি ঘটনা একেবারে একরকম সমাজের ইতিহাসেও যেমন প্রকৃতিতেও তার চাইতে বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই (যেমন একই প্রজাতির দুটি প্রাণী বা একই গাছের দুটি পাতাও একেবারে একরকম নয়)। অপরদিকে সমাজে ও ইতিহাসে নির্দিষ্ট ও বিশেষ ছাড়াও সাধারণও আছে, যা ঐতিহাসিক বিকাশের একই স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশ ও জাতির অর্থনীতিতে, সামাজিক সম্পর্কে, রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। এই সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে বের করেই আমরা সামাজিক জীবনের বিধানগুলিকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হই।

একথা মনে করা যেতে পারে যে সামাজিক ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলি যেহেতু মানুষের নিজের ক্রিয়াকলাপের ফল, সেগুলিকে বোঝা ততটা কঠিন নয় যতটা কঠিন প্রকৃতির ঘটনাবলীকে বোঝা। আর তা ছাড়া মানুষও

সমাজের পক্ষে প্রকৃতির বিশাল বিশাল শক্তি, যেগুলি মানুষের প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন, তাদের পদানত করার চেয়ে সামাজিক সম্পর্কগুলির উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই সহজতর হওয়া উচিত। কিন্তু মানব-ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে এ চিত্র সঠিক নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সমাজের সাধারণ বিজ্ঞান তখন ও ভ্রূণ অবস্থায় ছিল। প্রকৃতির বিধান ও শক্তিগুলিকে মানবসমাজ ধাপে ধাপে জানছিল ও আয়ত্তে আনছিল। কিন্তু মানবসমাজের প্রকৃত চরিত্র ও তার বিধান-গুলিকে আবিষ্কার করা ঢের বেশি কঠিন কাজ বলে দেখা গেল। সামাজিক বিধান ও প্রক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ জানা ও আয়ত্তে আনা আবার আরও কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হল। সামাজিক বিজ্ঞান সৃষ্টি করা এবং সমাজজীবনের বিপ্লবী পরিবর্তন আনার বাস্তব কাজে তা প্রয়োগ করার ভিতর দিয়েই কেবল এই সব সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দিল।

মানবসমাজ, সামাজিক ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়া নানাবিধ বিজ্ঞানের দ্বারা অনুশীলিত হয়। রাজনৈতিক অর্থনীতি অর্থনৈতিক ও উৎপাদন সম্পর্ক, বৈষয়িক জিনিসপত্রের উৎপাদন পদ্ধতির অভ্যুদয় ও বিকাশের বিধান নিয়ে তদন্ত করে। আইনগত বিজ্ঞানগুলি বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক ও বিচার-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ রাষ্ট্রের ও আইন সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ এবং সেগুলির কাজকর্ম নিয়ে অনুশীলন করে। নন্দনতত্ত্ব ও কলা সমালোচনা, কলার অভ্যুদয় ও বিকাশ, বাস্তবের সঙ্গে কলার সম্পর্ক, শৈল্পিক সৃজনশীলতার পদ্ধতিগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করে। নীতিশাস্ত্র মানুষের মধ্যে নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র নিয়ে অনুশীলন করে। কাজেই বিভিন্ন বিজ্ঞান যদিও মানবসমাজ নিয়ে অনুশীলন করে তবু তার প্রত্যেকটি সামাজিক জীবনের কেবল এক-একটি দিক, কোনও এক বা অপর ধরনের সামাজিক সম্পর্ক বা ঘটনাবলী (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত) নিয়ে অনুশীলন করে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সামাজিক জীবনের পৃথক পৃথক দিক নিয়ে কারবার করে না, করে তার বিধানসমূহ ও তার ক্রিয়াকলাপের ও বিকাশের চালিকা শক্তিগুলি নিয়ে, সামাজিক জীবনের সমস্ত দিক ও

সম্পর্কগুলির অন্তর্নিহিত সংযোগ ও বিরোধসমূহসহ তাকে একটা অখণ্ড সমগ্র ভাবে নিয়ে। বিশেষ বিভাগীয় বিজ্ঞানগুলি যা করে সেভাবে না করে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রধান হিসাবে সমাজবিকাশের সবচেয়ে সাধারণ বিধানগুলি নিয়ে, সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলির অভ্যুদয়, অস্তিত্ব ও বিকাশের চালিকা-শক্তিগুলি নিয়ে অনুশীলন করে।

সাধারণ সমাজতত্ত্বগত বিধানগুলি, যেগুলি সমস্ত ঐতিহাসিক যুগেই প্রযোজ্য, সেগুলি প্রত্যেকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনে, প্রত্যেকটি যুগে একটা নির্দিষ্টভাবে ক্রিয়া করে। কাজেই সাধারণ সমাজতত্ত্বগত বিধানগুলির চরিত্র ও সারমর্ম সম্পর্কে যদি আমরা সঠিক ধারণা পেতে চাই, তাহলে আমাদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে, বিভিন্ন গঠনে (যথা—সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের আমলে) তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করতে হবে। কাজেই "সাধারণ সমাজতত্ত্বগত বিধানসমূহের" ধারণার মধ্যে আছে অন্তর্নিহিত সংযোগ ও সম্পর্ক যা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলির সবচেয়ে সাধারণ বিধানসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের মত বিজ্ঞানগুলি থেকেও স্বতন্ত্র। ঐতিহাসিক বিজ্ঞান মানে তা দিনপঞ্জীগত পরম্পরায় বিভিন্ন দেশের ও জাতির এবং ঘটনাবলীর অনুশীলন করবে। ঐতিহাসিক বিজ্ঞান ঘটনার গতিকে সাধারণ তত্ত্বগত নিরিখে বা বিমূর্তভাবে বিচার করতে পারবে না, তাকে প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও প্রকৃত জনগণের ক্রিয়াকলাপ এবং আকস্মিকতার প্রভাব, যা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে কখনও কখনও দারুণ ভূমিকা নেয়, সে সবকে বিবেচনা করে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপে বিচার করতে হবে।

অপর পক্ষে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটা সাধারণ তত্ত্বগত, পদ্ধতিবিদ্যা-ঘটিত বিজ্ঞান। এ কোনও বিশেষ জাতি বা বিশেষ দেশ নিয়ে অনুশীলন করে না, অনুশীলন করে সমগ্র মানবসমাজকে তার বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ বিধানগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে।

সাধারণভাবে মার্কসবাদী দর্শনের মতই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্ব ও

পদ্ধতি উভয়কেই একত্রে গ্রথিত করে। সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ও পদ্ধতি বিজ্ঞানঘটিত (epistemological) প্রশ্নের অর্থাৎ সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চেতনার মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সমাধান দেয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এ আমাদের সমাজের সবচেয়ে সাধারণ বিধান ও চালিকা-শক্তিগুলির কথা বলে, কাজেই এ এক বৈজ্ঞানিক সাধারণ সমাজতত্ত্বগত তত্ত্ব। এই কারণেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একই সংগে সামাজিক জীবনের ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলিকে অধ্যয়ন করার কার্যকর পদ্ধতি এবং বিপ্লবী ক্রিয়ারও পদ্ধতি। একমাত্র এর সাহায্যেই ইতিহাসবিদ, অর্থনীতি-বিদ, আইন ও কলার ছাত্ররা সামাজিক ঘটনাবলীর জটিলতার ভিতর পথ খুঁজে বের করতে পারে। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ পথপ্রদর্শক সূত্রের কাজ করে।

ইতিহাস যখন তীব্র মোড় বদলায় এবং যখন ঘটনাবলীর এবং শ্রেণী ও পার্টিগুলির ব্যবহারের বিশেষত সুশৃংখল ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় তখন সেই বেগবান সামাজিক বিকাশের সেই দ্রুত পরিবর্তনের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিশেষ পদ্ধতি বিজ্ঞানগত গুরুত্ব অর্জন করে।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বিধানসমূহ ও পরিচালক শক্তিগুলিকে এবং সমগ্র-ভাবে বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াকে অধ্যয়ন করে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম। একাজে ঐতিহাসিক বস্তুবাদই তার প্রধান ভরসাস্থল। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের পটভূমিকায় বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমকে মানব সংস্কৃতির সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, যথা ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদি সহ সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলিও অনুশীলন করতে হয়, তাতেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদই প্রধান সহায়ক।

নির্দিষ্ট সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অঙ্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অথবা জনমত গ্রহণ, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নাবলী প্রেরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মার্কসবাদের সাধারণ সমাজতত্ত্বগত তত্ত্ব ও তার পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজন।

সমাজের সাধারণ তত্ত্বগত বিজ্ঞান হিসাবে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ব আবার তার বিকাশের জন্য নির্ভর করে নির্দিষ্ট সমাজতত্ত্বগত গবেষণার উপর, সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংখ্যাতত্ত্বগত ও অপরাপর বহু অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপাত্তের (data) ব্যাপক ব্যবহারের উপর। নির্দিষ্ট সমাজতত্ত্বগত গবেষণা বিভিন্ন ধরনের ও বাস্তব জীবনের পরিবেশে সমাজতত্ত্বগত বিধানগুলির ক্রিয়ার প্রণালী উদ্ঘাটন করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত রচনাগুলিতে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির নির্দিষ্ট অনুশীলনে সাধারণ সমাজতত্ত্বগত পদ্ধতির প্রয়োগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। যে সব মার্কসবাদীরা জীবনের দ্রুত বিকাশের দ্বারা উপস্থাপিত নতুন ও অপ্রত্যাশিত জিনিসগুলি দেখতে অপারগ হতেন তাঁদের সঙ্গে বিতর্কে লেনিন প্রায়ই গ্যেটের ফাউস্ট থেকে এই কথাগুলির উদ্ধৃতি দিতেন: "বন্ধু, তত্ত্ব ধূসর (পক্ককেশ), কিন্তু জীবনের শাশ্বত বৃক্ষ সবুজ।" জীবন অর্থাৎ পৃথিবীতে ও ইতিহাসে আসলে যা ঘটে তা সর্বদা সবচেয়ে অগ্রসর সামাজিক তত্ত্বের চেয়েও সমৃদ্ধ। আমাদের এই ঝঞ্ঝামথিত ও গতিশীল যুগে এই একটা বিষয়ে আমাদের বিশেষ সচেতন থাকা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঘটনার গতিপথ সম্পর্কে এক বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পথপ্রদর্শক যোগায়; ঘটনাবলীকে বুঝতে, বৈজ্ঞানিকভাবে পূর্বাভাস দিতে এবং সমাজবিকাশের সম্ভাবনা ও প্রবণতাগুলিকে দেখতে আমাদের সক্ষম করে এবং তার ভিতর দিয়ে বিপ্লবী ক্রিয়ার তত্ত্বগত ভিত্তি যোগায়।

৩. *সামাজিক বিকাশের বিধানসমূহ ও তাদের বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র*

একশ বছরেরও আগে এ কনট্রিবিউশন টু দা ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকনমি বইয়ের ভূমিকায় মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক প্রতিজ্ঞা ও নীতিগুলি সম্বন্ধে তাঁর চিরায়ত সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন: "মানুষের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে তারা নির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে যেগুলি অপরিহার্য ও তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, এগুলি উৎপাদন সম্পর্ক, যা তাদের বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী হয়। এই সব উৎপাদন সম্পর্কের মোট যোগফলই হল

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রকৃত ভিত্তি, যার উপর গড়ে ওঠে একটা আইনগত ও রাজনৈতিক সৌধ এবং যার সঙ্গে সংগতি রেখে তৈরি হয় সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলি। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মননগত জীবন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মানুষের চেতনা তাদের সত্তাকে নির্ধারিত করে না, বরং উল্টো, তাদের সামাজিক সত্তাই তাদের চেতনাকে নির্ধারিত করে। বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিগুলির তৎকালীন উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় অথবা এই একই কথার আইনগত প্রকাশমত সেই সম্পত্তি-সম্পর্কগুলির সঙ্গে (সংঘর্ষ হয়) যার মধ্যে তারা এতদিন ধরে কাজ করছিল। এই সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের রূপের জায়গায় তার শৃংখলে পরিণত হয়। তারপরই শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের একটা যুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের পর সমগ্র বিপুল সৌধটি কমবেশি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সব রূপান্তরকে বিচার করার সময়ে উৎপাদনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বৈষয়িক রূপান্তর —যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করা যায়—তার সঙ্গে আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মগত, নান্দনিক অথবা দার্শনিক, সংক্ষেপে সেইসব মতাদর্শগত রূপগুলি, যার ভিতর দিয়ে মানুষ এই সংঘর্ষ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং লড়াই ক'রে নিষ্পত্তি করে—সেগুলিকে তফাত করে দেখা উচিত। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কি ভাবে, তার ভিত্তিতে তাকে বিচার করা যায় না, তেমনি রূপান্তরের এই রকম একটা পর্যায়কে তার নিজের চেতনা দিয়ে আমরা বিচার করতে পারিনে, এই চেতনাকে বরং বৈষয়িক জীবনের বিরোধগুলি দিয়ে সামাজিক উৎপাদিকা শক্তিগুলির ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির ভিতরকার তৎকালীন বিরোধ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। কোনও সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে সব উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের সুযোগ আছে সেগুলি বিকশিত হয়ে যাবার আগে (সে ব্যবস্থা) ধ্বংস হয় না, আর নতুন, উচ্চতর উৎপাদন সম্পর্ক কখনও দেখা দেয় না যতক্ষণ না পুরানো সমাজেরই গর্ভে সেগুলির অস্তিত্বের বৈষয়িক পরিস্থিতি পরিণত হয়ে ওঠে। কাজেই মানবজাতি নিজের সামনে এমন সব কর্তব্যই উপস্থিত করে যার সে সমাধান করতে পারে ; কারণ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে সব সময়ে

দেখা যায় যে কর্তব্যগুলি কেবল তখনই দেখা দেয় যখন সেগুলির সমাধানের জন্য বৈষয়িক পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই বিরাজমান বা অন্তত তার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।"(১)

মার্কসবাদী সামাজিক তত্ত্বের মূল প্রতিজ্ঞা ও নীতিগুলির এই সূত্রায়ন তার দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে: প্রথমটি হল ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিধি-শাসিত প্রক্রিয়া হিসাবে সুসঙ্গত প্রয়োগ, যা চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদন পদ্ধতিগুলির বিকাশ দ্বারা নির্ধারিত, আর দ্বিতীয়টি হল কঠোর ঐতিহাসিকীকরণতত্ত্ব (historicism), সমাজকে এমন একটা কিছু হিসাবে বিবেচনা করা যা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে।

আমরা আগে উল্লেখ করছি যে মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগেও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির অগ্রগতির প্রভাবে সামাজিক জীবনকে, সমাজের ইতিহাসকে একটা বিধি-শাসিত প্রক্রিয়া হিসাবে বুঝতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে যান্ত্রিক, অথবা প্রকৃতিতে যেমন ঘটে তেমনি শারীরিক অথবা জীবতাত্ত্বিক বিধানগুলির মত করেই সাধারণত সামাজিক বিধানগুলির বিচার করা হত। কাজেই সামাজিক জীবন, যা মন ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের দ্বারা সৃষ্ট, তার নির্দিষ্ট চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি অবহেলিত হয়েছিল।

মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মহান অবদান হল সামাজিক জীবনে, সমাজের ইতিহাসে কেবল তাই উদ্ঘাটন করা নয় যা সামাজিক বিধানগুলিকে প্রকৃতির বিধানগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত করে, সেই সঙ্গে এটাও দেখান যে সামাজিক-ঐতিহাসিক বিধানগুলি প্রকৃতির বিধানগুলি থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। সামাজিক বিকাশকে তাঁরা যে একটি প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন তার ভিতর দিয়েই একথা প্রকাশিত হয়।

প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এমন এক প্রক্রিয়া যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির মতই প্রয়োজনীয় ও বিষয়গত এবং ততটাই বিধান-শাসিত। এ এমন একটা প্রক্রিয়া যা শুধু যে মানুষের ইচ্ছা ও চেতনার উপর অ-নির্ভর-শীল তাই নয়, বরং আসলে সেই ইচ্ছা ও চেতনাকেই নির্ধারিত করে। আবার সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া জনগণের নিজেদের

১। কে, মার্কস ও এফ, এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ৫০৩-০৪।

ক্রিয়ারই ফল ; সে দিক থেকে তা প্রকৃতির প্রক্রিয়াগুলির মত নয়। প্রথম নজরে এই প্রতিজ্ঞাটির মধ্যে যুক্তির দিক থেকে একটা বিরোধ আছে বলে মনে হয়। সামাজিক জীবন ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হল চেতনা, ইচ্ছা ও বাসনাসম্পন্ন এবং নিজেদের সামনে কতকগুলি কর্তব্য ও লক্ষ্যসম্পন্ন জনগণের সৃষ্টি—এই তথ্যের সঙ্গে ইতিহাস কতকগুলি প্রয়োজনীয়; বিষয়গত বিধান মেনে চলে যেগুলি মানুষের ইচ্ছা ও চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়—এই তথ্যকে আমরা মেলাব কি করে ?

এই বিরোধের মীমাংসা হতে পারে যদি আমরা মনে রাখি যে জনগণ (বিশেষত বড় বড় জনগোষ্ঠী—জাতি, শ্রেণী, পার্টি প্রভৃতি) তাদের লক্ষ্য অনুসরণ করতে গিয়ে কতকগুলি ভাব ও বাসনা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, আবার সেই সঙ্গে সর্বদাই এমন কতকগুলি বিষয়গত পরিস্থিতিতে বাস করে যা তাদের ইচ্ছা ও বাসনার উপর নির্ভর করে না এবং যা শেষ পর্যন্ত তাদের ক্রিয়াকলাপ, তাদের ভাব-ভাবনা ও বাসনার গতিমুখ ও চরিত্র নির্ধারণ করে।

বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই প্রতিজ্ঞা থেকে এগোয় যে সামাজিক চেতনার ব্যাপারে সামাজিক সত্তাই মূল। সামাজিক চেতনা সামাজিক সত্তার প্রতিফলন। তা মোটামুটি সঠিক প্রতিফলন হতে পারে অথবা ভুলও হতে পারে। ভাববাদীরা যা মনে করে তা ঠিক নয়, এই চেতনা সামাজিক জীবনের ব্যবস্থা এবং সামাজিক বিকাশের গতিমুখ নির্ধারণ করে না। বরং সামাজিক সত্তাই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষ ও সামাজিক শ্রেণীগুলির সামাজিক চেতনা, ভাবধারা, আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে। তাহলে যে সামাজিক চেতনা ঐতিহাসিক বস্তুবাদে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে তার ধারণার মধ্যে কি নিহিত আছে ?

দার্শনিক বস্তুবাদে সত্তার কোটী (category) বা শ্রেণীকে বস্তুর ও প্রকৃতির ধারণার সঙ্গে একই বলে মনে করা হয়। কাজেই সামাজিক সত্তা বলতে মার্কসবাদীরা বোঝে সমাজের বৈষয়িক জীবন, তার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। সামাজিক জীবন গঠিত হয় সামাজিক উৎপাদন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নিয়ে, শেষোক্তর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে জনগণের

আপন পুনরুৎপাদন, বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জনগণের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তার, অর্থাৎ উৎপাদন বা অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির এবং পরিবার, শ্রেণী, জাতি ও মানবগোষ্ঠীর অপরাপর রূপগুলির জীবনের বৈষয়িক দিকগুলির পুনরুৎপাদন।

সামাজিক সত্তাই মুখ্য, কারণ তা সামাজিক চেতনার বাইরে ও তা থেকে স্বাধীনভাবে বিরাজ করে, সামাজিক চেতনা গৌণ, কারণ তা জনগণের সামাজিক সত্তার প্রতিফলন।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে: সামাজিক চেতনা থেকে সামাজিক সত্তার স্বাতন্ত্র্য বুঝব কি করে? জনগণ নিজেই কি তাদের উৎপাদনের উপকরণ সৃষ্টি করে না? জনগণের নিজের উদ্দেশ্যময় ক্রিয়াকলাপই কি মানবিক শ্রমের পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য নয়? উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষেরা নিজেরাই কি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে না? এই ধারার যুক্তি দিয়ে রুশ মাখপন্থী বোগদানভ সিদ্ধান্ত করেন যে চেতনার সাহায্য ছাড়া জনগণ একত্র হতে পারে না, ফলত সামাজিক জীবন তার সমস্ত রকম প্রকাশে সচেতন ও মানসিক দিক থেকে সক্রিয় জীবন। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চেতনা অভিন্ন।

জনগণ নিজেই তাদের সামাজিক জীবন গড়ে তোলে, কিন্তু কোনও মতেই সর্বদা বা সর্বত্র তা তারা সচেতনভাবে গড়ে তোলে না। অবশ্য উৎপাদনের প্রতিটি পৃথক প্রক্রিয়া তারা সচেতনভাবে করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তারা যে সব সামাজিক সম্পর্কে প্রবেশ করে তার চরিত্র সম্বন্ধে, কিভাবে এই সব সম্পর্ক পরিবর্তিত হচ্ছে বা সেই সব পরিবর্তনের সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে তারা সর্বদা সচেতন। জীবনধারণের প্রয়োজনের তাড়নায় জনগণ কাজ করে, জিনিসপত্র তৈরী করে ও বিনিময় করে, এবং তার মধ্যে দিয়ে তৈরি অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি তাদের সচেতন পছন্দ বা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে না, তারা সামাজিক উৎপাদনের যে স্তরে পৌঁছেছে তার উপর নির্ভর করে লেনিন বলেছেন যে জনগণ সচেতন সত্তা হিসাবে পারস্পরিক সম্পর্কে প্রবেশ করে, তা থেকে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে আসা যাবে না যে সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চেতনা অভিন্ন। সামাজিক চেতনা সামাজিক সত্তার মোটামুটি সঠিক প্রতিফলন

হতে পারে, কিন্তু কখনই একেবারে একই হতে পারে না কারণ প্রথমত সামাজিক চেতনা সামাজিক সত্তাকে নির্ধারণ করে না, দ্বিতীয়ত, এমনকি এর সবটা জুড়েও নেই।

উপরন্তু জনগণের সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মূর্ত ও সামাজিক জীবনের মঞ্চে আবির্ভূত তাদের ইচ্ছা, লক্ষ্য, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে, একত্রে মিলে মিশে যায় ও পরস্পর-বিরোধী হয়, আর এই সমস্তর ফল প্রায়ই এই হয় যে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কদাচিৎ আয়ত্তে আসে। লক্ষ লক্ষ মানুষের অসংখ্য ক্রিয়া ও আকাঙ্ক্ষার সংঘাত অনেক সময়ে এমন ফল প্রসব করে যা কেউ আগে থেকে বোঝেনি বা কেউ পাওয়ার জন্যও চেষ্টা করেনি। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এই স্লোগানগুলি ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ সালে ফরাসী জনগণকে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা কাজে দাঁড়াল শ্রমশক্তি বিক্রয়ের স্বাধীনতায়, সাম্য দাঁড়াল শ্রমিক ও পুঁজিবাদীর মধ্যে "সাম্যে", এবং মৈত্রী শোষক ও শোষিতদের মধ্যে "মৈত্রী"তে।

১৯৩৯-১৯৪৫ সালে ফ্যাশিস্ত অক্ষশক্তির দেশগুলি যখন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করল তখন তাদের ইচ্ছা ছিল বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ধ্বংস করা। কিন্তু বাস্তবে কি হল? ফ্যাশিবাদের পরাজয়, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাব এবং সমাজতন্ত্র শক্তিশালী হওয়া।

সামাজিক বিকাশকে একটা প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ব'লে চরিত্রায়ণ করে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: "ইতিহাস এমনভাবে তৈরী হয় যে শেষ ফল সর্বদা উদ্ভূত হয় বহু পৃথক পৃথক ইচ্ছার সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে, যেগুলির ভিতর প্রত্যেকটি আবার বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে তা জীবনের বহু বিশেষ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অতএব অসংখ্য পরস্পর ছেদক শক্তি রয়েছে, বিভিন্ন শক্তির সমান্তরিক ক্ষেত্রের একটা অসীম পরম্পরা আছে, যা থেকে একটা ফল দাঁড়াচ্ছে—তা হল ঐতিহাসিক ঘটনা। একেই আবার দেখা যেতে পারে এমন একটা শক্তির ফল হিসাবে যা সামগ্রিক দিক থেকে অচেতনভাবে ও ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কাজ করে। কারণ ব্যক্তি-বিশেষ যা ইচ্ছা করে অপর সকলে তাতে বাধা দেয়, আর যা দাঁড়ায় তা

কেউ চায় নি। অতএব ইতিহাস এতকাল পর্যন্ত একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ধরনে এগিয়েছে এবং গতির ওই একই বিধানের দ্বারা মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষদের ইচ্ছা—যে ব্যক্তিদের প্রত্যেকে তাই-ই কামনা করে যা করতে তার শারীরিক গঠন ও বাইরেকার পরিবেশ, শেষকাণ্ডে অর্থনৈতিক পরিবেশ (হয় তার নিজের ব্যক্তিগত নয় সাধারণভাবে সমাজের পরিবেশ) তাকে বাধ্য করে—যা চায় তা পায় না, মিলেমিশে মোট যোগফলের একটা গড়ে, একটা অভিন্ন ফলে দাঁড়ায়—এই তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্ত মোটেই করা যাবে না যে সেগুলির ফল হল শূন্য। বরং প্রত্যেকেরই ওই ফলে অবদান রাখে ও সেই অবদানের পরিমাণে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।"(১)

কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেই, যখন সমাজ সামাজিক সম্পর্কের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন জনগণ ক্রমবর্ধমান পরিসরে তাদের লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে শুরু করে। তবু এমনকি এই পর্যায়েও সামাজিক বিকাশ বিষয়গত কারণ ও বিধান যেগুলি জনগণের চেতনার বাইরে বিরাজমান থাকে এবং তাদের ইচ্ছা, চেতনা, লক্ষ্য ও কর্তব্যসমূহকে নির্ধারিত করে, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত একটি প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই থাকে। এইভাবে সমাজতন্ত্র সামাজিক বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা ক্রমশ জয় করে, কিন্তু এমনকি সেখানেও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি নির্ধারিত হয় বিষয়গত পরিস্থিতির দ্বারা, যে সমস্ত বাস্তব সম্ভাবনা জনগণকে অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয় ও ক্রিয়ার সময়ে যেগুলি থেকে তাদের অগ্রসর হতে হয় সেগুলির দ্বারা। এমনকি এখানেও বিষয়ীবাদ (subjectivism) ও স্বেচ্ছাচার নেতিবাচক ফল প্রসব করতে পারে এবং ক্রিয়া কেবল তখনই সাফল্যমণ্ডিত হয় যখন তা বিষয়গত সামাজিক বিধানসমূহের অনুযায়ী হয়।

সামাজিক বিধানসমূহের মানে কি ?

আমরা জানি যেকোনও বিধান ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে একটা বিষয়গত, প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী সংযোগ প্রকাশ করে। সেইভাবেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও অপরাপর সামাজিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানগুলিও সামাজিক ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা প্রয়োজনীয়, স্থায়ী ও পৌনঃপুনিক সংযোগ প্রকাশ করে।

১. কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৮।

কতকগুলি সামাজিক বিধান সামাজিক বিকাশের সর্বস্তরে চালু থাকে। এই সব বিধানের মধ্যে আছে সামাজিক চেতনার ব্যাপারে সামাজিক সত্তার নির্ধারক ভূমিকা; সমাজের একটা বিশেষ কাঠামোর ব্যাপারে উৎপাদনের পদ্ধতির নির্ধারক ভূমিকা, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে উৎপাদিকা শক্তিগুলির নির্ধারক-ভূমিকা; সামাজিক সৌধের ব্যাপারে অর্থনৈতিক ভিত্তির নির্ধারক ভূমিকা; সামাজিক সম্পর্কের মোট যোগফলের উপর ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক প্রকৃতির নির্ভরশীলতা, ইত্যাদি। এগুলি হল সাধারণ সমাজতত্ত্বগত বিধান, এরা কমিউনিজমসহ সামাজিক বিকাশের সর্বস্তরে চালু থাকে।

সাধারণ সমাজতত্ত্বগত বিধানগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি আছে যেগুলি কেবল কয়েকটি সামাজিক গঠনের ক্ষেত্রে চালু থাকে। এগুলি হল প্রধানত সমাজের শ্রেণীবিভক্ত হওয়া, যা কেবল কয়েকটি উৎপাদন পদ্ধতিরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, এবং শ্রেণী-সংগ্রাম ইতিহাসের চালিকা শক্তি হওয়া, যা কেবল সেই সব সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের পক্ষেই প্রযোজ্য, যেগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কিছু সমালোচক বলে থাকে যে বিধান এমন একটা সম্পর্ক যা সর্বদা ও সর্বত্র বিরাজমান। শ্রেণী-সংগ্রামের বিধান যদি এই দাবি পূরণ করতে না পারে তবে তা কোনও বিধানই নয়।

প্রকৃতির শাশ্বত বিধানগুলির সঙ্গে তুলনা করলে সামাজিক জীবনের বিধানগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে সাধারণভাবে সেগুলির অস্তিত্ব ও ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময় ধরে চলে। শ্রেণী-সংগ্রামের বিধান ছাড়াও অপরাপর সামাজিক বিধান কেবল তখন ও সেখানেই চালু থাকে যখন ও যেখানে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি ও সম্পর্ক বিরাজ করে। তা সত্ত্বেও যেগুলি বস্তুনিষ্ঠ ও প্রকৃত বিধান, সেগুলি সামাজিক ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সহজাত ও আপেক্ষিকভাবে নিত্য সম্পর্ক প্রকাশ করে। হাজার হলেও পৃথিবীর জীবতত্ত্বের বিধানগুলি পর্যন্ত সূর্যের উপর কাজ করে না। কিন্তু তার জন্য কেউ তাদের বাস্তবতা বা বস্তুনিষ্ঠায় সন্দেহ করে না।

কিছু কিছু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক বিধানগুলিকে (যথা—ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব ও বিকাশের বিধানকে) শাশ্বত, প্রাকৃতিক,

অ-পরিবর্তনশীল বিধানের মর্যাদা দেয়, ধনতন্ত্রের মধ্যেকার সম্পত্তির অসমতা এবং আধিপত্য ও দমন সহ ধনতন্ত্রকে তারা সমাজের বিকাশের সমস্ত স্তরেই দেখে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধানগুলি সম্বন্ধে এই ধরনের মতের সমালোচনা করে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: "আমাদের কাছে 'অর্থনৈতিক বিধানগুলি' প্রকৃতির শাশ্বত বিধান নয়, (এগুলি) ঐতিহাসিক বিধান যা ওঠে ও মিলিয়ে যায়; আর অর্থনীতিবিদদের দ্বারা যতটা উপযুক্ত বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে রচিত হয়েছে সেদিক থেকে আধুনিক রাজনৈতিক অর্থনীতি আমাদের কাছে নিছক সেই রকম বিধান ও শর্তাবলীর সংক্ষিপ্তসার যেগুলির অধীনেই কেবল আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ বিরাজ করতে পারে. সংক্ষেপে বললে এ হল তার উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্তগুলির বিমূর্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। অতএব এই সমস্ত বিধান যেগুলি নিছক বুর্জোয়া সম্পর্ক প্রকাশ করে সেগুলির কোনওটাই আমাদের কাছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের চেয়ে পুরানো নয়, যেগুলি এতদিন পর্যন্ত গোটা ইতিহাসেই মোটামুটি চালু থেকেছে সেগুলি কেবল সেই সব সম্পর্ককেই প্রকাশ করে যেগুলি শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণী-শোষণ-ভিত্তিক সমস্ত সমাজেরই অভিন্ন শর্তাবলী।"(১)

প্রত্যেক বিধান নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করে এবং তার ক্রিয়ার ফলাফল সেই সব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এই পরিস্থিতি বা শর্তাবলী একটা গঠন থেকে আর একটা গঠনের ক্ষেত্রে তফাত হয় এবং বিভিন্ন দেশে নির্দিষ্ট রূপ নেয়।

ঠিক যেমন এক একটা দেশে ধনতন্ত্র সেই দেশের ঐতিহাসিক অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে (কম-বেশি পরিমাণে প্রাক-ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো সহ), সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রেও তা হয়। এই সমাজও আপন বিকাশে কিছু সাধারণ বিধান মেনে চলে প্রতি দেশের ঐতিহাসিক অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সেখানকার উৎপাদিকা শক্তির ও সংস্কৃতির স্তর অনুযায়ী) বিশিষ্ট দিক ও চরিত্র অর্জন করে। কিন্তু এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য আসল জিনিসটাকে প্রভাবিত করে না; অর্থাৎ এগুলি

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সহজাত সাধারণ বিধানগুলিকে বিলুপ্ত করে না ও করতে পারে না। ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের বিকাশের জন্য কোনও জাতীয় বিধান নেই, এমন বিধান নেই যা প্রত্যেক পৃথক দেশের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য; প্রত্যেকটি পৃথক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের বিধানগুলি সাধারণ সমাজতত্ত্বগত বিধানের সূত্রে যদিও নির্দিষ্ট, তবু সেগুলি নিজেরাও আবার একটা বিশিষ্ট গঠনের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মত এখানেও সাধারণ ও বিশেষের, আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ের দ্বান্দ্বিক ঐক্য আছে। এই ঐক্যকে অগ্রাহ্য বা লঙ্ঘন করলে, আন্তর্জাতিকের ক্ষতি করে জাতীয়ের উপর অতিরিক্ত জোর দিলে জাতীয়তাবাদী ঝোঁকে নিয়ে যেতে পারে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং তত্ত্বের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতাবাদী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে দেখতে ও বুঝতে হবে যে এইখানে একটা পার্থক্যসূচক সীমারেখা আছে।

৪. জনগণের সচেতন ক্রিয়াকলাপ এবং ইতিহাসে তার ভূমিকা। স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীতা

সামাজিক বিকাশকে একটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করার দরুন আমরা কি মানুষের সৃজনমূলক, বিপ্লবী রূপান্তরসাধক ক্রিয়াকলাপের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা যথাযথ উপলব্ধি লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করছি না? এ কি প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলির ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপ, ঐতিহাসিক উদ্যোগকে খাটো করায়, বিষয়ীগত উপাদানের ভূমিকাকে খাটো করায় নিয়ে যায় না? যারা ইতিহাসের বিষয়ীগত ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নেয় তারা প্রায়ই মার্কসবাদীদের অদৃষ্টবাদের দোষে দোষী করে। দক্ষিণ ও "বাম" উভয় প্রকারের সংস্কারবাদীরাই বর্তমানে সামাজিক বিকাশ ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ বিধানগুলি সম্বন্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার বিরোধিতা করে। বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদদের অনুসরণ করে তারা বলে থাকে যে এই শিক্ষা জনগণের স্বাধীন, উদ্দেশ্যময় ক্রিয়াকলাপকে খাটো করে দেখে, এ মানুষের মর্যাদাকে হীন করে, কাজেই এ মানবতাবাদ-বিরোধী। তারা দাবী করে যে এই শিক্ষা অর্থনৈতিক উপাদানকেই সর্বস্ব বলে মনে করে, আর "ভাবধারা, ও সামাজিক চেতনার

বিভিন্ন রূপ, যথা—দর্শন, নৈতিকতা, ধর্ম এ সব কিছুই নয় এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সবের কোনও তাৎপর্য নেই। মার্কসবাদের সমালোচকরা এইভাবে ব্যাপারটা উপস্থিত করে। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে তারা অর্থনৈতিক, বিকৃত.বস্তুবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। এই দুই ধারা কিন্তু আসলে মৌলিকভাবে পরস্পরের বিরোধী।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কোনও মতেই রাজনীতির, সামাজিক চেতনার, নানা ধরনের আত্মিক মূল্যবোধের তাৎপর্যকে অগ্রাহ্য করে না, বরং উল্টো, সামাজিক জীবনে এগুলির বিপুল ভূমিকাকে স্বীকার করে। প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি (যথা—বর্ণবৈষম্যবাদী মতাদর্শ ফ্যাশিবাদের নীতিসমূহ) অত্যন্ত নেতিবাচক ভূমিকা নেয়। এগুলি বিভিন্ন জাতির জীবনে অতি গুরুতর বিপর্যয় আনতে পারে ও আনে।

বিপরীত পক্ষে প্রগতিশীল, বিপ্লবী ভাবধারাগুলি (দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক) ও সেগুলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর্মনীতিসমূহ বিরাট ভূমিকা নিতে পারে, বিশেষত সেই সব ভাবধারা যখন জনগণের মধ্যে ব্যাপক হয়ে ওঠে, যখন জমায়েতকারী, সংগঠক ও রূপান্তরসাধক ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী পার্টিগুলি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নীতি বর্তমান স্তরে সেই রকম ভূমিকা নেয়।

সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদের মতই ঐতিহাসিক বস্তুবাদও দুটি বিরোধী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই রূপ নেয় ও বিকশিত হয়ে ওঠে। এই ঝোঁকগুলির প্রথমটি হল ইয়ং হেগেলিয়ানদের বিষয়ীবাদ এবং রাশিয়ায় নারোদনিক ও মাখপন্থীদের বিষয়ীবাদ এবং ট্রটস্কিপন্থী ও "বাম" কমিউনিস্টদের স্বেচ্ছাসেবাবাদ (voluntarism); দ্বিতীয়টি হল ভবিতব্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ যা জনগণের সচেতন, সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপকে খাটো করে দেখে (বুর্জোয়া বিষয়বাদ, অর্থনীতিবাদ, ধনতন্ত্র আপনাআপনি শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী তত্ত্ব, ইত্যাদি)।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বুর্জোয়া সমালোচকরা মার্কসবাদী পার্টিগুলির বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, বিশেষত ধনতন্ত্রের অবধারিত পতন সম্পর্কে তাদের শিক্ষার মধ্যে একটা বিরোধ আবিষ্কার

করার চেষ্টা করে। এইসব সমালোচকরা বলে যে যদি আমরা জানি যে চন্দ্রগ্রহণ অনিবার্য এবং কতকগুলি বিধান অনুযায়ী তা ঘটতে বাধ্য তাহলে এই রকম গ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য একটা পার্টি গড়ার কথা কেউ ভাববে না, কিন্তু মার্কসবাদীরা বলে যে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রকে সরিয়ে তার জায়গা দখল করবেই করবে, তবু তারা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক পার্টি তৈরি করে। উদাহরণ স্বরূপ এই যুক্তি বর্তমানে উপস্থিত করেছেন নয়া-কান্টপন্থী রুডলফ স্টামলার।

চন্দ্রগ্রহণ "সংগঠন করার জন্য" কিংবা বসন্ত বা গ্রীষ্ম আনার জন্য পার্টি তৈরী করা অবশ্যই মূর্খের কাজ ও অসম্ভব। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরার বা চাঁদের চলাফেরার ব্যাপারে মানুষের ক্রিয়াকলাপের কোনও অংশ নেই। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে এবং চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরত। কিন্তু ইতিহাস জনগণের দ্বারা এবং কেবল জনগণের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে। সামাজিক বিকাশের বিধানগুলি প্রকৃতির বিধানের মত নয়, সেগুলি মানুষের ক্রিয়াকলাপের বিধান। এই ক্রিয়াকলাপের বাইরে সেগুলির অস্তিত্ব নেই। সেই কারণেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসহ সকল সামাজিক বিপ্লব ঘটে কেবল সামাজিক বিকাশের বিধান-গুলির, বিশেষত শ্রেণী-সংগ্রামের বিধানগুলির ভিত্তিতে প্রগতিশীল শ্রেণী-সমূহের সংগ্রামের ফল হিসাবে। সামাজিক বিকাশের ও সামাজিক বিপ্লবের নীতিগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত সামগ্রিক ও প্রগাঢ় হবে শ্রমজীবী জনগণের চেতনা, সংহতি, ঐক্য ও সংগঠন তত দৃঢ়তর হবে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম তত সফল হবে, ইতিহাসের অগ্রগতি তত দ্রুততর হবে।

ঠিক যেমন প্রকৃতির বিধান ও প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের স্বত-স্ফূর্ত শক্তিগুলিকে বশে আনার সবচেয়ে বেশি সুযোগ দেয়, সামাজিক বিধানগুলি সম্পর্কে জ্ঞান তেমন সামাজিক বিকাশের শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার, সচেতনভাবে ইতিহাস সৃজন করার ও সামাজিক প্রগতির উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করার জন্য প্রগতিশীল শ্রেণীগুলিকে সুযোগ দেয়। সমাজ বিকাশের বিষয়গত বিধানগুলিকে জানলে প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলির পক্ষে সম্ভব হয় অন্ধভাবে ও স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ না করে তারা কি করছে সে বিষয়ে সজ্ঞানভাবে এবং সেই অর্থে আরও স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করা।

সমাজবিকাশের বিধানগুলি সাধারণত প্রবণতা হিসাবে কাজ করে। এগুলি বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, গাদা গাদা আকস্মিক ঘটনাবলীর জাল ভেদ করে, শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলি কর্তৃক সমর্থিত বিরোধী ঝোঁকগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে পথ করে নেয়। প্রগতিশীল শক্তিগুলি ও প্রবণতাগুলির জয় সুনিশ্চিত করতে হলে ওই সমস্ত শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলিকে পঙ্গু ও পরাস্ত করতে হয়।

বিভিন্ন প্রবণতা ও ঝোঁকের মধ্যে সংঘর্ষের মানে প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে একাধিক সম্ভাবনা থাকে। যেমন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা সব সময়ে থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যুদ্ধ বাধানোর স্বার্থান্বিত অনেক শক্তি বরাবর থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের মধ্যে সহজাত এই সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে আর একটা বাস্তব সম্ভাবনা আছে, সে হল শান্তি নিশ্চিত করার সম্ভাবনা। এর উদ্ভব হয় সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলি, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত শান্তিকামী শক্তির আন্দোলনের বৃদ্ধি থেকে।

অতএব ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও পূর্বনির্ধারণ একই জিনিস নয়। বস্তুগত বিধানগুলির ফল ও সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন ঝোঁকের কল্যাণে বাস্তব জীবনে কতকগুলি সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় কি না তা নির্ভর করে জনগণের ক্রিয়াকলাপের উপর, শ্রেণী-সংগ্রামের গতিধারার উপর।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার বিধানগুলি, সামাজিক বিকাশের বিষয়গত বিধানগুলি সম্পর্কে জ্ঞান জনগণের ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা থেকে তাদের মুক্ত করা দূরে থাকুক, এই বিধানগুলির রূপায়ণের জন্য তাদের তরফ থেকে সক্রিয় ও সচেতন ক্রিয়াকলাপ দাবি করে। প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শিক্ষা মানুষের ভূমিকা, তাদের সচেতন ক্রিয়াকলাপের ভূমিকাকে খাটো করে দেখে না, বরং প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়াকলাপ ও সংগ্রামের তাৎপর্যকে তুলে ধরে। এই সমস্ত বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞতা, সংগ্রামের বাস্তব পরিবেশ ও উপায়গুলিকে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে না পারা শ্রমজীবী জনগণকে, শ্রমিক-শ্রেণী ও তাদের

পার্টিগুলিকে হয় নিরাশা ও নিষ্ক্রিয়তা অথবা হঠকারিতা ও পরাজয়ের পঙ্কে নিয়ে ফেলে।

এইভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তার মধ্যেকার সম্পর্কের সমস্যা, স্বাধীন ইচ্ছা ও পূর্বনির্ধারণবাদের সমস্যা প্রভৃতি পুরানো দার্শনিক ও সমাজতত্ত্বগত সমস্যাবলীর মীমাংসা করে।

"স্বাধীনতা প্রাকৃতিক বিধানগুলি থেকে স্বাধীনতার স্বপ্নের মধ্যে নিহিত নয়, নিহিত এই সব বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের মধ্যে এবং এই জ্ঞান সেগুলিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়মিতভাবে কাজ করানোর যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করে তার মধ্যে। একথা বহিঃপ্রকৃতির বিধান এবং মানুষের শারীরিক ও মানসিক অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রক বিধান উভয় ক্ষেত্রেই সত্য—এই দুই শ্রেণীর বিধানকে আমরা চিন্তাতেই বড় জোর পরস্পর থেকে আলাদা করতে পারি; বাস্তবে নয়। কাজেই ইচ্ছার স্বাধীনতার মানে আর কিছুই নয়, বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা। কাজেই একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কে মানুষের বিচারের আধেয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয়তা যত বেশি ভূমিকা নেবে বিচার তত স্বাধীনতর হবে। অপর পক্ষে অজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অনিশ্চয়তা যা বহু ধরনের ও পরস্পর-বিরোধী সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে স্বেচ্ছাচারীভাবে বেছে নেয় বলে মনে হয়, তা এর ভিতর দিয়ে ঠিক এই জিনিসই দেখিয়ে দেয় যে এ স্বাধীন নয়, যে বস্তুটিকে এর নিজের নিয়ন্ত্রণ করার কথা ঠিক তার দ্বারাই এ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অতএব স্বাধীনতা নিহিত আছে নিজেদের উপর এবং বহিঃপ্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, এ এমন নিয়ন্ত্রণ যা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত; অতএব একে স্বভাবতই ঐতিহাসিক বিকাশের ফসল হতে হবে।"(১)

প্রকৃতির বিধানগুলি সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর বক্তব্য সামাজিক বিধান সম্বন্ধে, এবং সামাজিক জীবনে স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। সামাজিক বিধানগুলি যখন অজ্ঞাত থাকে এবং জনগণ যখন তার বিপক্ষে কাজ করে, তখন সেগুলি মানুষের বিরুদ্ধে বৈরীভাবাপন্ন স্বতস্ফূর্ত শক্তি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যখন আমরা এই সব বিধান ও তার চরিত্র জানতে পারি, যে পরিবেশে ও যে গতিমুখে সেগুলি কাজ করছে

১। এফ, এঙ্গেলস, অ্যান্টি ডুরেরিং, পৃষ্ঠা ১০৬-০৭।

তা জানতে পারি তখন আমরা সেগুলি আয়ত্ত করতে পারি ও সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারি। সমাজতন্ত্রের আমলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মানুষেরা; জনসাধারণ বিষয়গত বিধানগুলিকে ক্রমশ বেশি করে নিজেদের ইচ্ছার অধীন করতে পারে এবং ফলত নিজেদের লক্ষ্য আরও বেশি করে অর্জন করতে পারে।

মানবজাতির ইতিহাস অবশ্যই সর্বদা সরল, ক্রমোচ্চ ধারায় এগোয় না। কেবল অগ্রগতি নিয়েই যদি এ তৈরি হত তা হলে ব্যাপারটা অতিশয় রহস্যময় হয়ে উঠত। তবু এই ইতিহাসের পশ্চাদগতি ও সর্পিলতা সত্ত্বেও, যুদ্ধ ও বর্বরদের আক্রমণের মত ঐতিহাসিক বিপর্যয় সত্ত্বেও, শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের ক্ষয় ও পতন সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে দেখলে মানবজাতির ইতিহাস যুক্তিযুক্ত-ভাবে একটা ক্রমোচ্চ ধারা ধরেই, একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন থেকে আর একটায়, নিম্নতর থেকে উচ্চতরে এগিয়েছে।

ঐতিহাসিক নড়াচড়া নানা ধরনের, সমানভাবে চলে না। এর মধ্যে অনেক কিছু থাকে যা বিশিষ্ট, বিভিন্ন জাতির বিকাশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিপুল তাৎপর্য এখানেই যে এ আপাতদৃষ্টিতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ও অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও মানবজাতির বিকাশের চরিত্রায়ন করে যে সব প্রধান ও অত্যাবশ্যক জিনিস তার মধ্যে বিধান, নিয়মিতভাব ও পৌনঃপুন্য উদ্ঘাটিত করেছে।

মানব জাতির ইতিহাসের মধ্যে, সমাজের বিকাশের মধ্যে কি কোনও অর্থ আছে না কি এই চলাচলের চরিত্র প্রাকৃতিক শক্তির মত যেমন নদী গতিপথে যা কিছু পড়ে তাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ইতিহাসে স্বর্গীয় ভবিতব্যনির্ধারণ, পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচী অথবা বিভিন্ন জাতির অলৌকিক ভাগ্য প্রভৃতির মত বাইরে থেকে কোনও অর্থ আরোপিত হয় একথা স্বীকার করার অবশ্য কোনও ভিত্তি নেই। কিন্তু প্রত্যেক যুগে সমাজের ইতিহাসের আবার একটা নিজস্ব নির্দিষ্ট আধেয় আছে। বিভিন্ন জাতি ও প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলিই ইতিহাস সৃষ্টি করে, নতুন; অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অপরাপর সামাজিক সম্পর্কের পথ খুলে দেয় ও কতকগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সংগ্রাম করে। এই সব কর্তব্য সম্বন্ধে জনগণ কম-বেশি পরিপূর্ণ সচেতন

হতে পারে, অথবা সেগুলিকে রহস্যময়, ধর্মীয় বা কষ্টকল্পিত রূপে ভুলভাবে বুঝতে পারে। ইতিহাসের বিরাট উত্তরণশীল পর্যায়গুলিতে জনগণের, প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ নতুন নতুন তুঙ্গে ওঠে। কাজেই মানবজাতির ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্ত নয়, সামাজিক চেতনাও তাতে একটা ভূমিকা নেয়।

বর্তমান যুগের আধেয় হল সমাজতন্ত্রের শক্তি ও ধনতন্ত্রের শক্তির মধ্যে সংগ্রাম, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিপ্লবী উত্তরণ। শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের সক্রিয় সংগ্রাম ঐতিহাসিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। আর এই অগ্রগতি বহু বাধাবিঘ্ন, সুগভীর সংঘাত ও বিরোধ জয় করার ভিতর দিয়ে হয়, কাজেই এ সরল রেখায় চলে না। এখানেও আঁকা-বাঁকা ও পেছিয়ে যাওয়া আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দিকে এগোচ্ছে। আর এর মধ্যেই তার সুগভীর অর্থ নিহিত আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈষয়িক উৎপাদন সমাজ-জীবনের ভিত্তি

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিষয়বস্তু হল মানবসমাজ এবং সমাজ-বিকাশের অতি সাধারণ বিধানসমূহ। সমাজ-জীবনে বৈষয়িক উৎপাদনের ভূমিকা নিরূপণ করাই ছিল এইসব বিধানগুলি আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপ। এ কথা সহজেই বোধগম্য যে মানব-জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সামগ্রী উৎপাদন করা ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই প্রতিজ্ঞাটি সহজবোধ্য এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের আমলের আগেই সমাজ-বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস সেখানে থামেননি, তাঁরা আর এক ধাপ এগোলেন, আর তা বিজ্ঞানে এক বিরাট আবিষ্কার হয়ে দাঁড়াল। এই আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন পদ্ধতির উপর সকল সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থা নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরশীলতা বিধিশাসিত।

উৎপাদন প্রক্রিয়াতে মানুষ শুধু বৈষয়িক উৎপন্ন সৃষ্টি করে না, উৎপাদন মানুষকে শুধু জীবিকার উপকরণই সরবরাহ করে না। বৈষয়িক উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ তাদের নিজেদের সামাজিক সম্পর্কগুলির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ঘটায়। সামাজিক উৎপাদন, তার কাঠামো, উৎপাদনের উপাদানসমূহ এবং তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের জীবনে যে সুগভীর সামাজিক পদ্ধতি চালু রয়েছে তার উদ্ঘাটন সম্ভবপর করে তোলে।

১. সমাজ ও প্রকৃতি, এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া

বৈষয়িক উৎপাদন সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামো ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অর্থাৎ চতুর্দিকস্থ প্রকৃতির সঙ্গে তার আন্তঃ-সম্পর্ক এই উভয়েরই

ব্যাখ্যার মূলসূত্র যোগায়। উৎপাদন হল মূলত সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। পারস্পরিক ক্রিয়ার এই প্রক্রিয়ায় মানুষ চারিদিককার প্রকৃতি থেকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণ করে। একই সঙ্গে আবার শ্রম ও উৎপাদন হল মানুষের নিজের একটি সামাজিক সত্তা হিসাবে গঠিত হবার ও প্রকৃতি থেকে উত্থিত হবার ভিত্তি।

দা পার্ট প্লেড বাই লেবার ইন দা ট্রানজিশন ফ্রম এপ টু ম্যান (বানর থেকে মানুষে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা) নামকপুস্তকে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে শ্রম হল মানুষের বিবর্তনের চালিকা শক্তি ও ভিত্তি। এই প্রতিজ্ঞাটিকে অবশ্য এমন অতি সরলীকৃতভাবে উপলব্ধি করলে চলবে না, যাতে মনে হতে পারে যেন মানুষের আগেই কাজের অস্তিত্ব ছিল।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুরুতে পশুর শিকার হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য অথবা নিজেদের জন্য পশু শিকারের উদ্দেশ্যে হাতের কাছে সাধারণ যা কিছু জিনিস পেত তাই ব্যবহার করত। তাদের ঐ সব কার্যকলাপ তখনও পর্যন্ত শ্রমের সেই-সব আদিম স্বতঃপ্রবৃত্ত রূপের "বিভাগে পড়ত যা আমাদের শুধু জন্তুর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।"(১) কিন্তু মানুষের পূর্বপুরুষদের এই আদিম কার্যকলাপই মানুষের শ্রমের এমন একটি রূপের বিকাশের শুরুকে চিহ্নিত করেছিল যা পরে মানুষের একটি অনন্য সম্পত্তি হয়ে উঠল।

প্রকৃতি থেকে পাওয়া জিনিসের সাধারণ ব্যবহার (যা কখনও কখনও জন্তুর মধ্যেও দেখা যেত) থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছোটখাট যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শুরু করল এবং তাই হল মানব-শ্রমেরই আবির্ভাবের অত্যাবশ্যক উপাদান। শ্রম-ক্রিয়াকলাপের দুটি নিয়ামক ফলাফল দেখা দিল। প্রথমত, মানুষের পূর্বপুরুষের দেহযন্ত্র শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গেই খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করল না, সেই সঙ্গে শ্রম-ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও খাপ খাইয়ে নিল। মানুষের শারীরিক সংগঠনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যথা সোজা হয়ে হাঁটা, সামনের ও পিছনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের পার্থক্য ঘটা, হস্ত ও মস্তিষ্কের বিকাশ শ্রম-ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে দেহযন্ত্রের খাপ খাইয়ে নেবার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, শ্রম-ক্রিয়াকলাপ

১। কে মার্কস, ক্যাপিটাল, ভল্যুম ১, পৃঃ ১৭৮।

যেহেতু সমন্বিত কার্যকলাপ বোঝায়, তাই শ্রম পারস্পরিক যোগাযোগ এবং শ্রম-সংক্রান্ত সামাজিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সোচ্চার কথাবার্তা ও ভাষার উদ্ভব ও বিকাশকে উৎসাহিত করল।

মানুষের গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি হাতিয়ার নির্মাণ শুরু হওয়া দিয়ে চিহ্নিত : এ হল মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার স্তর (পিথেকঅ্যানথ্রোপাস ও নিয়ানডারথাল মানুষ)। অধুনিক প্রত্নতত্ত্ব অনুসারে চতুষ্পদ (কোয়াটারনারি) পর্যায়ের মধ্যেই প্রাচীনতম পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে। মানুষের প্রাচীনতম পূর্ব-পুরুষ পিথেকঅ্যানথ্রোপির (বানর-মানুষ) অবশেষও এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত (প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে)। এর দ্বারা শ্রমের বিকাশ ও মানুষের ক্রমবিকাশের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় প্রধান গুণগত পর্যায় হল প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে প্যালিওলিথিক যুগে (প্রস্তর-যুগের গোড়াতে) নিয়ানডারথাল মানুষের (১৮৫৭ সালে রেনিশ প্রাশিয়ার নিয়ান-ডারথাল-এ প্রাপ্ত খুব নীচু ধরনের মাথার খুলিবিশিষ্ট মানুষ) জায়গায় আধুনিক ধরনের মানুষ (হোমোস্যাপিয়েন—বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টির পর্যায়। নিয়ানডারথাল মানুষের চেহারায় তখনও অতীতের বানরদের বহু বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট ছিল। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে আর মানুষের দৈহিক আকৃতির ধরনের মধ্যে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। এই স্তরে উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বড় বড় পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলি হল পাথর, হাড় ও শিং থেকে শ্রমের নানাবিধ হাতিয়ার তৈরি। মানুষ ও তার শ্রমের হাতিয়ারের বিবর্তনের পর্যায়গুলি একই সঙ্গে আবার মানব সমাজের আদিম রূপ অর্থাৎ ট্রাইবাল সমাজ গঠনের পর্যায়। মানুষ একটি সামাজিক সত্তা, কোনও দিনই সমাজের বাইরে বা সমাজ গঠিত হবার আগে তার অস্তিত্ব ছিল না এবং আবির্ভাব ঘটাও সম্ভব ছিল না। আর মানুষ সৃষ্টি হবার আগে সমাজেরও আবির্ভাব ঘটতে পারে না, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের নতুন রূপগুলি এই কারণেই বিকশিত হচ্ছিল যে মানুষের পূর্বপুরুষেরা মানুষ হয়ে উঠছিল।

নানারকম বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানুষকে জন্তু থেকে পৃথক করা যায়। এসবের মধ্যে অবশ্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল শ্রমের যন্ত্রপাতি

উৎপাদন,(১) সোচ্চার কথাবার্তা এবং বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা। এর মধ্যে আবার প্রথমটি হল মুখ্য। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে মানুষেরা :"...তাদের জীবিকার উপাদান উৎপাদন শুরু করার পর থেকেই নিজেদের জন্তু থেকে পৃথক করতে শুরু করে...।"(২)

খুব সাধারণভাবে ধরলে বলা যায় যে মানুষ জীবনধারণের উপকরণ অর্থাৎ খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ও উৎপাদন করার জন্য প্রাকৃতিক সামগ্রী ও শক্তিগুলিকে যেভাবে কাজে লাগায়, তাই হল উৎপাদন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া মানে একথা ধরে নিতে হবে যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অথবা শ্রম এমনভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে যা শ্রমের বস্তুগুলিকে রূপান্তরিত করছে। মানুষের কার্যকলাপের সহজাত রূপগুলির সংগে মানবশ্রমের বৈসাদৃশ্য এই যে মানব-শ্রম কথাটির প্রকৃত অর্থ হল উদ্দেশ্যময় ক্রিয়াকলাপ এবং যার ফলে এমন জিনিস তৈরি যাকে মার্কস বলেছেন যে আগে থেকেই মানুষের চিন্তায় ছিল, অর্থাৎ কল্পনায় ছিল। মৌমাছিরা খুবই দক্ষতার সঙ্গে মৌচাক বানায়। এই মৌমাছিদের আচরণের সঙ্গে তুলনা করে মার্কস বলেছেন যে সবচাইতে নিকৃষ্ট স্থপতিও সবচাইতে ভালো মৌমাছি থেকে এই কারণে উন্নত যে, সে যে বাড়ি তৈরি করে তা আগে থেকেই কল্পনায় তৈরি করে নেয়।

শ্রমের বস্তুকে প্রভাবিত করার মত সময়োপযোগী উপকরণের অর্থাৎ হাতিয়ারের সাহায্যে শ্রম-ক্রিয়া হয়ে থাকে। এই হাতিয়ারগুলি মানবশ্রমের অপরিহার্য উপাদান।

জন্তুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল আশু ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ, এর জন্য তারা স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নখ, দাঁত ইত্যাদি ব্যবহার করে। হাতিয়ার এ থেকে শ্রমের উপকরণের সাহায্যে সংঘটিত মূলত মানব ক্রিয়াকলাপে উত্তরণ করে দেয়। শ্রমের উপকরণগুলি যেন মানুষের স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যংগের মতই কাজ করে চলে, তবে সেগুলির কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়।

১। বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনের সূত্র অনুযায়ী মানুষ "হাতিয়ার নির্মাণকারী জন্তু"। মার্কস একথা ক্যাপিটাল-এ উদ্ধৃত করেছেন। (কার্ল মার্কস এর ক্যাপিটাল, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৭৯ দেখুন।

২। কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দা জার্মান ইডিওলজি, পৃষ্ঠা ৩১।

রুশ জীববিদ্যাবিদ তিমিরায়াজেভ জড় প্রকৃতির সঙ্গে তুলনায় জীব-দেহের জৈবকাঠামোর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট নিরূপণ করে লিখেছেন ঃ "স্ফটিক বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত, জৈবকাঠামো শব্দটিই বোঝায় যে এর অংশগুলি হল অংগপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি।"(১) সমাজকে একটি সামাজিক জৈব কাঠামো রূপে বর্ণনা করা যায়। জীবদেহের জৈবকাঠামোয় স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি ব্যবস্থা রয়েছে, এইগুলি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কাজ করে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ ও মানব-সমাজের বিকাশের সংগে জড়িত হল কৃত্রিম অংগপ্রত্যাঙ্গের অর্থাৎ হাতিয়ার বা শ্রমের উপকরণের উন্নয়ন।

মানুষের বিকাশ মূলত তার সামাজিক অঙ্গপ্রত্যংগের অর্থাৎ শ্রমের উপকরণের পরিবর্তনের মধ্যে প্রকাশিত হয় বলে তার কোনও স্বাভাবিক সীমা নেই। লুদভিগ্ নোয়রের মতে শ্রমের হাতিয়ার বা উপকরণগুলি "...অসংখ্য অত্যন্ত বৈশিষ্টমূলক কাজ করে, আর একাজ করে এর দরুন জীবদেহে কোনও পরিবর্তন না ঘটিয়ে অথবা তাকে অন্য কাজ করতে অক্ষম না করে।"(২) জন্তুর সংগে মানুষের বৈসাদৃশ্য এই যে মানুষের শ্রম প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিককে প্রভাবিত করে, তাকে পরিবর্তন করে ও নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে খাপ খাইয়ে নেয়।

উপসংহারে বলা যায় যে মানব শ্রম এমনকি সর্বাপেক্ষা উন্নত জন্তুদের ক্রিয়াকলাপ থেকেও নিম্নোক্ত কারণে পৃথক। প্রথমত, জন্তুদের যে বৈশিষ্ট্যের দরুন তারা প্রকৃতির সংগে নিজেদের শুধু খাপ খাইয়েই নেয়, তার জায়গায় মানব-শ্রম প্রকৃতির উপর সক্রিয় প্রভাব খাটায়, দ্বিতীয়ত, মানব-শ্রমের মধ্যে ধরে নেওয়া হয় উৎপাদনের উপকরণগুলির প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যবহার ও সর্বোপরি সেগুলির উৎপাদন; তৃতীয়ত, শ্রমের অর্থই হল উদ্দেশ্যময়, সচেতন ক্রিয়াকলাপ; চতুর্থত, শুরু থেকেই শ্রম চরিত্রের দিক থেকে সামাজিক এবং সমাজের বাইরে তার অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না।

১। কে, এ, তিমিরায়াজেভ, ওয়ার্কস, ভল্যুম ৫, মস্কো ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ১১১। (রুশভাষায়)
২। লুদভিগ্ নোয়রে—দাস ভেরখ জয়েক মাইনংস্ ভিয়েমার ১৮৮০ পৃষ্ঠা ১৮০।

এই সব কারণেই সামাজিক বিকাশ জীবদেহের বিকাশের থেকে স্বতন্ত্র। জীবদেহের কাঠামোর কোনও মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই মানুষ একটি সামাজিক সত্তা হিসাবে বিকশিত হয়। এই কারণেই এই উভয় প্রক্রিয়ার চরিত্র ও বিকাশের হার পৃথক। একটি স্তরের মতোই সামাজিক জীবনে এমন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যে সময়কাল জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাবার পক্ষে নিতান্ত অপর্যাপ্ত (অবশ্য মানুষের কার্যকলাপের দরুন প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটে তা ধরা হয়নি)।(১) উপরন্তু জীবদেহের কয়েকটি অংশ যেহেতু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, তার জন্য জীবদেহের দৈহিক বিকাশ মন্থর হবার প্রবণতা দেখা যায়। অপরপক্ষে সমাজের বিকাশের গতিপথ আঁকাবাঁকা হলেও অথবা তাতে সাময়িক কোনও পশ্চাদপসরণ ঘটলেও সাধারণভাবে তার গতিধারায় অতি-বৃদ্ধিরই প্রবণতা প্রকাশ পায়।

জীবদেহের ক্রমবিকাশের তুলনায় সমাজ বিকাশে ধারাবাহিকতার নতুন ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটার দরুনই বহুলাংশে এই গতিবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে। জৈব জগতে তথ্য সঞ্চয় ও তা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে সঞ্চার প্রধানত ঘটে বংশধারার ব্যবস্থার মারফত। এই বংশধারাই সহজাত প্রবৃত্তি ভিত্তি রচনা করে। উঁচু জাতের জন্তুদের মধ্যে মাতাপিতা কর্তৃক সন্তানসন্ততিদের বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্য শেখানর মধ্য দিয়েও তা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। সামাজিক জীবনে প্রতিটি প্রজন্মের পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া উৎপাদনের উপকরণগুলি এবং সেই সঙ্গে ভাষা, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে মূর্ত সামাজিক অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতাও বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। জৈব প্রক্রিয়ায় গুণাবলীর সঞ্চার যেখানে বংশধারার যন্ত্রে (অর্থাৎ জিন বা বংশাণুগুলিতে) সঞ্চিত করা যায় যে তথ্য তার দ্বারাই সীমাবদ্ধ, সামাজিক অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার সেখানে নিরন্তর ঘটে ও তার কোনও সীমা নেই। খুব সাধারণ

১। ব্রিটিশ মার্কসবাদী জন লুইস কথাটা প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ করেছেন: "কেবল প্রজন্মগত পরিবর্তনের মারফত জীবদেহগত বিবর্তনের যা অর্জন করতে পাঁচ কোটি বছর লেগেছিল উড়তে শেখায় আমরা পঞ্চাশ বছরে তাতে পৌঁছে গেলাম।" (জে লুইস ম্যান অ্যান্ড এভলিউশন, লন্ডন, ১৯৬২ পৃষ্ঠা ৪৯)।

অর্থে দেখলে সংস্কৃতি হল এই অভিজ্ঞতার মূর্ত রূপ এবং মানব ইতিহাসের গতিপথে সৃষ্ট বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যবোধের সমষ্টি। প্রতিটি প্রজন্ম সংস্কৃতিকে নব নব সাফল্যে সমৃদ্ধ করে। জীবজগতে যেখানে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে স্বতস্ফূর্তভাবে ও অচেতনভাবে, সেখানে মানব-সমাজের ইতিহাসের গতিপথে তার বৈষয়িক জীবনের অবস্থাকে সচেতনভাবে ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তন করার ও প্রকৃতির সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার অনেক বেশি সামর্থ্য থাকে।

প্রতিটি বৈষয়িক ব্যবস্থায় একথা ধরে নিতে হবে যে তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্ক আছে। সামাজিক জীবনের বিশেষ চরিত্র উৎপাদন অথবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। সামাজিক সম্পর্কগুলির সকল রূপই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্ভূত মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কগুলির অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং সামাজিক জৈবকাঠামোকে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত করে ও ঐক্যবদ্ধ করে।

গুণগতভাবে নতুন সম্পর্কের কতকগুলি রূপ সামাজিক জৈবকাঠামোকে গঠন করে এবং তার বিকাশের ক্ষেত্রে তদনুযায়ী নির্দিষ্ট বিধান থাকে যা জীবজগতের বিধানগুলি থেকে ভিন্ন ধরনের। মার্কস ও এঙ্গেলসই সামাজিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় জৈবিক বিধানগুলির প্রয়োগ যে ভ্রান্ত তা দেখিয়েছিলেন। প্রকৃতির অপরাপর বিধানগুলির মত জৈবিক বিধানগুলি সামাজিক ঘটনাবলীর বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে না। সমাজ তার নিজস্ব বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও অপরাপর বিধান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সমাজের বিকাশ ঘটে। কয়েকটি প্রাকৃতিক পূর্বশর্ত ছাড়া সমাজের বিকাশ কল্পনাই করা যায় না। এসবের মধ্যে প্রধান হল সমাজের চারিপাশের প্রাকৃতিক অবস্থা, সাধারণত যাকে বলা হয় ভৌগোলিক পরিবেশ,(১) এবং যাদের নিয়ে জনসমষ্টি গঠিত হয় সেই জনগণের সংগঠন।

১। ভৌগোলিক পরিবেশের ধারণা অবশ্যই গোটা প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে না, প্রকৃতি অসীম, অন্তর্ভুক্ত করে প্রকৃতির সেই অংশকে যা সমাজকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত

সমাজ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রকৃতি-প্রাধান্যমূলক তত্ত্ব এই সব প্রাকৃতিক পূর্ব-শর্তগুলির উপর ইতিহাসের নিয়ামক ভূমিকা আরোপ করার চেষ্টা করে। এইভাবে ভৌগোলিক অদৃষ্টবান-এর প্রবক্তারা (ফরাসী দার্শনিক চার্লস মন্তেসকু, ইংরেজ ঐতিহাসিক হেনরী টমাস বাকলে, ফরাসী ভূতত্ত্ববিদ এলিজি রেকলুজ ও অন্যান্যেরা) বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও বিভিন্ন জনগণের ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হিসাবে তারা যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে তার প্রভাবকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বাস্তবে অবশ্য একই ধরনের ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে একেবারে ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে একই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় (উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন সময়ে ট্রাইবাল ব্যবস্থা দেখা গিয়েছে)। সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ঐতিহাসিক পরম্পরা ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের উপর আরোপ করা যায় না। পরিবেশের পরিবর্তনের তুলনায় এই পরম্পরা যদি অনেক দ্রুততরও ঘটে তা হলেও প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সমাজের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল নয় বলেই ওইভাবে আরোপ করা যায় না।

সমাজ-বিজ্ঞানে প্রকৃতি-প্রাধান্যমূলক তত্ত্বের প্রধান পদ্ধতিগত ভুল এই যে তারা সমাজ-বিকাশের উৎসকে সমাজের বাইরের একটা কিছু বলে দেখেন। সমাজের যে কোনও উন্নয়নশীল ব্যবস্থার উপর বাইরের পরিবেশের প্রভাব অবশ্য অস্বীকার করা যায় না অথবা খাটো করে দেখা যায় না। কিন্তু এই ধরনের একটি ব্যবস্থার পরিবর্তন কেবল পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের ছাপ নয় অথবা তার প্রভাবের নিষ্ক্রিয় ফলাফল নয়। প্রতিটি ব্যবস্থায়

করে, যা মানব-জীবন ও মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে। কিছু কিছু লেখক ভৌগোলিক পরিবেশকে প্রকৃতির সেই ক্ষেত্র বলে ব্যাখ্যা করেন যা সমাজের দ্বারা পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়। পরে আমরা দেখতে পাব যে মানুষকে ঘিরে থাকে প্রকৃতির যে অংশ তা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ছাপ বহন করে, কিন্তু মানুষের জীবন প্রকৃতির সেই সব শক্তি দ্বারাও প্রভাবিত হয় যেগুলি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে (যথা—সৌর বিকীরণ, পৃথিবীর ভিতরকার এনার্জির ধারকগুলি, যা ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণের নড়াচড়ার মধ্যে উদঘাটিত হয়, ইত্যাদি)।

বিকাশের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ যুক্তিসিদ্ধ ধারা আছে এবং ব্যবস্থাটি আবার পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভাব খাটায়।

আমরা যদি ব্যবস্থাগুলির আধুনিক বিন্যাস গ্রহণ করি তবে সমাজকে তথাকথিত খোলা ব্যবস্থার অন্যতম বলে গণ্য করা যায়, যা তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শুধু শক্তি বিনিময় করে না, সেই সঙ্গে জড় পদার্থও বিনিময় করে। মার্কস দেখিয়েছেন যে, সমাজ প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত বিপাক (metabolism) ঘটে, প্রতিনিয়ত পদার্থের বিনিময় চলে, এবং তা হয় শ্রম ও উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ থেকে মানুষ তার পুষ্টির উপকরণ এবং ব্যবহারযোগ্য জিনিস তৈরির জন্য কাঁচা মাল আহরণ করে। খনিজ সম্পদ তাকে উৎপাদনের উপকরণ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দেয়। উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত হয় শক্তির বিভিন্ন উৎসের ব্যবহার : প্রথমে মানুষের নিজস্ব শারীরিক ক্ষমতা, যে সব জন্তুকে সে পোষ মানায় তাদের শক্তি, বাতাস ও জলশক্তি এবং শেষ পর্যন্ত বাষ্প, বিদ্যুৎ রাসায়নিক ও পারমাণবিক প্রক্রিয়ার শক্তি।

ভৌগোলিক পরিবেশ সমাজের বিকাশকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রভাবিত করে, কিন্তু মানুষের স্বভাব ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের উপর ভৌগোলিক অবস্থা কখনই প্রধান ভূমিকা নেয় না (যে কথা মন্তেসকু ও অন্যান্য ভৌগোলিক অদৃষ্টবাদীরা বলে থাকেন)। প্রধান বিষয় হল উৎপাদন ও আদান-প্রদানের অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রভাব খাটান। নিম্নতর সাংস্কৃতিক মানের পর্যায়ে যখন মানুষ মূলত তৈরি জিনিস সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকত, তখন তারা প্রকৃতি-দত্ত জিনিসপত্র, যথা—উর্বর জমি, মাছের প্রাচুর্য ইত্যাদির মত জীবন ধারণের প্রাকৃতিক উপকরণের উপরই বেশি গুরুত্ব দিত। উচ্চতর পর্যায়ে, যখন শিল্পের বিকাশ ঘটে তখন জলপ্রপাত, নৌচালনযোগ্য নদী, বন, ধাতু, কয়লা ও তেলের মত জীবনধারণের প্রাকৃতিক উপকরণগুলি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপের গতি অবশ্যই বিভিন্ন জাতির মধ্যে এক নয় এবং তা বহুলাংশে তারা যে ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করে তার উপর নির্ভরশীল। উত্তরাঞ্চলের আধা গ্রীষ্মমণ্ডলে, মেসোপোটেমিয়ার উর্বর এলাকায়, নীল উপত্যকা ইত্যাদির মত অঞ্চলে বসবাসকারী ট্রাইবগুলির

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ সুদূর উত্তর ও সুদূর দক্ষিণের পরিবেশের মধ্যে বসবাসকারী ট্রাইবগুলির তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত ঘটে।

একই সময়ে আবার উৎপাদনের বিকাশের অসম হার ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থা এবং বিভিন্ন লোকের মধ্যে সম্পর্ক কি আকার গ্রহণ করে তার সঙ্গে অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা বিচ্ছিন্নতা, তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান অথবা সংঘর্ষ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত।

ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রভাব সর্বদাই সামাজিক অবস্থার দ্বারা, মূলত উৎপাদনের বিকাশের স্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানুষ তার পারিপার্শ্বিকে প্রাপ্ত জিনিসপত্রকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে, ক্রমশই বেশি বেশি সামগ্রীকে উৎপাদনের আওতায় আনে, মানবজাতি প্রকৃতির নতুন নতুন ক্ষেত্রে (ভূগর্ভে ও সমুদ্রগর্ভে, বহির্বিশ্ব ইত্যাদিতে) প্রবেশ করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সেগুলিকে আয়ত্ত করে। এর অর্থ হল প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যাপক ও বহুমুখী হয়ে ওঠে।

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য কখনই তার গুরুত্ব হারাবে না ; এই সম্পদ যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিনিময় ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের ব্যাপক প্রসারের দরুন নিজ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অপর দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা সম্ভব হয়। যে সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নেই তারা যথেষ্ট উন্নত সাংশ্লেষিক জিনিসপত্র তৈরির শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারে। উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সমাজের নির্ভরশীলতা হ্রাস পেতে থাকে। সাংশ্লেষিক পদার্থের উৎপাদন প্রাকৃতিক কাঁচামালের উপর শিল্পের নির্ভরশীলতা হ্রাস করে, বহুদূর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার শক্তির উৎসের কাছে কলকারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।

অর্থনৈতিক যোগাযোগের প্রসার ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের দ্বৈত প্রক্রিয়া উভয়েই প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক অবস্থা যেখানে নিজে থেকে অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে পরিবর্তিত হয়, সেখানে মানুষ এই পরিবর্তনের হার তরান্বিত করতে

পারে, মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশে তার উৎপাদন ক্রিয়াকলাপের ছাপ থাকে।

পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে জীবন্ত জৈবকাঠামোগুলির ক্রিয়াকলাপের ফলাফল। এই সব ক্রিয়াকলাপের দরুনই; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে চুনা-পাথর, ডলোমাইট, মার্বল, কয়লা, পীট, উর্বর জমি ইত্যাদি তৈরি হয়। আকাদেমিশিয়ান ভেরনাদস্কির সৌরজগতের আবরণের মধ্যেকার জীবমণ্ডল (biosphere) সম্পর্কিত ধারণাতে পৃথিবীর উপরকার জীবনের সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত হল জৈবকাঠামো এবং সেই সব জড় পদার্থ, জীবন যা আয়ত্তে এনেছে ও রূপান্তরিত করেছে। পৃথিবীর উপর যদি জীবনের অস্তিত্ব না থাকত তবে তা চাঁদের মতই বন্ধ্যা দেখাতো। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৌর-জগতের আবরণের উপর "জীবনের চাপ" অপরিমেয়ভাবে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতকে প্রভাবিত করে, কোনও কোনও ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীকে নির্মূল করে এবং অপর অনেক উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রচলন ঘটায় বা পরিবর্তন সাধন করে। উদ্ভিদ জগতের এক বিপুলাংশকে মানুষ নতুন আকৃতি দিয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে মাত্র কয়েক রকমের আপেল পাওয়া যেত; এখন সেখানে দশ হাজারেরও বেশি রকমের আপেল পাওয়া যায়। বহু রকম উদ্ভিদের চাষের এলাকা মানুষের প্রভাবে প্রসারিত হয়েছে। আলু, যা প্রথম দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিস পর্বতমালার উপত্যকায়, ভুট্টা যা পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকায়, তরমুজ যা এসেছে আফ্রিকা থেকে এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া মানুষের প্রচেষ্টাতেই অপরাপর দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভূত্বকের উপর মানুষের প্রভাবের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভূতাত্ত্বিক শক্তিগুলির সঙ্গে তুলনা করা চলে। আকাদেমিশিয়ান ফারসম্যানের মতে ৫০০ বছরের মধ্যে মানুষ পৃথিবী থেকে ৫ হাজার কোটি টন কার্বন, ২০০ কোটি টন লোহা, ২০০০ কোটি টন তামা, ২০০০ কোটি টন সোনা ইত্যাদি আহরণ করেছে। আকাদেমিশিয়ান কালেস্নিক বলেছেন যে মানুষের উৎপাদন ক্রিয়াকলাপ প্রতি বছর ভূগর্ভ থেকে প্রায় ৫ ঘন কিলোমিটার

শিলাপাথর তুলে আনে। মানুষ মহাদেশগুলির মধ্য দিয়ে খাল কাটে এবং সাগর থেকে জমি উদ্ধার করে। মরুভূমিতে জল এনে, জলাভূমির জল শুকিয়ে নিয়ে এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে মানুষ এমনকি তার আবহাওয়া মণ্ডলেরও পরিবর্তন ঘটায়। মানুষের উৎপাদন ক্রিয়াকলাপের ফলেও অপ্রত্যক্ষভাবে আবহাওয়া প্রভাবিত হয়, কারণ তেল, কয়লা ও পীট জ্বালানির ফলে বছরে ১৫০ কোটি টন কার্বন বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। বাতাসে কার্বনের পরিমাণই হল পৃথিবীর উপরকার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপাদান।

সমাজের উপর প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণই স্বতস্ফূর্ত, কিন্তু প্রকৃতির উপর সমাজের প্রতিক্রিয়া সব সময়েই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সচেতন সংগ্রামের ফল। তাছাড়া প্রকৃতির অভিপ্রেত রূপান্তর ঘটাবার সময় মানুষের ক্রিয়াকলাপের অদৃষ্টপূর্ব ফলাফল দেখা যায়, ফলে কখনও কখনও প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। কার্ল মার্কস বলেছেন যে কৃষিকার্য যখন স্বতস্ফূর্তভাবে এগোতে থাকে এবং সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তখন তা পিছনে মরুভূমি রেখে যায়।(১) উদাহরণস্বরূপ, যত্রতত্র গাছ কেটে ফেললে নদীর প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়, খাদগুলিকে বিস্তীর্ণ করে ফেলে ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। প্রচুর পরিমাণ জমি ক্ষয়ে যায় ও চাষের অযোগ্য হয়ে ওঠে।

রাসায়নিক কীটনাশক ও আগাছা ধ্বংস করার ওষুধের ব্যবহার শুধু পোকামাকড় ও আগাছা ধ্বংস করে তা নয়, প্রায়ই তা বহু অন্য গাছ-গাছড়া ও জন্তুকে বিষাক্ত করে ফেলে।

সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাপারে সমসাময়িক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে সমগ্র ভূমণ্ডল মানুষের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে, মানুষ এমনকি ভূমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। মানুষ ভূত্বকে যা পাওয়া যায় তার প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসকে ও প্রাকৃতিক শক্তির প্রায় সকল উৎসকে কাজে লাগাচ্ছে।

কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপের পরিসর যত বাড়ে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের উপর নিয়ন্ত্রণবিহীন প্রভাবের বিপদ ততই বাড়তে থাকে।

১। কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস সিলেক্টেড করেসপনডেন্স্ পৃষ্ঠা ২৪৪ দেখুন।

মানুষের ক্রিয়াকলাপের এই উপজাত ফলের অন্যতম উদাহরণ হল প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যেকার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, শিল্প থেকে উপজাত আবর্জনা তেজষ্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি দ্বারা জল ও বাতাস দূষিত হওয়া, যা আবার মানুষের জীবনকেই বিপদাপন্ন করে তুলতে পারে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক জাঁ দোরস্ত তাঁর "প্রকৃতির মৃত্যুর পূর্বে" নামক গ্রন্থে লিখেছেন "...আপাত-বিরোধী বলে মনে হলেও প্রকৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আধুনিক কালের সব চাইতে জরুরী সমস্যা হল আমাদের নিজেদের হাত থেকে নিজেদের প্রজাতিকে বাঁচান। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নির্বোধ মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।"(১) তবুও এই বিপদের জন্য মানুষকেই শুধু দায়ী করা যায় না, কারণ এর জন্য দায়ী হল তার ক্রিয়াকলাপকে মুনাফা অথবা সংকীর্ণ উপযোগবাদ ও অদূরদর্শিতার অধীন করা।

সমগ্র সৌরজগতের পরিসরেই প্রকৃতির প্রক্রিয়াগুলির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার করা মানুষের পক্ষে ক্রমশই জরুরী হয়ে উঠছে এবং শুধু এর মারফতই মানুষ পৃথিবীর প্রকৃত প্রভু হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা সচেতন মানবিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সংগঠিত প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার মণ্ডলরূপে যে নুস্ফিয়ার বা যুক্তিমণ্ডল (গ্রীক শব্দ 'নুস' মানে যুক্তি থেকে) এর ধারণা উপস্থিত করেছেন তার মধ্যেও এই প্রয়োজনীয়তার কথা নিহিত আছে। ভেরনাদস্কি যাকে দেখেছিলেন "প্রধানত বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির অগ্রগতি এবং তার ভিত্তিতে মানবজাতির সামাজিক শ্রম দ্বারা সৃষ্ট যুক্তিমণ্ডল"(২) হিসাবে বিংশ শতাব্দীর জীবমণ্ডল তাই হয়ে উঠছে। এই ধরনের একটি যুক্তিমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বশর্ত হল সকল দেশ ও মহাদেশ জুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার এবং তা ধনতান্ত্রিক সমাজের সাধ্যাতীত; আর তা অর্জন করতে হলে চাই উৎপাদনের উপকরণগুলির সামাজিক মালিকানা। এর জন্য আরও প্রয়োজন উৎপাদনের বিচক্ষণ ও কার্যকর পরিকল্পনা এবং দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা, যা এমনকি সমাজতন্ত্রের আমলেও আপনা থেকেই হয় না।

পৃথিবীর প্রকৃত প্রভু হতে হলে কিছুতেই খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না; প্রকৃতির রূপান্তর ঘটানর কাজটিকে সামগ্রিকভাবে একটি অখণ্ড কাজ হিসাবে দেখতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে বলা হয়েছে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত দ্রুত অগ্রগতির অবস্থার মধ্যে এই অগ্রগতি যাতে বাতাস ও জল দূষিত হওয়ার ও জমি ক্ষয় হওয়ার মারাত্মক বিপদের উৎসে পরিণত না হয়, তার জন্য সব কিছুই করতে হবে এবং তার সংগে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির প্রতি মিতব্যয়ী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্তর, সামাজিক ব্যবস্থার চরিত্র এবং সমাজ ও জনগণের নিজেদের বিকাশের স্তরের উপর।

মূলত ঐ একই নীতি মানুষের ইতিহাসের অপর একটি প্রাকৃতিক পূর্ব-শর্তের পক্ষে সত্য—তা হল মানুষের দৈহিক কাঠামো ও তার জৈবিক গুণাবলী।(১) এই সব জৈবিক গুণাবলীর জন্যই তার খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু যে উপায়ে সে তার এই প্রয়োজন মেটায় তা জৈবিক পরিস্থিতি দ্বারা নির্ধারিত হয় না, হয় সামাজিক অবস্থা দ্বারা। মানুষের জৈবিক গুণাবলী অনুযায়ী প্রজনন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ঘটে, তথাপি জনসংখ্যার বৃদ্ধি মূলত একটি সামাজিক ঘটনা এবং তা সমাজের বিকাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রকৃতি-প্রাধান্যবাদীদের দৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সমাজ-বিকাশের বিধান নিরপেক্ষ একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। তারা এমনকি এও মনে করে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই ঐ বিকাশকে নির্ধারিত করে। উপরন্তু, কিছু সমাজতত্ত্ববিদ একে একটা ইতিবাচক উপাদান হিসাবে দেখে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এমন একটি ঘটনা হিসাবে গণ্য করে যা মানুষকে খাদ্য সরবরাহের

১। দা জার্মান ইডিওলজি বইতে মার্কস ও এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন যে ইতিহাসের প্রথম পূর্বশর্ত হল "জীবন্ত মানব ব্যক্তির অস্তিত্ব। কাজেই প্রথম যে তথ্য প্রমাণ করতে হবে তা হল এই সব ব্যক্তির শারীরিক সংগঠন এবং বাকি প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সেই অনুযায়ী সম্পর্ক।" (কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দা জার্মান ইডিওলজি, পৃষ্ঠা ৩১)।

নতুন নতুন উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত করে এবং এইভাবে উৎপাদনের বিকাশকে উৎসাহিত করে (উদাহরণস্বরূপ, রুশ সমাজতত্ত্ববিদ কোভালেভস্কির মতামত এই রকমই ছিল); অন্যান্যরা (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথিউজ এবং বর্তমান কালে তাঁর সমর্থক নয়া ম্যালথিউজবাদীরা) জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে সামাজিক বিপর্যয়ের এক উৎস হিসাবে দেখেন।

ম্যালথিউজের "বিধান" অনুযায়ী জীবিকার উপকরণগুলি যেখানে সমান্তর শ্রেণীর (অ্যারিথমেটিকাল প্রোগ্রেশন) ভিত্তিতে বাড়ে, সেখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় গুণোত্তর শ্রেণীর (জিওমেট্রিকাল প্রোগ্রেশন) ভিত্তিতে। জনসংখ্যা খাদ্য সরবরাহ থেকে বেশি দ্রুত হারে বেড়ে চলে এবং ম্যালথিউজ মনে করেন এই জন্যই আসে শ্রমজীবি জনগণের মধ্যে অনাহার, বেকারি ও দারিদ্র্য। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে শ্রমজীবি জনগণকে তাদের অবস্থা উন্নত করতে হলে তাদের পরিবারে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।(১)

বাস্তবে জনসংখ্যার ও জীবিকার উপকরণগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির হারের মধ্যেকার সম্পর্ক চিরকালের জন্য সত্য এমন কোনও ব্যাপার নয়। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা গঠনের সময়ে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল কৃৎকৌশলগত ভিত্তি ও বিকাশের মন্থরগতির দরুন উৎপাদিকা শক্তিগুলির উপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপ পড়ত এবং তার ফলে প্রায়ই বিপুল জনসংখ্যা দেশান্তরে যেত। অপরপক্ষে দ্রুত কৃৎকৌশলগত অগ্রগতির অবস্থায় জীবিকার উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে যথেষ্ট পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়। তা বোঝা যায় মাথা পিছু উৎপাদন বৃদ্ধি দেখে। ব্রাজিলের বিজ্ঞানী জুসে দা কাস্ত্রো কর্তৃক উদ্ধৃত পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৫০ সালের শেষ ভাগে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বছরে ১·৫ শতাংশ, সেখানে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ শতাংশ। কিন্তু এই সব গড় হিসাব থেকে খাদ্য সম্পদের খুবই অসম বন্টন বোঝা যায় না। এশিয়া ও পৃথিবীর অপরাপর অনেক দেশে কোটি কোটি মানুষ প্রয়োজন মত খাদ্য পাচ্ছে না। এসবের কারণ হল অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা, ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক

১। ম্যালথিউজের ভাবধারা পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধ, "বাড়তি জনসংখ্যার" নিধন ইত্যাদির পক্ষে যুক্তি হিসাবে।

কাঠামো এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কর্তৃক অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ।

উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলিতে জনাধিক্য উৎপাদিকা শক্তিগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে না, বরং উৎপাদিকা শক্তিই জনসংখ্যার উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং আপেক্ষিক বাড়তি জনসংখ্যা সৃষ্টি করে। মার্কস ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের মধ্যে জনসংখ্যায় এই বিধানই দেখেছিলেন।

ধনতন্ত্রের আমলে জনসংখ্যার সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে মার্কস যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা সমাজ বিজ্ঞানের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, উৎপাদনের প্রত্যেকটি ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত পদ্ধতির জনসংখ্যা সম্পর্কিত নিজস্ব নির্দিষ্ট বিধান আছে এবং চরিত্রের দিক থেকে তা ঐতিহাসিক। মার্কসের মতে—"শুধু উদ্ভিদ ও জন্তুদের জন্য জনসংখ্যার একটি বিমূর্ত বিধান আছে এবং তা থাকে শুধু ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ মানুষ তাদের উপর হস্তক্ষেপ করে না।"(১)

জনসংখ্যার আকার, তার বৃদ্ধি, ঘনত্ব এবং অঞ্চলগতভাবে তার অবস্থান সমাজের বিকাশকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশের উৎপাদনের প্রারম্ভিক সম্ভাবনা নিরূপণ করি, তখন আমাদের সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যা উভয়কেই হিসাবের মধ্যে রাখতে হয়। উপযুক্ত সংখ্যক মানুষ ও জনসংখ্যার ঘনত্ব ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগান অসম্ভব বা কঠিন হয়ে পড়বে (উদাহরণস্বরূপ সুদূর উত্তরের বহু অঞ্চলে ও মরুভূমিতে)।

একই সঙ্গে আবার কোনও সমাজ কত মানুষ নিয়ে গঠিত হয় তার প্রকৃত সংখ্যা উৎপাদনের বিকাশের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। নব-প্রস্তরযুগের গোড়ায় (অর্থাৎ প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে) যে সব আদিম ট্রাইবগুলো সব মহাদেশে ছড়িয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক লক্ষ। বর্তমান যুগের শুরুতে (খ্রীষ্টাব্দ) পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি থেকে ২০ কোটির মধ্যে এবং ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তা বেড়ে ৩০ কোটি হয়। তার পর থেকে জনসংখ্যা ১০ গুণেরও বেশি বেড়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হওয়া উৎপাদন পদ্ধতির অথবা জনগণের

১। কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, ভল্যুম-১, পৃষ্ঠা ৬৩২ দেখুন।

জীবনধারণের মানের পরিবর্তনের কারণ নয়; বরং তা এর একটি ফল। জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর অনুপাতের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করে। বহু সংখ্যক সামাজিক উপাদান দ্বারা ঐ প্রক্রিয়া দুটি প্রভাবিত হয়—সেগুলি হল অর্থনৈতিক সম্পর্ক, জীবনধারণের মান, আবাসগৃহের অবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকাশ, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি। জনসংখ্যার পুনরুৎপাদনের ধরনও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

উন্নত দেশগুলিতে বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: নীচু অথবা গড়পড়তা জন্ম-হার (প্রতি ১০ হাজারে ১৫ থেকে ২০ জন), নীচু মৃত্যু হার (প্রতি ১০ হাজারে প্রায় ১০ জন) ও দীর্ঘ আয়ু (৬৫ থেকে ৭৩ বছর) এবং ফলত এক প্রজন্মের জায়গায় আর এক প্রজন্ম আসার হার অপেক্ষাকৃত মন্থর। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশে জনসংখ্যার পুনরুৎপাদনের অন্য এক ধরন দেখা যায়: উচ্চ জন্ম-হার (প্রতি ১০ হাজারে ১৪ থেকে ৫০ জন), যথেষ্ট বেশি মৃত্যু হার (প্রতি ১০ হাজারে ২০ বা তার থেকেও বেশি), অপেক্ষাকৃত কম আয়ু (আফ্রিকার দেশগুলিতে গড়ে ৩৫) এবং প্রজন্মগুলির দ্রুত পর পর আসা।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিকাশের অসম স্তর, ঐতিহাসিকভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অবস্থা ও অপরাপর উপাদানের দরুনই এই পার্থক্য হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণ থেকে দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনসংখ্যার পুনরুৎপাদনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই ব্যবস্থা বেকারির অবসান ঘটায়, সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে কর্মে বিনিয়োগের উচ্চ মাত্রা চালু করে, এবং জীবনযাত্রার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের সুস্থিত বৃদ্ধির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। এই সব ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাফল্যের সঙ্গে একত্রে মৃত্যু-হার যথেষ্ট কমিয়েছে এবং আয়ু বাড়িয়েছে। মূলত স্বতস্ফূর্ত প্রক্রিয়া হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা অথবা তার বিপরীত করা অর্থাৎ জন্ম-হার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় নীতি, আইনগত ও অপরাপর ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে তাকে কম-বেশি প্রভাবিত করা যায়। নয়া ম্যালথিউজবাদীদের মতে—বর্তমান "জন্মসমষ্টির জন্মহারের বিস্ফোরণ" পারমাণবিক বোমা থেকে কম ভয়াবহ নয়। আমেরিকান

জীববিদ্যাবিদ পল এরলিখ ক্যান্সার রোগের দাবানলের মত বিস্তৃতির সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার তুলনা করেছেন এবং তাঁর মতে— আগামী দশ বছরের মধ্যে নতুন নতুন ব্যাপক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চল দেখা দেবে। অপরাপর ম্যালথিউজবাদীদের মত তিনিও অবশ্য দুর্ভিক্ষের সামাজিক কারণগুলি দেখতে চান না।

বৈজ্ঞানিক হিসাব থেকে দেখা যায় যে কৃষি-জমির পরিপূর্ণ ব্যবহার ও তার ক্রমবর্ধমান ফসল বর্তমান বিশ্বে যত লোক আছে তার দশগুণ বেশি লোকের জন্য খাদ্য সংস্থান করতে পারে। নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে সাগর ও মহাসাগরের বিপুল খাদ্যভাণ্ডারের ব্যবহার এবং রাসায়নিক উপায়ে খাদ্যবস্তুর সংশ্লেষ ব্যবস্থার আরও অগ্রগতি আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে খাওয়ানর সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এই সব সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়ণ জীবমণ্ডলকে আরও যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করার উপায় খুঁজে বের করার উপরই শুধু নির্ভর করে না, বরং সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান, বহু দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা দূরীকরণ এবং কোটি কোটি জনগণের উপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ণ ও শোষণের অবসানের উপর নির্ভর করে।

ম্যালথিউজবাদের সমালোচনার অর্থ এই নয় যে সাধারণভাবে সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার এবং যুক্তিযুক্ত পুনরুৎপাদন প্রতিষ্ঠা করার কোনও সমস্যা নেই। এঙ্গেলস স্বীকার করেছিলেন যে ভবিষ্যতে বিশ্বের জনসংখ্যা এমন বৃদ্ধি হবার বিমূর্ত সম্ভাবনা রয়েছে, যখন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে জনসংখ্যাকে রেখে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। "যদি কমিউনিস্ট সমাজের মানুষ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে ঠিক যেভাবে ইতিমধ্যে সে সমাজ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবে, সেই-ভাবেই ঐ সমাজ ও একমাত্র ঐ সমাজই কোনও অসুবিধা ছাড়াই তা করতে পারবে।"(১)

এ ধরনের কল্পনা করা ভুল হবে যে স্থান-কালের নির্দিষ্ট অবস্থা বিবেচনা না করে মার্কসবাদ সর্বদাই ও সর্বত্রই জন্ম-হার বৃদ্ধি দাবি করে। এই বিকৃত

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস সিলেক্টেড করেসপনডেন্স, পৃষ্ঠা ৩৩৫।

ধারণাটি ম্যালথিউজবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যেকার বিরোধের প্রকৃত চরিত্রকে বিকৃত করে। এই বিরোধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাবলী গ্রহণের যোগ্যতা স্বীকার বা অস্বীকার করা নিয়ে নয়, বরং সমাজের সমস্যাবলী সমাধানের সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি নিয়েই। ম্যালথিউজবাদীদের মতে— অনাহার ও মৃত্যুর কারণ হল জনসংখ্যার মাত্রাধিক বৃদ্ধি, আর মার্কসবাদীদের মতে অনাহার ও মৃত্যুর কারণ হল সেকেলে সামাজিক ব্যবস্থা ও প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের কম বিকাশ। প্রথমোক্তরা জন্ম-হার হ্রাসকে সমাজের সকল দুর্ভোগের সর্বরোগহর দাওয়াই হিসাবে দেখেন, আর শেষোক্তদের মতে—আধুনিক কালের জরুরী সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের প্রধান পথ হল ধনতন্ত্রের বদলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

সমাজের বিকাশকে তার নিজস্ব নিয়ম দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে হবে; সমাজের রূপান্তর ঘটানর মূল চাবিকাঠি সমাজের হাতেই রয়েছে। সমাজ-বিকাশের প্রকৃত আভ্যন্তরীণ কারণগুলি বুঝতে হলে সমাজের জীবন ও অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে বৈষয়িক উৎপাদনের ভূমিকা খুঁজে বের করতে হবে।

২. সমাজের উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদিকা শক্তিগুলির ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের স্থান

বৈষয়িক উৎপাদন সামাজিক জীবনের একটি ক্ষেত্র যেখানে বৈষয়িক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন এবং তারপরে গোটা সমাজ ভোগ করে, হয় নতুন উৎপাদনের জন্য, নয় ব্যক্তিদের ভোগের জন্য।

বিকাশের স্তর যতই উঁচু হোক না কেন, কোনও সমাজ উৎপাদন ছাড়া বাঁচতে পারে না ও তার বিকাশও ঘটে না। উৎপাদন যদি ক্ষণিকের জন্যও বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার ফলাফল একবার কল্পনা করলেই বোঝা যায়। রুটি, জুতো ও কাপড়ের কলগুলি চলবে না; রেলগাড়ি চলাচল করবে না; বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ ইত্যাদি থাকবে না। সহজেই একথা ধরে নেওয়া যায় যে উৎপাদন সম্পূর্ণ থেমে গেলে সমাজ অনিবার্যভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। উৎপাদন ছাড়া কোনও সমাজ থাকতে পারে না।

যদিও উৎপাদন সমাজ-জীবনের একটি স্থায়ী শর্ত, তথাপি সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে এবং মানুষের নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক ক্রিয়া চলে। পারস্পরিক সম্পর্কের এই দুই রূপেই হল যে কোনও নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত দিক। ফলত সাধারণভাবে উৎপাদন পদ্ধতির বিশ্লেষণের জন্য উৎপাদিকা শক্তিগুলি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলি কি এবং তারা কি ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তা বের করা অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন।

উৎপাদিকা শক্তিগুলি হল সেই শক্তি যার দ্বারা সমাজ প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে ও তাতে পরিবর্তন ঘটায়।

ঐ শক্তিগুলি প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ব্যক্ত করে। কিন্তু প্রকৃতিকে কখনই সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায় না। প্রকৃতি হল শ্রমের সর্বজনীন বিষয় (অব্জেক্ট)। মার্কস বলেছেন, শ্রম হল ঐশ্বর্যের পিতা ও প্রকৃতি হল মাতা। অবশ্য প্রকৃতির সব কিছুই শ্রমের আশু বিষয় নয়, শুধু সেই অংশটুকুই শ্রমের বিষয় যা উৎপাদনে নিয়ে আসা হয় এবং যতখানি মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

মানুষ প্রকৃতি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং শ্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করে, খনিজপদার্থ উত্তোলন শিল্প, অহল্যাভূমি কর্ষণ ইত্যাদি ছাড়া অন্য সব কিছু উৎপাদনই এমন সব বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাতে পূর্বেই শ্রম ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবেই যে ইস্পাত মেশিন-টুল নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, তা আগেই কারখানায় তৈরি করা হয়েছে। কাঁচামাল (উদাহরণস্বরূপ—তুলা, দানা শস্য, খনিজ আকর) এবং আধা-তৈরি সামগ্রী-গুলি শ্রমের মনুষ্যসৃষ্ট বিষয়। মানুষ প্রকৃতি থেকে শ্রমের জন্য শুধু তৈরি জিনিসই সংগ্রহ করে না, সেই সঙ্গে নিজের জন্য জিনিস তৈরি করেও নেয়। শিল্পের অগ্রগতির ফলে আরও বেশি নতুন নতুন বস্তুর ব্যবহার শুরু হয়। আধুনিক শিল্প বহুবিধ দুর্লভ ধাতু, নতুন নতুন মিশ্র ধাতু এবং নতুন ধরনের সাংশ্লেষিক জিনিস, যথা—প্লাস্টিক, সাংশ্লেষিক তন্তু ইত্যাদি ব্যবহার করে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ নতুন নতুন জিনিস মানুষের উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত করে।

শ্রমের উপকরণগুলি এমন জিনিস বা জিনিসের সমাহার যা মানুষের

শ্রমের বিষয় ও নিজের মধ্যে স্থাপন করে এবং উপকরণগুলি ওই বিষয়ের উপর মানুষের প্রভাবের সক্রিয় পরিবাহী যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। শ্রমের বিষয় ও উপকরণ অর্থাৎ শ্রম প্রক্রিয়ার বৈষয়িক উপাদান সামগ্রিকভাবে হল উৎপাদনের উপকরণ।

শ্রমের উপকরণগুলির গঠন খুবই বিভিন্ন ধরনের এবং এক যুগ থেকে অপর যুগে তা বদলে যায়। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে বর্তমানে মেশিন ও ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, উৎপন্নের পরিবহন, গুদামজাত করা ও অপরাপর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের বহু রকমের সহায়ক উপকরণ ব্যবহৃত হয়। কোনও একটি বিশেষ যুগে যে সব উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহৃত হয় এবং সে যুগে সবচেয়ে চলতি থাকে তার মধ্যে মার্কস প্রধানত মনোনিবেশ করেছেন সেই সব উপকরণগুলির উপর যেগুলি প্রকৃতির উপর মানুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিবাহী হিসাবে অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি হিসাবে কাজ করে। মার্কসের ভাষায় এইগুলিই হল উৎপাদন ব্যবস্থার অস্থি ও পেশী এবং প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের এবং মানুষের অর্জিত শ্রম-উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূচক। একই সঙ্গে আবার উৎপাদনের যন্ত্রপাতিগুলি সমগ্র প্রযুক্তিবিদ্যাগত সমাহারের অংশ মাত্র এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত ঝোঁকগুলির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হলে ঐ সমাহারের মধ্যে যে সব জটিল পারস্পরিক নির্ভরতা ও পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে সে সব বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

শ্রমের উপকরণগুলি উৎপাদনের বিকাশের ভিত্তি নির্ধারণ করে দেয়। "বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগের মধ্যে পার্থক্য যে জিনিসপত্র তৈরি হয়েছে তার দ্বারা বোঝা যায় না, বোঝা যায় কিভাবে সে সব তৈরি হল ও কি যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি হল তার দ্বারা।"(১) প্রত্যেকটি প্রজন্ম তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে শ্রমের যেসব উপকরণগুলি পায় সেই উপকরণগুলিই আরও বিকাশের পথে অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় এবং এই-ভাবেই তা ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্নতার ভিত্তি গঠন করে।

শ্রমের উপকরণগুলি তখনই সক্রিয় শক্তি হয়ে ওঠে যখন তা জীবন্ত শ্রম অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমেই কেবল শ্রমের বিষয়ের রূপান্তর সাধন করে।

১। কে. মার্কস ক্যাপিটাল, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৮০।

মানুষের অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উৎপাদন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য থাকার দরুন তারাই অন্যতম উৎপাদিকা শক্তি।

সার সংকলন করে বলা যায় যে সামাজিক উৎপাদিকা শক্তিগুলি হল সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সর্বোপরি শ্রমের যন্ত্রপাতি এবং সেই সঙ্গে জনগণ যারা ঐসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ও বৈষয়িক সামগ্রী উৎপাদন করে।

শ্রমের উপকরণগুলি যেহেতু প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয়, সেই কারণে উৎপাদিকা শক্তিগুলির মধ্যে তারা নির্ধারক উপাদান, তেমনি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রমজীবী জনগণই আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদিকা শক্তি। মানুষই মেশিন ব্যবহার করে, শ্রমের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে এবং উৎপাদন করে। শ্রমের উপকরণগুলি কি রকম কাজ করবে তা নির্ভর করে জনগণের নৈপুণ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর, মেশিনগুলিকে তারা কত সফলভাবে ব্যবহার করতে পারে তার উপর এবং এই সব মেশিনগুলিকে তারা কি পরিমাণে আয়ত্তে এনেছে তার উপর। একই সঙ্গে আবার মানুষের এইসব গুণই শ্রমের উপকরণগুলির প্রাপ্যতা এবং তারা কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে তার উপর নির্ভর করে। গাড়ি ছাড়া তার চালক থাকতে পারে না, বিমান ছাড়া বিমান-চালক থাকতে পারে না।

উৎপাদনের প্রযুক্তিবিদ্যার উপর মানুষের অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের এই নির্ভরতা হল বিষয়ের উপর বিষয়ীর এবং উৎপাদনের বৈষয়িক উপাদানের উপর ব্যক্তিগত উপাদানের নির্ভরতারই অভিব্যক্তি। কারিগর থাকার পর্যায়ে মানুষের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আকার গ্রহণ করে এবং এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত ঐতিহ্যের চরিত্র ধারণ করে। মধ্যযুগে কারিগরেরা তাদের আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতা গোপন রাখত এবং অপরিচিতদের দৃষ্টি থেকে তা সযত্নে সরিয়ে রাখত। এই পরিস্থিতিতে উৎপাদনের প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে কোনও পরিবর্তনকে উৎসাহ দেওয়ার বদলে শাস্তি দেওয়া হত এবং এইভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে বদ্ধ অবস্থাকে বাড়িয়ে তোলা হত।

মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন শুরু হবার পর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মেশিন নিয়ে কাজ করার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ক্রমশ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদল সাধারণ মজুর তার কোদাল ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খনন যন্ত্র চালাতে পারবে না, যদিও সে কোদাল দিয়ে যে কাজ করছিল খনন যন্ত্র সেই কাজ করবে। কিন্তু তাকে এই নতুন মেশিন চালাতে শিখতে হবে। একই সঙ্গে আবার মেশিন উৎপাদন, বিশেষত তার কয়েকটি রূপ (উদাহরণ স্বরূপ— নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরায় উৎপাদন) অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে।

মানুষ শ্রমের যে উপকরণগুলি তৎকালীন পাওয়া যায় শুধু তাই ব্যবহার করে না, সেই সঙ্গে নতুন উপকরণও সৃষ্টি করে। শ্রমের যন্ত্রপাতি হল মানুষের জ্ঞানের বাস্তবে রূপায়িত শক্তি। মানুষের অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা উৎপাদনের সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের জন্য, আবিষ্কারের কাজের জন্য এবং উৎপাদনকে যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার (র‍্যাশনালাই-জেশনের জন্য জরুরী। অপরাপর উপাদানগুলি একই থাকলে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ও তার সম্ভাবনাগুলির ব্যবহার মানুষের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং মানুষের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নয়ন হল শ্রম উপকরণগুলির উন্নয়ন এবং অনুরূপভাবে মানুষের নিজের তার সংস্কৃতি ও কৃৎকৌশলগত মানের উন্নয়ন। উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তর সামাজিক শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা দ্বারা নির্দেশিত হয়। শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান উপাদান হল আরও উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি, শ্রমের উপকরণ তৈরি অর্থাৎ কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি। তৎকালীন যন্ত্রপাতি ও শ্রমের উপকরণগুলির আরও উন্নয়ন, আরও বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ও নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাপ্রসূত নতুন নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণ, বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রের উন্নয়ন এবং অর্থনীতির সকল শাখাকে অনুরূপভাবে যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত করাই হল আসলে সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের প্রধান উৎস।

সমাজের অস্তিত্বের পর থেকে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিপুল উন্নতিসাধন হয়েছে। ঐতিহাসিক বিচারে খুবই আদিম পাথর, হাড়, কাঠের জিনিসপত্র অর্থাৎ পাথরের ছেনি ও সূচাল হাতিয়ার, লাঠি ও বর্শা এবং হাড়ের তৈরি

নানা ধরনের বাসনপত্র তৈরি করা ও ব্যবহার করা দিয়েই উৎপাদন শুরু হয়েছিল। আগুন কি ভাবে জ্বালাতে হয় ও তার ব্যবহার আবিষ্কার মানুষের বিকাশের প্রাথমিক স্তরের অন্যতম সাফল্য। এঙ্গেলস্-এর মতে—এই আবিষ্কার মানুষকে জন্তু-জগৎ থেকে চূড়ান্তভাবে পৃথক করল। মৃৎপাত্রের আবির্ভাব সমাজকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। তীর-ধনুক উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে মানুষের সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেল। এই ভাবে মানুষের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হল এমন সব আদিম হাতিয়ার যার সাহায্যে তারা শিকার, মাছ ধরা ও নানা জিনিস সংগ্রহ করতে সক্ষম হল। হাতিয়ারগুলি উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সেগুলিকে এক-একটা বিশেষ কাজে নিয়োগ করার ঝোঁক দেখা দিল। আদিম সমাজের একেবারে গোড়ার পর্যায়ে মানুষ কেবল শ্রমের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত, আর নিজের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি প্রকৃতি থেকে তৈরি অবস্থায় আহরণ করত (সংগ্রহ করে ভোগের অর্থ-নীতি), যার ফলে তারা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর খুব বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ত।

আদিম উৎপাদনের বিকাশে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল বেঁচে থাকার উপকরণগুলি সংগ্রহ করে ভোগ থেকে ওই উপকরণগুলির উৎপাদনে উত্তরণের ভিতর দিয়ে। এই উত্তরণ কৃষি ও পশু প্রজননের উদ্ভবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নব-প্রস্তরযুগে এই উত্তরণ ঘটে। ফলমূল সংগ্রহ করার মারফত কৃষির পথ প্রস্তুত হয় এবং পশু শিকার পশু প্রজনন প্রচলনে সাহায্য করে। লম্বা কাটার কোদাল দিয়ে একেবারে আদিম জমি চাষের পদ্ধতিতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের প্রয়োজন হত। কিন্তু এই চাষ ব্যবস্থা ছিল এক নতুন মৌলিক পদক্ষেপ, কারণ এর ফলে মানুষের পক্ষে একটি নতুন শক্তিশালী উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ মাটি ব্যবহার করা সম্ভব হল। কৃষি যন্ত্রপাতির বিকাশের ফলে লাঙ্গল এবং চাষ ও ফসল কাটার অপরাপর উপকরণের আবির্ভাব ঘটল। ধাতুর যন্ত্রপাতি—প্রথমে তামা ও ব্রোঞ্জ এবং পরে লোহা—ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আরও অগ্রগতি ঘটল। কৃষি, পশু প্রজনন ও ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতি উৎপাদনকে উচ্চতর স্তরে তুলে দিল। পশু প্রজনন ও জমি আবাদ, যন্ত্রপাতি ও কৃষিজ উৎপাদন, এবং পরবর্তীকালে মানসিক ও কায়িকশ্রমে সামাজিক শ্রম-বিভাগের ভিত্তি সৃষ্টি হল। লোকে আরও বেশি

উৎপাদন শুরু করল এবং ফলে সম্পদ সঞ্চয় করা সম্ভব হল। এসবের দরুন সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থা থেকে শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজে রূপান্তরের পথ প্রশস্ত হল। উৎপাদনের এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের সংস্কৃতিক বিকাশের জন্য লিখিত ভাষায় আবিষ্কারের বিপুল গুরুত্বও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শ্রেণীভিত্তিক সমাজে প্রথম কারিগরের যন্ত্রপাতির ভিত্তিতেই উৎপাদনের বিকাশ ঘটে। মার্কস এই ভিত্তিকে এই অর্থে রক্ষণশীল বলে বর্ণনা করেন যে কারিগরের যন্ত্রপাতি বিশিষ্ট ধরনের এবং এমন রূপ ধারণ করতে পারে যা তার বিকাশকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, ছুরি, কুঠার, বেলচা ও লম্বা বাঁটের কোদাল কিছু পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগান যেতে পারে, কিন্তু তা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। অবশ্য এই যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ঘটল ও সেই ভিত্তিতে উৎপাদনও বিকশিত হল এবং বিভিন্ন ধরনের শাখায় সৃষ্টি হল।

জন্তু-জানোয়ারদের দৈহিক শক্তি ছাড়াও জল ও বায়ুর (যথা—বায়ু-চালিত কল, জলচালিত চাকার) শক্তি ব্যবহৃত হল এবং আরও জটিল যন্ত্রপাতির প্রচলন হল। মানবজাতির ভাণ্ডারে আরও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সঞ্চিত হল যা প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল; সেগুলি হল যান্ত্রিক ঘড়ি, বারুদ, কাগজের উৎপাদন ও ছাপাখানা, দিগদর্শন যন্ত্র ইত্যাদি। এই সবই উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে এক গুণগত উল্লম্ফনের জন্য অর্থাৎ মেশিন উৎপাদনের আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করল।

অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে হস্তশিল্পশালায় উৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচার) মেশিনের আবির্ভাবের জন্য আশু কৃৎকৌশলগত পূর্বশর্ত যোগাল। শ্রমে সহযোগিতা, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য অনেক লোকের একত্রে শ্রম করা সব সময়েই কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে চালু ছিল—যেমন পাথরখাদ, কামারশালা, নির্মাণকার্য ইত্যাদিতে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে হস্তশিল্পশালায় উৎপাদন ও সাধারণ সহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য এই যে কয়েকটি বিশেষ সামগ্রীক উৎপাদনের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে ঐ উৎপাদন করা হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে হস্তশিল্পশালায় উৎপাদনের এই শ্রম বিভাগের ফলে কয়েকটি যন্ত্রপাতির বিশেষীকরণ হয় এবং

মানুষ নিজেও বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে ও এক-একটি বিশেষ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। একজন কারিগর যেখানে একটা গোটা জিনিস তৈরি করত, সেখানে ঐ জিনিসের উৎপাদন বেশি সংখ্যায় করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অংশ তৈরির জন্য অনেকগুলি বিশেষ ধরনের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয় এবং আলাদা আলাদা শ্রমিকরা তা করতে থাকে। এর ফলে শ্রম উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এক-একজন শ্রমিকের কাজ মেশিন দিয়ে করানর পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে।

মেশিনের সাহায্যে শিল্পোৎপাদন শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তখন ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। মার্কস এই বিপ্লবকে তাঁত ও সূতা কাটার যন্ত্রের আবির্ভাবের সংগে যুক্ত করে দেখিয়েছেন। যে সব কাজ আগে হাতে করা হত সেই জায়গায় এই মেশিন বহু সংখ্যক শ্রমিকের স্থান গ্রহণ করল। এই সব মেশিনের জন্য প্রয়োজন হল মোটরের এবং বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনরূপে এই মোটর আবিষ্কৃত হল। এই মোটর, এর শক্তি প্রেরণের বন্দোবস্ত এবং মেশিন হল মেশিন উৎপাদনের প্রথম উৎপাদন বন্দোবস্ত। একটি যথোপযুক্ত কৃৎকৌশলগত বনিয়াদ অর্থাৎ মেশিন দিয়ে মেশিন উৎপাদনের বনিয়াদ সৃষ্টি হবার পর বিকাশের এই চক্রটি পূর্ণাঙ্গ হল। উৎপাদনের বিকাশে এক নতুন যুগের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে এইভাবে একেবারে একটি মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে যে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে অপরাপর ইউরোপীয় দেশে ও উত্তর আমেরিকায় এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়া ও জাপানে বিস্তার লাভ করল। মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন পুঁজিবাদের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি গঠন করল।

বর্তমান যুগেও প্রযুক্তিবিদ্যা মেশিন দিয়ে উৎপাদনের ভিত্তিতে বিকশিত হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক লোককে কলে-কারখানায় একই ছাদের তলায় জড়ো করে শ্রম প্রক্রিয়াকেই সামাজিক চরিত্রের রূপ দিচ্ছে। একই সংগে আবার বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও উৎপাদনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে শ্রমবিভাগের বহুবিধ রূপের ব্যাপক বিকাশ হচ্ছে। এই শ্রমবিভাগ আবার উৎপাদনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে কোনও

একটি শাখায় কোনও পরিবর্তন হলে তা দ্রুত অপর সব শাখায় বিস্তার লাভ করছে।

মার্কসের মতে—কারিগরীভিত্তিক উৎপাদনের তুলনায় মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত ভিত্তি বিপ্লবী, কারণ এর বিকাশের সম্ভাবনা অসীম এবং উৎপাদনে বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ পৌনঃপুনিক কৃৎকৌশলগত বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনের বিকাশ দেখিয়ে দিয়েছে যে মানুষের শ্রম কি বিপুল শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে।

বিগত শতাব্দীতে উৎপাদিকা শক্তিগুলির আরও বিকাশের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করার সময় মার্কস দেখিয়েছেন যে মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনের বিকাশ আলাদা আলাদা মেশিন চালানর বদলে মেশিনের একটি ব্যবস্থা-বলীতে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনে নিয়ে যাবে; যাতে মানুষ আর বৈষয়িক উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকবে না ও শুধু মেশিন নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন ও মেরামতি এবং নতুন মেশিন নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত থাকবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিকাশ উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নয়নে এক বিপুল উল্লম্ফনের এবং সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবী পরিবর্তনগুলি এই বিপ্লবের মধ্যে সমন্বিত হয়। কৃৎকৌশলগত অগ্র-গতির দিক থেকে এই বিপ্লবের সারমর্ম হল, এই বিপ্লব স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের যুগের প্রবর্তন করে। সাইবারনেটিকস (যন্ত্রের ভিতরে নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগের তত্ত্ব) ও রেডিও-ইলেকট্রনিকস-এর বিকাশ ও কৃৎকৌশলগত প্রয়োগ এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা নিয়েছে।

মেশিন ও মোটর শ্রমের বিষয়ের উপর আশু প্রভাব ফেলার কাজটা মানুষের বদলে কৃৎকৌশলের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবপর করে তুলেছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মেশিনের এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের কাজ মানুষের হাতেই ছিল। কিন্তু কমপিউটারের কলাকৌশলের দরুন মেশিন এখন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার কাজও নিয়ে নিচ্ছে। বৈষয়িক উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এখন করা যায়। ফলে

উৎপাদিকা শক্তিগুলি নতুন এক গুণগত স্তরে উন্নীত হচ্ছে। বর্তমানে আমরা এখনও এই প্রক্রিয়ার শুরুর স্তরে রয়েছি। কিন্তু এর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা খুবই স্পষ্ট। আংশিক স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন থেকে পূর্ণাংশ স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের দিকে এগোন হচ্ছে। তখন মানুষ ও প্রকৃতির মাঝখানে কোনও যন্ত্র অথবা এমনকি কতকগুলি মেশিনের সমাহারও থাকবে না, থাকবে একটি স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়া।

এনার্জেটিকস-এর (এনার্জির তত্ত্ব) ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিপ্লব চলছে। পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাপ-পারমাণবিক শক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও ব্যবহার করা যায় তার অন্বেষণ চলছে। মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যার সৃষ্টিতেও ওই বিপ্লব প্রতিফলিত হচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর বাইরেও মানুষ প্রবেশ করছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব সমাজে বিজ্ঞানের ভূমিকা ও উৎপাদনের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বদলে দেয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব এই অর্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অংশগ্রহণের ফলে সংঘটিত হয়েছিল যে উৎপাদন বিজ্ঞানের সামনে কতকগুলি সমস্যা উপস্থিত করে দেয় এবং এই সব সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান উৎপাদনের নিখুঁতিকরণ সম্ভবপর করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ, বিখ্যাত "কারনট সাইকল"-এর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। শক্তি উৎপাদন যন্ত্রের এটি একটি আদর্শ নমুনা। ইতিমধ্যে যে সব বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন চালু হয়েছিল এ হল সেগুলির তত্ত্বগত সামান্যীকরণ এবং তা তাপ-গতি বিজ্ঞানের (থারমোডাইনামিকস) বিকাশে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনে গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় এবং বিজ্ঞানের আরও সচেতন প্রয়োগ উৎপাদনের পক্ষে একটি কৃৎকৌশলগত প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে ওঠে।

বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের পরিস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া আরও উন্নত হয়। এখানে বিজ্ঞানের বিকাশ প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের নতুন নতুন রূপের জন্ম দেয়। উৎপাদন যদিও তখনও বিজ্ঞানের বিকাশে চূড়ান্ত বৈষয়িক ভিত্তি হয়ে থাকে, কিন্তু কৃৎকৌশলগত প্রয়োজনীয়তা দাবি করে যে বিজ্ঞানকে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ আগে থেকে অনুমান করতে হবে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডি. বার্নাল উল্লেখ করেছেন, "আগের কালে

বিজ্ঞান শিল্পকে অনুসরণ করত ; এখন বিজ্ঞান শিল্পকে ধরে ফেলার এবং তার নেতৃত্ব দেবার দিকে এগোচ্ছে…" ।(১)

সাধারণভাবে মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনের বিকাশের সংগে সংগে এবং বিশেষত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন ক্রমবর্ধমানভাবে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রয়োগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে, আর বিজ্ঞান উৎপাদনের প্রত্যক্ষ শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। মার্কসের এই তত্ত্বটি এই অর্থে বোঝা ভুল হবে যে সাধারণভাবে বিজ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে মিশে যায় এবং তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য হারায় ও আত্মিক উৎপাদনের ক্ষেত্র আর থাকে না।

বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা শক্তিতে রূপান্তরের অর্থ হল প্রথমত, শ্রমের উপকরণ ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রক্রিয়াগুলি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাস্তবায়িত হওয়ার ফল ; বিজ্ঞান ছাড়া নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা সৃষ্টি হতে পারে না এবং এমন কি বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যাও বিজ্ঞান ছাড়া কিছু করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংগে যুক্ত সকল শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অত্যাবশ্যক উপাংশ হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, উৎপাদন ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ, বিশেষত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানের প্রয়োগেরই ফল হয়ে ওঠে। চতুর্থত, উৎপাদনের ধারণাটিই বিস্তারিত হয় এবং উৎপাদন বলতে শুধু উৎপাদন প্রক্রিয়াই বোঝা যায় না, সেই সংগে সে সম্পর্কে গবেষণা এবং বিকাশধারাও বোঝায়। ফলত বিজ্ঞান ও উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করার ঝোঁক দেখা যায়।

সামগ্রিক ফলাফল হল উৎপাদিকা শক্তিগুলির মধ্যে মানুষের অংশ বাড়ান। মানুষের অংশ বলতে শুধু কায়িক শ্রমিকই নয়, সেই সংগে কৃৎকুশলী, ইঞ্জিনিয়ার এবং এমনকি বিজ্ঞানীদেরও বোঝায়, কারণ তাঁরা উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত পরিচর্যার সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয়করণ ও "বৈজ্ঞানিকীকরণ" কায়িক ও মানসিক শ্রমকে কাছাকাছি আনার ভিত্তি সৃষ্টি করে, শ্রমিকদের শ্রমকে মননশীলতা দেয়, শ্রমকে আরও অর্থবহ ও সৃজনশীল করে তোলে, শ্রমের বৃত্তিগত কাঠামোতে

১। জে. ড. বার্নাল, সায়েন্স ইন্ হিস্ট্রি, লন্ডন ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ২০।

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে এবং দক্ষশ্রমিক, কৃৎকুশলী ও ইঞ্জিনিয়ারদের অনুপাত বৃদ্ধি করে।

আধুনিক স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিটি ব্যক্তির কাছে অনেক বেশি দাবি করে, প্রতিটি লোকের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, দায়িত্ব গ্রহণ করার এবং যৌথ স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতা দাবি করে।

অতএব অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হস্তশিল্পশালার উৎপাদনে শ্রমিক যেখানে ছিল "আংশিক" শ্রমিক, যেখানে মেশিনের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ শ্রমিকদের "মেশিনের লেজুড়ে" পরিণত করেছিল, সে জায়গায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের বিকাশের অর্থ হল প্রতিটি ব্যক্তির সৃজনশীল ক্ষমতার উন্নয়ন এবং অদক্ষ ও একঘেয়ে শ্রম থেকে তার মুক্তি, ব্যক্তির সর্বাত্মক বিকাশ, যা হল কমিউনিজমের আদর্শ, ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে বিচার করলে তা উৎপাদিকা শক্তিগুলিরই একটি প্রয়োজন হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রবণতার চাহিদা এবং সমাজের কমিউনিস্ট বিকাশের চাহিদা যে একই হয়ে উঠছে এ থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

বুর্জোয়া লেখকেরা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলে যে মার্কসবাদ মানুষকে শুধু একটি "উৎপাদিকা শক্তি" হিসাবে গণ্য করে এবং ব্যক্তি হিসাবে তার কোন মূল্য আছে বলে মনে করে না। এক্ষেত্রে "মার্কসীয় তত্ত্ববাগীশ" ও "সোভিয়েত তত্ত্ববাগীশরা" বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বাস্তবে অবশ্য উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে মানুষ হল কাজের মানুষ, কর্মরত মানুষ এবং এর অর্থ হল সৃজনশীল মানুষ। মানুষকে একটি উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে স্বীকার করে নেবার অর্থ এই নয় যে মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে বা তাকে একটি বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হচ্ছে। পক্ষান্তরে এর অর্থ হল মানুষকে স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করা এবং তার এমন সব কাজ করার ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া যা তাকে জন্তু-জগতের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে ও প্রকৃতির উপর তার আধিপত্য এনে দিয়েছে। উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে মানুষকে চিহ্নিত করলে তাকে খাটো করা যায় না। বরং তার দ্বারা মানুষের উপর নিপীড়ন, তার শ্রমকে অভিশাপে পরিণত করা এবং শ্রমিককে

দাস হিসাবে গণ্য করাকেই নিন্দা করা হয়। এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতি মানুষকে একটি বস্তুর স্তরে নামিয়ে আনে, আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সর্বপ্রকার নিপীড়নের বিরোধী।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ঘোষণা করে যে উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে মানুষ হবে মুক্ত শ্রমিক এবং যথেষ্ট উন্নত এবং সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, আর এ মানবতাবাদ খুবই বাস্তব, কাল্পনিক নয়। পুঁজিবাদের আমলে আধুনিক কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান তীব্র সামাজিক বিরোধের জন্ম দেয়, আর সেখানে বিভিন্ন ধরনের "কৃৎকৌশলগত কল্পকাহিনী" শোনা যায়, যা প্রযুক্তিবিদ্যাকে নিঃশর্ত করতে চায় ও তাকে মানুষের বিরোধী একটি শক্তি হিসাবে গণ্য করে। উদাহরণস্বরূপ, এই দাবি করা হয় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ মানুষের অমঙ্গল ডেকে আনে। একথা বলা হয়ে থাকে যে প্রযুক্তিবিদ্যা ইতিমধ্যেই মানুষের পক্ষে বহু ধরনের বিপদ সৃষ্টি করেছে এবং তার জীবনকে আরও বেশি বেশি ছকে বাঁধা ও নৈর্ব্যক্তিক করে তুলেছে।

এইসব ধারণাসম্পন্ন লেখকেরা প্রযুক্তিবিদ্যাকে মানুষ থেকে পৃথক করে শ্রমিকশ্রেণীর ও সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা খাটো করে দেখে এবং যে সামাজিক পরিস্থিতির উপর কৃৎকৌশলগত বিকাশের চূড়ান্ত ফলাফল মূলত নির্ভরশীল তার তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে। যদি ধনতন্ত্রের আমলে জীবন প্রকৃতপক্ষে আরও ছকে বাঁধা হয়ে উঠতে থাকে ও মানুষ তার ব্যক্তিত্ব হারাতে থাকে, তবে তার কারণ কৃৎকৌশলগত অগ্রগতির মধ্যে নিহিত নয়, তা হল উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্য, যার অর্থ হল শোষণভিত্তিক সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রযুক্তিবিদ্যার অপরাপর সামাজিক ফলাফল দেখা যায়, কারণ এখানে প্রযুক্তিবিদ্যা শ্রমজীবী মানুষের বিকাশে, তার বৈষয়িক ও আত্মিক অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

এই কারণে প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কগুলির সঙ্গে সম্পর্ক থেকে আলাদা করে দেখা কোনও মতেই চলে না।

৩. উৎপাদন সম্পর্ক

উৎপাদন সব সময়েই ছিল সামাজিক এবং এখনও তাই রয়েছে। বৈষয়িক সামগ্রী তৈরির জন্য মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কে আসে এবং এইসব সম্পর্কের পরিধির মধ্যেই কেবল প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের অস্তিত্ব থাকে।

পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিগতভাবে কখনই কিছু উৎপাদন করেনি। সমাজের বাইরে ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কোনও ব্যক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম এই ধারণা নিছক উদ্ভাবন ও নিতান্ত কল্পনা। আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে জন্তু-জগৎ থেকে মানুষ বেরিয়ে এসেছে এবং অপরাপর মানুষের সংস্রবে এসে একমাত্র সমাজের মধ্যেই বিকশিত হয়েছে। সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের প্রথম পর্যায়গুলি ছিল যৌথ উৎপাদনের পর্যায়। এই উৎপাদন যখন যৌথ চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং আলাদা আলাদা পরিবারভিত্তিক উৎপাদন চলতে থাকে, সে সময়েও মানুষের মধ্যেকার উৎপাদন সম্পর্কগুলি থেকে গিয়েছিল। ওই সম্পর্কগুলি রক্ষিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সামাজিক শ্রমবিভাগের বিকাশ এবং পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই সম্পর্কগুলি আরও প্রসারিত হয়। শ্রমবিভাগ বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উৎপাদকই ক্রমবর্ধমানভাবে অপরদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কারণ সে তার কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি তাদের কাছ থেকে নেয় এবং নিজের উৎপন্ন তাদের বিক্রি করে। পরিশেষে মেশিনের সাহায্যে বৃহদাকার উৎপাদনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকদের মধ্যে এই আন্তঃসম্পর্কগুলি আরও অঙ্গাঙ্গী হয়ে পড়ে। শ্রম প্রক্রিয়ার ব্যাপক সামাজিকীকরণে তা প্রতিফলিত হচ্ছে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়। উদাহরণ স্বরূপ, বিভিন্ন ধরনের বিশেষীকৃত বৃত্তির মধ্যে শ্রমের কৃৎকৌশলগত বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কতকগুলি সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্ক রয়েছে যে কোনও কারখানার কর্মশালার মধ্যে, বিশেষ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উৎপাদনের নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে। এগুলিকে উৎপাদন-কৃৎকৌশলগত সম্পর্ক রূপে বর্ণনা করা যায়। এই সব সম্পর্কই উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জাম,

প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংগঠন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সেইজন্যই পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক কারখানার মধ্যে এক্ষেত্রে কোন লক্ষণীয় পার্থক্য নাও দেখা দিতে পারে।

সামাজিক উৎপাদন (অর্থনৈতিক) সম্পর্কগুলি ভিন্ন ধরনের। তার চরিত্র সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলি কিভাবে বণ্টিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে, অথবা ভাষান্তরে বললে উৎপাদনের মূল উপকরণগুলির মালিকানার সমস্যাটির সমাধান ওই সমাজে কিভাবে করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে।

খুবই সাধারণরূপে মূল নীতির দিক থেকে এই সমস্যাটির দুভাবে সমাধান করা যেতে পারে: হয় উৎপাদনের উপকরণগুলি সমগ্র সমাজের সম্পত্তি থাকে, নয় থাকে ব্যক্তি বা সমাজের কোনও অংশের হাতে, যেখানে সমাজের অপর অংশকে মালিকানায় অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভাষান্তরে বললে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা সামাজিক বা ব্যক্তিগত হতে পারে। কিন্তু মালিকানা শুধু আইন অনুযায়ী কোনও জিনিসের মালিক হবার অধিকার নয়। মালিকানা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্পর্ক। বস্তুর সঙ্গে অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে মানুষের অপ্রত্যক্ষ সম্পর্কের মাধ্যমে ঐ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক যদি সমগ্র সমাজ হয়, তবে উৎপাদনের উপকরণগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজের সদস্যদের সমান অধিকার থাকে এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতার ও পারস্পরিক সহায়তার যৌথ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক মালিকানার ধরনগুলির মতই এই সহযোগিতার রূপগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ইতিহাসে সামাজিক সম্পত্তি দেখা গিয়েছে নিম্নলিখিত রূপগুলিতে—গোষ্ঠী, ট্রাইব অথবা আদিম কমিউন-এর সম্পত্তি; আর্টেল অথবা কমিউনে ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবী জনগণের গোষ্ঠীগত সম্পত্তি, রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি অর্থাৎ জনগণের সম্পত্তি। অপরপক্ষে যদি উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক ব্যক্তিবিশেষরা হয়, যদি উৎপাদনের উপকরণগুলি সমগ্র সমাজের না হয়ে মাত্র তার একাংশের হাতে থাকে তবে সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির রূপ নেয়, উৎপাদনের উপকরণগুলির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অসম হয়ে ওঠে এবং সমাজে প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্পর্ক

ও শোষণের সম্পর্ক দেখা দেয়। এই সব সম্পর্কের রূপগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কারণ তা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধরনের উপর নির্ভরশীল।

ইতিহাসে বৃহদাকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির তিনটি মূল ধরন দেখা যায়—সেগুলি হল দাসপ্রথাভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক এবং সেই সঙ্গে ওই তিনটির অনুরূপ মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের তিনটি ধরণও দেখা গিয়েছে। সমাজ-বিকাশের এই সব স্তরে ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে কৃষক ও কারিগরদের ছোট ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল অথবা এখনও আছে।

সম্পত্তির রূপ উৎপাদক ও উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে যোগসূত্রের চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়। দাসপ্রথায় উৎপাদন সম্পর্কগুলির বৈশিষ্ট্যমূলক চরিত্র ছিল এই যে শুধু উৎপাদনের উপকরণগুলি নয়, সেই সঙ্গে কর্মরত মানুষ নিজেই অপর একজন মানুষের, অর্থাৎ দাস-প্রভুর সম্পত্তিতে পরিণত হত। দাসকে একটি বস্তু হিসাবেই গণ্য করা হত।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ব্যবস্থা জমিতে বৃহদাকার সম্পত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যবস্থায় সামন্ত ভূস্বামী তার জমিতে কৃষকদের বিনা মজুরিতে কাজ করতে অথবা তাদের কর বা কাজের বদলে খাজনা দিতে বাধ্য করে তাদের উপর শোষণ চালায়।

পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হল কারখানা, খনি ইত্যাদির মত উৎপাদনের মূল উপকরণগুলির পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মুক্ত শ্রম অর্থাৎ ব্যক্তিগত নির্ভরতা, শ্রমের উপকরণ ও জীবিকার উপকরণ থেকে মুক্ত। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাই শ্রমিককে বাধ্য করে তার শ্রমক্ষমতা পুঁজির মালিককে একটি পণ্য হিসাবে বিক্রি করতে এবং কেবল এইভাবেই সে শ্রমের উপকরণের সঙ্গে একত্রিত হতে পারে ও উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।

সমাজতন্ত্রে মানুষের উপর মানুষের সবরকম শোষণ অবলুপ্ত হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীগুলির মধ্যে, বিশেষত শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে তখনও পার্থক্য থেকে যায়। এই সব পার্থক্য উৎপাদনের উপকরণগুলির সামাজিক মালিকানার বিভিন্ন রূপের (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সমবায় অথবা যৌথ খামার সম্পত্তি) সঙ্গে যুক্ত। আরও

বিকাশ ঘটলে, অর্থাৎ কমিউনিজমে উত্তরণ হলে এই সব পার্থক্য আর থাকবে না।

মানব জাতির ইতিহাসে সম্পত্তির সম্পর্কগুলি মৌলিক তাৎপর্যসম্পন্ন। সম্পত্তির প্রধান রূপ কি তারই ভিত্তিতে মানব ইতিহাসের সব যুগগুলি পরস্পর থেকে আলাদা হয়। বস্তুত সম্পত্তি-সম্পর্কগুলি সবসময়েই উৎপাদন সম্পর্কগুলির একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অথবা তার সমষ্টি। এই সম্পর্কের সীমা বৈষয়িক উৎপন্নের চলাচল দ্বারা নির্ধারিত হয়। এর শুরু হয় বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং তারপর বিনিময় ও বণ্টন মারফত ক্রেতার কাছে পৌঁছয় এবং ব্যক্তিগত ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটে। ভোগ উৎপাদনের উপরই নির্ভরশীল, কিন্তু একই সংগে আবার এক অর্থে তার বিরোধী, এই কারণে যে ভোগ উৎপাদন সম্পর্কগুলির ক্ষেত্র থেকে বৈষয়িক উৎপন্নকে বের করে নেয়।

ফলত, উৎপাদন সম্পর্কগুলি বৈষয়িক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের উপকরণ-গুলির সংগে উৎপাদক যেভাবে একত্রিত হয় শুধু তাই-ই প্রকাশ করে না, সেই সংগে ক্রিয়াকলাপের বিনিময়ের ও সেই ক্রিয়াসঞ্জাত উৎপন্নগুলি বিনিময়ের সম্পর্কগুলিকে এবং উৎপন্ন বৈষয়িক সামগ্রীর বণ্টনকেও বোঝায়। ক্রিয়া ও ক্রিয়াসঞ্জাত উৎপন্নের বিনিময়ের প্রয়োজন উদ্ভূত হয় শ্রমের সামাজিক বিভাগ অর্থাৎ শিল্প ও কৃষিতে, মানসিক ও কায়িক শ্রমে বিভাগের অস্তিত্ব থেকে।

উৎপাদন সম্পর্কগুলির এই সমষ্টির সামাজিক চরিত্র সম্পত্তির চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ, ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির ভিত্তিতে পণ্য বিনিময় পুঁজির কার্যকলাপের অত্যাবশ্যক উপাদান এবং এই পণ্য বিনিময় ধনতান্ত্রিক বাজারের বিধানগুলির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকে মেনে চলে ও ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতির মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পণ্য নিজেই ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনের প্রাথমিক কোষের রূপ গ্রহণ করে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পণ্যের উৎপাদন ও বিনিময়ের সামাজিক চরিত্র ভিন্ন, কারণ এখানে সামাজিক সম্পত্তি, উৎপাদন ও বিনিময়ের মারফত প্রাপ্ত মুনাফা সমগ্র সমাজের স্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

বণ্টনের চরিত্র, বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর আয়ের রূপ ও

পরিমাণও সম্পত্তির রূপের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের আমলে শোষণের অনস্তিত্ব ও কাজ অনুযায়ী বণ্টনের নীতি সামাজিক সম্পত্তির প্রাধান্য দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির মতই উৎপাদন সম্পর্কগুলিও সামাজিক জীবনের বৈষয়িক দিকের অঙ্গীভূত। উৎপাদন সম্পর্কগুলির বৈষয়িক চরিত্র এই তথ্যের মধ্যে মূর্ত হয় যে বিষয়গতভাবে এবং মানুষের ইচ্ছা ও চেতনা থেকে স্বতন্ত্রভাবে সেগুলির অস্তিত্ব রয়েছে। সেগুলির অস্তিত্ব ও চরিত্র মানুষের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় উৎপাদনের স্তর দ্বারা। উপরন্তু, জনগণের মধ্যেকার উৎপাদন (অথবা অর্থনৈতিক) সম্পর্কগুলি জনগণের সামাজিক চেতনা দ্বারা শুধু নির্ধারিত হয় না তাই নয়; এমনকি পুরোপুরি তার উপলব্ধির মধ্যেও থাকে না। "আপনি যে বেঁচে আছেন ও কাজ করছেন, সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করছেন ও বিনিময় করছেন, তা বিষয়গতভাবে প্রয়োজনীয় ঘটনাবলীর ও বিকাশের পরম্পরার জন্ম দেয় এবং তা আপনার সামাজিক চেতনা থেকে স্বতন্ত্র এবং কখনও শেষোক্তর পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যেও আসে না।"(১)

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক উৎপাদনের দুটি অবিচ্ছেদ্য দিক। বিমূর্তভাবেই কেবল উৎপাদন সম্পর্ক ছাড়া উৎপাদনের শক্তিগুলির অথবা উৎপাদনের শক্তিগুলি ছাড়া উৎপাদন সম্পর্কগুলির বিচার করা চলে। বাস্তবে তারা আধেয় ও রূপের মতই একে অপর থেকে অবিচ্ছেদ্য যদি এক্ষেত্রে আমরা উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে আধেয় হিসাবে এবং উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে সামাজিক রূপ হিসাবে ধরি। সাধারণভাবেই যেমন আধেয় রূপকে নির্ধারণ করে তেমনি উৎপাদিকা শক্তিগুলি উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে নির্ধারণ করে দেয়। উৎপাদন সম্পর্কগুলি আবার উৎপাদিকা শক্তিগুলির ক্রিয়াকলাপকে এক বিশেষ সামাজিক গুণ দ্বারা ভূষিত করে। যদিও উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির অবস্থা ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কগুলিই প্রত্যেকটি উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিক চরিত্র নির্ধারণ করে।

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৪, পৃষ্ঠা ৩২৫।

৪. উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের ডায়লেকটিকস

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির বৈশিষ্ট্যগুলিকে উৎপাদন পদ্ধতির দুটি দিক হিসাবে বিচার করে দেখার পর এখন আমরা এদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে দেখব।

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ার সমগ্র ইতিহাসে দেখা যায় যে তা একটি সাধারণ সমাজ-বিজ্ঞানগত বিধান মেনে চলে। তা হল উৎপাদিকা শক্তিগুলির চরিত্র ও বিকাশের স্তরের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কগুলির সঙ্গতির বিধান। এই বিধান উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উপর উৎপাদন সম্পর্কগুলির বস্তুগতভাবে বিদ্যমান নির্ভরশীলতা বর্ণনা করে এবং উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির নিয়ামক প্রভাবের অধীনেই যে নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হয় সে তথ্য প্রতিষ্ঠা করে।

মানুষ যখন সবে জন্তু অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন তারা যে সব পাথরের হাতিয়ার ও অপরাপর জিনিস ব্যবহার করত (যদিও ওই সব যন্ত্রপাতি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করার মত ছিল), সেগুলি ছিল এত আদিম ও অনুৎপাদক যে কোনও ব্যক্তি ওই সব হাতিয়ার নিয়ে একাকী নিজের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করতে পারত না। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখীন হতে মানুষের দুর্বলতার দরুনই তারা একত্রে কাজ করতে এবং পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য হত। এক্ষেত্রে প্রধান উৎপাদিকা শক্তি ছিল মানুষের যৌথ প্রয়াসের শক্তি এবং এর ভিত্তিতেই যৌথধর্মী আদিম কমিউনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির আরও বিকাশ—প্রথমে প্রস্তর থেকে ব্রোঞ্জে, এর পরে লোহার যন্ত্রপাতিতে উত্তরণ শ্রম উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। এর ফলে মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে অথবা একটি পরিবার ভিত্তিতে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। শ্রম বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্নের এক উদ্বৃত্ত অংশ (অর্থাৎ অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মেটাবার পর উৎপন্নের যে অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়) দেখা দিল এবং এরই সঙ্গে দেখা দিল বিশেষ বিশেষ উৎপাদকদের

মধ্যে কি উৎপাদন করবে তা বেছে নেওয়ার প্রবণতা; ও তার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ঘটল।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির চরিত্র ও বিকাশের স্তরের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কগুলির সঙ্গতির বিধানটি উৎপাদনের এই স্তরে এই তথ্যের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির ব্যক্তিগত চরিত্রের অনুরূপ। এ থেকে মনে হতে পারে যে উৎপাদকদের ব্যক্তিগত শ্রমভিত্তিক ছোট ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তিই শুধু ব্যক্তিগত ব্যবহারের যন্ত্রপাতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সম্পত্তির রূপ কখনই কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন সৃষ্টি করেনি, কারণ এই রূপটি নিজে থেকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির কোনও নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে অক্ষম। এই কারণেই দেখা যায় যে এর পাশাপাশি সৃষ্টি হতে থাকে অপরের শ্রম আত্মসাৎ করার ভিত্তির উপর অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করার ভিত্তির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিভিন্ন রূপ এবং উদ্বৃত্ত শ্রম ও উদ্বৃত্ত উৎপন্নের আবির্ভাবের দরুনই তা সম্ভবপর হয়।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তর যখন খুবই নীচু ছিল, তখন যে কোনও লোককে তার উপর বলপ্রয়োগ করে অথবা অর্থনীতি-বহির্ভূত অপর কোনও উপায়ে চাপ সৃষ্টি করে সে যা উৎপাদন করেছে তার একাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য করা যেত। এইভাবেই শোষণের প্রথম রূপ দাসপ্রথা প্রত্যক্ষ ও নগ্ন বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই প্রথার সাহায্যে মানুষকে শ্রমের উপকরণে পরিণত করা হত ও তাদের কোন অধিকারই থাকত না। অর্থনীতি বহির্ভূত বাধ্যবাধকতা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হত। এই সমাজ ব্যবস্থায় প্রধান উৎপাদিকা শক্তি কৃষকরা উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলির মালিক ছিল না।

ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ উৎপাদক উৎপাদনের উপকরণগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল; ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শ্রমের উপকরণগুলি ব্যবহারের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হস্তশিল্পশালায় "আংশিক শ্রমিক"-এ পরিণত হল। কিন্তু ধনতন্ত্র ক্রমশ মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন শুরু করে দিল এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই সামাজিক চরিত্র এনে দিল। মেশিনের ব্যবহার মানুষকে এক বৃহদাকার যৌথ সংস্থায় একত্রিত করার

এবং সমগ্র সমাজে ব্যাপকভাবে শ্রম বিভাগ প্রবর্তন করার বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে দিল। এই সময়েই আধুনিক শিল্প-সংশ্লিষ্ট সর্বহারা জন্ম নিল এবং এই শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে গেল ও অর্থনীতিগতভাবে পুঁজির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

এই সব মিলে উৎপাদিকা শক্তিগুলির চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটল। উৎপন্ন এখন আর আলাদা আলাদা উৎপাদকের শ্রমের ফল নয়, ও কোন গোষ্ঠীর বা অনেক লোকের যৌথ শ্রমের ফল। উৎপাদকরা এখন আর উৎপন্নের মালিক নয়, উৎপন্ন আত্মসাৎ করে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক পুঁজিপতিরা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্র এবং আত্মসাতের ব্যক্তিগত ধনতান্ত্রিক রূপের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং এইটিই হল পুঁজিবাদী সমাজের মূল দ্বন্দ্ব। স্বতঃস্ফূর্ত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপর্যয়, উৎপাদনে নৈরাজ্য, অত্যুৎপাদনের সংকট এবং সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে।

একচেটিয়া পুঁজিপতি; পুঁজিপতিদের বড় বড় গোষ্ঠীর সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমসাময়িক উৎপাদিকা শক্তিগুলির সামাজিক চরিত্রের প্রতিফলন। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুখোমুখী হয়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র পরিকল্পনার কয়েকটি নীতি প্রবর্তন করার এবং ধনতন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এর কোনওটাই ধনতন্ত্রের চরিত্র পরিবর্তন করে না এবং করতেও পারে না, কারণ বুর্জোয়ারাই উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলির মালিক থাকে।

প্রতিযোগিতা, পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীকরণের বন্দোবস্ত ছোট একদল পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ আরও বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত করে দেয়। একই সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণগুলি থেকে উৎপাদকদের বিচ্ছেদ, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম; শোষণ ও ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে ও বেড়ে ওঠার ঝোঁক দেখায়। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এই মৌলিক দ্বন্দ্বের সমাধান করা যায় না; কারণ উৎপাদনের উপকরণগুলির সামাজিক মালিকানাই শুধু উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেতে পারে। বৃহদাকার

শিল্পের বিকাশ শুধু উৎপাদনের উপকরণগুলির সমাজতান্ত্রিক মালিকানার বৈষয়িক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে না; সেইসঙ্গে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকেও অপরিহার্য করে তোলে।

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব উৎপাদনের আরও সামাজিকীকরণের পথ করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধনতন্ত্র ও উৎপাদনের উপকরণগুলির ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা সামাজিক প্রগতির প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন হয়ে ওঠে।

ধনতন্ত্রের আমলে ধনতান্ত্রিক মুনাফার স্বার্থেই অর্থনীতিকে পরিচালিত করা হয়। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তন বৈষয়িক উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস করে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষকে "বাড়তি" বলে কাজ থেকে বের করে দেয়, নতুন নতুন বিরোধ ও সমাধানের অতীত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। শ্রমজীবী জনগণের উপকারের জন্য ও মানুষের সর্বাত্মক বিকাশের স্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বড় বড় আবিষ্কারগুলি প্রয়োগের পথে ধনতন্ত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব ওই ধরনের বিরোধের জন্ম দেয় না। ঐ বিপ্লব কমিউনিস্ট সমাজের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি নির্মাণে, সকল শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক কল্যাণ বৃদ্ধিতে সাংস্কৃতিক ও কৃৎকৌশলগত স্তর উন্নয়নে ও সর্বাত্মক বিকাশে সাহায্য করে।

একথা যুক্তিযুক্ত যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের কয়েকটি অভিন্ন ফলাফল সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র উভয়কেই প্রভাবিত করে। সেগুলি হল সমাজে বিজ্ঞানের বৃহত্তর ভূমিকা, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যয়বৃদ্ধি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত কাজের অধিকতর তাৎপর্য, নতুন নতুন বৃত্তির আবির্ভাব ইত্যাদি। একথা ধরে নেওয়াও ভুল হবে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের বিকাশের ফলে কোনও প্রতিবন্ধক ছাড়াই তা এগিয়ে চলে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সুবিধা এই যে এই বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলী পরিকল্পিতভাবে সমাধান করার ক্ষমতা তার আছে। কারণ এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক, সামাজিক সম্পর্কগুলির বিকাশের চাহিদা ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই সম্পর্কগুলিকে কমিউনিস্ট সম্পর্কে বিকশিত হতে উদ্দীপনা যোগায়।

ব্যাপক আকারে যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সাহায্যে উৎপাদন শুধু আলাদা আলাদা শিল্প ও কারখানাকেই অখণ্ড উৎপাদন ব্যবস্থাতে টেনে আনে না, এক-একটা গোটা অর্থনৈতিক অঞ্চলকেও টেনে আনে; পরে পরে তা এক-একটি দেশের অথবা কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক সমাহারগুলিতেও ব্যাপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিতে পরিব্যাপ্ত হবে। ইতি-মধ্যেই প্রতীয়মান এই ঝোঁকের একটি প্রতিফলন হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র ইউরোপীয় অংশের মত বিরাট বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে বিদ্যুৎশক্তির বড় বড় জাল সৃষ্টি। উৎপাদনের আরও সামাজিকীকরণ এমন একটি বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করে, যা থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সমগ্র সমাজের স্বার্থে ও সচেতন নিয়ন্ত্রণে আনার এবং জাতি ও দেশগুলির বিচ্ছিন্নতা দূর করার বিষয়গত সম্ভাবনা ও চাহিদার উদ্ভব হয়।

সার সংকলন করে বলা যায় যে প্রত্যেকটি উৎপাদন সম্পর্কের রূপ তত-দিনই স্থায়ী হয় যতদিন তা উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু বিকাশ যেমন এগোতে থাকে তেমনি ক্রমে ক্রমে উন্নয়নশীল উৎ-পাদিকা শক্তিগুলির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কগুলির বিরোধ বেধে যায় এবং এই সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। তখন নতুন উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির ভূমিকা হয় উৎপাদিকা শক্তিগুলির আরও বিকাশের রূপ হিসাবে কাজ করা। মার্কস বলেছেন যে মানুষ যে সব উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করে তা কখনও বর্জন করে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে উৎপাদন সম্পর্কগুলি ঐ সব উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের রূপ হিসাবে এতদিন কাজ করে এসেছে সেগুলিকে বর্জন করে না। "বরং যাতে তারা লব্ধ সাফল্য থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সভ্যতার ফল না হারায়, তার জন্য যে মুহূর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার পদ্ধতির সঙ্গে ইতিমধ্যে অর্জিত উৎপাদিকা শক্তিগুলির আর সামঞ্জস্য থাকে না তখন থেকেই তারা তাদের প্রথাসিদ্ধ সামাজিক রূপগুলি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।"(১)

যদি উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতির প্রভাবে উৎপাদন সম্পর্কগুলির

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ৫১৯।

পরিবর্তন ঘটে, তবে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ কি ভাবে ঘটে ?

এক্ষেত্রে আমাদের বহুবিধ কারণের একটা গোটা সমষ্টির ক্রিয়াকে বিবেচনায় আনতে হবে। ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎপাদনের অগ্রগতির পারস্পরিক ক্রিয়া অনুধাবন করে আমরা দেখেছি যে ভৌগোলিক অবস্থা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি উৎপাদনকে সবিশেষ প্রভাবিত করে এবং তা উৎপাদনকে উৎসাহিত অথবা প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু এগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের মূল উৎস নয়।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের একটি নিজস্ব আভ্যন্তরীণ যুক্তি রয়েছে। শ্রমের আরও জটিল যন্ত্রপাতি তার আগে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের যন্ত্রপাতি থেকেই সৃষ্টি হয়। আপেক্ষিকভাবে অগ্রসর যে কোনও অর্থনীতিতে কোনও একটি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলে তা অবশ্যম্ভাবীভাবে অপর শিল্পগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ স্বরূপ, শিল্প উৎপাদনের অগ্রগতি কৃষির কৃৎকৌশলগত সাজসরঞ্জামের উন্নয়ন ঘটায়, নির্মাণকার্যের যন্ত্রীকরণ করে ; কৃষিকার্যের বিপুল বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম সারের উৎপাদনের চাহিদা দেখা দেয় এবং তা আবার রাসায়নিক শিল্পের বিকাশে উৎসাহ যোগায়। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুম নতুন ও আরও বেশি কার্যকরী যন্ত্রপাতি তৈরি হতে থাকে, ফলে বর্তমানের বহু মেশিন সেকেলে হয়ে পড়ে এবং তার জায়গায় নতুন মেশিন চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। উৎপাদনের বিকাশের এই অমোঘ যৌক্তিকতার সঙ্গে সমাজ খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয়।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও বিরোধ দুইই আছে। প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে মানুষ নিজেকে পরিবর্তন করে, নিজের কর্মক্ষমতা বাড়ায় ও সাংস্কৃতিক স্তরকে উন্নত করে। অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শ্রমের নতুন উপকরণগুলির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই উপকরণগুলির আবিভার্ব ঘটলে ও ব্যবহার শুরু হলে মানুষ আবার বাধ্য হয় সেগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। উৎপাদনের বিকাশের এটাই হল আভ্যন্তরীণ পরিচালিকা শক্তি। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তিগুলির আভ্যন্তরীণ চাহিদা থেকে এ ব্যাখ্যা পাওয়া

যায় না যে কেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদনের বিকাশ দ্রুত ঘটে, আবার অপর কিছু ক্ষেত্রে মন্থরগতিতে ঘটে; কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোটামুটি সমতালে চলে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি ও সংকটের মধ্য দিয়ে চলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এমন ঘটে তাও বলা যায় না। সকল প্রযুক্তিবিদ্যাই হল বাস্তবায়িত জ্ঞান, আর মানুষের জ্ঞানের বিকাশ ছাড়া কোনও কৃৎকৌশলগত বিকাশ ঘটে না। বর্তমানে গবেষণা ও উন্নয়ন কৃৎকৌশলগত অগ্রগতির শক্তিশালী উৎস। কিন্তু বিজ্ঞানের নিজেরই অগ্রগতি, তার প্রকৃত বৃদ্ধি-হার উৎপাদনের বিকাশের উপর অধিকতর মাত্রায় নির্ভরশীল। উৎপাদনের বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজের ও মানুষের চাহিদাগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রত্যক্ষভাবে অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন সর্বদাই মানুষের কয়েকটি চাহিদা মেটাবার কাজ করে এবং এই সব চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যেকার একটি জটিল দ্বন্দ্বমূলক আন্তঃসম্পর্ক নিজে থেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। চাহিদাগুলিই উৎপাদনের বিকাশের ফলে বেড়ে যায়, কতকগুলি চাহিদার পূরণ নতুন চাহিদার জন্ম দেয় এবং তা কোনও না কোনও ভাবে উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। কিন্তু মানুষের চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক উৎপাদন সম্পর্কগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ঃ চাহিদাগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে না; করে উৎপাদন সম্পর্কগুলিব মাধ্যমে।

উৎপাদন সম্পর্কগুলির প্রত্যেকটি রূপই উৎপাদনকে একটি বিশেষ লক্ষ্যের অধীন করে এবং এই লক্ষ্য সবসময়েই মানুষের চাহিদা নয়। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে জনসাধারণ ও শ্রেণীগুলি বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপনা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তা প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে হয়ে থাকে; ধনতান্ত্রিক সমাজ একভাবে উদ্দীপিত হয়, আর সমাজতান্ত্রিক সমাজ হয় অন্যভাবে। উৎপাদন সম্পর্কগুলির সক্রিয় চরিত্র এই তথ্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় যে সেগুলি লোকের মধ্যে ক্রিয়ার কিছু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের জন্ম নেয়।

শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীগুলি উৎপাদনের বিকাশকে তাদের স্বার্থ ও প্রয়োজনেব অধীন করে নেয়। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়নের তাগিদে হয় না। এখানে যার উপর নজর দিতে হবে তা হল পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফা সৃষ্টির তাগিদ। প্রসারিত উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের বিষয়গত

বিধান, সর্বোচ্চ মুনাফা সৃষ্টির বিধান ও ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বিধান-গুলিই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও তার উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নয়নের পরিচালিকা শক্তি ছিল এবং এখনও আছে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ উৎপাদক শ্রমজীবী জনগণের কার্যকলাপ কিসের দ্বারা উদ্দীপিত হয়? নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কগুলির ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যক্ষ উৎপাদনের অবস্থানের ওপর তা নির্ভরশীল। উৎপাদন সম্পর্কগুলির কোনও বিশেষ রূপ এই কারণেই প্রগতিশীল বলে গণ্য হতে পারে যদি তা জনগণের জন্য তাদের পূর্বেকার অবস্থার তুলনায় কয়েকটি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেয়। একজন দাস সে যে কাজই করুক না কেন তাতে তার কোনও আগ্রহ থাকে না, কারণ সে কাজ করে চাবুকের ভয়ে। সামন্ততন্ত্রের আমলে প্রত্যক্ষ উৎপাদক কৃষকের নিজের খামার থাকে, পরিবার থাকে এবং সেই জন্যই সে তার উৎপাদন বাড়াবার জন্য কাজে কিছু পরিমাণে আগ্রহ দেখায়। শ্রমিক উৎপন্ন দ্রব্যের আনুষ্ঠানিকভাবে সমান মালিক হিসাবে সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের মালিক পুঁজিপতির সম্মুখীন হয়। শ্রমিকের শ্রম-শক্তি বিক্রয় করার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা যত বাড়ে, মজুরিও সেই সঙ্গে বাড়ে এবং সেইজন্যই সে তার শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পুঁজিপতির জন্য কাজ করার ফলে শ্রমিক বাধ্য হয় তার কাজকে কেবল জীবনধারণের একটি উৎস রূপে গণ্য করতে। ধন-তান্ত্রিক উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের জটিল বন্দোবস্তটি এমনভাবে করা হয় যাতে তা শ্রমিককে তার সমস্ত প্রচেষ্টা ও ক্ষমতাকে খাটাতে বাধ্য করে। মজুরি ব্যবস্থাও এই উদ্দেশ্য সাধন করে। শ্রমিকের পক্ষে উৎপাদন থেকে বিতাড়িত হওয়ার ও বেকার হয়ে পড়ার ভয় দাস প্রভুদের সর্দারদের চাবুকের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়।

সুতরাং উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়নের কারণগুলিকে যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে ওই উন্নয়ন ঘটে তা থেকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক-গুলির ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। আদিম সমাজের অপরি-পক্ক প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ও আধুনিক মেশিনের প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের উৎস এক নয়। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি উৎপাদন পদ্ধতির উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের নিজস্ব নির্দিষ্ট কারণ (উৎস) ও অর্থ-

নৈতিক বিধান আছে এবং তা সংশ্লিষ্ট যুগ ধরে চালু থাকে ও ঐ সব বিধানের চরিত্র উৎপাদন সম্পর্কগুলির চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

উৎপাদন সম্পর্কগুলির ফলাফল তখনই ইতিবাচক হয় যখন উৎপাদিকা শক্তিগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে সাহায্য করে, এবং তখনই নেতিবাচক হয় যখন এই সংগতি বিপর্যস্ত হয় ও উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কগুলির বাধা হয়ে দাঁড়াবার ফলাফল সম্পর্কে মার্কসবাদী প্রতিজ্ঞাটিকে অতিসরলীকৃতভাবে বা যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, যথা ট্রেন থামাবার জন্য ব্রেক কষার ফল যা দাঁড়ায় সেভাবে দেখা উচিত না। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে চালু উৎপাদন সম্পর্কগুলি তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে, সেগুলি সমসাময়িক উৎপাদিকা শক্তিগুলির চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যায় না যে উৎপাদনের বিকাশ একেবারে থেমে গেছে।

তাহলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলির বাধা হয়ে ওঠার ফলাফল কি হয়? সর্বোপরি এই তথ্য থেকেই তা ধরা পড়ে যে ইতিমধ্যে অর্জিত উৎপাদনের স্তর সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় না। মার্কস লিখেছেন "…ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদনের কোনও একটি প্রসারিত স্তরে বাধার সম্মুখীন হয়, যে স্তরকে পক্ষান্তরে অপর কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একেবারেই অপর্যাপ্ত মনে হত। চাহিদা পূরণ নয়, উৎপাদন ও মুনাফা লাভ দ্বারা স্থিরীকৃত একটি বিন্দুতে এসে তা একেবারে থেমে যায়।"(১) মার্কসের মতে এ থেকেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ত্রুটি প্রকাশ পায়। আর শ্রমের উপকরণ ও সেই সঙ্গে জনগণ সম্পর্কেও সেকথা প্রযোজ্য। শ্রমের প্রচণ্ড তীব্রতা বৃদ্ধি করতে গিয়ে ধনতন্ত্র জনগণকে মাত্রাতিরিক্ত শ্রমে নিযুক্ত করে তাদের ক্লান্ত ও নিঃশেষ করে ফেলে, বেকার ও আধা-বেকারদের এক বাহিনী সৃষ্টি করে এবং এইভাবে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদিকা শক্তিকে অর্থাৎ মানুষের শক্তিকেই অপচয় করে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে বাধা হয়ে ওঠার দরুন ধনতান্ত্রিক

উৎপাদন সম্পর্কগুলির ফলাফল দাঁড়ায় যে, উৎপাদনের বিকাশ খুবই মন্দার ভেতর দিয়ে এবং "সমৃদ্ধি" ও সংকটের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ অর্থনীতির সামরিকীকরণ, উন্মত্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতা অথবা এমনকি যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যুদ্ধের জন্য বাজেটের বিপুল বৃদ্ধির মধ্যে তা দেখা যায়, বিশেষত দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অগ্রগামী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে। বর্তমান কালের ধনতন্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কারগুলিকে যুদ্ধ ও সমরবাদের পক্ষে এবং প্রগতির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কাজে লাগায়।

সুতরাং উৎপাদন সম্পর্কগুলির সক্রিয় ভূমিকার অর্থ এই নয় যে সম্পত্তির রূপগুলি আপনা থেকেই উৎপাদনের বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায় বা পিছনে টেনে রাখে। একমাত্র মানুষই উৎপাদনের বিকাশ ঘটায়, অথবা তার উল্টো, অর্থাৎ বিকাশে অনাগ্রহী হয়। মানুষই তাদের উৎপাদন উৎপত্তিকে বিকশিত করে ও পরিবর্তন করে নেয় এবং এটাই তাদের ইতিহাসের ভিত্তি গঠন করে। উৎপাদিকা শক্তিগুলির উৎপাদনগুলির (অর্থাৎ জনগণ ও যন্ত্রপাতির) পারস্পরিক ক্রিয়া সর্বদাই কোনও না কোনও উৎপাদন সম্পর্কের রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং এই সম্পর্কগুলিই বিভিন্ন কাজে মানুষকে উদ্দীপিত করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের চরিত্র ও স্তরের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক-গুলির সামঞ্জস্যের বিধানটি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশকেই শুধু নির্ধারণ করে না, সেই সঙ্গে এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির বদলে অন্য এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি চালু করার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে দেয়।

পুরানো সমাজের জঠরে উৎপাদিকা শক্তিগুলির যখন বিকাশ ঘটতে থাকে সেই সময়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক তার গর্ভে জন্ম নেয়, যা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ নেয় এবং নতুন উৎপাদন পদ্ধতির ভ্রূণ হয়ে দাঁড়ায়। আদিম কমিউন ব্যবস্থার গর্ভেই দাসপ্রথা জন্ম নিয়েছিল, একই ভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

সুতরাং পুরানো উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই নতুন নতুন উপাদানের পরিমান গত সঞ্চয় ও নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর বিকাশ হয়; বিকশিত উৎপাদিকা

শক্তিগুলি সমাজে প্রচলিত পুরানো উৎপাদন সম্পর্কগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে আসে। পুরানো সম্পর্কগুলির কবল থেকে মুক্ত না হয়ে এই বিরোধের মীমাংসা করা যায় না; অর্থাৎ নতুন সম্পর্কগুলি আপনা-আপনি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। শাসকশ্রেণী ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সৌধ পুরানো সম্পর্কগুলিকে আঁকড়ে থাকে।

পুরানো উৎপাদন সম্পর্কগুলির নতুন সম্পর্কে উত্তরণ শুধু পরিমাণগত পরিবর্তন দ্বারা অসম্ভব। এখানে গুণগত উত্তরণ হতে হবে অর্থাৎ পুরানো সেকেলে ও জড় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপগুলির বিপ্লবী ধ্বংস সাধন করতে হবে, যা উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধনতন্ত্রের আমলের পুরানো সমাজের গর্ভে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির কেবল বিষয়গত পূর্বশর্তের আবির্ভাব হয়, তার রূপ হয় উৎপাদনের বিপুল-ভাবে সামাজিকীকরণের ও এমন সব আধুনিক উৎপাদিকা শক্তিসৃষ্টির যার চরিত্র সামাজিক। নতুন উন্নয়নশীল উৎপাদিকা শক্তিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজতন্ত্রের নতুন উৎপাদন সম্পর্কগুলি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আকার গ্রহণ করে না ও করতেও পারে না।

সুবিধাবাদী ও শোধনবাদীরা মার্কসবাদের এই প্রতিজ্ঞাটি সর্বদাই অস্বীকার করেছে এবং এখনও করছে। তাদের মতে—"এমনকি উৎপাদন সম্পর্কগুলি সহ সমাজতন্ত্রের টুকরোটাকরা" ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমলেই জন্ম নেয়, সমাজতন্ত্রের উত্তরণ ঐ সম্পর্কগুলির ক্রম-বিকাশের মধ্যেই নিহিত এবং এই উত্তরণ নিছকই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটে, আর এজন্য বিপ্লবী ঝঞ্ঝা ও অভ্যুত্থানের প্রয়োজন নেই।

সুবিধাবাদীদের বিপরীতে বিপ্লবী মার্কসবাদীরা, কমিউনিস্টরা এই তথ্য থেকে অগ্রসর হয় যে উৎপাদনের উপকরণগুলির সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে তৈরি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলি ধনতন্ত্রের আমলে আলাদা আলাদা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক শাখার কাঠামোর মধ্যে জন্ম নিতে পারে না; যেভাবে সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলি। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলির আবির্ভাবের জন্য সমগ্র

রাষ্ট্রভিত্তিতে উৎপাদনের উপকরণগুলির সমাজতান্ত্রিক সামাজিকীকরণ করতেই হবে এবং শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেই কেবল তা করতে পারে। তাই বিপ্লব এবং সচেতনভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে নতুন সমাজ নির্মাণ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন হতে পারে না।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির চরিত্র ও বিকাশের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কগুলির সামঞ্জস্যের বিধানটি সমাজতন্ত্রের আমলেও চালু থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলি বিপ্লবী অভ্যুত্থান বা ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ ডেকে আনে না। সমাজ এখন উন্নয়নশীল উৎপাদিকা শক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন সম্পর্কগুলির পরিবর্তন ঘটাবার জন্য সময়মত ব্যবস্থাবলী গ্রহণে সক্ষম অর্থাৎ এ দুয়ের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধগুলি সচেতনভাবে সমাধানে সক্ষম। এর জন্য শুধু বিষয়গত পরিস্থিতিরই প্রয়োজন তা নয়; সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিষয়ীগত উপাদানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ, অর্থাৎ সমাজ উন্নয়নের জন্য সঠিক নীতি ও উপযুক্ত পরিচালনা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি এবং শ্রমজীবী জনগণ বর্তমান পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজ ও অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার যে ক্রম-বর্ধমান সুযোগ দেয় তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির পূর্ণ ব্যবহার, আরও উন্নয়ন, শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক কল্যাণ ও সংস্কৃতির আরও বেশি দ্রুত বিকাশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উন্নয়ন—এই সব উচ্চ অগ্রাধিকারসম্পন্ন কর্তব্যগুলির রূপায়ণ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সকল শাখার অখণ্ড, নিবিড় ও সমানুপাতিক বিকাশের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন

বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ঐক্য ও বৈচিত্র্য

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এক সহজাত বৈশিষ্ট্য হল সমাজ সম্পর্কে তার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। বেশির ভাগ বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ সাধারণভাবে সমাজ সম্পর্কে এক বিমূর্ত অধিবিদ্যক ব্যাখ্যা থেকে অগ্রসর হয়। সমাজকে তারা ইতিহাসের বাইরেকার একটা কোটী হিসাবে দেখে। এর বিপরীতে মার্কসবাদ সমাজকে দেখে দ্বন্দ্বমূলকভাবে, অপরিবর্তনশীল হিসাবে নয়, বিকাশমান একটা কিছু হিসাবে দেখে, ফলত তার বিকাশের গুণগতভাবে নির্দিষ্ট স্তরগুলিকে, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনগুলিকে খুঁজে বের করে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের মার্কসবাদী ধারণা—ইতিহাস অনুশীলনকে একটা মূর্ত ভিত্তিতে বসাতে আমাদের সুযোগ দেয়। সমাজের ইতিহাস যেহেতু নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ইতিহাস থেকে তৈরি হয় সেই কারণে সেগুলির বিকাশের বিধানগুলিকে এবং এক গঠন থেকে অপর গঠনে উত্তরণকে আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। মার্কস এইভাবেই অগ্রসর হয়েছিলেন। ক্যাপিটাল গ্রন্থে তিনি ধনতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের বিধানগুলির বিশ্লেষণ করেছিলেন; তার ঐতিহাসিকভাবে অস্থায়ী চরিত্র এবং একটি নতুন ও উচ্চতর ব্যবস্থার দ্বারা অর্থাৎ কমিউনিজমের দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ার অনিবার্যতাও দেখিয়েছিলেন। সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের তত্ত্ব মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর।

১. সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনের ধারণা

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি সামাজিক জীবন ও ঐতিহাসিক বিকাশের ভিত্তি হল বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন পদ্ধতি।

উৎপাদন পদ্ধতি অন্য সমস্ত সামাজিক ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সংশ্লেষ প্রত্যক্ষ হতে পারে বা অস্পবিস্তর দূরস্থ হতে পারে; কিন্তু এর অস্তিত্ব আছে এবং এই সংশ্লেষ আবিষ্কার ইতিহাসের বিষয়বাদী ব্যাখ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র বা জাতি, বিজ্ঞান বা নৈতিকতা, ভাষা বা কলা যে কোনও সামাজিক ব্যাপারই আমরা ধরি না কেন তাকে তার নিজের নিরিখে বোঝা যায় না; বোঝা যায় কেবল সমাজ থেকে জাত এবং কতকগুলি বিশেষ সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যাপার হিসাবে। ঠিক যেমন কোনও একটি বিশেষ সমাজে জনগণের জীবনযাত্রার ধারার চরিত্র মূলত নির্ধারিত হয় উৎপাদনের পদ্ধতি দ্বারা, সেইভাবেই অন্য সমস্ত সামাজিক ব্যাপারও শেষ পর্যন্ত উৎপাদন পদ্ধতির উপরই নির্ভরশীল এবং তা থেকেই উদ্ভূত হয়।

কাজেই প্রত্যেক সমাজের সহজাত ব্যাপারগুলির আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও পারস্পরিক সংযোগ কতকগুলি বিধান অনুযায়ী উদ্ভূত হয়। সামাজিক জীবনের সব কটি দিক অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পর সংযুক্ত এবং শেষ পর্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কগুলির অধীন। উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের ও সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি; এই পদ্ধতি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের গোটা আভ্যন্তরীণ কাঠামোকে নির্ধারণ করে। সেই কারণে লেনিন এই বলে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের চরিত্র নির্ধারণ করেছিলেন যে এগুলি এক-একটি একক, অখণ্ড "সামাজিক জৈব কাঠামো।" অর্থাৎ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও ভিতর থেকে পরস্পর সংযুক্ত সামাজিক ঘটনাবলী ও সম্পর্কের এক ব্যবস্থা। সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন কতকগুলি পৃথক পৃথক ব্যাপারের সমষ্টি নয়, যান্ত্রিকভাবে আহরিত নানাজাতীয় সামাজিক ব্যাপারের একটি পিণ্ড নয়, একটি অখণ্ড সামাজিক ব্যবস্থা যার প্রত্যেকটি অঙ্গকে (অর্থাৎ নানা ধরনের সামাজিক ব্যাপারগুলিকে) স্বয়ং সম্পূর্ণ হিসাবে, বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখলে চলবে না, দেখতে হবে কেবল অপরাপর সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে সংযুক্ত করেই, কারণ সমাজের ক্রিয়ায় ও বিকাশে এর প্রত্যেকটি এক-একটি নির্দিষ্ট ও অনন্য ভূমিকা নেয়। সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনের ধারণার মধ্যে এই অখণ্ডতাই প্রকাশিত হয়। এক-একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে সমাজের সব কটি দিকই এই ধারণার মধ্যে বিরাজ।

করে। সমাজের চরিত্রায়ন করে যে বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি তা থেকে শুরু করে সমাজের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারা সকলের সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য।

সমাজের ইতিহাস পৃথক পৃথক দেশের এবং নানাবিধ ভৌগোলিক ও ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বসবাসকারী নিজ নিজ বিশেষ নরগোষ্ঠীগত, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পৃথক পৃথক জাতির ইতিহাস নিয়ে গঠিত। ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, তার দরুন কিছু কিছু দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদের ধারণা হয়েছে যে ইতিহাস কখনও আপন পুনরাবৃত্তি করে না এবং সমস্ত ঘটনা ও ব্যাপার একেবারেই আলাদা আলাদা, আর ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের কর্তব্য হতে পারে কেবল এই সব আলাদা আলাদা ঘটনার বর্ণনা দেওয়া এবং কোনও একটা আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেগুলির মূল্যায়ন করা। ইতিহাস সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা বিষয়ীগত হতে বাধ্য, কারণ ইতিহাসকে বিচার করার জন্য যে সব আদর্শ ও মূল্যবোধ বেছে নেওয়া হয় সেগুলি এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারমূলক হয় এবং ইতিহাস নির্ধারণ করার জন্য কোন্‌টা অত্যাবশ্যক ও চূড়ান্ত এবং কোন্‌টা উপজাত ও গৌণ সেই বিষয়গত মানদণ্ডটিই হারিয়ে যায়।

সামাজিক সম্পর্কগুলির সমষ্টির মধ্যে থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচায়ক হিসাবে উৎপাদন সম্পর্ককেই আলাদা করে বেছে নেবার ভিতর দিয়েই সমাজের মার্কসবাদী তত্ত্ব এই বিষয়ীবাদকে কাটিয়ে ওঠে। উৎপাদন সম্পর্কই সমাজ-জীবনে মুখ্য ও গৌণ বিচার করার বিষয়গত মানদণ্ড যুগিয়েছে। বিভিন্ন দেশের ব্যবস্থাবলীর মধ্যে পুনরাবৃত্তি ও নিয়ম শাসন এবং ঐতিহাসিক বিকাশের একই স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এর ভিতর দিয়েই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যথা—ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক সংগঠনের রূপ ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই তিনটি দেশেরই কতকগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি হল শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব, শোষণের সম্পর্ক ও পণ্য-ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির অস্তিত্ব, এবং ফলত এই দেশগুলির বুর্জোয়া সমাজের স্তরে থাকা ও ধনতান্ত্রিক গঠনেরই অঙ্গ হওয়া। এইভাবে বিজ্ঞান তুলনা করার একটা ব্যাপক ক্ষেত্র পাচ্ছে, দেশ ও জাতিসমূহের ইতিহাসের মধ্যে থেকে সাধারণ কোন্‌টি তা বেছে নিচ্ছে

পারছে এবং এই ভিত্তিতে এদের বিকাশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকেও আরও নিবিড়ভাবে সূত্রায়ন করার সুযোগ পাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন ও বিকাশের বিশ্লেষণের পক্ষেও এই দৃষ্টিভঙ্গি সমানই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণে উত্তরণ প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব নির্দিষ্ট বিধানসহ একটি নতুন সামাজিক গঠন, অর্থাৎ কমিউনিস্ট গঠনের বিকাশ। যে সমস্ত দেশ সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ ধরেছে সে সব দেশেই এই সব বিধান চালু এবং এগুলির সর্বজনীন প্রযোজ্যতা রয়েছে। আবার প্রতিটি দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হয় তার ঐতিহাসিক ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এবং বলা বাহুল্য, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দাবি করে যে এই দুটি উৎপাদনকেই বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে এবং কোনওটিকেই নিঃশর্ত করা চলবে না। জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অতিরঞ্জিত করলে "সমাজতন্ত্রের জাতীয় পথ"কে নিঃশর্ত করার অবস্থায় পৌঁছে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে এই পথকে মনে করা হয় অপরাপর দেশে সমাজতন্ত্রের বিকাশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ। এ থেকে আবার দাঁড়ায় কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য অন্যের ক্ষেত্রে অস্বীকার করায় এবং কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশের নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার ঝোঁকের পক্ষে যুক্তি খাড়া করায়। এ জাতিসর্বস্ব মনোভাবকে উৎসাহ যোগায় এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ঐক্যকে ব্যাহত করে। পক্ষান্তরে জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করা এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ বিধান ও বৈশিষ্ট্যগুলি মতান্ধভাবে আঁকড়ে থাকা কোনও একটি নির্দিষ্ট জাতির ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করায় নিয়ে যেতে পারে। অতএব ইতিহাসে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সমস্যাটির তত্ত্বগত ও সাধারণ সমাজতত্ত্বগত তাৎপর্য ছাড়াও ব্যবহারিক রাজনৈতিক গুরুত্বও আছে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ধারণা কেবল ইতিহাসের বিকাশের একই স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি যেছে বের করাই সম্ভবপর করে না, একটা ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে আর একটা ঐতিহাসিক পর্যায়কে তফাত করাও সম্ভবপর করে। প্রত্যেকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন মানবসমাজের বিকাশে এক-একটা নির্দিষ্ট স্তর।

সমাজের ইতিহাস হল সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলির বিকাশের এবং একটার জায়গায় আর একটা আসার ইতিহাস। সম্পত্তির (উৎপাদন সম্পর্কের) প্রচলিত রূপ অনুসারে পরস্পর থেকে তফাত করে দেখার মত পাঁচটি মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের কথা মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা সাধারণত বলে থাকেন, সেগুলি হল : আদিম কমিউন, দাস, সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট। আদিম কমিউন ব্যবস্থায় মানুষের অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং মানব সমাজের আরও বিকাশের পূর্বসর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। একে সরিয়ে দিয়ে স্থান দখল করেছিল পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী সমন্বিত গঠন, অর্থাৎ দাস, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ; এগুলির বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক অসাম্য; মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্রেণী-বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত শেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন হল ধনতন্ত্র। একে স্থানচ্যুত করে এল বিরোধ-বিহীন কমিউনিস্ট গঠন, তার ভিত্তি হল সমতা ও ভ্রাতৃত্ব, প্রকৃতিকে বশে আনা ও মানুষের সর্বাত্মক বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একত্রে জীবনযাপন ও একত্রে কাজ করায় মানুষকে মানুষের সাহায্য করা।

এই সব গঠনগুলির পরম্পরা এমন একটা স্থির ছক নয় যা প্রত্যেক দেশের লোককে মানতেই হবে, কারণ কোনও কোনও জাতির বিকাশ ব্যাহত হয়ে থাকে; আবার কোনও কোনও জাতি একটা গোটা গঠনকেই পাশ কাটিয়ে যায়। ইতিহাস নানারকম উত্তরণশীল রূপেরও জন্ম দেয়।

ঐতিহাসিক প্রগতির মূল স্তরগুলির প্রকাশক উপোরোক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলির ছক মানবিক বিকাশের প্রধান ধারাটি উদ্ঘাটিত করে। নির্দিষ্ট ইতিহাসের পদ্ধতিবিদ্যাগত অনুশীলন এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিকতা বোঝার পক্ষে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে।

অতএব সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ধারণাটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ঐক্য ও অখণ্ডতার স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথক পৃথক দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক বিকাশের পথ যতই বৈচিত্র্যময় হোক না কেন, ইতিহাসে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি, নিয়মশাসন ও কতকগুলি বিধান আছে। উপরন্তু ঐতিহাসিক বিকাশের পৃথক পৃথক স্তরগুলি সামাজিক সম্পর্কের এক-একটি গুণগতভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা।

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন একটি নির্দিষ্ট ধরনের সমাজ,

প্রচলিত সমাজ; প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে নিজস্ব নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী চালু ও বিকাশমান একটি অখণ্ড সমাজব্যবস্থা। সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের অর্থনৈতিক কঙ্কালটি ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত হয়, কিন্তু গোটা শরীরটা, অর্থাৎ তার রক্তমাংসাদির মধ্যে অপরাপর সামাজিক ব্যাপার ও সম্পর্ক থাকে। এ সব মিলে যে জটিল কাঠামোটি হয় এখন আমাদের তার খবরাখবর নিতে হবে।

২. সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের কাঠামো, ভিত্তি ও সৌধ

প্রত্যেকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন এক-একটি নির্দিষ্ট সামাজিক জৈব-কাঠামো ; অপরাপর গঠনগুলির সঙ্গে তার গুণগত পার্থক্য আছে। কিন্তু সকল সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনেরই অথবা অন্তত অধিকাংশ গঠনেরই কিছু সাধারণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই সব সাধারণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য-গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে প্রত্যেক পৃথক পৃথক গঠন, প্রত্যেক নির্দিষ্ট সমাজ সম্বন্ধে কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুশীলন করা হবে তার নীতিগুলিকে স্থির করা যায়।

এক-একটা নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক সম্পর্ক দিয়ে এক-একটা সমাজকে চেনা যায়। সামাজিক সম্পর্কগুলি সংযোগ ও পারস্পরিক ক্রিয়ার একটা বিশেষ রূপ যা কেবল সমাজের মধ্যেই বিরাজ করে এবং জনগণের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বলতে বোঝায় উৎপাদন, রাজনীতি, মননগত জীবন ইত্যাদির ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ। এই সম্পর্কগুলিকে সামাজিক সম্পর্ক বলা হয় কেবল এই কারণে নয় যে তারা সমাজের মধ্যে বিরাজ করে, এই কারণেও বটে যে তারা বিরাট বিরাট জনসমষ্টি, সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়।

সামাজিক সম্পর্ক অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর বিভিন্ন ধরনের মধ্যে আছে ঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত, সামাজিক-মনস্তত্ত্বগত, সাংগঠনিক, নৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনও নিয়মিত পারস্পরিক সংযোগ খুঁজে পেতে হলে আমাদের মনস্থির করতে হবে কোন্ সম্পর্কগুলি মুখ্য ও কোন্‌গুলি তা থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ গৌণ।

লেনিন লিখেছিলেন যে ইতিহাসে বস্তুবাদ প্রবর্তন করে মার্কস সকল সামাজিক সম্পর্ককে বৈষয়িক ও মতাদর্শগত দুই রকমের সম্পর্কে বিভক্ত করেছিলেন; শেষোক্তটি হল প্রথমটির উপরকার সৌধ।

বৈষয়িক সম্পর্কগুলি হল উৎপাদন (অর্থনৈতিক) সম্পর্ক যার উদ্ভব হয় মানবিক ক্রিয়াকলাপের মূলগত ধরন হিসাবে বৈষয়িক সামগ্রী উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার, উৎপাদন ও ভোগের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং প্রাত্যাহিক জীবন ও পরিবারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মূল সম্পর্কগুলিও বৈষয়িক। অতএব বৈষয়িক সামাজিক সম্পর্কের ধারণাটি অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধারনা থেকে ব্যাপকতর।

সমস্ত বৈষয়িক সম্পর্কের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল যে সেগুলি সামাজিক চেতনা নিরপেক্ষভাবে বিরাজ করে এবং সামাজিক সম্পর্কের অন্যান্য সমস্ত রূপের তুলনায় সেগুলি মুখ্য। উদাহরণ স্বরূপ মূল্যের কথা ধরা যাক—মূল্য বলতে এক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদকদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বোঝাচ্ছে। মার্কসের মতে—উৎপাদিত সামগ্রী অর্থাৎ ব্যবহার মূল্যের মতই মূল্যও সমানই বিষয়গত ও বৈষয়িক। অথচ আবার মূল্য শরীরময় এমন একটা কিছু নয় যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। মূল্য হল পণ্যের উৎপাদকদের মধ্যেকার বিষয়গত বৈষয়িক সম্পর্ক। এর মানে হল সামাজিক অর্থে বৈষয়িকতাকে শরীরময়, ধরাছোঁয়ার মত একটা কিছুর অর্থে বৈষয়িকতার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক করে দেখা যায় না। অবশ্য মানব শ্রমের সাফল্যগুলির বৈষয়িক শরীরময় মূর্তরূপ ছাড়া সমাজ থাকতে পারে না। শ্রমের উপকরণ, ঘরবাড়ি, চষা ক্ষেত, পার্ক, খাল—এসবই মানুষের হাতের তৈরি, অর্থাৎ মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও ভাবধারার বৈষয়িক রূপ। কিন্তু এইগুলিই একমাত্র উপাদান নয় যা নিয়ে "সামাজিক বস্তু" অর্থাৎ সকল সামাজিক সম্পর্কের বিষয়গত ভিত্তি তৈরি হয়। এই ভিত্তি তৈরি হয় বৈষয়িক সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা, অর্থাৎ উৎপাদন ও নিজেদের আশু জীবনের পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সব সম্পর্কের উদ্ভব হয় তার দ্বারা।

সৌধগত সম্পর্ক, অর্থাৎ বৈষয়িক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত গৌণ সম্পর্কগুলিকে মতাদর্শগত সম্পর্কের সাধারণ শিরোনামায় একত্র করা যেতে পারে, এরই মধ্যে পড়ে রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ইত্যাদি সম্পর্ক। এই সম্পর্ক-

গুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে সামাজিক চেতনার ভিতর দিয়ে প্রাথমিকভাবে পার হয়েই কেবল এগুলির উদ্ভব হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কোনও সর্বহারা পার্টির সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক তৈরি হয় সচেতনভাবে ; রাজনৈতিক পার্টি তৈরি হয় সেই সদস্যদের দ্বারা যারা সচেতনভাবে তার কর্মসূচী ও কর্মকৌশল গ্রহণ করে ; এখানে ভাবধারা সংগঠনের পুরোগামী হয়। এর পাল্টা সত্য সর্বহারা শ্রেণীর মত একটা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, এই শ্রেণী তৈরি হয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তৈরি হয় সেই সব লোকদের মধ্যে থেকে যারা উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার চাপে পুঁজির মালিকদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।

বৈষয়িক ও মতাদর্শগত সম্পর্কগুলির মধ্যে তফাত করার পর এখন প্রত্যেক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের কাঠামো ও নির্দিষ্ট গুণের অর্থাৎ তার ভিত্তি ও সৌধের চরিত্রায়ন করার মত ধারণাগুলির সংজ্ঞানির্দেশে অগ্রসর হওয়া যাক।

ভিত্তি ও সৌধ হল আপেক্ষিক ধারণা।

ভিত্তি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, একটা নির্দিষ্ট সমাজের উৎপাদন সম্পর্কগুলির মোট যোগফল। ভিত্তির ধারণা বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রের বাইরেকার সামাজিক ব্যাপারগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে উৎপাদন সম্পর্কগুলির সামাজিক ভূমিকাকে প্রকাশ করে। উৎপাদন সম্পর্কগুলি বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিগুলির একটি রূপ, আবার সেই সঙ্গে সেগুলি সৌধগত রূপগুলির আধেয়ও নির্ধারণ করে।

সৌধ তিনভাগের সামাজিক ব্যাপার নিয়ে তৈরি। প্রথমত, সামাজিক ভাবধারা, মেজাজ, সামাজিক অনুভূতি. অর্থাৎ মতাদর্শ ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রাষ্ট্র, বিচারালয়, গীর্জা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, সৌধগত (মতাদর্শগত) সম্পর্কগুলি। অতএব সৌধ হল নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উদ্ভূত সামাজিক ভাবধারা, প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কগুলির মোট যোগফল। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ব্যাপার অন্তর্ভুক্ত আছে, যেগুলি তা সত্ত্বেও কতকগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সৌধ ভিত্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে "…সমাজের

অর্থনৈতিক কাঠামো সর্বদা বাস্তব ভিত্তি যোগায়, যা থেকে এগিয়েই কেবল আমরা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের বিচারপদ্ধতিগত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয়, দার্শনিক ও অপরাপর ভাবধারাগুলির গোটা সৌধের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা রচনা করতে পারি।"(১)

প্রত্যেক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনেরই নিজস্ব ভিত্তি ও সেই অনুযায়ী সৌধ থাকে। কাজেই ভিত্তির মতই সৌধও ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট চরিত্রের।

একটা নির্দিষ্ট সমাজে কি ধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে, কি কি শ্রেণী আছে তার উপর নির্ভর করে সেখানে তদনুযায়ী রাজনৈতিক, আইনগত ও দার্শনিক মতামত এবং তদনুযায়ী সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাধান্য হবে। যে দেশে রাজনীতিতে, বিচারগত ব্যবস্থায় ও মনন জগতে শ্রমজীবী জনগণের প্রধান ভূমিকা থাকে সেখানকার অর্থনীতির উপর সামন্ত ভূস্বামী বা পুঁজি-পতিদের প্রাধান্য অসম্ভব। এ রকম একটা অসামঞ্জস্য নিশ্চয়ই বেশি দিন টিকতে পারে না। সামন্ততান্ত্রিক বা বুর্জোয়া সমাজে উৎপাদন সম্পর্কগুলি হল শ্রেণী সম্পর্ক। একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে শ্রেণী প্রধান অবস্থানে থাকে স্বভাবতই সে তার রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে, এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য আইন রচনা করে ও পাশ করে এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ও ভাষান্তরে বললে গোটা সামাজিক সৌধ জুড়ে প্রধান অবস্থানে বিরাজ করে।

নির্দিষ্ট ভিত্তির চরিত্রের প্রতিফলন করে সেই ভিত্তির ভিতর যে বিরোধ রয়েছে সৌধ তদনুযায়ী সেগুলিকে প্রকাশ করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অর্থ-নৈতিক বিরোধগুলি অবধারিতভাবে সৌধের ভিতরকার বিরোধগুলির মধ্যে প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় রাষ্ট্র এবং জনগণের বিপ্লবী মনোভাব ও আন্দোলনের মধ্যে বিরোধে, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার মতাদর্শগত সংগ্রামের ভিতরে বিরোধ ইত্যাদিতে।

উপরন্তু ভিত্তি ও সৌধ উভয়ের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয়, কারণ সেখানে অতীতের অবশেষ ও ভবিষ্যতের বীজ থাকে। একই কারণে ভিত্তি ও সৌধের মধ্যেও বিরোধ দেখা দেয়, অর্থাৎ বিকাশের প্রক্রিয়ায় এই

১। এফ. এঙ্গেলস, অ্যান্টি-ড্যুরিং, পৃষ্ঠা ৩৭।

বিরোধের উদ্ভব ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে তৎকালীন প্রগতিশীল ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও আধিপত্যকারী সামন্ততান্ত্রিক সৌধের মধ্যে তীব্র বিরোধ বেধে উঠেছিল। এমনকি সামন্ততন্ত্রের পটভূমিকাতেও নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বুর্জোয়ারা তাদের মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক প্রবক্তারা অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শে ভূস্বামী ও ভূমিদাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এইভাবে তারা নিপীড়িত কৃষক ও শহুরে শ্রমিকদের ব্যাপক সমর্থনলাভে সক্ষম হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবের তরঙ্গের পর তরঙ্গে আলোড়িত হয়েছিল। সেই বিপ্লব বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও আত্মিক প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশের পথ খুলে দিয়েছিল।

আমাদের আপন কালেও ধনতান্ত্রিক সমাজ সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও সাংগঠনিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে; কিন্তু এই রকম একটা সমাজে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কগুলির উদ্ভব হতে পারে না ; কারণ সেগুলির ভিত্তি হল উৎপাদনের উপকরণে সামাজিক মালিকানা এবং সেই মালিকানা রাজনৈতিক বিপ্লব ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিরাট ধনতান্ত্রিক সৌধের (বুর্জোয়া রাষ্ট্র, মতাদর্শগত যন্ত্র, ইত্যাদি) গোটাটা ধনতন্ত্র ও তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া ধনতান্ত্রিক ভিত্তিকে স্থানচ্যুত করে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্ররা ক্ষমতা দখল করে এবং সর্বহারার একনায়কত্বের রূপে সমাজতান্ত্রিক সৌধের ভিত্তি সৃষ্টি করে। পুরানো ভিত্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, বুর্জোয়া সৌধকে ধ্বংস ও রূপান্তরিত করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের একটা নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য শ্রমজীবী জনগণ কর্তৃক এই একনায়কত্ব ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে যে প্রথমে রাজনৈতিক ও মতাদর্শ সৌধের পত্তন হয়েছে এবং পরে যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এই তথ্য কিছু বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ ও রাজনীতিবিদদের একটা নতুন অছিলা দিয়েছে।

তারা দাবি করছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আচরণ সৌধের তুলনায় ভিত্তির মুখ্যতা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু একথা সত্য নয়। নতুন রাজনৈতিক সৌধ শূন্যের উপরে গড়ে ওঠেনি। এই সৌধ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তাকে প্রকাশ করেছে। ধনতন্ত্রের গর্ভে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক পূর্বশর্ত গঠন ছাড়া, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সহজাত উৎপাদিকা শক্তিগুলি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির ভিতরকার বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই অসম্ভব হত। উপরন্তু নতুন রাজনৈতিক সৌধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির কারণ নয়, এ কেবল তা নির্মাণের একটা হাতিয়ার, এমন এক হাতিয়ার যা শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের দ্বারা তৈরি।

শেষত, সর্বহারার একনায়কত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এমন কি গোড়ার দিকেও কোনও একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়া নিশ্চয়ই ছিল না। এই রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করেছিল। বিপ্লবের জয়লাভের অব্যবহিত পরেই এই কাঠামোর উদ্ভব হয়েছিল। বিপ্লবের বিজয় ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর কোনও স্থায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নই উঠত না। অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের পরেই কেবল সৌধের রূপান্তর সম্পূর্ণ হতে পারে এবং তা হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আরও বিকাশ ও জনসাধারণের চেতনায় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জয়ের সাহায্যে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে ব্যাপক জনগণের চেতনাকে নতুন করে গড়ে তোলা, পুরানো ভাবধারা, বিশ্বাস ও নীতিবোধকে হটিয়ে নতুন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ জয়লাভ কয়েক দশকব্যাপী এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ফলত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সৃষ্টি হওয়ার পরেই কেবল সমাজতান্ত্রিক সৌধ চূড়ান্তভাবে গড়ে উঠতে পারে। কাজেই আমরা এই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বরং প্রমাণিত করে এবং সমৃদ্ধ করে।

ভিত্তির উপর সৌধের নির্ভরশীলতার কথা আমরা বিবেচনা করেছি। অর্থনৈতিক ভিত্তিই রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সৌধ ও তার উপাঙ্গগুলির আধেয় নির্ধারণ করে—এই সত্যের মধ্যেই তা প্রকাশিত। ভিত্তিতে পরি-

বর্তনের প্রভাবেই সৌধে পরিবর্তন ঘটে। পুরানো ভিত্তির উচ্ছেদ ও নতুন ভিত্তির অভ্যুদয় সমগ্র বিপুল সৌধটিকে পরিবর্তিত করে।

সেই সঙ্গেই আবার এই সৌধ ভিত্তি থেকে একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা ভোগ করে। যান্ত্রিক নির্ভরশীলতার একটা ব্যবস্থা যতটা কঠোর ও ঘনিষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় একটা সামাজিক ব্যবস্থা কখনই ততটা হতে পারে না। শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের পরস্পর সংবন্ধতা, অর্থনীতি ও নানাবিধ মতাদর্শের মধ্যে অন্তর্বর্তী যোগসূত্রগুলির জটিল ব্যবস্থা ইত্যাদির মারফত ভিত্তি সৌধকে প্রভাবিত করে। জনগণ ও সামাজিক শ্রেণীগুলি ইতিহাস সৃষ্টি করে। তারা ভিত্তিকে পরিবর্তিত করে, বিপ্লব সম্পন্ন করে, সৌধকে পরিবর্তিত করে, কর্মনীতি রচনা করে, নতুন নতুন ভাবধারা সৃষ্টি করে ও মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে। কাজেই ভিত্তির উপর সৌধের নির্ভরশীলতাকে অতি-সরল করে দেখা অথবা আপনা-আপনি হয়ে যাবে এমন একটা ব্যবস্থা হিসাবে বোঝা উচিত নয়। সৌধতে যা কিছু পরিবর্তন হবে তা অর্থনৈতিক কারণেই হবে একথা ধরে নেওয়া ভুল। সৌধের উপাদানগুলির মধ্যে নানাবিধ পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে। তা থেকে যে সব ফলাফল হয় তা কখনও কখনও অর্থনীতিগতভাবে নির্ধারিত হয় না। চূড়ান্ত বিচারেই কেবল অর্থনীতি সামাজিক সৌধকে নির্ধারিত করে।

সৌধ সর্বদাই একটা সক্রিয় শক্তি ও সেই হিসাবে তা আপন ভিত্তিসহ সামাজিক জীবনের সকল দিককে প্রভাবিত করে।

সৌধের সামাজিক ভূমিকা হল তার ভিত্তিকে রক্ষা করা, দৃঢ়তর করা ও বিকশিত করা। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে যে শ্রেণী অর্থনীতিতে আধিপত্য করে সৌধ তার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রাধান্য নিশ্চিত করে। সমাজ-তান্ত্রিক সৌধ শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতা নিশ্চিত করে, সেখানে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেয় শ্রমিকশ্রেণী। এই সৌধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকশিত ও সুদৃঢ় করতে এবং কমিউনিস্ট সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সৌধ কেবল একটা মতাদর্শগত শক্তি নয়। আমরা আগেই বলেছি যে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সামাজিক ভাবধারা এবং রাজনৈতিক, আইনগত ও অপরাপর প্রতিষ্ঠান উভয়েই। এই সব প্রতিষ্ঠানের রূপ হয় রাজনৈতিক

দল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ইত্যাদি। রাষ্ট্রের মত একটা রাজনৈতিক সৌধ কেবল মতাদর্শের উপর নির্ভর করে না, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু রূপের উপরও নির্ভর করে। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে ; তার মধ্যে সৈন্য-বাহিনী, পুলিশ, বিচারালয়, কারাগার প্রভৃতির মত বৈষয়িক উপাদানও থাকে।

বর্তমান যুগে ইতিহাসে একটা সক্রিয় উপাদান হিসাবে সৌধের ভূমিকা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বুর্জোয়া সৌধের ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য জনগণের উপর সর্বপ্রকারে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব খাটান, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা, সামাজিক বিরোধগুলিকে ঠেকান, সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রতিযোগিতা তীব্রতর করা। অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সৌধ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার সংগে সংগে নতুন সমাজ গড়ে তোলার সৃজনশীল লক্ষ্য পূরণ করে। নতুন সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাই সমাজতান্ত্রিক সৌধের বর্ধিত সক্রিয়তার কারণ এবং এই প্রয়োজনীয়তা দিয়েই সেই সক্রিয়তার ব্যাখ্যা মেলে।

সৌধের নিজের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে; ভিত্তিতে যে সব বদল হয় সেগুলির সংগে খাপ খাইয়ে নেবার একটা প্রক্রিয়া সৌধের মধ্যে চলে। একথা সুস্পষ্ট যে সৌধ যত বেশি ভিত্তির সংগে মিল রাখতে পারবে ভিত্তিকে সে তত কার্যকর-ভাবে প্রভাবিত করতে পারবে।

সমাজতান্ত্রিক সৌধ অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির বিকাশে সাহায্য করার সংগে সংগে নিজেও এমন নতুন নতুন রূপ নেয় যা এই সব সম্পর্কের নতুন স্তরের সংগে, বৈষয়িক উৎপাদন ও সংস্কৃতির নতুন স্তরের সংগে আরও বেশি সংগতিপূর্ণ। এর ভিতর দিয়ে সে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি বিকাশের আরও কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়।

ভিত্তি ও সৌধ যে কোনও সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের মৌলিক কাঠামোগত উপাদান। এগুলি সেই গঠনের গুণগত অনন্যতার চরিত্র নির্দেশ করে, অন্য গঠনের থেকে তার কোথায় তফাত তা দেখিয়ে দেয়। এক-একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে ভিত্তি ও সৌধ ছাড়াও

সামাজিক জীবনের আরও উপাদান থাকে (যথা—দৈনন্দিন ব্যাপার, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি), কিন্তু একটা সম্পূর্ণ সামাজিক জৈবকাঠামো হিসাবে কোনও একটা গঠনের নির্দিষ্ট চরিত্র এই ভিত্তি ও সৌধই ঠিক করে দেয়।

৩. ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ঐক্য ও বৈচিত্র্য

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলির বিকাশ এবং একটার জায়গায় অন্যটা বসা ইতিহাসের প্রগতিশীল ধারা নির্ধারণ করে। উৎপাদন পদ্ধতির একটা দিক অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তিগুলি হল সেই উপাদান যা সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে, নিম্নতর থেকে উচ্চতর স্তরে সেই বিকাশের গতিমুখ নির্ধারিত করে। উৎপাদন পদ্ধতির অপর দিকটি অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কগুলি ঐতিহাসিক বিকাশে ছেদকে প্রকাশ করে। অচল উৎপাদন সম্পর্কগুলির বিলোপ হয় এবং তার জায়গা নেয় উচ্চতর ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক এবং উচ্চতর গঠন। অতএব একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের উদ্ভব ও বিকাশ, উচ্চতর গঠনে উত্তরণ হয় উৎপাদিকা শক্তিগুলির চরিত্র ও বিকাশের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কগুলির সঙ্গতির যে বিধান তারই ক্রিয়ার দরুন। গঠনগুলির বিকাশে ও একটি জায়গায় আর একটি বসার একটা প্রবণতা হিসাবেই এই বিধান আত্মপ্রকাশ করে।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে একেবারে গোড়া থেকেই মানুষ সর্বদা সমাজেই বাস করেছে ও বিকশিত হয়েছে। প্রথমে এ জিনিসটা ঘটে এক একটা ক্ল্যান (গোষ্ঠী) বা ট্রাইবের ক্ষুদ্র পরিসরে। ট্রাইব আবার একটা নরগোষ্ঠীগত সম্প্রদায়ও বটে, তার আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ট্রাইব উৎপাদনেরও একটা ইউনিট, কারণ ট্রাইবের লোকেরা জীবিকা অর্জনের জন্য এবং সামাজিক সংগঠনের একটা রূপ ও ভাষাগত ঐক্য পাবার জন্য যৌথভাবে কাজ করত। প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিগুলির সামনে পৃথক পৃথক ব্যক্তির দুর্বলতার জন্যই যৌথ কাজের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত। বাঁচার জন্যই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হত।

মানবজাতির জীবনের এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল যৌথ ক্রিয়াকলাপ

(শ্রমবিভাগ কেবল বয়স ও স্ত্রী-পুরুষভিত্তিক), বণ্টনে সমতা, কঠোর ট্রাইবাল নিয়মকানুন (ধর্মীয় নিষেধ) ও প্রতি ব্যক্তির এগুলি সম্পূর্ণ মেনে চলা এবং বাঁচার জন্য দৈনন্দিন কঠোর সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তরুণতর প্রজন্মকে তৈরি করার একটা বিস্তারিত ব্যবস্থা। এই পর্যায় চলেছিল হাজার হাজার বছর ধরে। এখানে উৎপাদনের স্তরের উপর জীবন-যাত্রার ধারার এবং সম্পর্কগুলির গোটা ব্যবস্থাটির নির্ভরশীলতা একেবারে আদিম সারল্যে প্রতিভাত। আদিম কমিউন গঠনটি সর্বত্র চালু ছিল। তা সত্ত্বেও এর কাঠামোর মধ্যে আস্তে আস্তে উৎপাদিকা শক্তিগুলি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। মানুষের শ্রম ক্রমশই বেশি করে উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠেছিল, কৃষি ও পশুপালনের মধ্যে কৃষি ও কারিগরির মধ্যে শ্রম বিভাগ হয়েছিল ; ট্রাইবগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নতুন রূপ অর্থাৎ বিনিময় শুরু হয়েছিল ; শ্রমের উপকরণগুলি ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়েছিল এবং উৎপন্ন জমিয়ে রাখা, সেগুলির পুনর্বণ্টন করা ও সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে সম্পদ সঞ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল। এই সম্পদের একটা উপাদান ছিল মানুষ নিজেই; কারণ শ্রমশক্তি শোষণ করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়ে উঠেছিল। কৃষির প্রয়োজন ছিল সুস্থিত জীবনযাত্রা, কারিগরির বিকাশ ও তার দরুন অনেক রকমের বিভিন্ন পণ্যের আবির্ভাব লোকেদের আরও ব্যাপক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে ও শহরে বসতি পত্তন করতে সক্ষম করেছিল। এই সমস্ত অবস্থার দরুন আদিম গোষ্ঠীগুলি ক্ষয় হতে লাগল এবং আদিম সাম্যের সম্পর্কও ভেঙে পড়ল ; তার জায়গায় এল শ্রেণী-সমাজ ও সেই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ।

শ্রেণী-সমাজ সর্বত্র একসঙ্গে আবির্ভূত হয়নি। এর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল ইয়াংৎসে ও হোয়াংহো, নীল ও গঙ্গা, আমুদরিয়া ও শিরদরিয়ার উপত্যকায়। এই সব অঞ্চলের উর্বর ও সহজে আবাদযোগ্য জমি, এমনকি কেবল আদিম কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যেও তুলনামূলকভাবে ভাল ফসল দিত, আর তাই এই সব জায়গাতেই আদিম কমিউনের প্রথম পতন শুরু হয় এবং দাসপ্রথার আবির্ভাব হয়।

দাস-মালিকানার গঠন সেখানেই আবির্ভূত হল যেখানে দাসপ্রথা সামাজিক উৎপাদনের ভিত্তি হয়ে উঠল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে (গ্রীস ও

তার উপনিবেশগুলি, কার্থেজ, রোম ও রোমক সাম্রাজ্য) দাসপ্রথা সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছিল ও তার নির্ভেজাল রূপ নিয়েছিল। প্রধানত যুদ্ধজয়ের ভিতর দিয়েই দাস জোগাড় হত এবং দাসদের ব্যাপক শোষণই দাসমালিকদের সম্পদের উৎস হত। প্রাচীন দুনিয়ার সমগ্র সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতি দাসশ্রমের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল।

সাধারণত গ্রীস ও রোমকে "আদর্শ" ধরে নিয়েই আমরা সমগ্র গঠনটির বিচার করি। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ সঠিক নয়। ভারত, চীন এবং নিকট প্রাচ্যের অনেকগুলি দেশে বিকাশ কিছুটা ভিন্নরূপে হয়েছিল। সে সব জায়গায় গ্রীস ও রোমের মত অত ব্যাপকভাবে দাসপ্রথা গড়ে ওঠেনি। আপেক্ষিকভাবে বিচ্ছিন্ন কৃষিভিত্তিক কমিউন ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্র নিয়ে তৈরি একটা ব্যবস্থা—যেখানে এই রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক ভূমিকা ছাড়াও কৃষি যার উপর নির্ভরশীল ছিল সেই সেচব্যবস্থা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের অর্থনৈতিক ভূমিকাও নিত—আর এই ব্যবস্থার অনুসঙ্গী হিসাবে কঠোর জাতিভেদ প্রথা এই মিলে একটা বিশেষ ধরনের সমাজ গড়ে তুলত। এই ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল একটা উৎপাদন পদ্ধতি কার্লমার্কস যার নাম দিয়েছিলেন <u>এশীয়</u>। এশিয়াতে ও আফ্রিকার কিছু দেশে (মিশরে) বিরাজমান এই ধরনের সমাজ ছিল শোষক ও শোষিতে বিভক্ত একশ্রেণীর সমাজ, কিন্তু এর মধ্যে কমিউন-সুলভ সম্পর্কের ও কিছু কমিউন-সুলভ রূপের উল্লেখযোগ্য রেশ বজায় থাকত, আর এই বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হত ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার নিম্ন স্তরের মধ্যে।

এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহের সংজ্ঞার ব্যাপারটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অনুশীলনের বস্তু। এই উৎপাদন পদ্ধতি একটি বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন কিনা তা নিয়ে ইতিহাসবিদরা গবেষণা করছেন। সে যাই হোক না কেন, একথা স্পষ্ট যে এ একটা বিশেষ ধরনের সামাজিক সংগঠন, যা অত্যন্ত মন্থর এবং পরিবর্তন ও বিকাশ-বিমুখ। তখনকার দিনের গতিশীল ভূমধ্যসাগরীয় দুনিয়া থেকে এই বৈশিষ্ট্যই এশীয় সমাজকে বিশেষ করে পৃথক করেছিল।

এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি ও দাসপ্রথার তুলনায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ একটা উচ্চতর সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন। শ্রমের ব্যক্তিগত হাতিয়ার, কারিগরি

কাজ, কৃষি ও পশুপালন প্রভৃতি একই জিনিস এই সমাজের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি, কিন্তু সেগুলি উচ্চতর স্তরে উন্নত।

দাস সমাজের তুলনায় প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের মধ্যে শ্রম সম্পর্কে কিছুটা বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের পক্ষে খানিকটা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সামন্ততন্ত্র পূর্বতন গঠনগুলির চেয়ে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ব্যাপকতর সম্ভাবনা খুলে দিয়েছিল।

আবার এদিকে সামন্ততন্ত্রে একটা স্থবির সমাজও ছিল। ছকবাঁধা প্রযুক্তি-বিদ্যা, স্থানীয় বিচ্ছিন্নতা ও পৃথক পৃথক থাকার প্রবণতা, যানবাহন ও যোগাযোগের সুযোগ না থাকা, সমস্ত রকম ক্রিয়াকলাপের উপর অনড় হুকুমদারি ও নিয়ন্ত্রণ, এস্টেটগুলির (আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী মর্যাদা বিভাগ) উঁচুনীচু অনুযায়ী ভাগ, প্রচলিত রীতিনীতির ভারী বোঝা, গীর্জা কর্তৃক আত্মিক জীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ধর্মের আধিপত্য সমস্ত প্রগতিশীল পরিবর্তনকে আটকে রাখত। জীবন ছিল চাকায় বাঁধা, অনড় ছন্দে গাঁথা।

কিন্তু ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীরে জীবনের নতুন সামাজিক রূপের মধ্যে ভেঙে বেরোনর বৈষয়িক পূর্বশর্ত সঞ্চিত হতে থাকল। শ্রম-বিভাগের বিকাশ, পণ্য-মুদ্রা সম্পর্কের উদ্ভব, নতুন বাজার দেখা দেওয়া ইত্যাদি নতুন উৎপাদিকা শক্তি, সহযোগিতা ও হস্তশিল্পশালার বিকাশ নিয়ে এল। তা আবার যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনের আবির্ভাবের পথ সুগম করল। নতুন উৎপাদিকা শক্তিগুলি নিজেদের বিকাশের সুযোগের জন্য নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপ দাবি করল। এইভাবে সামন্ততন্ত্র এক নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল—সে হল ধনতান্ত্রিক সমাজ।

ধনতন্ত্রের আমলে ইতিহাস প্রকৃত অর্থে বিশ্ব ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল। বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ভূখণ্ডের পূর্বতন বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত হল এবং এই প্রথম অর্থনীতির একটা একক বিশ্ব-ব্যবস্থা দেখা দিল, একক বিশ্ববাজারের উদ্ভব হল।

ধনতন্ত্রের বিকাশের উৎস ও ভিত্তি হল মেশিন উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত উৎপাদিকা শক্তিগুলি। এই পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের

হার বিপুল বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই বিকাশ আবার বিরোধসংকুল রূপ ধরে এগোয়, কারণ এবং ভিত্তি হল উদ্বৃত্ত মূল্য অর্থাৎ শ্রমিকদের বিনামূল্যে শ্রম ধনিকদের দ্বারা আত্মসাৎ করা। প্রতিযোগিতা, মুনাফার জন্য কামড়া-কামড়ি, উৎপাদনের নৈরাজ্য এবং মাঝে মাঝে সংকট এইগুলিই হল ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য।

অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যে ধনতন্ত্র অনেকগুলি স্তরের ভিতর দিয়ে যায়। গোড়ার দিককার ধনতান্ত্রিক সঞ্চয় থেকে শুরু করে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের, রাষ্ট্রীয় এক-চেটিয়া ধনতন্ত্রের যুগে পেঁছায়।

ধনতন্ত্র সম্পর্কে মার্কস-এর বিশ্লেষণের ধারা ধরে লেনিন দেখিয়েছিলেন যে স্বাধীন প্রতিযোগিতা থেকে একচেটিয়ায় উত্তরণ, অর্থপুঁজির সর্বময় ক্ষমতা—যা বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে আপন নিয়ন্ত্রণে আনে—তাতে উত্তরণ বন্ধতা ও ক্ষয়ের প্রবণতার শুরুর সূচনা করে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে ধনতন্ত্রের পতন ঘোষণা করে। কিন্তু বন্ধতার এই প্রবণতাকে উৎপাদনের বিকাশের সম্পূর্ণ থেমে যাওয়া হিসাবে দেখা আদৌ চলবে না। বরঞ্চ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থনৈতিক বিকাশের উচ্চহার সম্ভবপর করে তোলে। কিন্তু ধনতন্ত্রের আমলে এই বিকাশ অত্যন্ত অসমভাবে হয়। কিছু কিছু ধনতান্ত্রিক দেশ অথবা একচেটিয়া গোষ্ঠী মুনাফার জন্য দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অপরদের হারিয়ে দেয়, তার ফলে শক্তিবিন্যাস বদলে যায় এবং বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। সাধারণভাবেই সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের সমস্ত বিরোধকে তীব্রতর করে, যথা সমরবাদ, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া প্রভৃতিকে জাগিয়ে তোলে। এই সব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকেই দুর্বল করে দেয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে।

পরবর্তী ঘটনাবলী লেনিনের সিদ্ধান্তগুলিকে সঠিক প্রমাণিত করেছে। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে অবশ্য বুর্জোয়ারা তাদের টলমল অবস্থাকে সামলানর জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যে অর্থনৈতিক প্রলয় তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ফেলতে পারে তা এড়ানর জন্য তারা উৎপাদন ও ভোগের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যাগত বিপ্লবের অগ্রগতি থেকে ফয়দা তোলার চেষ্টা করে এবং অর্থনৈতিক

একীকরণ ঘটানর চেষ্টা করে। কিন্তু উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও আত্মসাতের ব্যক্তিগত রূপের মধ্যেকার বিরোধ, শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার বিরোধ, একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাপক মেহনতী মানুষের বিরোধ, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ ইত্যাদির মত ধনতন্ত্রের মৌলিক বিরোধগুলির সমাধান এসব চেষ্টার মারফত হতে পারে না। বরঞ্চ বুর্জোয়ারা যে সব ব্যবস্থা নেয় সেগুলি কেবল ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির সামাজিক চরিত্রকে বাড়িয়ে দেয়; ফলে আধুনিক উৎপাদিকা শক্তিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটা ব্যবস্থায় অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তাকেই বাড়িয়ে দেয়।

ধনতন্ত্র মানব ইতিহাসের একটা দারুণ পর্যায়ে চূড়ান্ত স্তর। সে পর্যায় হল শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের পর্যায়। এই পর্যায়ে সমস্ত বড় বড় সমস্যার মীমাংসা হয় সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে তীব্র সংগ্রামের গতিপথে। এই সংগ্রাম সমস্ত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হয়। কারণ শ্রেণীগুলো নিজেরা বদলে যায়, তেমনি বিরোধগুলোও বদলায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক বিকাশের রকমটা তাদের সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ন থাকে। সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যেকার বিরোধের বিভিন্ন রূপ থেকেই, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রামের থেকেই তা এগোয়।

মানব দাসত্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর রূপ দাসপ্রথা থেকে শুরু করে শ্রেণীগঠনগুলির ইতিহাস শোষণের রূপের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে; প্রত্যক্ষ করেছে অর্থনৈতিক নয় এমন সব রূপের জায়গায় অর্থনৈতিক রূপের বাধ্যবাধকতার প্রবর্তন, উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপের ফল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উৎপাদন এবং উৎপাদনের উপকরণের মালিক উভয়ের মধ্যেই বৈষয়িক আগ্রহের বিকাশ।

মানব ইতিহাসের এই স্তরের একটা বিরাট সাফল্য হল প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিপুল অগ্রগতি। এইসব মানুষকে অভাবিত তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছে এবং সামাজিক বিরোধগুলিকে জয় করার ও সামাজিক অস্তিত্বের মৌলিকভাবে এক নতুন স্তরে এগোবার পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছে।

যেমন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর, অর্থাৎ আদিম কমিউন গঠনের ফল হয়েছিল মানবজাতির অভ্যুদয় এবং তার সামাজিক বিকাশের পূর্বশর্ত

সৃষ্টি। আদিম সমাজ সৃষ্টি করে মানুষ প্রকৃতির থেকে ভেঙে বেরিয়েছিল এবং "প্রাকৃতিক অবস্থা" থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিকাশের চূড়ান্ত ফল হল বিজ্ঞান ও বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশের এমন এক স্তরে পৌঁছোন যা মানুষকে সক্ষম করে প্রকৃতির শক্তিগুলির উপর নিজের হুকুম কায়েম করতে।

ইতিহাসের নতুন স্তরের অর্থাৎ কমিউনিস্ট গঠনের লক্ষ্য হল মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উপর তার নিজের আধিপত্য কায়েম করা এবং বৈষয়িক ও অ-বৈষয়িক উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিকাশের ভিত্তিতে নিজেকে সামগ্রিক-ভাবে বিকশিত করা, কমরেড-সুলভ সহযোগিতা ও কমিউনিস্ট পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ককে বিকশিত করা।

এই হল বিশ্ব ইতিহাসের অমোঘ গতি। বর্তমানে ধনতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ ঘটেছে বিশ্ব পরিসরে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের অস্তিত্বের সুদীর্ঘ পর্যায়ের অবসান হতে চলেছে এবং একটা নতুন গঠনের অভ্যুদয় ঘটছে। মানবজাতির ইতিহাসে এই নতুন যুগের সূত্রপাত করেছে রাশিয়ার মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তারপর সমাজতন্ত্র কেবল একটা দেশের সীমানা অতিক্রম করে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। কঠোর সংগ্রাম, বহু বাধাবিঘ্ন ও বিরোধের মধ্য দিয়ে নতুন দুনিয়ার জন্ম হচ্ছে। এই দুনিয়া এগিয়ে চলেছে, সে ভুল করছে, আবার আপন গতিপথে তার সংশোধন করছে, বিকাশের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ করছে, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করছে—এসবের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র ইতিমধ্যে আপন আসন দৃঢ়ভাবে কায়েম করছে, আর ইতিহাসের রথচক্রকে পিছনে ফিরিয়ে দেবে দুনিয়ার এমন কোনও শক্তি নেই।

বৈষয়িক উৎপাদনের গতির সাধারণ বিধান দ্বারা ঐতিহাসিক বিকাশ যতটা নির্ধারিত হয় সেই পরিমাণে এই বিকাশের সাধারণ ধারাটিকে আমরা পরীক্ষা করলাম। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি ব্যাপারে সামাজিক বিকাশের ব্যাখ্যা করেছি। মূর্ত ইতিহাস অনেক বেশি সমৃদ্ধ, আর তা অনেক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত যেগুলির পরিবর্তন

হয় ও এই প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন ঘটায়। কাজেই এই প্রক্রিয়াকে একটি একক রেখায় অগ্রসরমান একটা কিছু বলে ধরে নেওয়া চলে না। ঐতিহাসিক বিকাশ বহুশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ঘটে এবং তাকে তার সুনির্দিষ্ট রূপে বুঝতে হলে এই পারস্পরিক ক্রিয়ায় অবদানরত সমস্ত অপরিহার্য উপাদানগুলিকে বিচার করে দেখা অবশ্য কর্তব্য। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নির্দিষ্ট ইতিহাস অধ্যয়ন করার পদ্ধতি যোগায়, কারণ এ কেবল ইতিহাসের ঐক্যকেই এবং তার সাধারণ ধারাকেই উদ্ঘাটিত করে না; উপরন্তু তার বৈচিত্র্যকে কেমন করে বুঝতে হবে তাও আমাদের দেখিয়ে দেয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতর বিকৃতির বিরুদ্ধে এবং নির্দিষ্ট ইতিহাসের উপর চাপিয়ে দেবার জন্য এর প্রতিপাদ্যগুলিকে ছক-বাঁধা অনড় সূত্রে পরিবর্তিত করা ও নির্দিষ্ট তথ্যের বিচার-বিবেচনার জায়গায় সেইগুলোকে বসিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা অনেকবার হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। যেমন এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "…ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী বাস্তব জীবনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ইতিহাসকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের উপাদান। মার্কস বা আমি কেউই কখনও এর বেশি দাবি করিনি। কাজেই কেউ যদি একে বিকৃত করে বলে যে অর্থনৈতিক উপাদানই একমাত্র নির্ধারক উপাদান তা হলে সে এই প্রতিপাদ্যকে একটা অর্থহীন, অনপেক্ষ, বোধভাষ্যহীন বুলিতে পরিণত করে।"(১) এঙ্গেলস এই সঙ্গে আরও বলেন যে সৌধের বিভিন্ন উপাদান, মতাদর্শ ইত্যাদি বিকাশের গতিপথকে প্রভাবিত করে। এই ঐতিহাসিক পারস্পরিক ক্রিয়াকে যদি আমরা অগ্রাহ্য করি এবং যে সব অসংখ্য আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা পথ করে নেয় সেগুলিকে দেখতে অসমর্থ হই তাহলে "…ইতিহাসের যে কোনও পর্যায় সম্পর্কে এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করাটা এক অঙ্কের সরল সমীকরণের চেয়েও সোজা হয়ে যাবে।"(২)

নানাবিধ কারণ বিশ্ব ইতিহাসের সাধারণ ধারাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সমাজের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের কথা আমরা

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৭।

২। পূর্বোক্ত, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৭।

আগেই উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে সমাজ বিকাশের গোড়ার স্তরে বিশ্ব ইতিহাসের গতিপথ অসম করায়, কিছু দেশের অগ্রগতি অপর কিছুর পশ্চাদ-পদতা আনায় ভৌগোলিক পরিবেশ ছিল অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। ভৌগোলিক অবস্থানের কল্যাণে প্রত্যেক জাতি একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশে বাস করে ও তার ফলাফলও অনুভব করে। অর্থনীতির তুলনায় যেগুলি অপ্রধান উপাদান, যথা—রাষ্ট্র, সাংস্কৃতিক মৌলিকত্ব, ঐতিহ্য, মতাদর্শ সামাজিক মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি, ইতিহাসের গতিপথের উপর সেগুলির প্রভাবও আমাদের অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ সংস্কৃতির কথা ধরা যাক। জার্মান দার্শনিক অসভাল্ড স্পেংলার এবং ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি বিচ্ছিন্ন ও স্বশাসিত সংস্কৃতির ধারণা তুলে ধরেছিলেন, যার মধ্যে বিশ্ব ইতিহাসের ঐক্যকে অস্বীকার করা নিহিত ছিল, তা ঐতিহাসিক তথ্যের পরিপন্থী। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতিগুলির এবং কেবল জাতীয় নয়, এক-একটা গোটা অঞ্চল বা মহাদেশের সংস্কৃতির মৌলিকত্বকে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ ভুল হবে। যেমন ইউরোপ ও এশিয়ার জাতিগুলির সংস্কৃতির মধ্যে যে কিছু কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বেশ কিছু মৌলিকত্ব আছে এইসব জাতির ইতিহাস অনুশীলনের সময় সেকথা কোন মতেই অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।

এক জাতির উপর অপর জাতির প্রভাবও ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যুদ্ধ ও দেশ দখল থেকে শুরু করে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মত বহুরকম রূপের মধ্য দিয়ে এই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। অর্থ-নীতি থেকে মতাদর্শ পর্যন্ত সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রেই এ হতে পারে। ইতিহাসে মতাদর্শগত প্রভাবের বিপুল গুরুত্ব দেখা গিয়েছে। যেমন ইউরোপ ও আমেরিকায় খ্রীষ্টধর্মের প্রসার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল; এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের প্রসারও অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছিল। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশ বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী মতাদর্শ প্রচারের পথ সুগম করেছে। এই মতাদর্শ এখন বিশ্ব ইতিহাসের গতিপথের উপর প্রবল প্রভাব ফেলছে।

বিশ্ব ঐতিহাসিক বিকাশের অসমতা বিবেচনার মধ্যে না রাখলে পৃথক পৃথক দেশের অনন্যতাকে বোঝা যাবে না। কোনও কোনও জাতি এগিয়ে যায়, আবার অন্য অনেকে পিছিয়ে থাকে; নানারকম সুনির্দিষ্ট কারণে কিছু

কিছু জাতি আবার এক-একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন লাফিয়ে পেরিয়ে যায়। কাজেই লিখিত ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে কেবল একটা গঠনই থাকেনি, বরং বিভিন্ন জাতি সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে থেকেছে এবং তাদের মধ্যে জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া চলেছে। তার মানে সকল জাতির ইতিহাসে গঠনগুলির একই পরম্পরা আমরা দেখতে পাইনে। যেমন মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় স্লাভ ও জার্মানিক জাতিগুলির মধ্যে এমন যুগে প্রাক-শ্রেণী ব্যবসা ভেঙে পড়ল যখন দাস-মালিকানাভিত্তিক গঠন (প্রাচীন রোম) তার সম্ভাবনা নিঃশেষ করে ফেলেছে ও তার পতনের কাল চলছে। সেই কারণে পূর্বোক্ত জাতিগুলির মধ্যে যে দাস কাঠামোর আবির্ভাব হয়েছিল তা একটা গঠনে বিকশিত হতে পারল না; মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের এই সব জাতি ট্রাইবাল ব্যবস্থা থেকেই সরাসরি সামন্ততন্ত্রে পেঁছে গেল।

ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত জাতিগুলির পারস্পরিক প্রভাব নির্ভর করে তাদের সামাজিক ব্যবস্থার চরিত্রের উপর। যেমন ধনতন্ত্রের চরিত্রের মধ্যেই একথা নিহিত আছে যে ধনতান্ত্রিক ইউরোপ তার কৃৎকৌশলগত উৎকর্ষ ব্যবহার করবে অপরাপর মহাদেশের জাতিগুলিকে দাসত্বশৃংখলে বাঁধার ও তাদের উপর ঔপনিবেশিক নিপীড়ন চালানর জন্য। ঔপনিবেশিকতা এই সব দেশের বিকাশকে কেবল ঠেকিয়েই রাখেনি, অনেক ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক গঠন একটা সংকট ও ক্ষয়ের অবস্থায় রয়েছে, এক দেশের পর আর এক দেশে তাকে হটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যে সব জাতি সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশে পিছিয়ে পড়েছিল এই যুগ তাদের অনেকের ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের স্তর এড়িয়ে সমাজতন্ত্র অভিমুখী পথ ধরার সুযোগ খুলে দেয়।

জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ধনতন্ত্রের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক একটা পথ বেছে নিয়েছে। জাতিতে জাতিতে প্রকৃত সমতা গড়ে তোলা ও প্রাক্তন পশ্চাদপদ জাতিগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ সর্বরকমে চেষ্টা করে। এই সব জাতি ভবিষ্যতে কিভাবে বিকশিত হবে? এই সব

দেশের মেহনতী মানুষদের, প্রগতিশীল ধনতন্ত্র-বিরোধী, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সামাজিক শক্তিগুলির কি ভূমিকা হবে কেবল তার উপরই এটা নির্ভর করবে না; সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক এই দুই বিশ্বব্যবস্থার সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা তার উপরও নির্ভর করবে এবং সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্র থেকে তার উৎকর্ষ কিভাবে প্রমাণ করবে, কিভাবে উন্নতিশীল দেশগুলির উপর তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক প্রভাব সক্রিয়ভাবে বিস্তার করবে তার উপরও নির্ভর করবে।

সামাজিক বিকাশের প্রগতিশীল চরিত্রকে অর্থাৎ উচ্চতর গঠন কর্তৃক নিম্নতর গঠনের স্থান দখলকে স্বীকার করলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একে কোনও মতেই একটা পূর্ব-নির্ধারিত প্রক্রিয়া বলে মনে করে না। একথা আমরা উল্লেখ করছি যে নানাবিধ কারণের একটা গোটা সমষ্টি দ্বারা ইতিহাসের বৈচিত্র্য, বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের বিকাশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হয়।

তবে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বিভিন্ন রকম হলেও প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে সামাজিক বিকাশের একটা করে প্রধান প্রবণতা আছে। এই প্রধান প্রবণতা অনুযায়ী বিশ্ব ইতিহাসের এক-একটা পর্যায়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার জন্য আমরা ঐতিহাসিক যুগের ধারণাটি ব্যবহার করি, যেমন যে কালে যে গঠনটি প্রধান হয়ে উঠেছিল সেই অনুযায়ী আমরা তাকে দাস সমাজের যুগ অথবা সামন্ততন্ত্রের যুগ বলে থাকি। আমাদের এখনকার কালে সামন্ততন্ত্রের অবশেষ এখনও অনেক দেশে দেখা যায়, কিন্তু তাই বলে বর্তমান কালকে "সামন্ততন্ত্রের যুগ" বলা হাস্যকর হবে।

প্রধান গঠনের নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গেও যুগের ধারনাটিকে সংশ্লিষ্ট করা যায়। যেমন আমরা প্রাক-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের যুগ ও সাম্রাজ্যবাদের যুগের মধ্যে তফাত করি।

লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী একটা যুগের প্রধান প্রবণতা বাছতে হলে সেই যুগে কোন্ শ্রেণী কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয় এবং সেই যুগের প্রধান আধেয়, বিকাশের প্রধান গতিমুখ ও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে বেছে বের করতে হবে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ধারণা সমাজের বিকাশের একটা বিশেষ স্তরের চরিত্র নির্ধারণ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের ধারণা তা করে না।

এই ধারণা আরও সুনির্দিষ্ট, এ ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট স্তরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যে বৈচিত্র্য হয় তাকে প্রতিফলিত করে। একই যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম গঠন বিরাজ করে। যথা— গ্রীস ও রোমের জাতিগুলি দাস-মালিকানাধীন সমাজে বাস করত, আবার তাদেরই পাশাপাশি এমন সব জাতি বাস করত যারা তখনও আদিম কমিউন ব্যবস্থার স্তরেই ছিল। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, আবার অন্য কিছু দেশে তখনও প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রইল। ঐতিহাসিক যুগের ধারণার মধ্যে ইতিহাসের কোনও নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রধানত চালু ধরন ও অন্য ধরন দুইয়েরই স্থান রয়েছে। লেনিন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রত্যেক যুগে অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী পৃথক, আংশিক নড়াচড়া হতে পারে ও হয়, নড়াচড়ার গড় ধরন ও হার থেকে নানাবিধ রকম-ফেরও হতে পারে।

শেষত, মানবজাতি যখন উত্তরণশীল পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার জীবনে যখন বিপুল পরিবর্তন ঘটছে তখন যুগের ধারণা এক সামাজিক-রাজনৈতিক গঠন থেকে আর একটায় উত্তরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। যেমন সমাজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়কে রেনেসাঁর (নবজন্ম) যুগ অথবা বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগ বলে আখ্যাত করা হয়।

বিশ্ব-ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের কালও একটা উত্তরণশীল যুগ—ধনতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের যুগ। এই উত্তরণ সমসাময়িক সামাজিক বিকাশের প্রধান প্রবণতা, এর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে ধনতন্ত্রের গোটা ব্যবস্থার সুগভীর সংকট এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের গঠন ও বিকাশ। আবার সেই সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে বর্তমানে অনেক জাতি রয়েছে যারা সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন ও অন্য স্তরে রয়েছে। তার ফলে সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে বিপুল বৈচিত্র্য দেখা যায়। সেগুলির মৌলিক সমাধান কেবল সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পথ ধরেই হতে পারে। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমই জাতিগুলিকে সামাজিক প্রগতির একটা উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে পারে। "বর্তমান স্তরে যখন পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশে সমাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সুস্থিত উন্নতির পথে, যখন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমাজের বিপ্লবী পুনর্নির্মাণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তিসমূহ

রয়েছে, যখন বহু দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম শোষণ ও নিপীড়নের গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হচ্ছে, তখন একথা এমনকি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সাম্রাজ্যবাদের কোনও ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ নেই।"(১) বিশ্ব-পরিসরে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে পরিণত হয়ে উঠেছে এবং তাই-ই এই যুগের মূল আধেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রেণীগুলি ও শ্রেণীসংগ্রাম

সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য বিকাশের যে সব সাধারণ বিধান তাদের মত না হয়ে শ্রেণীসংগ্রামের বিধান হল কেবল কয়েকটি মাত্র গঠনের বিকাশের বিধান। শ্রেণীবিভাগহীন আদিম কমিউন ব্যবস্থা থেকে এগিয়ে মানবজাতি বিভিন্ন শ্রেণী-বিভক্ত গঠনের ভিতর দিয়ে কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় পেঁাছায়। এই ব্যবস্থায় শ্রেণী-পার্থক্য চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হবে। সমাজের বিকাশের কতকগুলি স্তরে শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে কেন? শ্রেণী কি? সামাজিক জীবনে শ্রেণী সম্পর্কের স্থান কি?

এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর রাষ্ট্র, রাজনৈতিক সম্পর্ক ও মতাদর্শগত জীবনের মত আধুনিক পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যাপারগুলির সারমর্ম সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির চাবিকাঠি যোগায়। শ্রেণী-বিভক্ত যে কোনও সমাজ-জীবনের বিশ্লেষণে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি হল মার্কসবাদের মৌলিক পদ্ধতিগত নীতিগুলির অন্যতম। এই নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লেনিন লিখেছিলেন: "রাজনীতিতে জনগণ সর্বদাই প্রবঞ্চনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনার নির্বোধ শিকার হয়েছে এবং যতক্ষণ না তারা সমস্ত নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনীতিগত ও সামাজিক বুলি, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির পিছনকার কোনও না কোনও শ্রেণীর স্বার্থ খুঁজে বের করতে শিখবে ততক্ষণ সর্বদাই তারা তা হতে থাকবে।"(১)

১. শ্রেণীগুলির উৎপত্তি ও সারমর্ম

শ্রেণীগুলি হল সমাজ যাতে বিভক্ত এমন বড় বড় জনগোষ্ঠী। কিন্তু শ্রেণী যে সব নীতির ভিত্তিতে বিভক্ত তা ছাড়াও আরও অপরাপর নীতি আছে যার ভিত্তিতে সমাজের আরও অনেক বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিভক্ত হয়: যথা—বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন গোষ্ঠী (তরুণ ও প্রবীণ প্রজন্ম), লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি, বৃত্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন গোষ্ঠী। এর কতকগুলি

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৯, পৃষ্ঠা ২৮।

বিভাগের স্বাভাবিক কারণ আছে (যথা—বয়স ও লিঙ্গ), আবার অন্য কতকগুলির উৎস সামাজিক। জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য আপনা থেকেই সামাজিক পার্থক্য ঘটায় না, কতকগুলি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতেই কেবল এগুলি সামাজিক অসাম্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। কাজেই বর্ণগত অসাম্য ঐতিহাসিক ব্যাপার, তার উৎস প্রাকৃতিক নয়, ঐতিহাসিক। বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর তাদের চামড়ার রং বা চুলের ধরন থেকে উদ্ভূত নয়। অনুরূপভাবেই স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক অসাম্যের কারণ প্রাকৃতিক নয়, ঐতিহাসিক। ইতিহাসের প্রথম দিককার পর্যায়গুলিতে মাতৃতন্ত্রের সময়ে নারীরা সমাজে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, উৎপাদনের পরিবর্তিত ভূমিকার দরুন পরবর্তীকালে তা তারা হারিয়ে ফেলে।

সাধারণভাবে শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে স্বাভাবিক পার্থক্যের কোনও সম্বন্ধ নেই, এ বিভাগ একই বর্ণের মধ্যে, একই নরগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্যেও বিরাজ করে।

কিছু বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ সমাজের শ্রেণী-বিভাগের কারণগুলিকে খোঁজে রাজনৈতিক উপাদান, যথা—বলপ্রয়োগের মধ্যে, কিছু জাতি কর্তৃক অপর জাতি বা জাতিগুলিকে পদানত করার মধ্যে। অবশ্য শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে উত্তরণ বলপ্রয়োগ ছাড়া হয়নি। কিন্তু বলপ্রয়োগ কেবল সামাজিক অসাম্যকে ত্বরান্বিত ও গভীরতর করেছে, সে আপনা থেকে কোনও কারণ নয়। ডাকাতি দিয়ে যেমন উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার উৎসের ব্যাখ্যা হয় না, হিংসা দিয়েও তেমনি শ্রেণীগুলির উৎসের ব্যাখ্যা হয় না। ডাকাতির ফলে কিছু সম্পত্তি এক মালিকের হাত থেকে আর মালিকের হাতে যেতে পারে, কিন্তু তা নিজে থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হয় অর্থনৈতিক কারণের দরুন, যেমন প্রাচীন এথেন্সের মত জায়গা, যা কখনও বিজিত হয়নি, সেখানেও এর অস্তিত্ব ছিল।

এর উৎস হল সমাজের মধ্যে শ্রম-বিভাগ, এই শ্রম-বিভাগ তখনই হয় যখন উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগে যে সব উৎপাদকেরা নিযুক্ত আছে তারা আলাদা আলাদা হয়ে যায় এবং তাদের শ্রমের ফলগুলি পরস্পরের সঙ্গে

বিনিময় করে। প্রথম পশুপালন ও কৃষিকার্য শ্রমের বিশেষ বিভাগ হয়ে ওঠে, তারপর হস্তশিল্পগুলি কৃষি থেকে তফাত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মানসিক শ্রম কায়িক শ্রম থেকে পৃথক হয়ে যায়। সামাজিক শ্রম বিভাগ ও বিনিময় আবার উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা আনে। এই ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তির পূর্বতন গোষ্ঠীগত রূপকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করে এবং এমন সব সামাজিক গোষ্ঠীর জন্ম দেয় সামাজিক উৎপাদনে যাদের অসম স্থান হয়, অর্থাৎ শ্রেণীগুলির জন্ম দেয়। সমাজ ধনী ও দরিদ্রে, শোষক ও শোষিতে বিভক্ত হয় এবং একটা অসাম্যের অবস্থা কায়েম হয়।

শ্রেণী-বিভাগের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে স্থূল রূপ ছিল দাসত্ব। দাসত্ব যেহেতু নগ্ন শারীরিক বলপ্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, একথা মনে হতে পারে যে তা বলপ্রয়োগের দ্বারাই সৃষ্ট। কিন্তু এ ধারণা ভুল। ট্রাইবগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং শিকার ক্ষেত্র নিয়ে লড়াই ইত্যাদি শ্রেণীগুলির আবির্ভাবের ঢের আগেই হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ সামাজিক শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা উদ্বৃত্ত উৎপন্নের নিয়মিত উৎপাদন সম্ভবপর না করেছিল ততক্ষণ এসব দাসত্বের উদ্ভবে নিয়ে যায়নি।

শ্রেণীগুলি দুভাবে গঠিত হয়েছিল: প্রথমত, কমিউনের ট্রাইবাল অভিজাতদের নিয়ে গঠিত একটি ছোট গোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং পরে একটা ব্যাপকতর অংশের ধনী ব্যক্তিদের আবির্ভাব; আর দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে বন্দী হওয়া অপরাপর ট্রাইবের লোকেদের এবং পরবর্তীকালে নিজের টাইবের যে সব লোকেরা দারিদ্র্যের দরুন ঋণগ্রস্ত হয়েছে তাদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা।

এঙ্গেলস-এর কথা অনুযায়ী "···সমাজের এই যুদ্ধমান শ্রেণীগুলি সর্বদাই উৎপাদন ও বিনিময়ের পদ্ধতির—এক কথায় তাদের সময়কার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফল (product)।"(১)

শ্রেণীগুলি হল সেই সব জনগোষ্ঠী যেগুলি মূলত চিহ্নিত হয় ঐতিহাসিক-ভাবে নির্ধারিত উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের স্থান দিয়ে। তার মানে প্রত্যেক শ্রেণীকে বুঝতে হবে, যে উৎপাদন পদ্ধতি তার জন্ম দেয় সেই পদ্ধতির

১। এফ. এঙ্গেলস, অ্যান্টি-ড্যুরিং, পৃষ্ঠা ৩৭।

সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে; এবং প্রত্যেক বিরোধসংকুল উৎপাদন পদ্ধতি সমাজে তার নিজস্ব বিশিষ্ট শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করে (দাস মালিক ও দাস, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ও ভূমিদাস, পুঁজিপতি ও সর্বহারা)।

প্রত্যেক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণীগুলি পৃথক অথবা এমনি সম্পূর্ণ উল্টো স্থান অধিকার করে, সেই স্থান নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দ্বারা। আমরা জানি, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক হল শোষণের সম্পর্ক, আধিপত্য করা ও পদানত থাকার সম্পর্ক। এর কারণ হল শাসক শ্রেণীগুলি উৎপাদনের উপকরণের একচেটিয়া মালিক, অর্থাৎ তারা হয় সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ বা অন্তত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলির মালিক, অথচ নিপীড়িত শ্রেণী কোনওটারই মালিক নয়। যেখানেই উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা সমাজের একটি অংশ কুক্ষিগত করে সেখানেই শ্রমিককে তার নিজের প্রয়োজনের জন্য ব্যয়িত শ্রম-সময়ের উপর উৎপাদনের উপকরণের মালিকের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অতিরিক্ত শ্রম-সময় ব্যয় করতে হয়।

উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে শ্রেণীগুলির সম্পর্ক শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকার উপরও নির্ভর করে। সামাজিক উৎপাদনে শ্রেণীগুলি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা নেয়। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে তাদের কিছু উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা করে, অর্থনীতি ও সমস্ত সামাজিক ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মূলত মানসিক শ্রমে নিযুক্ত থাকে, অন্যরা বাধ্যতামূলক কঠোর শারীরিক শ্রমের বোঝা বহন করে।

সামাজিক উৎপাদন এবং সমাজের সমগ্র জীবন যত জটিলতর হয় নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কাজ তত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ সুপ্রাচীন প্রাচ্যের দেশগুলিতে বৃহদাকার সেচপ্রকল্পগুলির জন্য এমন এক ধরনের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ দরকার হল আলাদা আলাদা ছোট ব্যক্তিগত চাষে যার দরকার হত না। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কার্যকলাপ ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া যন্ত্রের সাহায্যে বর্তমানের বৃহদাকার উৎপাদন কল্পনাই করা যেত না। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সামাজিক উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সাধারণত সেই সেই শ্রেণীর হাতে থাকে যারা উৎপাদনের উপকরণের মালিক। মার্কস মন্তব্য করেছিলেন: "একজন লোক শিল্পের নেতা বলেই সে পুঁজিপতি

নয়, বরঞ্চ পুঁজিপতি বলেই সে শিল্পের নেতা। ঠিক যেমন সামন্ততান্ত্রিক যুগে সমরনায়ক ও বিচারকদের কাজটা ছিল ভূসম্পত্তির গুণ, শিল্পে নেতৃত্বও তেমনি পুঁজির গুণ।"(১)

যখন কোনও উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে ব্যাহত করতে শুরু করে শ্রমের সামাজিক সংগঠনে শাসক শ্রেণীর ভূমিকাও তখন পরিবর্তিত হয়; তা তখন উৎপাদনে সংগঠনের ভূমিকা হারিয়ে ফেলে এবং সমাজদেহের উপর একটা পরগাছায় পরিণত হয়। ভূসম্পত্তিবান অভিজাতদের আমলে তাদের এই অবস্থাই হয়েছিল, আর এখন বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটছে (বুর্জোয়ারা তাদের সংগঠকের ভূমিকা ব্যবস্থাপকদের হাতে, কৃৎকুশলী বুদ্ধিজীবীদের উপরের স্তরের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে)।

শ্রেণীগুলি তাদের সামাজিক আয়ের পরিমাণ ও উৎস অনুযায়ীও পরস্পর থেকে তফাত হয়।

শ্রেণীগুলির মধ্যে এই পার্থক্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তবুও সেটা নির্ধারক উপাদান নয়। আমরা যদি নিজেদের একটা প্রশ্ন করি তা হলে সহজেই ব্যাপারটা দেখতে পাব, প্রশ্নটা হল: আয়ের নানাবিধ উৎস থাকে কেন এবং ফলত শ্রেণীগুলির অস্তিত্বের পক্ষে বিভিন্ন পরিস্থিতি থাকে কেন? প্রধান কারণ নিহিত থাকে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থানের মধ্যে। মার্কস-এর কথামত প্রথম দৃষ্টিতে একথা মনে হতে পারে যে কোনও একটা শ্রেণী গঠিত হয় আয়ের অভিন্ন উৎসওয়ালা লোকেদের দ্বারা। কিন্তু এই ধারণা শ্রেণী-সম্পর্কের গভীরে প্রবেশ করে না। এ যাকে প্রধান ও নির্ধারক সম্পর্ক বলে ধরে নেয় তা আসলে বণ্টনের একটা রূপ যা উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। আমরা যদি কেবল আয়ের পরিমাণ ও উৎস বিবেচনা করি তাহলে আমরা শ্রেণীগুলির যথাযথ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারিনে এবং নানাবিধ সামাজিক স্তর ও গোষ্ঠী যারা নানাবিধ উৎস থেকে তাদের আয় করতে পারে সেগুলিকে শ্রেণীগুলি থেকে তফাত করতে পারিনে। উদাহরণ স্বরূপ ধনতন্ত্রের আমলে সরকারি কর্মচারীরা রাষ্ট্র থেকে বেতন পায়, আর অনেক ডাক্তারের প্রাপ্য ব্যক্তিগত

রোগীদের কাছ থেকে আসে। তাদের আয়ের উৎস ভিন্ন ভিন্ন। তাতে কি তাদের বিশেষ শ্রেণী হিসাবে গণ্য করার যুক্তিযুক্ততা হয় ?

শ্রেণীর কোনও একটা বৈশিষ্ট্যের উপর যদি আমরা কৃত্রিম জোর দিই তাহলে এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় পেঁছাতে পারিনে। সব কটা বৈশিষ্ট্যকে আমাদের একত্র করে অঙ্গাঙ্গী ঐক্যে বিচার করতে হবে। লেনিনই আমাদের শ্রেণীগুলির একটা পূর্ণ, সমন্বিত ও সুসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিয়েছেন: "শ্রেণীগুলি হল বড় বড় জনগোষ্ঠী যারা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত ও ব্যাখ্যাত), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকায় এবং ফলত সামাজিক সম্পদের যে অংশ তারা ব্যবহার করে তার পরিমাণে এবং তা অর্জন করার পদ্ধতিতে পরস্পর থেকে পৃথক। শ্রেণীগুলি হল এমন সব জনগোষ্ঠী সামাজিক অর্থনীতির একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় পৃথক পৃথক স্থানের দরুন যার একটা অপরটার শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।"(১)

সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী-বিভাগ সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আত্মিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়।

শ্রেণী-বিভাগ সমাজ-জীবনের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ব্যাপ্ত, সামাজিক সম্পর্কের সমস্ত ব্যবস্থাটিকে তা প্রভাবিত করে। আমরা দেখেছি যে এই সব সম্পর্ক বৈষয়িক ও মতাদর্শগত দুইভাগে বিভক্ত। কিন্তু শ্রেণীগুলির মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়—বৈষয়িক না মতাদর্শগত ? উত্তর হল দুই-ই। শ্রেণীগুলি এমন কতকগুলি অর্থনৈতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত যেগুলি শোষকশ্রেণীগুলিকে শোষিতদের শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম করে। এই সমস্ত সম্পর্কের মোট যোগফল সমাজের শ্রেণী-কাঠামো গঠন করে এবং শ্রেণীসংগ্রামের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি যোগায়। শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, রাজনৈতিক জীবনেই সেগুলি সবচেয়ে বেশি করে প্রতিফলিত। শেষত, শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক, শ্রেণীসংগ্রাম মতাদর্শ এবং সমাজের আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা একথা উল্লেখ করেছিলেন যে

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্‌টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২৯, পৃষ্ঠা ৪২১।

ধনতন্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে নিহিত সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার বিরোধ সমগ্র সমাজ-জীবনকে, এই সমস্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার পরিস্থিতিকে ও তাঁদের গার্হস্থ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। আর শ্রমিকদের যে বুর্জোয়াদের থেকে পৃথক ভাবধারা ও ধারণা আছে, নীতিবোধ ও নৈতিক নীতি আছে এবং তারা যে পৃথক কর্মনীতি অনুসরণ করে তাকেও উক্ত বিরোধ প্রভাবিত করে। প্রাত্যহিক জীবনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, ভাবধারা ও বিশ্বাসে এবং সামাজিক মনস্তত্ত্বে এই বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের যে পার্থক্য থাকে সেগুলি অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত।

সমাজে শ্রেণী-পার্থক্য ছাড়াও অপরাপর সামাজিক পার্থক্য আছে। সেগুলির মধ্যে পড়ে উৎপাদনে, সামাজিক শ্রমে অসম স্থানের অধিকারী লোকেদের মধ্যে এবং বিভিন্ন সম্পত্তিগত মর্যাদা, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ইত্যাদির অধিকারী লোকেদের মধ্যে অসাম্য।

উদাহরণ স্বরূপ এর মধ্যে পড়ে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার তফাত, অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচারে শিল্প ও কৃষিতে নিযুক্ত লোকেদের মধ্যে তফাত এবং শারীরিক ও মানসিক শ্রমে নিযুক্ত লোকেদের মধ্যে তফাত।

শহর ও গ্রামের মধ্যেকার তফাত সমগ্র জনসংখ্যাকে দুইভাগে বিভক্ত করে, একভাগ শহরে বাস করে, অপর ভাগ গ্রামে। প্রত্যেক শ্রেণীগঠনে এই বিভাগের অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে। উদাহরণ স্বরূপ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক ও সামন্ত প্রভুরা প্রধানত গ্রামেই বাস করত, শহরগুলি তখন প্রধানত কারিগর, ব্যবসায়ী ও উদীয়মান বুর্জোয়াদের কেন্দ্র ছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজে শহর ও গ্রাম দু জায়গাতেই সমস্ত সামাজিক অংশগুলিরই প্রতিনিধিত্ব থাকে, যদিও তার মাত্রা বিভিন্ন রকমের হয়। সেই কারণেই বুর্জোয়া ও পেতিবুর্জোয়ারা শহর ও গ্রামীণ দুইভাগে বিভক্ত হয়, আর শ্রমিক শ্রেণীও শহুরে ও গ্রামীণ সর্বহারা এই দুভাগে বিভক্ত হয়।

শ্রেণীগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রতিফলনের দরুণ গোষ্ঠীগত পার্থক্যগুলিকেও সামাজিক পার্থক্য বলে গণ্য করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কতখানি উৎপাদনের উপকরণের মালিক তার উপর নির্ভর ক'রে বুর্জোয়ারা নিজেরাই ছোট, মাঝারি ও বড় পুঁজিপতিতে বিভক্ত হয়।

বুর্জোয়াদের একচেটিয়া ও অন-একচেটিয়ায় বিভাগের কথাও আমাদের

অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, আর একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মধ্যে কোন্ গোষ্ঠী-গুলি যুদ্ধশিল্পের সঙ্গে, অর্থনীতির সামরিকীকরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত তাও খেয়াল রাখতে হবে। এরা হল বুর্জোয়াদের সবচেয়ে আগ্রাসী অংশ, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কর্মনীতির উপর এরা প্রায়ই নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে।

সমাজে কিছু কিছু লোকের কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ স্তর থাকতে পারে যা কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা ছাড়া থাকে শ্রেণীচ্যুত লোকজন, যারা নিজের শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে (যেমন—ধনতন্ত্রের আমলে লুম্পেন-প্রলেটারিয়েট বা ছন্নছাড়া সর্বহারা—এদের মধ্যে থাকে সেই সব লোক যাদের কোনও নির্দিষ্ট বৃত্তি নেই এবং যারা সমাজের সবচেয়ে নীচের তলায় নেবে গিয়েছে, অর্থাৎ ভিক্ষুক, বেশ্যা, চোর ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে)।

নানারকম সামাজিক পার্থক্যের মধ্যে প্রধান ও নিয়ামক পার্থক্য হল শ্রেণী-পার্থক্য। প্রথমত এদের উদ্ভব হয় সমাজের গভীরতম ভিত্তিভূমি থেকে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থেকে, উৎপাদন সম্পর্কগুলির সারমর্ম থেকে, যা অপরাপর সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, শ্রেণীগুলি হল সবচেয়ে প্রবল এবং সাধারণত সবচেয়ে জনবহুল সামাজিক গোষ্ঠী, যেগুলির আন্তঃসম্পর্ক ও সংগ্রাম সমাজের সমগ্র ইতিহাসের উপর, তার সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শ-গত জীবনের উপর নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদেরা প্রায়ই "শ্রেণীর" ধারণাটিকে "সামাজিক গোষ্ঠীর" আরও সাধারণ ধারণার মধ্যে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করে, ধন-তান্ত্রিক সমাজ যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এই ধারণার জায়গায় তারা বসাতে চায় এই সমাজ বিভিন্ন সামাজিক "স্তরে" বিভক্ত (তারা স্তর, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে), এই সব শব্দ ভূতত্ত্ব থেকে ধার নেওয়া, সমাজ যে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত একথা বোঝানর জন্য ব্যবহৃত। সাধারণত এর মধ্যে এক ধরনের উঁচু থেকে নীচে বিভিন্ন স্তর বিন্যাস নিহিত থাকে। বিভিন্ন স্তরের গঠন নির্ধারণ করার জন্য নানারকমের মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, যথা—বৃত্তি, সম্পদ, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি, কিন্তু প্রধান ও

নিয়ামক উৎপাদনটির উপর কোনও জোর দেওয়া হয় না, এই উপাদানটি হল উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে সম্পর্ক, শেষ পর্যন্ত যার দ্বারাই লোকের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ এফ. ৎসমানেৎস্কি তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার সামাজিক গঠনের বিশ্লেষণে শ্রেণীসমূহের অস্তিত্বকে এড়িয়ে গিয়েছেন, কিন্তু কয়েক ডজন আলাদা আলাদা ধর্মীয় গোষ্ঠী, স্থায়িভাবে আমেরিকায় আগত নরগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘুরা ও তাদের বংশধর, নানা রকম সংস্কৃতি, বহু ক্লাব এবং ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, কতকগুলি সরকারী গোষ্ঠী, এবং বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক ও শিল্পী সংস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গোষ্ঠীগুলির এই ধরনের বিন্যাসের পিছনকার লুকোন উদ্দেশ্য হল সমাজে শ্রেণীবিরোধের অস্তিত্বের যে মৌলিক ঘটনা আছে তাকে ঢেকে দেওয়া। আয়, বৃত্তি, সাংস্কৃতিক স্তর, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি অনুযায়ী বিন্যস্ত গোষ্ঠীগুলিকে ধরা এবং শ্রেণীগুলির জায়গায় সেগুলিকে বসানর মাধ্যমে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদরা দাবি করে যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণীগুলি "অন্তর্হিত" হয়েছে, অথবা এক ধরনের "মধ্যশ্রেণী"র মধ্যে সেগুলি মিশে গিয়েছে।

সমসাময়িক সমাজে নানাবিধ সামাজিক স্তর ও গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার অস্তিত্ব মার্কসবাদীরা অস্বীকার করে না। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠভাবে গঠিত হয়েছে যে সব জনগোষ্ঠী, যথা শ্রেণী, জাতি, ইত্যাদি সেগুলির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে (রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ইত্যাদি) গঠিত সংগঠনগুলিকে মিশিয়ে ফেলা ভুল। আর দ্বিতীয়ত, যে কোনও গোষ্ঠীর প্রকৃত সামাজিক তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হতে পারে একমাত্র তখনই যখন আমরা সমাজের শ্রেণী-কাঠামোর মধ্যে তার স্থান ও শ্রেণীসংগ্রামে তার ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারি।

২. *সামাজিক কাঠামো ও তার পরিবর্তন কিভাবে হয়*

সমস্ত শ্রেণী, সামাজিক স্তর এবং গোষ্ঠীগুলি ও তাদের সম্পর্কের ব্যবস্থার মোট যোগফল সমাজের সামাজিক কাঠামো গঠন করে।

যখন একটা উৎপাদন পদ্ধতির বদলে আর একটা উৎপাদন পদ্ধতি বসে

তখন শ্রেণীগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপকরণের বণ্টন পরিবর্তিত হয়,:ফল হয় কতকগুলি শ্রেণীর জায়গায় আর কতকগুলি শ্রেণী আসে।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের ইতিহাসে শ্রেণী-দাসত্বের তিনটি মূল রূপ দেখা যায়; সেগুলি হল ঃ দাসত্ব, ভূমিদাসত্ব এবং ভাড়াখাটা শ্রম। শোষণের এই পদ্ধতিগুলির পর পর একটি অন্যটির জায়গা দখলের মানে হল শ্রমজীবীর ব্যক্তিগত পরাধীনতার জায়গায় ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক পরাধীনতা কায়েম হয়েছে।

যে যুগে দাস-মালিকানা-প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি চালু ছিল তখন দাস-মালিক কেবল উৎপাদনের উপকরণের মালিক ছিল না, উৎপাদনরত শ্রমিকেরও মালিক ছিল। শ্রমিককে তখন উৎপাদনের সরঞ্জাম হিসাবেই কেবল দেখা হত। রোমান লেখক মারকুস তেরেনতিউস ভারো তাঁর কৃষি-সংক্রান্ত রচনাতে ক্ষেতে চাষ করার সাজ-সরঞ্জামকে তিনটি কোটীতে ভাগ করেছিলেন ঃ "কথাবলার ক্ষমতাওয়ালা সরঞ্জাম, অস্ফুট শব্দ উচ্চারক সরঞ্জাম এবং বোবা সরঞ্জাম; কথা বোলনেওয়ালা সরঞ্জাম হল দাসেরা, অস্ফুট শব্দ উচ্চারক সরঞ্জাম হল বলদ, বোবা সরঞ্জাম হল মালটানা গাড়ি।"(১)

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির আমলে কৃষকের একটা ছোট খামার ও কিছু উৎপাদনের সরঞ্জাম থাকত। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী উৎপাদনের প্রধান উপকরণ, অর্থাৎ জমির মালিক হত, আর এই মালিকানাই তাকে কৃষকের বাড়তি শ্রম আত্মসাৎ করতে সুযোগ দিত। ভূমিদাসকে তার সামন্ত ভূস্বামীর সম্পত্তি হিসাবে সম্পূর্ণ গণ্য করা হত না, ভূস্বামী তাকে কিনতে ও বিক্রি করতে পারত, কিন্তু (আইনসংগতভাবে) হত্যা করতে পারত না। সামন্ত প্রভু কৃষকের বাড়তি উৎপন্ন আত্মসাৎ করত হয় বেগারের (কাজ দিয়ে শোধ) মারফত, নয় ছাড়ের খাজনার (উৎপন্ন দিয়ে শোধ) মারফত, অথবা মুদ্রায় খাজনার মারফত (যখন কৃষক জমির মালিককে একটা নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ দিত)। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের বিভিন্ন স্তরে আত্মসাৎ করার এই সব রূপ ক্রমাগত বদলে যেত।

দাস-মালিকানার সমাজে এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও সামাজিক কাঠামো অনন্য রূপ নেয়। অনেকগুলি প্রাচ্য দেশে সমাজ বিভিন্ন জাতে

১। এর্নাসয়েন্ট মোডস অব প্রোডাকশন ওরিজিনাল সোর্সেজ, লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৩ পৃষ্ঠা ২০ (রুশভাষায়) থেকে উদ্ধৃত।

বিভক্ত হত, জাতগুলো হত বংশগত বৃত্তির একত্রে সংবদ্ধ লোকেদের পৃথক পৃথক গোষ্ঠী। "...ভারতীয় ও মিশরীয়দের মধ্যে শ্রম বিভাগ যে স্থূল রূপে প্রকাশিত হত তাতে তাদের রাষ্ট্র ও ধর্মে জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন হত।"(১)

প্রাচীন ভারতে স্বাধীন জনসমষ্টি চারটি জাতে বিভক্ত ছিল: ব্রাহ্মণ (অভিজাত পুরোহিত পরিবার), ক্ষত্রিয় (সামরিক অভিজাতগণ), বৈশ্য (কমিউনের, অর্থাৎ গোষ্ঠী সমাজের স্বাধীন সদস্যদের অধিকাংশ) এবং শূদ্র (সমাজের সর্বনিম্ন অংশ, গোষ্ঠী সমাজ থেকে বহিভূর্ত, ট্রাইব থেকে বিচ্ছিন্ন, ইত্যাদি), এদের সকলের নীচে ছিল দাসেরা। এশীয় ধরনের দাস রাষ্ট্রের দ্বারা এই জাতিভেদ আরও শক্ত হয়েছিল এবং ধর্ম একে গরিমায় ভূষিত করেছিল (ধর্মবিশ্বাস ছিল যে দেব ব্রহ্মা নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন, ক্ষত্রিয়দের বাহু থেকে, বৈশ্যদের উরু থেকে, আর শূদ্রদের পা থেকে)।

দাস-মালিকানার সমাজে (যথা—প্রাচীন গ্রীস, রোম প্রভৃতিতে) এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও রাষ্ট্রের সাহায্যে জনসংখ্যাকেও বিভিন্ন এস্টেটে অর্থাৎ সম্পত্তির পরিমাণ, মর্যাদা ইত্যাদি অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষ বিভাগে বিভক্ত করার ভিতর দিয়ে শ্রেণী-পার্থক্য দৃঢ়তর করা হত। আইন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক এস্টেটের একটা বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে দিত এবং বিশেষ অধিকার ও দায়-দায়িত্ব দিত। এস্টেটগুলি শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হত; তবে সম্পূর্ণভাবে সেই অনুযায়ী হত না কারণ এগুলি আবার ক্ষমতার ও আইনগত সুযোগ-সুবিধার উঁচু থেকে নীচু স্তরবিভাগের একটা উপাদানের প্রবর্তন করত।(২)

১। কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস দা জার্মান ইডিওলজি পৃষ্ঠা ৫২।

২। প্রাচীন রোমে জনসমষ্টি গোষ্ঠীপতি (প্যাট্রিশিয়ান) ও সাধারণ লোক (প্লিবিয়ান) দুভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলি আবার নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রমে (গ্রেডে) উপবিভক্ত থাকত। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে সর্বোচ্চ এস্টেটে ছিল পুরোহিত ও অভিজাতবর্গ; তৃতীয় অর্থাৎ সর্বনিম্ন এস্টেটে (বনিক, কারিগর, কৃষক ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যা হত না উচ্চতর এস্টেটের ক্ষেত্রে তা হত, অর্থাৎ তারা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। কর দেওয়া থেকে তাদের রেহাই দেওয়া হত, শারীরিক শাস্তিও তাদের দেওয়া, বেত না

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের শ্রেণীবিভাগকে সরল করে দিল, আর যা হোক নীতিগতভাবে উঁচু থেকে নীচু স্তরবিভাগগত সুযোগ-সুবিধার অবসান করল। ধনতন্ত্রের আমলে প্রত্যক্ষ উৎপাদকরা অর্থাৎ শ্রমিকেরা আইনগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু উৎপাদনের উপকরণ থেকে তারা বঞ্চিত এবং পুঁজিপতিদের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। সেই কারণে মার্কস ও এঙ্গেলস শোষণের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ভাড়াখাটা দাসত্বের ব্যবস্থা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

কাজেই বিরোধসংকুল উৎপাদন পদ্ধতিগুলির চরিত্র শোষণের বিভিন্ন পদ্ধতির জন্ম দেয় এবং সেই সঙ্গে সমাজকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী-বিভক্ত করে।

বিরোধসংকুল শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে মূল শ্রেণী হল সেইগুলি যেগুলি চালু উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং যেগুলি ছাড়া এই পদ্ধতি অকল্পনীয় হয়। উক্ত উৎপাদন পদ্ধতির মূল বিরোধ এই সব শ্রেণীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংগ্রামের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

এই মূল শ্রেণীগুলি ছাড়াও সামাজিক কাঠামো গঠিত হয় অ-মৌলিক অথবা উত্তরণশীল শ্রেণীসমূহ নিয়ে। এই সব শ্রেণী সংশ্লিষ্ট থাকে পূর্ববর্তী উৎপাদন পদ্ধতিগুলির অংশবিশেষের অবশেষের সঙ্গে অথবা বিশেষ অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির রূপের সঙ্গে। ফলত এগুলি হয় সামাজিক অর্থনীতির অচল অথবা নতুন উদীয়মান রূপের সঙ্গে জড়িত পুরানো অথবা নূতন শ্রেণী। উদাহরণ স্বরূপ দাস সমাজগুলিতে ছোট স্বাধীন কৃষক খামারী এবং কারিগরদেরও অস্তিত্ব ছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শহরগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গিল্ড ও কর্পোরেশনে সংগঠিত কারিগর, বণিক প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত নতুন সব সামাজিক স্তরের উদ্ভব হয়েছিল। মধ্য যুগের শেষের দিকে শহরের গিল্ডভুক্ত কারিগররা শোষক হয়ে উঠল এবং তাদের শিক্ষানবীসরা হল শোষিত শ্রমিক সাধারণ। কৃষকদের শোষণ করার জন্য ধনতান্ত্রিক ও প্রাক-ধনতান্ত্রিক উভয় রকম শোষণ পদ্ধতি ব্যবহারকারী বড় বড় ভূস্বামীরা ধনতান্ত্রিক সমাজে অনেক দিন টিকে থেকেছিল এবং যে সব

নিজেদের এস্টেটের বিচারালয় ছাড়া তাদের বিচার হত না, এবং ভূমি ও সেই ভূমির সঙ্গে আবদ্ধ ভূমিদাসদের তারা মালিক হতে পারত। প্রাক-বিপ্লব রাশিয়াতে এস্টেট পাঁচটি ছিল: অভিজাত-বর্গ, পুরোহিতরা, বণিকেরা, মেশ্চানে (পেটি-বুর্জোয়া) ও কৃষকেরা।

দেশে সামন্ততন্ত্রের উল্লেখযোগ্য রেশ এখনও রয়েছে সেখানে এখনও অন্যতম অ-মৌলিক শ্রেণী হিসাবে এরা রয়েছে।

অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশে অ-মৌলিক শ্রেণী হিসাবে রয়েছে পেতি-বুর্জোয়ারা। এদের মধ্যে পড়ে কৃষক, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী ও ছোট সম্পত্তির মালিক। এরা সংখ্যার দিক থেকে সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের মধ্যবর্তী একটা অবস্থানে থাকে। তারা যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক তার জন্য তারা বুর্জোয়াদের কাছাকাছি যায় (যদিও ব্যক্তিগত পুঁজিপতির সম্পত্তির মত তাদের সম্পত্তি অনর্জিত নয়, সাধারণত তা ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে অর্জিত সম্পত্তি); কিন্তু নিজেরা শ্রমজীবী হওয়ার দরুন এবং পুঁজির নিপীড়নের শিকার হওয়ার দরুন তারা সর্বহারার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত।

উৎপাদনের বিকাশ শ্রেণীগুলির সংখ্যা ও মর্যাদা বদলে দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুর্জোয়াদের সংখ্যা বেশ বেশি ছিল, কারণ তখন শ্রমের যন্ত্রপাতি প্রধানত মাঝারি ও ছোট পুঁজিপতিদের মালিকানায় ছিল। ইংল্যান্ডে মোট সক্ষম জনসংখ্যার ৮ শতাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অপরাপর দেশে এই অনুপাত আরও বেশি ছিল। এদিকে ভাড়াটে শ্রমিকের বাহিনীতে মোট সক্ষম জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ছিল না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ, রাষ্ট্রের সঙ্গে একচেটিয়াদের যোগাযোগ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। উৎপাদনের ঘনীভবন ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে, বিশেষত বেড়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প কোম্পানিগুলির সাধারণ সক্রিয় পুঁজিতে ২০০-টি বৃহত্তম কোম্পানির অংশ ১৯৫০ সালে ৪৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৪৫-৫৭ সালে ৫৭ শতাংশ হয়েছে, তারা মোট নিট মুনাফার ৬৮ শতাংশ পকেটস্থ করেছে। এ সমস্তর ফল হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের একটা শক্তিশালী স্তর গঠন। একচেটিয়ারা বহু ছোট ও মাঝারি পুঁজিপতিদের বিচূর্ণ করে ফেলার দরুন সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় বুর্জোয়াদের সংখ্যা কমেছে। অত্যন্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এরা

এখন মোট সক্ষম জনসংখ্যার এক থেকে চার শতাংশ। সঙ্গে সঙ্গে আবার এ সব দেশে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের ক্ষমতা ও সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুঁজির মুখোমুখী ভাড়াটে শ্রমিকদের বাহিনী উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। শহর ও গ্রামে ব্যবসায় থেকে অনেক লোক বিতাড়িত হওয়ার দরুন পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে যারা খসে গেল তাদের আগমের মারফতই প্রধানত এই বাহিনীর সংখ্যা বেড়েছে।

ধনতন্ত্র যত বিকশিত হয় পেতি-বুর্জোয়াদের মধ্যে তত ভাঙন আসে; এদের একটা সামান্য অংশ নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে চলে যায়, আর বৃহত্তর অংশ দেউলিয়া হয়ে যায় এবং হয় অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল সম্পত্তির মালিক, নয় সর্বহারা বা আধা-সর্বহারায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের চেয়ে বৃহদাকার উৎপাদনের সুবিধার উপর এবং মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক নিয়মিত প্রক্রিয়া হিসাবে এ চালু থাকে।

কিন্তু এই প্রক্রিয়া ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সম্পূর্ণ উৎখাত করে না। অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজে কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি ক্ষুদ্র উৎপাদকদের ব্যবসা থেকে তাড়িয়ে দেয় একথা ঠিক। তারা তাল রাখতে পারে না। পুরানো যন্ত্রপাতির বদলে নতুন যন্ত্রপাতি বসান, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, টেলি-মেকানিক্স এবং অপরাপর জটিল ও ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করতে পেরে ওঠে না। কিন্তু উৎপাদনের সমস্ত কাজ নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া একচেটিয়া পুঁজির পক্ষে সুবিধাজনক নয়। একচেটিয়ারা ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের জন্য এর অনেক কাজ রেখে দেয়।

মার্কসবাদীরা কখনও দাবি করেন নি যে মধ্যস্তরের সর্বহারা হয়ে যাওয়ার এই ঝোঁকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাদের সম্পূর্ণ অবলোপ। লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন একটা বিরোধসংকুল পথ ধরে চলে। "ধনতন্ত্র অবধারিতভাবে বারংবার অনেকগুলি নতুন 'মধ্যস্তর' সৃষ্টি করে (কারখানার উপাঙ্গ, বাড়িতে বসে কাজ, বড় বড় শিল্প, যথা—বাই-সাইকেল ও মোটর-শিল্পের চাহিদা মেটাতে সারা দেশে ছড়ান ছোট ছোট

কর্মশালা, ইত্যাদি)। এই নতুন ক্ষুদ্র উৎপাদকরা আবার তেমনি অবধারিত-ভাবে সর্বহারার বাহিনীতে নিক্ষিপ্ত হয়।”(১)

সমসাময়িক উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে পেতি-বুর্জোয়ারা টিকে থাকে তারা “স্থিতিশীল” (সংস্কারবাদীরা এই দাবি করে) বলে নয়, কারণ তাদের বিরোধী বৃহৎ পুঁজির আবার তাদের দরকারও হয়। সামগ্রিকভাবে ধরলে অবশ্য ছোট ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া পুঁজিবাদের দ্বারা ক্রমাগত উৎখাত হয়ে সাধারণভাবে সর্বহারা ও ভাড়াটে শ্রমিকদের বাহিনীতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

যে কোনও, এমনকি সামান্য উৎপাদনের উপকরণ থেকেও পুঁজির দ্বারা “মুক্ত” ভাড়াটে শ্রমিকদের বাহিনী উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাধিক অংশ। এরা ১৯৬৮ সালে ব্রিটেনের শারীরিক দিক থেকে সক্ষম জন-সংখ্যার ৯৩ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার ৮৫ শতাংশ, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের ৮১ শতাংশ, ফ্রান্সের ৭৬ শতাংশ, ইতালির ৬৫ শতাংশ এবং জাপানের ৬০ শতাংশ ছিল।

বিগত দশ বছরে শহরে শিল্পভিত্তিক সর্বহারার মূল অংশগুলির সংখ্যা ও অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, আর উল্টোদিকে কৃষিসংশ্লিষ্ট সর্বহারাদের সংখ্যা কমে গিয়েছে। এই শতাব্দীর গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেনে, জার্মানিতে ও ফ্রান্সে শিল্পশ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৯৯ লক্ষ, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৫ কোটি ৮১ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এখন শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনী সারা বিশ্বব্যাপী, ছড়িয়ে আছে ইউরোপ, আমেরিকা এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায়। এই বাহিনী এখন আরও পরিণত ও শিক্ষিত আরও সচেতন ও সংগঠিত ; আর সমাজে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকাও তারা বাড়িয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের পরিস্থিতি শ্রমিকশ্রেণীর গঠন বদলে দিয়েছে, অদক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা কমে গিয়েছে এবং দক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

অ্যাসেম্বলি লাইনের (নরবচ্ছিন্ন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার) প্রবর্তন সর্ববিধ কাজের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত সাধারণ ধরনের কারখানা শ্রমিকের সঙ্গে বিরাট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ শ্রমিকদের জুড়ে দিয়েছে যারা এই লাইনের অপেক্ষাকৃত সরল কাজকর্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্বয়ংক্রিয়

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৫, পৃষ্ঠা ৩৯।

ব্যবস্থার প্রবর্তন অবশ্য কেবল একটি বিষয়েই দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের অবলোপ ঘটাচ্ছে এবং স্বয়ংক্রিয় লাইন চালানর, ঠিকঠাক করে নেওয়ার ও মেরামত করার ব্যাপারে সুদক্ষ একটা নতুন স্তর সৃষ্টি করেছে।

বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশরা প্রায়ই দাবি করে থাকে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লবের পটভূমিকায় সর্বহারা অবলুপ্ত হতে বাধ্য, তার প্রথম কারণ উৎপাদনে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমবে ও সহায়তামূলক শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়বে, এবং দ্বিতীয় কারণ বুদ্ধিজীবী ও কর্মচারীদের সংখ্যা সাধারণভাবে বাড়বে।

সর্বপ্রথম এ কথা লক্ষ্য করতে হবে যে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ ও অর্থ-নীতিবিদেরা "সর্বহারা"র ধারণাটিকে ভুলভাবে কেবল কায়িক শ্রমিকদের সঙ্গেই এক করে দেখে। মার্কস নিজে যৌথ শ্রমিকের ধারণাটির প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যে তিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত এবং নানাবিধ সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত কায়িক ও মানসিক শ্রমিক উভয়কেই ধরেছিলেন।

শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব সহায়ক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র (বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ভোজনাগার ইত্যাদি) সম্প্রসারণ সম্ভবপর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শারীরিক দিক থেকে সক্ষম লোকদের অর্ধেকেরও বেশি ইতিমধ্যেই এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রও ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো আবার তৈরি করে। সহায়ক কাজকর্মে নিযুক্ত লোকেরা সমাজের শ্রেণীবিভাগের বাইরে অবস্থান করে না, শিল্প ও কৃষিতে নিযুক্ত লোকেরা যে সব শ্রেণী ও সামাজিক স্তরে বিভক্ত এরাও তার অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

সেই রকমই বুদ্ধিজীবী ও কর্মচারীদের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি যা সমগ্র সমর্থ জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি বাড়ে, তা জনসংখ্যার "অ-সর্বহারায় পরিণত হওয়ার" অথবা সর্বহারাকে হজম করে এক নতুন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর" অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য বহন করে না।

"বুদ্ধিজীবী" কথাটি সাধারণত মননগত চরিত্রের কাজকর্মে পেশা হিসাবে নিযুক্ত লোকজনদের বোঝানর জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে অনেক কর্মচারীও থাকতে পারে, কিন্তু সকল কর্মচারীই এর অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ

তাদের অনেকে নিছক মননগত কাজে নিযুক্ত নয়, কেবল নানাবিধ টেকনিকাল কাজই করে থাকে।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কখনও একটা পৃথক শ্রেণী ছিল না, আর হতেও পারে না। শ্রেণীর দিক থেকে এরা সমরূপ নয়, কারণ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে এরা গঠিত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ সাধন করে। রুশ মার্কসবাদী ভেরোভস্কি কথাটাকে এইভাবে উপস্থিত করেছেন: বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় "একটা মতাদর্শগত পার্লামেন্টের মত যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যে সব শ্রেণী তাদের পাঠিয়েছে তাদের স্বার্থ যেমন একত্রে মেশে সেই অনুযায়ী নানাবিধ জোট তৈরি করে। কাজেই সমগ্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যের কথা বলার কোনও ভিত্তি নেই…।"(১)

বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবী ও কর্মচারীদের সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থ জনসংখ্যার মধ্যে এদের অংশ ১৮৮০ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ১০.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৪.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সেই সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক মর্যাদার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আগেকার কালে এরা ছিল কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত লোকেদের থেকে বহুদূর, তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক ও আপেক্ষিকভাবে সমাজের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত একটা অংশ। বর্তমানে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা এত বিরাট কারণ তারা বৈষয়িক ও আত্মিক উৎপাদনের সকল শাখাতেই কাজ করে।

বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়াররা বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারমান অংশ। বস্তুত বিরাট সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার ও কৃৎকুশলী সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর কাছাকাছি একটা স্থান পাচ্ছে। বিগত শতাব্দীতে বুদ্ধিজীবী ও কর্মচারীরা একটা অপেক্ষাকৃত সুবিধাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অংশ ছিল, কিন্তু বর্তমানে তারা কর্মচারী সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। কাজের পরিস্থিতি ও বেতনের দিক থেকে কর্মচারীদের প্রায়ই মজুরি শ্রমিকদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকে, তাদের চেয়ে ভাল কিছু পায় না।

১। ভি. ভি. ভোরোভস্কি, ওয়ার্কস, ভল্যুম ২, লেনিনগ্রাদ, ১৯৩১ পৃষ্ঠা ১৪ (রুশ ভাষায়)।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রোসেসিং শিল্পে কর্মচারীদের গড় বেতন কায়িক শ্রমিকের গড় মজুরির চেয়ে ২·৩ গুণ বেশি ছিল, বর্তমানে তা কেবল ওই মজুরির ১০ ভাগের ৯ ভাগের সামান্য একটু বেশি। ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিরাট অংশ তাদের আগেকার সেই ভারিক্কী কাজ হারিয়েছে—যার দরুনই তারা মার্কস কথিত পুঁজির কমিশন-প্রাপ্ত ও কমিশন না পাওয়া অফিসার বনে যেত, বর্তমানে শ্রমিকদের মত এই সব কর্মীদের বেতন হার ও কাজের ছন্দ বাস্তব প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমশ বেশি করে নির্ধারিত হচ্ছে। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃৎকুশলী কর্মী ও কর্মচারীদের যে অনুপাত বৃদ্ধিকে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদেরা সমাজের "অ-সর্বহারায় পরিণত হওয়া" হিসাবে তুলে ধরছে তা আসলে এই কথাই বোঝায় যে সমাজের এই অংশের ক্রমশ বেশি বেশি ভাগ ধনতন্ত্রের দ্বারা জীবনের এমন পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে যা অনেকটা শ্রমিকশ্রেণীর পরিস্থিতির মত।

আবার সেই সঙ্গে "ঐতিহ্যময়" পেশাগুলিতে নিযুক্ত (ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী ইত্যাদি) বুদ্ধিজীবীদের কিছু অংশ সমাজের মধ্য অংশের সম-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছে এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের উপরের স্তর (যথা ম্যানেজার) সাধারণত শাসকশ্রেণীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সমাজের শ্রেণী-কাঠামো লক্ষণীয়ভাবে জটিল, মূল শ্রেণীগুলি ছাড়াও তার মধ্যে নানা রকম অ-মৌলিক শ্রেণী ও মধ্যবর্তী স্তর রয়েছে। উপরন্তু শ্রেণীগুলি সামন্ততান্ত্রিক আমলের উঁচু থেকে নীচু স্তরযুক্ত এস্টেটগুলির মত বন্ধ জনগোষ্ঠী নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ক্রমাগত কোনও না কোনও সামাজিক গোষ্ঠী বা স্তর থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে এই তরলতাকে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদরা শ্রেণী-বিভাগের অবলোপ বলে দেখাতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ বলে যে শ্রেণীগুলি অনবরত নড়াচড়ার মধ্যে আছে, কিছু কিছু লোক সেগুলিতে ঢুকছে, আবার একই শ্রেণীর মধ্যে উপরে উঠছে বা নীচে নামছে—যেমন হয়ে থাকে বড় বড় অট্টালিকাগুলির লিফটে। অবশ্য সামন্ততন্ত্রের আমলের অসংখ্য উঁচুনীচু স্তরগত বাধার তুলনায় ধনতান্ত্রিক আমলে অনেক বেশি সামাজিক নড়াচড়া থাকে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক আমলে শ্রেণীর বেড়া অবলুপ্ত হয় না, শ্রেণী-বিরোধ বাড়ে। ধনতন্ত্রের বিকাশের গোড়ার যুগে অভিজাত সম্প্রদায়ের কিছু

লোক, গ্রাম্য কুলাক (ধনী চাষী) প্রভৃতি শাসক শ্রেণীর মধ্যে ঢুকতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে একচেটিয়া পঁজিপতিদের চক্রে ঢোকা নিঃসপত্ন ক্ষমতার যুগে পেতি-বুর্জোয়ার পক্ষে অভিজাত সম্প্রদায়ে ঢোকার চেয়ে কিছু সহজ নয়। মার্কিন অর্থনীতিবিদ ফার্ডিনান্ড লুন্ডবার্গ তাঁর দা রিচ অ্যান্ড দা সুপার-রিচ বইতে দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থের ক্ষমতা কিভাবে বেড়েছে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ২ লক্ষ অত্যন্ত ধনী লোক আছে, তাদের বেশির ভাগই (৫০০) সবচেয়ে ধনী পরিবারের। তাদের ৬০ শতাংশই এই সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

কিছু কিছু ব্যক্তির শ্রেণী মর্যাদা পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু তাতে সমাজের শ্রেণী কাঠামো তৈরি করে যে সব শ্রেণী তাদের মধ্যেকার পার্থক্য ঘুচে যায় না। উপরন্তু ধনতন্ত্রের আমলে জনগণের সামাজিক মর্যাদার সব পরিবর্তন ঘটে, যথা ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া, কৃষক ও কারিগরদের সর্বহারায় পরিণত হওয়া, শ্রমিকদের মধ্যে বেকারী বৃদ্ধি ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল শ্রেণীগুলির মধ্যে পার্থক্য তা কেবল আরও বাড়িয়েই দেয়।

৩. শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীসংগ্রাম : শ্রেণীসংগ্রামের রূপ ও সংগঠন

আদিম কমিউনের পতনের পর থেকে সমাজের ইতিহাসে বরাবর শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছে। "স্বাধীন ব্যক্তি (ফ্রিম্যান) ও দাস, গোষ্ঠীপতি ও সাধারণ লোক (প্যাট্রিশিয়ান অ্যান্ড প্লিবিয়ান), ভূস্বামী ও ভূমিদাস, গিল্ডের নায়ক ও কারিগর (গিল্ডমাস্টার অ্যান্ড জার্নিম্যান), এককথায় উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক ক্রমাগত পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, এ লড়াই প্রতিবার শেষ হয়েছে হয় বৃহত্তর সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে, নয় দাবিদার শ্রেণীগুলির একই ধ্বংসে।"(১) ম্যানিফেস্টো অব দা কমিউনিস্ট পার্টি-তে মার্কস ও এঙ্গেলস ধনতন্ত্রের আগেকার আমলের শ্রেণীসংগ্রামের মূল রূপগুলিকে এই

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যুম ১ পৃষ্ঠা ১০৮-০৯।

ভাবে চিত্রিত করেছিলেন। ধনতন্ত্রের আমল শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করেছে।

শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় কি কারণে? এটা কি ঐতিহাসিক-ভাবে অনিবার্য? বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা বলে থাকে যে এ হল শ্রেণীগুলির মধ্যে "ভুল বোঝাবুঝির", "যোগাযোগে পারস্পরিক ব্যর্থতা"র ফল, সমাজের শাসক অংশের ভুলপথে পরিচালিত নীতি, "বদমায়েশ লোকেদের প্ররোচনা" ইত্যাদির ফল। অনেকেই এমন সব সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের জন্য আবেদন করে যা যুধ্যমান শ্রেণীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু পরস্পরে মেলান অসম্ভব ও পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলিকে এমনকি "সর্বোত্তম ভাবধারা বা নৈতিক মূল্যবোধের সাহায্যে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব এ আশার মধ্যে এই প্রশ্নের প্রতি একটা ভুল ও ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত আছে। বস্তুত যে সমাজে শ্রেণীগুলি তাদের অর্থ নৈতিক অস্তিত্বের পরিস্থিতির দরুন পরস্পরের বিরুদ্ধে সংস্থাপিত হয় সেখানে কোনও স্থায়ী সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত সামাজিক অবস্থা ও পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের দ্বারাই শ্রেণীসংগ্রাম প্রজ্বলিত হয়। শ্রেণীস্বার্থ কি? তার পিছনে কি আছে? কখনও কখনও বলা হয় যে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর সদস্যদের চেতনা দিয়ে শ্রেণীস্বার্থ নির্ধারিত হয়। একথা সঠিক নয়। কোনও বিশেষ ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণী কিছু দিন পর্যন্ত নিজেদের মৌলিক স্বার্থ সম্বন্ধে অচেতন থাকতে পারে এবং কতকগুলি বিশেষ স্বার্থের (যথা বর্ধিত মজুরি, কাজের ঘণ্টা কমান, ইত্যাদি) জন্য লড়াই করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মৌলিক শ্রেণীস্বার্থের অস্তিত্ব থাকে না।

শ্রেণীস্বার্থ শ্রেণীর চেতনা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সামাজিক উৎপাদনে তার অবস্থান ও ভূমিকার দ্বারা। সর্বহারারা যেহেতু উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে বঞ্চিত এবং পুঁজিবাদী শোষণের শিকার, কাজেই ধনতন্ত্রের অবসানে তারা স্বার্থান্বিত, আর সেই জন্যই তারা একটা বিপ্লবী শ্রেণী।

বুর্জোয়া ও সর্বহারা পরস্পরবিরোধী শ্রেণী, কারণ তাদের স্বার্থ একেবারে বিপরীত ও মিলনের অতীত। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজগুলিতেও তাই ছিল ঃ দাসমালিক ও দাস, ভুস্বামী ও ভূমিদাস।

পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক কেবল একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের অন্তর্ভুক্ত বিরোধী শ্রেণীগুলির মধ্যেই হতে পারে তা নয়, বিভিন্ন গঠনের শ্রেণীগুলির মধ্যেও হতে পারে, এর একটি গঠন অপরটিকে হটিয়ে বসে যায়। শোষণের বুর্জোয়া পদ্ধতি যখন সামন্ততন্ত্রের পদ্ধতির সঙ্গে সংঘর্ষে এল তখনকার বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের সঙ্গে সম্পর্ক এর একটি উদাহরণ। কিন্তু উভয় শ্রেণীই যেহেতু শোষক ছিল তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। অনেকগুলি দেশের অর্থনীতিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতি বুর্জোয়া পদ্ধতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ; আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও ভুস্বামীরা প্রায়ই একটি করে অভিন্ন মোর্চা গঠন করত, বিশেষত যখন তারা তাদের অভিন্ন শত্রু অর্থাৎ সর্বহারার নেতৃত্বে জনগণের সম্মুখীন হত।

শ্রেণীস্বার্থের বিরোধিতা কিংবা পার্থক্য যেমন শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রামের ভিত্তি তৈরি করে তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ একত্রে মেলা তাদের একসঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সমসাময়িক ধনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সর্বহারা, কৃষক ও শহুরে পেতি-বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও কর্মচারীদের অধিকাংশের সংযুক্ত কর্মোদ্যোগের পক্ষে বিষয়গত পরিবেশ আছে। সবচেয়ে বিপ্লবী, সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী হিসাবে সর্বহারারা এই সব গোষ্ঠীগুলির যে কোনও মৈত্রীর স্বাভাবিক নেতা।

শ্রেণী সংগ্রামের সময়ে অভিন্ন শত্রুর সম্মুখীন হলে, এমনকি মৌলিকভাবে পৃথক শ্রেণীগুলিও দেখতে পেতে পারে যে তাদের স্বার্থ সাময়িকভাবে একত্রে মিলেছে। এইভাবে জাতিব্যাপী লক্ষ্যগুলি, যথা—উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শ্রমজীবী জনগণ (অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, শহুরে পেতি-বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী) ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সংযুক্ত কর্মোদ্যোগের ভিত্তি যোগাতে পারে। কিন্তু সে রকম একটা অবস্থাতেও প্রত্যেক শ্রেণী তার নিজের অধিকার অনুযায়ী, নিজের শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে। সেই কারণেই লেনিন দাবি করেছিলেন ঃ "…বিশেষ

নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ অভিন্ন লক্ষ্যগুলিতে একত্রিত হয় বিভিন্ন শ্রেণীর যে সব নানারকম স্বার্থ তার একটা একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ।"(১)

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ ও সংস্কারের প্রবক্তারা এবং দক্ষিণ-পন্থী সমাজ-তন্ত্রীরা শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। তারা দাবি করে প্রগতির পরিচালক শক্তি হল "শ্রেণী সহযোগিতা"। কিন্তু তথ্যের বিচারে দেখা যায় যে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজগুলির বিকাশের পরিচালক শক্তি হল শ্রেণী-গুলির মধ্যে বিপ্লবী সংগ্রাম। বস্তুবাদী ডায়লেকটিকস আমাদের বলে যে সমস্ত বিকাশের উৎস নিহিত আছে বিরোধী শক্তি ও ঝোঁকগুলির মধ্যে সংগ্রামের ভিতর। শ্রেণীসমাজে ডায়লেকটিকসের এই বিধান শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে শ্রেণী-সংগ্রাম সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দীপক ছিল শ্রমিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য এবং কারখানার উৎপাদনের বাধ্যতামূলক ছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শ্রমিকদের বাধ্য করার জন্য পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষা। মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে ব্রিটেনে "...১৮২৫ সাল থেকে যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কেবল শ্রমিক ও নিয়োগকারীদের মধ্যে যুদ্ধের ফল।"(২) শ্রমিকদের প্রতিরোধ পুঁজিপতিদের প্রধানত কাজের সময় বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করতে বাধা দেয় এবং পুঁজিপতিদের বাধ্য করে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ান ও অধিকতর কার্যকর যন্ত্রপাতি নিয়োগের মারফত প্রয়োজনীয় কাজের সময় কমানর উপর সকল প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করতে।

কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রাম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিকাশের পরিচালক শক্তি— এই মার্কসবাদী প্রতিজ্ঞার মানে এই নয় যে শ্রেণী-সংগ্রামই উৎপাদিকা শক্তি-গুলির বিকাশের প্রধান কারণ। সমাজের শ্রেণী-কাঠামো এবং সেই কাঠামো কর্তৃক সৃষ্ট শ্রেণী সংগ্রাম এই উভয়েই উৎপাদিকা শক্তিগুলির ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। শ্রেণী-সংগ্রাম ঐতিহাসিক বিকাশের পরিচালক শক্তি হিসাবে কাজ করে প্রধানত এই কারণে যে এই সংগ্রাম সেই উপায় যার দ্বারা একটা অচল সমাজ ব্যবস্থা একটা নতুন ও

১। ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস ভল্যুম ১২, পৃষ্ঠা ৪০৪।
২। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ৫২১।

উন্নততর ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও অচল উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংঘর্ষ শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধিতার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংঘর্ষের সমাধান হয় সমাজ বিপ্লবের দ্বারা, যে বিপ্লব শ্রেণী-সংগ্রামেরই উচ্চতর প্রকাশ।

শ্রেণী-সংগ্রাম ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উদ্দীপক হিসাবে কেবল সমাজ বিপ্লবের যুগেই কাজ করে না, তথাকথিত শান্তিপূর্ণ যুগেও করে। সংস্কার-গুলি, সংস্কারবাদীদের দ্বারা প্রশংসিত ছোটখাট উন্নতিগুলি আসলে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকেই উপজাত। যে কোনও দেশে গণতন্ত্রের মাত্রা প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির বিপ্লবী সংগ্রামের সুযোগের উপরই চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে। শ্রেণীগুলির মধ্যে সহযোগিতাই সমাজ-প্রগতির পরিচালক শক্তি—এই বুর্জোয়া তত্ত্বের পাল্টা লেনিন এই সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন যে শ্রেণী-সংগ্রামই ইতিহাসের আসল চালক। তিনি লিখেছিলেন: "সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব, অর্থাৎ মার্কসবাদ অনুযায়ী···ইতিহাসের প্রকৃত পরিচালক শক্তি হল বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম। বুর্জোয়া দার্শনিকদের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রগতি পরিচালক শক্তি হল সমাজের সেই সব উপাদানের ঐক্য যারা তার কিছুকিছু প্রতিষ্ঠানে "খুঁত" বুঝতে পারে। প্রথম তত্ত্বটি বস্তুবাদী, দ্বিতীয়টি ভাববাদী। প্রথমটি বিপ্লবী, দ্বিতীয়টি সংস্কারবাদী। প্রথমটি আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সর্বহারার কর্মকৌশলের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। দ্বিতীয়টি বুর্জোয়াদের কর্মকৌশলের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।"(১)

শ্রেণী-সংগ্রামের চরিত্র ও রূপ নানাবিধ হতে পারে। সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে, যথা—অর্থনীতিতে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম হয়। এর তীব্রতার বিভিন্ন মাত্রা হতে পারে—কোনও বৈরী-ভাবাপন্ন শ্রেণীর প্রতি নিষ্ক্রিয় বিরোধিতা থেকে তার অবস্থানগুলির উপর সক্রিয় আক্রমণ ও প্রচণ্ড শ্রেণী-সংঘর্ষ পর্যন্ত; এ সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য, স্বতস্ফূর্ত বা সচেতন সবই হতে পারে। শ্রেণী-সংগ্রামের একটা রূপের বদলে আর একটা রূপের আগম নির্ভর করে পরিস্থিতির পরিবর্তন, বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরকার বিরোধের তীব্রতার মাত্রা, প্রত্যেক শ্রেণীর বিকাশ ইত্যাদির উপর।

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১১, পৃষ্ঠা ৭১।

শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ শ্রেণী-সংগঠনগুলির রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত। সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টান্তের ভিতর একথা খুব স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে। সর্বহারারা ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের শ্রেণী-সংগ্রাম তিনটি প্রধান রূপে পরিচালিত করে: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত।

ঐতিহাসিকভাবে দেখলে অর্থনৈতিক সংগ্রামই সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের প্রথম রূপ। সকল দেশেই শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য। তারা লড়েছে উচ্চতর বেতন, কাজের ঘণ্টা কমান, কাজের পরিবেশের উন্নতি ইত্যাদির জন্য। এই সব সংগ্রামের ভিতর দিয়েই সর্বহারাদের প্রথম সংগঠনের উদ্ভব হয়েছিল. এই সংগঠন অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নই তাদের শ্রেণী-সংগ্রামের বিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল। সাধারণই হোক আর আংশিকই হোক, ধর্মঘটগুলিই অর্থনৈতিক সংগ্রামের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কতকগুলি দেশের, যথা ইতালির বর্তমান অবস্থায় উৎপাদন হ্রাস বা কারখানা বন্ধের জন্য মালিকদের চেষ্টার জবাব শ্রমিকেরা দিয়েছে কারখানার ভিতর "অবস্থান" ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘটের সময় তারা কারখানা দখল করে এবং উৎপাদন বন্ধ করা মালিকদের পক্ষে যাতে অসম্ভব হয় তার জন্য ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে তুলে নেয়।

দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু তা শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্ত করে না।

ধনিকদের তত্ত্ববাগীশরা বলে থাকে যে সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রাম নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে কারণ তাদের অবস্থা ক্রমশ উন্নত হচ্ছে এবং একচেটিয়াদের মুনাফা সমাজের সর্বস্তরে "চুঁইয়ে যাচ্ছে"। আসলে কিন্তু মজুরি-বৃদ্ধি মূল্য-বৃদ্ধি ও শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির চেয়ে পিছিয়ে থাকে, তার মানে শোষণের প্রকৃত মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। সংস্কারবাদী ও দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী, যারা ধনতন্ত্রের উপর কাল্পনিক গুণের আরোপ করে, তারা কতকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশে মজুরি, কাজের পরিস্থিতি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে যে সব সামাজিক আইনকানুন প্রবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করে, কিন্তু তারা এই সত্য কথাটা লুকিয়ে রাখে যে এই সব সুবিধাগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে জিতে নিতে হয়েছে, এগুলি

কোনমতেই একচেটিয়াদের "শুভেচ্ছা'র ফল নয়। অনেকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে প্রধানত সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রামের দরুন। কতকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশে নিজেদের হাত ও মাথা দিয়ে তৈরি বিপুল সম্পদ থেকে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের জন্য জীবনযাত্রার মোটামুটি সহনীয় অবস্থা আদায় করেছে, উনবিংশ শতাব্দীর দুর্দশার তুলনায় জীবনযাত্রার মানের কিছু উন্নতি করতে পেরেছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এমনকি সবচেয়ে ধনী ধনতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ দারিদ্র্যসীমায় বা তার কাছাকাছি বাস করে। শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা আদৌ বাড়েনি। শ্রমিকশ্রেণীরও অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের মতই এখনও শোষিত হয়, উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় কোনও অংশ পায় না এবং সমাজের পরিচালনায়ও কোনও সত্যিকারের অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় না। এরা পায় সবচেয়ে নীচুদরের ও সস্তা, ছকবাঁধা বাসস্থান, "পাইকারী হারে ভোগ্য" মোটরকার ইত্যাদি। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এখনও বস্তীতে বাস করে।

উপরন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কিছু কিছু শ্রমিকগোষ্ঠীর অর্জিত উন্নত জীবনযাত্রার মান জীবনধারণের ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি; মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির দরুন বাতিল হয়ে যায়। সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের ও তার পরিবারের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বাড়ে, কিন্তু মজুরি পিছিয়ে পড়ে থাকে। একথাও মনে রাখা দরকার যে উন্নত দেশগুলির একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত সহনীয় জীবনযাত্রার মান এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণকে লুণ্ঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই লুণ্ঠন হয়ে থাকে এই সব দেশের সঙ্গে অ-সম বিনিময়, মেয়েদের অ-সম মজুরি, নিগ্রো ও অপরাপর বহিরাগত শ্রমিকদের কঠোর শোষণ, উপরন্তু নিজেদের দেশেও শ্রমজীবী জনগণকে তীব্রতর শোষণের মারফত।

সমসাময়িক বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশরা যুক্তি দেয় যে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে "একীভূত হয়ে গিয়েছে এবং এই সমাজে তাদেরও "কিছু স্বার্থ থাকে", কারণ এর কাছ থেকে তারা জীবনের কিছু ভাল জিনিস পাচ্ছে। কিন্তু তারা একথাটা লুকিয়ে রাখে যে এই সমস্ত ভাল জিনিস শ্রমিকশ্রেণী নিজেই তৈরি করেছে এবং কেবল তাদের

ক্রমাগত লড়াইয়ের মারফতই নিজেদের শ্রমে তৈরি সম্পদের একটা অংশ তাদের হাতে ফের এসেছে। যে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা এত বেড়েছে পুরানো দিনের মতই তারা এখনও যে সম্পদ সৃষ্টি করে তার অতি বিপুল অংশই পায় না; এখনও উদ্‌বৃত্ত মূল্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এখনও তারা পুঁজির দ্বারা শোষিত হয়। শ্রমিকদের ধর্মঘট অভিযানের অগ্রগতির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে তা দ্বিগুণ হয়, আর ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে চারগুণ হয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ কোটি।

লক্ষনীয় যে প্রধান প্রধান একচেটিয়া অধিকৃত শিল্পগুলিতে, অর্থাৎ একচেটিয়া মালিকানার বড় বড় কারখানগুলিতে কেন্দ্রীভূত শ্রমিক যাদের মজুরি অন-একচেটিয়া ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি, তারাই ধর্মঘট অভিযানে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা দেখায়। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কারখানাগুলিতে শ্রেণী-সংঘর্ষ তীব্রতর হয়। ধনতন্ত্রের পরিস্থিতিতে এই বিপ্লব শ্রমিকদের দুর্দশা বাড়িয়ে দেয়।

অর্থনৈতিক সংগ্রাম কেবল সর্বহারার আরও দারিদ্র্যবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকেই প্রতিহত করে না, ব্যাপকতর বিপ্লবী কর্তব্যের মোকাবিলার জন্য সর্বহারাকে সংগঠনও যোগায়। শ্রমিকেরা যদি পুঁজির লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে তা হলে মার্কস-এর কথা অনুযায়ী তারা উদ্ধারের অতীত হৃত মনোবল হতভাগ্যদের এক দলিত পিণ্ডে অবনত হবে। "পুঁজির সঙ্গে প্রতিদিনকার সংঘর্ষে কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করলে তারা নিশ্চিতভাবে কোনও বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করার অযোগ্য বলে নিজেদের প্রমাণ করবে।"(১)

অর্থনৈতিক সংগ্রাম যদিও গুরুত্বপূর্ণ, পুঁজিবাদী শোষণের অবসান করার পক্ষে আপনাআপনি তা যথেষ্ট নয়। এই শোষণের অবসানের জন্য সর্বহারাদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সংগ্রাম হতেই হবে।

এমন কি আংশিক অর্থনৈতিক দাবি, যথা—কাজের সময় কমান, নিশ্চিত ন্যূনতম মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা (বিশেষ করে পেন্সন ইত্যাদি), প্রভৃতির জন্য সংগ্রামও সর্বহারাকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহিত করে।

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ৭৫।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা বহুল পরিমাণে সমরবাদ ও অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের উপর নির্ভরশীল। কাজেই ধর্মঘট অভিযান প্রায়ই রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।

রাজনৈতিক সংগ্রাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংগ্রামের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের দায় থাকার দরুন পুঁজিপতিরা ভয় পায় যে শ্রেণী-সংগ্রাম গণবিপ্লবী সংগ্রামে পরিণত হয়ে উঠতে পারে, কাজেই তারা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং শ্রমজীবী জনতাকে শোষণের অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন রূপ ব্যবহারের চেষ্টা করছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সর্বহারার শক্তি প্রভূত বৃদ্ধি করে।

রাজনৈতিক সংগ্রাম বহু রূপ নেয়। পার্লামেন্ট, স্থানীয় কাউন্সিল ও অপরাপর রাষ্ট্রসংস্থার নির্বাচনে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে গণ-মিছিল, সংসদীয় মঞ্চের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার থেকে শুরু করে ক্ষমতার জন্য বিপ্লবী সংগ্রাম পর্যন্ত। সর্বহারাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হল পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষমতা উৎখাত করা ও নিজের ক্ষমতা, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আর-একবার এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার হিসাবে তাকে সংহত করা।

ঐতিহাসিক দিক থেকে রাজনৈতিক সংগ্রাম অর্থনৈতিক সংগ্রামের পর বিকাশ লাভ করেছে, কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে এর স্থান প্রথম, কারণ শ্রেণী-সংগ্রামের এ একটা উচ্চতর রূপ। এর যুক্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. অর্থনৈতিক সংগ্রামে শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর পৃথক পৃথক বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে (যথা পৃথক পৃথক কারখানার মধ্যে), কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিক ও পুঁজিবাদীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে গোটা শ্রেণী হিসাবে সমাবিষ্ট হয়।

২. অর্থনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকেরা তাদের নিজস্ব দৈনন্দিন স্বার্থ কখনও কখনও শ্রমিকশ্রেণী পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে; কিন্তু

রাজনৈতিক সংগ্রামে তারা তাদের নিজস্ব মৌলিক, সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করে।

৩. অর্থনৈতিক সংগ্রাম যদি রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে পৃথকভাবে পরিচালিত হয় তাহলে তাতে তারা কেবল ট্রেড ইউনিয়ন ধরনের চেতনা অর্থাৎ তাদের নিজস্ব সংকীর্ণ বৃত্তিগত স্বার্থ সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করে। মার্কসবাদী পার্টি কর্তৃক পরিচালিত রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী প্রকৃত শ্রেণী, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক চেতনা, অর্থাৎ তার মৌলিক সাধারণ শ্রেণীস্বার্থ, তার রাজনৈতিক ব্রত ও বিপ্লবী লক্ষ্যসমূহ সম্বন্ধে উপলব্ধি অর্জন করে।

৪. অর্থনৈতিক সংগ্রাম সর্বহারাকে তার প্রয়োজনীয় সংগঠন যোগায় ট্রেড ইউনিয়নের রূপে, রাজনৈতিক সংগ্রাম মার্কসবাদী রাজনৈতিক পার্টি, অর্থাৎ সর্বহারার শ্রেণী সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ গড়ে তোলার দাবি করে।

মতাদর্শগত সংগ্রামও সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপ। একটা ব্যাপক অর্থনৈতিক, বিশেষ করে একটা রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিক-শ্রেণীকে উৎসাহিত করতে হলে তাকে তার মৌলিক শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে অবশ্যই সচেতন করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে এই চেতনা যোগায়। এই তত্ত্ব সামাজিক বিকাশের বিধান-গুলিকে, ধনতন্ত্রের বিকাশের বিধানগুলিকে উদ্ঘাটিত করে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ থেকে মুক্তির জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের উপায় পদ্ধতি বাৎলায়। শ্রমিকশ্রেণীর ও তার পার্টির তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত সংগ্রামের লক্ষ্য হল বুর্জোয়া ভাবধারা ও বদ্ধধারণা থেকে শ্রমিকদের মনকে মুক্ত করা। শ্রমিক-শ্রেণীর স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রবেশ তাকে বিকাশের একটা উচ্চতর স্তরে তুলে দেয়। কাজেই শ্রেণী-সংগ্রামের মতাদর্শগত রূপ সর্বহারার চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে শ্রেণী-সংগ্রামের অপরাপর রূপের মতই অত্যাবশ্যক।

এই সংগ্রামের গতিপথে শ্রেণীগুলি রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আকার পায়। শ্রেণীগুলির বিকাশের জটিল গতিপথ সেগুলিকে ইতিহাসের নিষ্ক্রিয় বস্তু থেকে তার সচেতন ও সক্রিয় কর্তা, তার স্রষ্টা করে তোলে। "আপনাতে

আপনি" শ্রেণীর বদলে তারা "নিজেদের জন্য"(১) শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস লিখেছিলেন: "অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেশের ব্যাপক জনগণকে শ্রমিকে রূপান্তরিত করেছিল। পুঁজির সংযোগ এই জনগণের জন্য একটা অভিন্ন পরিস্থিতি, অভিন্ন স্বার্থ সৃষ্টি করেছে। অতএব পুঁজির বিরুদ্ধে এই জনগণ ইতিমধ্যেই একটা শ্রেণী, কিন্তু নিজের পক্ষে এখনও তা হয়নি। এই সংগ্রামে···এই জনতা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজের পক্ষেও একটা শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায়।"(২)

সক্রিয়ভাবে কর্মরত কর্তা হিসাবে, "নিজের পক্ষে" শ্রেণী হিসাবে একটা শ্রেণীর গঠনে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনগুলির, বিশেষত রাজনৈতিক পার্টিগুলির উদ্ভব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

রাজনৈতিক পার্টিগুলির সংগ্রামের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম সবচেয়ে নির্দিষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক দলগুলি শ্রেণীগুলির স্বার্থ প্রতিফলিত করে এবং তাদের সংগ্রামের নেতৃত্ব করে। পার্টিগুলি শ্রেণীগুলি থেকে এই দিক থেকে তফাত যে (১) তারা কখনও একটা গোটা শ্রেণী জুড়ে হয় না, শ্রেণীর কেবল একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করে—পার্টি কথাটাই লাতিন শব্দ 'পারস' (পারটিস) থেকে উদ্ভূত, পারস মানে অংশ; (২) সেগুলি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ও ভাবধারা নিয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রসর ও সক্রিয় প্রতিনিধিদের সচেতন সহযোগের ফল, কিন্তু শ্রেণীগুলি নিজেরা সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয়। কাজেই শ্রেণী রূপ নিয়ে গড়ে ওঠার পরে পার্টির উদ্ভব হয়।

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা এবং সংস্কারবাদী ও শোধনবাদীরা পার্টি ও শ্রেণীর মধ্যে সংযোগকে লুকোতে চেষ্টা করে। জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ভেবার সমাজকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক—এই তিনটি

১। একথা স্বীকার্য যে সমস্ত শ্রেণীরই এই পরিবর্তন হয় না। শাসক শ্রেণীগুলি সাধারণত নিপীড়িত শ্রেণীর চেয়ে আগে নিজেদের মৌলিক স্বার্থগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়। কিছু কিছু নিপীড়িত শ্রেণী (যথা দাসরা) তাদের মৌলিক স্বার্থ আদৌ বুঝতে পারে না, অথবা অপেক্ষাকৃত একটা উন্নত শ্রেণীর (এ ক্ষেত্রে যেমন কৃষক) নেতৃত্ব যখন সংগ্রামের রাস্তা ধরে কেবল তখনই বোঝে।

২। কে. মার্কস, দা পভার্টি অব ফিলজফি, মস্কো ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১৬৬।

স্বাধীন ভাগে ভাগ করেন। শ্রেণীগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগের মধ্যে ফেলা হয়; তথাকথিত মর্যাদা অনুযায়ী গোষ্ঠীগুলি—যেগুলি সমাজে তারা কতটা শ্রদ্ধা পায় তার মাত্রানুযায়ী বিশিষ্ট হয়—সেগুলি সামাজিক ভাগের মধ্যে পড়ে, আর পার্টিগুলিকে ফেলা হয় রাজনৈতিক ভাগের মধ্যে। বহু বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ভেবারকে অনুসরণ করে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পার্টিগুলিকে শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

অবশ্য সমাজের পার্টিতে বিভক্ত হওয়া সাধারণত শ্রেণীওয়ারি বিভাগ অনুযায়ী হয় না। এক-একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব অনেক সময়েই একটি পার্টির দ্বারা হয় না, হয় অনেকগুলি পার্টির দ্বারা, তারা সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর ভিতরকার পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর স্বার্থেরও প্রতিফলন করে। বুর্জোয়া পার্টিগুলির ভিতরে বিরোধ অনেক সময়েই কিছুটা অগভীর চরিত্রের হয়, কিন্তু কখনও কখনও শ্রেণীর ভিতরকার নানাবিধ উপদলের গভীরতর পার্থক্যের প্রতিফলন করে এবং সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে সেগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিটি পার্টির প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে। লেনিন লিখেছিলেন: "বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিতে সমাজের বিভক্ত হওয়াটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সুগভীর সংকট গোটা দেশকে কাঁপিয়ে দেয়···সংগ্রামের গভীরতা সমস্ত বুলি কপচান, যা কিছু ক্ষুদ্র ও অপ্রাসঙ্গিক সমস্ত সরিয়ে ফেলে দেয়। পার্টিগুলি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও জনগণের কাছে আবেদন করে, আর জনগণ তাদের অভ্রান্ত সহজাতবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং প্রকাশ্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় জ্ঞান লাভ করে সেই সব পার্টিকে অনুসরণ করে যা এক-একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।"(১)

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর, রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও সক্রিয় অংশ, তার অগ্রবাহিনী। অগ্রবাহিনীকে বিশিষ্ট করে যে স্তরের শ্রেণী-চেতনা সেই স্তরে ওঠার পক্ষে ধনতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের অধিকাংশই শোষণের গুরুভারে অতিরিক্ত পীড়িত। এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন, যা শ্রমিকদের কম পরিণত অংশ অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝতে পারে তেমন

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৮, পৃষ্ঠা ৪৫।

সরলতর একটা সংগঠন, তাতেও গোটা শ্রমিকশ্রেণী যোগ দেয় না। কাজেই কারও এরকম মোহ থাকা উচিত নয় যে ধনতন্ত্রের পরিস্থিতিতে (এমনকি ধনতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের পর্যায়েও) শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী ও গোটা শ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্যসূচক সীমারেখা আপনা থেকেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। কেবল কমিউনিজম-এর চূড়ান্ত বিজয়ের পরই এই সীমারেখা মুছে যেতে পারে।

সর্বহারার অন্য সব সংগঠন, যথা—ট্রেড ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংস্থা প্রভৃতি শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে কাজ করে, কিন্তু তারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সর্বহারার শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিই কেবল সর্বহারার সংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপকে ঐক্যবদ্ধ করায় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একই লক্ষ্যে পরিচালিত করায় সক্ষম।

কিন্তু অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি যেমন আছে তেমনি সুবিধাবাদী পার্টিও আছে। সুবিধাবাদ ও শোধনবাদ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে আকস্মিক ঘটনা নয়। তাদের সামাজিক ভিত্তি আছে, সেগুলি শ্রমিকদের স্থিতিহীন অংশের উপর বুর্জোয়া চাপের ফল।

শ্রমিকশ্রেণী সমরূপ নয়; এর ভিতর বহুবিধ স্তর আছে, যেমন—পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে যারা সম্প্রতি এসেছে, উঁচু মাইনের উচ্চতর স্তর, শ্রমিক-দের মধ্যেকার অভিজাতরা। সাম্রাজ্যবাদের আমলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়ারা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ লুণ্ঠন করে এবং চড়া এক-চেটিয়া দর বজায় রেখে পাওয়া মুনাফার অংশবিশেষ দিয়ে সর্বহারার উচ্চতর অংশকে ঘুষ দিতে পারে। এতেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সুবিধাবাদের জন্ম ও পোষণ হয়। সর্বহারার অংশবিশেষকে দূষিত করা কেবল ঔপনিবেশিক অতি-মুনাফা থেকেই হয় না, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যগুলি আত্মসাৎ করার মারফত একচেটিয়া ধনতন্ত্র যে অতি-মুনাফা করে তা থেকেও হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর অ-সম চরিত্র অবধারিতভাবে তার বিভিন্ন অংশের মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য আনে, আর শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের

প্রতিটি মোড় এই পার্থক্য বাড়িয়ে দেয়, অতি-"বাম" ও দক্ষিণপন্থী উভয় প্রকার বিচ্যুতি ও ঝোঁকের জন্ম দেয়। বিপ্লবী আন্দোলনের ডায়লেকটিকস এমনই যে এর বৃদ্ধি, শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপকতর অংশের, বিশেষ করে অপর সামাজিক স্তরে (যথা পেতি-বুর্জোয়া) জড়িত হওয়া—যা এমনিতে একটা ইতিবাচক ঘটনা—তাই আবার সেই সঙ্গে দক্ষিণ ও "বাম" উভয় প্রকার সুবিধাবাদের চর্চায় উৎসাহ যোগাতে পারে। সুবিধাবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের মধ্যে মনোমালিন্যকে বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে দুর্বল করার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু কিছু কিছু দেশের বুর্জোয়ারা সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামকে মন্থর করে দিতে সাময়িকভাবে যদিও সক্ষম হতে পারে, এই সংগ্রাম বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের নেই।

শ্রেণীসংগ্রাম শ্রেণী-বিভক্ত সমাজগুলির বিকাশের মৌলিক বিধান ও তার পরিচালিকা শক্তি। এই বিধান মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক আবিষ্কৃত, এতে আছে যে…"সমস্ত ঐতিহাসিক সংগ্রাম—সেগুলি রাজনৈতিক, ধর্মীয়, দর্শনগত, অথবা অন্য কোনও মতাদর্শগত ক্ষেত্র যেখানেই চলুক না কেন—আসলে তারা কেবল সামাজিক শ্রেণীগুলির সংগ্রামের মোটামুটি সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, আর এই সব শ্রেণীর ও তার ভিতর দিয়ে সেগুলির মধ্যেকার সংঘর্ষের অস্তিত্বও আবার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের বিকাশের মাত্রার দ্বারা, তাদের উৎপাদনের পদ্ধতি ও তার দ্বারা স্থিরীকৃত বিনিময়ের পদ্ধতির দ্বারা নির্ধারিত।"(১) এঙ্গেলস-এর মতে এই বিধান ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের পক্ষে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজকে বোঝার পক্ষে তেমনিই গুরুত্বপূর্ণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পক্ষে এনার্জির রূপান্তরের বিধান।

৪. ঐতিহাসিক প্রয়োজন এবং শ্রেণীগুলির বিলোপ সাধনের পথ

সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল শ্রেণীগুলির মধ্যে অবধারিত বিরোধ সমন্বিত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিলোপ সাধন এবং শ্রেণীবিহীন

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ৩৯৬-৯৭।

কমিউনিস্ট সমাজ সৃষ্টি। ধনতন্ত্রের সংকটের যুগেই কেবল এই লক্ষ্য আয়ত্ত-যোগ্য হয়েছে।

একথা স্বীকার্য যে বৈরীভাবাপন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের অবিচার ও সে সমাজের অবসানের আহ্বান অনেক আগেই, ধনতন্ত্রের উষাকালেই শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তখন তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনের পরিপন্থী ছিল। শ্রেণী-বিলোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তখনও সৃষ্টি হয়নি।

কেবল উন্নত ধনতন্ত্রের যুগেই উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিপুল বৃদ্ধি সে রকম অবস্থা সৃষ্টি করে যেখানে "···শ্রেণী-পার্থক্যগুলির অবস্থান প্রকৃত একটা প্রগতি হতে পারে, সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিতে জড়ত্ব অথবা এমনকি অবনতি না এনে স্থায়ী হতে পারে।"(১) এরকম একটা অবস্থায় শ্রেণী ও সামাজিক পার্থক্য বিলোপের জন্য, শ্রেণী-অসাম্য বিলোপের জন্য নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক প্রগতির প্রয়োজনের সঙ্গে; বস্তুগত প্রয়োজনের সঙ্গে একত্রে মেশে।

সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ শহর ও গ্রামের মধ্যে, মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে শ্রম বিভাগের পুরানো সামাজিক রূপগুলির বিলোপের বৈষয়িক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে ; এই বিলোপকে প্রয়োজনীয় করে তোলে। বৈপরীত্যের (অ্যান্টিথিসিস) বিলোপ এবং পরবর্তীকালে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সমস্ত মৌলিক পার্থক্যের বিলোপ "···কেবল সম্ভবই নয়, এ শিল্প উৎপাদনেরই একটা প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষি উৎ-পাদনেরও।···"(২) এ কেবল সংখ্যালঘুর নয়, সমাজের সকল সদস্যদের স্বাধীন ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর করে এবং ফলত সামাজিক অগ্রগতি বিপুলভাবে ত্বরান্বিত হয়।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি কেবল শ্রেণীগুলির ধ্বংসই প্রয়োজনীয় করে তোলেনি, এ এমন সামাজিক শক্তিরও জন্ম দিয়েছে যা এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম। এই শক্তি হল আধুনিক সর্বহারা।

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ৩৮৭।

২। এফ, এঙ্গেলস, অ্যান্টি ডুরিং, পৃষ্ঠা ৩৫১-৫২।

এ পর্যন্ত যত নিপীড়িত শ্রেণী মুক্তির জন্য লড়াই করেছে তার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র যে সমাজে শ্রেণীবিভাগের অবসান ঘটাতে পারে। যখন দাসেরা নিজেদের মুক্ত করেছিল তখন তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণের সকল রূপের অবসান ঘটাতে পারেনি, কেবল দাসত্বের সম্পর্কেরই অবলোপ ঘটিয়েছিল। যখন ভূমিদাসরা নিজেদের মুক্তি অর্জন করেছিল তখন তারা নিজেদের ছোট্ট জমির টুকরোটিরই মালিক হয়েছিল। কিন্তু সর্বহারারা সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার অবলোপ এবং মানুষের উপর মানুষের সকল রকমের শোষণের অবসান ঘটিয়ে ছাড়া আর কোনও মতেই নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। সেই কারণেই তারা বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম করে নিপীড়নের হাত থেকে কেবল নিজেকেই নয়, সমগ্র শ্রমজীবী জনগণকেই উদ্ধার করে।

সর্বহারারা এই কারণে সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী নয় যে তারা সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। ধনতন্ত্র লক্ষ লক্ষ অভাবী কৃষক ও শহরের গরিবদের ভিক্ষাবৃত্তি ও দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করে. হাজার হাজার ভবঘুরে অনেক সময়ে সর্বহারার চেয়েও বেশি কষ্ট পায়, কিন্তু তাতে করে তারা বেশি বিপ্লবী হয়ে পড়ে না। সর্বহারা যে ধনতন্ত্রের উৎখাতে আগ্রহী একটি শোষিত শ্রেণী কেবল, তার দ্বারাই তাদের ক্রমাগত বিপ্লবী উদ্যোগ নির্ধারিত হয় না, এ সত্যের দ্বারাও নির্ধারিত হয় যে শ্রমজীবী জনগণের সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বহারাই কেবল এক নতুন, উচ্চতর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বাহন।

উপরন্তু সর্বহারারা সবচেয়ে সংগঠিত ও সচেতন শ্রেণী। সর্বহারারা যেহেতু বৃহদাকার উৎপাদনের সংগে সম্পর্কিত তাই লেনিনের কথামত তারা "…ধনতন্ত্রের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্র ও স্নায়ুর উপর অর্থনৈতিকভাবে আধিপত্য করে…।(১) বৃহদাকার উৎপাদনে শ্রমের পরিবেশেরই দরুন সর্বহারা ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলার শিক্ষায় শিক্ষিত, সেই কারণে শ্রমজীবী জনগণের অপরাপর শ্রেনীর চেয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন আন্দোলন করতে অধিকতর সক্ষম। পূর্বেকার বিপ্লবী শ্রেণীগুলি, যারা এমনকি একটি জাতির সীমার মধ্যেও সর্বদা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি তাদের মত না হয়ে সর্বহারারা আন্ত-

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩০, পৃষ্ঠা ২৭৪।

জাতিক পরিসরে শ্রেণীসংগ্রাম চালায়। আন্তর্জাতিকতাবাদ সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য ও অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য।

মার্কসবাদীরা যে একমাত্র সুসঙ্গত বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে সর্বহারাদেরই বেছে নেয় তা বাকি শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড় করানর জন্য নয়, শ্রমজীবী জনতার নেতা হিসাবে তার ভূমিকা তুলে ধরার জন্য। সর্বহারার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারে আর সমস্ত শ্রেণী "একটা নিশ্ছিদ্র প্রতিক্রিয়াশীল জনতা"—জার্মান সমাজতন্ত্রী ফার্ডিনাণ্ড লাসালের এই বক্তব্যকে মার্কস সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। লাসালের শিক্ষা ভুল ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকারক। এতে সর্বহারাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। পুঁজিকে পরাস্ত করতে হলে সর্বহারাকে, শ্রমজীবী জনতাকে, সর্বোপরি কৃষককে এবং সেই সঙ্গে শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী ও কর্মচারীদের পক্ষে আনতে হবে। ধনতন্ত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ধ্বংস নিয়ে আসে, বৃহৎ সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও কর্মচারীদের সর্বহারায় পরিণত করে, জনগণের সামনে সমরবাদ ও যুদ্ধের সর্বনাশ উপস্থিত করে, সংস্কৃতি ও কলার ক্ষেত্রে যা কিছু অর্জিত হয়েছে তাকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে। কাজেই বর্তমান যুগ শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসার সম্ভাবনা তুলে ধরে। তাদের সাহায্যেই কেবল সর্বহারা তার ঐতিহাসিক ব্রত সফলভাবে নিষ্পন্ন করতে পারে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী জনগণের নানাবিধ গোষ্ঠী যে সব সামাজিক সঙ্ঘর্ষের মধ্যে এসে পড়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব তার পরিসর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। এখন এই গোষ্ঠী কেবল সেই সব শ্রমিককে নিয়েই তৈরি হয় না যারা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের দরুন কাজ থেকে বিচ্যুত হয় অথবা নিজেদের দক্ষতা থেকে বঞ্চিত হয়ে অল্প বেতনের পেশায় চলে যেতে বাধ্য হয়। দেউলিয়া ক্ষুদ্র উৎপাদকগণ, যাদের নতুন সর্বহারা পরিবেশের মধ্যে মানিয়ে নিতে হয় এবং নিম্নপদস্থ অফিস কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবী যাদের জীবনযাত্রা ক্রমশ কঠিনতর হচ্ছে ও যারা ধনতন্ত্রের অমানুষিক ও জন-বিরোধী চরিত্র সম্বন্ধে ক্রমাগত আরও সচেতন হয়ে উঠছে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তরুণদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যারা বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে অক্ষম হয়, তারাও এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে।

কিছু অতি-"বাম" তত্ত্ববাগীশ (যথা—হারবার্ট মারকিউজ) যুক্তি দেখায় যে শ্রমজীবী জনগণের এই সব গোষ্ঠীর প্রবর্ধিত কর্মতৎপরতার মানে হল শ্রমিকশ্রেণী তার বিপ্লবী ভূমিকা হারাচ্ছে। অতি-"বাম"রা ছাত্রদের উপর খুব ভরসা করে, ছাত্রদের তারা সবচেয়ে বিপ্লবী শক্তি হিসাবে, তথাকথিত "রক্ষণশীল" সর্বহারার আধুনিক বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করে। ছাত্ররা অবশ্যই বিরাট রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্ষম। ব্রিটিশ মার্কসবাদী পামি দত্ত লিখেছেন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরের এই চতুর্বিংশতি বর্ষে একটা গোটা নতুন প্রজন্ম সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে যারা যুদ্ধ অথবা ফ্যাশিজম কখনও দেখেনি, যারা সাগ্রহ সরলতা ও খোলা চোখ নিয়ে এবং ক্রোধ নিয়ে আধুনিক দুনিয়ার বীভৎসতা ও ক্লেদগুলিকে, অর্থাৎ বোমা, দারিদ্র্য, সামাজিক অসাম্য, বর্ণবিদ্বেষ, ধনী ও দরিদ্র জাতিগুলির মধ্যেকার বিরাট ব্যবধান প্রভৃতিকে দেখে। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিসহ সর্বত্র আগেকার যে কোনও সময়ের তুলনায় ব্যাপকতর সংখ্যক তরুণদের মধ্যে এই বিপুলতর চাঞ্চল্য বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম সর্বাপেক্ষা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য।"...(১) ছাত্ররা যারা উচ্চতর শিক্ষায় অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ঘৃণা করে, তারা ব্যবসায়ের দাস হতে চায় না, কিন্তু তারা অস্থির এবং বিভিন্ন শ্রেণী থেকে সমাগত ; তারা সমাজের অন্যতম উৎপাদক শক্তিও নয়, সেই কারণে স্বাধীনভাবে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটানর ঐতিহাসিক ব্রত সম্পন্ন করতে অক্ষম, সে কাজ কেবল সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বর্তমানে জনসংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক তার বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক ভূমিকা "হারান"র সাক্ষ্য দেয় না, বরং তা এই সাক্ষ্যই দেয় যে এই সব দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে পুঁজিপতি একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনসংখ্যার ব্যাপক সামাজিক অংশগুলিকে জমায়েত করার বেশ ব্যাপকতর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

ধনতন্ত্রের উকিলরা যাই বলুক না কেন, ধনতন্ত্রের বিকাশ শ্রেণী-পার্থক্য বিলোপের পথ সুগম করে না, বরং এই পার্থক্য তীব্রতর করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি একদিকে উৎপাদনের উপকরণের মালিক পুঁজিপতি ও অপর

দিকে উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত সর্বহারা ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেকার বিরোধকে ক্রমাগত পুনর্জন্ম দেয় ও গভীরতর করে। একমাত্র সর্বহারা বিপ্লবই এই উৎপাদন পদ্ধতির অবসান করে, তার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে এবং তার ভিতর দিয়ে সমাজের পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভাজন বিলুপ্ত করে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এবং সর্বহারার ক্ষমতা দখল শ্রেণী-বিলোপের প্রক্রিয়াকে শুরু করে। এ প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী এবং দুই পর্যায়ে ঘটে। একটি পর্যায় হল ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্যায়, এই সময়ের মধ্যে শোষক শ্রেণীগুলিকে উৎখাত করা হয় এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্যেকার অ-সর্বহারা লোকেদের সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায় হল সমাজতন্ত্রের বিকাশের ও ক্রমে ক্রমে তা কমিউনিজমে উত্তীর্ণ হওয়ার, যখন অবশিষ্ট শ্রেণী-পার্থক্যগুলিকে দূর করা হয়।

এই কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার রূপ ও সময়ের পরিমাণ এক-এক দেশে এক-এক রকম হয়, তা নির্ভর করে পুরানো ব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক কাঠামোর উপর। অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিতে যেখানে ধনতন্ত্র সমাজের শ্রেণী-কাঠামোকে সরল করে দিয়েছে, যেখানে সমাজের দুটো বিরাট শ্রেণীর মেরুকরণ আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, সেখানে শ্রেণীগুলির বিলোপ দ্রুততর হারে হতে পারে। অপরপক্ষে যে সব দেশে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, যেখানে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সামাজিক স্তরগুলি থেকে যায়, সেখানে এই প্রক্রিয়া অনেকগুলি উত্তরণশীল পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এবং অনিবার্যভাবে আরও জটিল ও দীর্ঘায়িত হয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি দুরকম হতে পারে—বড় অথবা ছোট, অপরের শ্রম শোষণের ভিত্তিতে অথবা মালিকের নিজের শ্রমের উপর নির্ভর করে। প্রথমটাকে উৎখাত করা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়টাকে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতে হয়, সমবায় অথবা ছোট ছোট খামার বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত করার মধ্যে দিয়ে। বড় বড় সম্পত্তির মালিকদের উৎখাত করার জন্য যে সব উপায় বা যত সময় দরকার এতে তার চেয়ে অন্য রকম দরকার হয়, কিন্তু শ্রেণীগুলির বিলোপের জন্য এটাও সেই রকমই অত্যাবশ্যক,

কারণ এটা যতক্ষণ সম্পাদিত না হচ্ছে ততক্ষণ ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণের জন্ম দেয় যে সব উৎস সেগুলিকে বিলুপ্ত করা যায় না।

শ্রেণী-পার্থক্যের সম্পূর্ণ বিলোপ করতে হলে আগে কেবল মালিকানা সম্পর্কেরই পরিবর্তন করে নিতে হয় না, শ্রমের পূর্বেকার সামাজিক বিভাগের রূপগুলিকেও কাটিয়ে উঠতে হয়, সামাজিক শ্রমের সংগঠনে যে যা ভূমিকা নিত তার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য এবং সামাজিক সম্পদের বণ্টনে অসাম্যকে কাটিয়ে উঠতে হয়। লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে " শ্রেণীগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ করতে হলে শোষকদের, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করাই যথেষ্ট নয়, তাদের মালিকানার অধিকার বিলুপ্ত করাই যথেষ্ট নয়, উৎপাদনের উপকরণের সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ করার প্রয়োজন, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার এবং কায়িক শ্রমিক ও মাথার শ্রমিকের মধ্যেকার পার্থক্যেরও বিলোপ করার প্রয়োজন।"(১) সামাজিক দিক থেকে সমরূপ এবং সম্পূর্ণ সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করতে পারার মত সমাজে উত্তরণের এই-ই একমাত্র পথ।

এ সমস্যা কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের আমলে সমাধান করা সম্ভব নয়। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্যায়ে সমস্ত শোষক শ্রেণীর অবলোপ মানে সামাজিক অ-সাম্যের মৌলিক উৎসগুলির বিলোপ সাধন হয়েছে। সমাজ আর এমন সব গোষ্ঠীতে বিভক্ত নয় যেখানে সামাজিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় নিজ অবস্থানের কল্যাণে কোনও গোষ্ঠীর লোক অপরের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে! কিন্তু সমাজতন্ত্রের আমলেও শ্রেণীগুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় না। তখনও শহর ও গ্রামে উৎপাদিকা শক্তিগুলির ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের স্তর অনুযায়ী শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকের মধ্যে শ্রেণী-পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যগুলি সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির দুই রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত; দুই রূপ হল—রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, অর্থাৎ সমগ্র জনগণের সম্পত্তি এবং সমবায়, যৌথ-খামার সম্পত্তি। এখানে মৌলিক ব্যাপার হল উৎপাদনের সামাজিকীকরণের, শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের অসম মাত্রা।

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যুম ২৯, পৃষ্ঠা ৪২১।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব তখনও বজায় থাকে তা হল শ্রমিক ও কৃষক। তারা অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, উৎপাদনের উপকরণের এক ধরনের সামাজিক মালিকানা ও একত্রে কাজের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ থাকে, তা সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট সমষ্টির কাঠামোর মধ্যে তখনও তাদের পার্থক্য থাকে উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা এবং আয় করার উপায় সম্পর্কিত ব্যাপারে। এই সব পার্থক্য ক্রমে ক্রমে মুছে যায়, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হতে অনেক বাকি থাকে।

শ্রমিকশ্রেণী সমাজে তার নেতৃত্বের ভূমিকা বজায় রাখে, কারণ এই সব পার্থক্য তখনও থাকে। এর কারণ, প্রথমত সমগ্র জনগণের সম্পত্তি, যে সব প্রতিষ্ঠান সেইখানে কাজ করার দরুন শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত; দ্বিতীয়ত শিল্প, যা সমগ্র অর্থনীতির পরিচালিকা শক্তি তাতে নিযুক্ত লোকেদের বিপুলাংশ হল শ্রমিকশ্রেণী; তৃতীয়ত শ্রমজীবী জনগণের যে কোনও গোষ্ঠীর চেয়ে শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর সংগঠিত। শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ এবং কমিউনিস্ট আদর্শের ভিত্তিতে সোভিয়েত সমাজের সকল শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলি ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে এবং বৃহত্তর সংসক্তি লাভ করছে।

সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রেণী-পার্থক্যই একমাত্র সামাজিক পার্থক্য নয়। শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ খামারী কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য ছাড়াও সাধারণভাবে শহর ও গ্রামের জনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য (গ্রামে কেবল যৌথখামারীরাই থাকে না, শ্রমিক ও অপরাপর কর্মচারীও থাকে); যেসব মূলত কায়িক শ্রমে নিযুক্ত থাকে তাদের সঙ্গে যারা প্রধানত মানসিক শ্রমে নিযুক্ত থাকে তাদের পার্থক্য; শেষত শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবী ও অপরাপর অফিস ও অন্যান্য কর্মচারী প্রত্যেকের মধ্যে আবার বিভিন্ন অংশ যাদের কাজের আধেয় বিভিন্ন, দক্ষতা বিভিন্ন এবং আয়ের স্তর বিভিন্ন, তাদের মধ্যেকার পার্থক্য।

এই সব পার্থক্য দূর করা প্রধানত দুটি বড় সামাজিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপার—(১) শহর ও গ্রামের মধ্যে এবং (২) কায়িক ও মানসিক শ্রমে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে মূল মূল পার্থক্যগুলি দূর করা। অতএব

সর্বোপরি উৎপাদনের বিকাশ ও সংস্কৃতির প্রসারের দ্বারাই এ নির্ধারিত হবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান এবং উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কের মারফত শ্রমিক ও কৃষকেরা ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, কারণ দুরকমের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিও ক্রমশ কাছাকাছি আসছে। আর একটা জিনিস যা সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীকে ঘনিষ্ঠতর করছে তা হল তাদের শ্রমের চরিত্র। প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতির ভিত্তিতে কৃষি-সংশ্লিষ্ট শ্রম ক্রমশ এক ধরনের শিল্পসংশ্লিষ্ট শ্রমে পরিণত হচ্ছে এবং জনগণের উৎপাদন ক্রিয়াকলাপে মানসিক ও কায়িক শ্রম ক্রমশ এক অঙ্গাঙ্গী ঐক্য অর্জন করতে শুরু করেছে। শ্রমের চরিত্র সমরূপ করার প্রক্রিয়া যত এগোয় কৃষকদের সাংস্কৃতিক ও কৃৎকৌশলগত স্তর তত ক্রমশ শ্রমিকদের স্তরের কাছাকাছি পেঁছয় এবং এই দুই শ্রেণীর স্তরই বুদ্ধিজীবী স্তরে ওঠে, তার মধ্যে দিয়ে সমগ্র জনগণের সাধারণ সাংস্কৃতিক উন্নতি সূচিত হয়।

শেষ পর্যন্ত শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক ও কৃৎকৌশলগত স্তরের পার্থক্য দূর হওয়ার ভিত্তিতে কমিউনিজমের দিকে এগোনর প্রক্রিয়ায় ক্রমশ আয়ের বণ্টনের রূপ এবং সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবেশ উভয় ক্ষেত্রেই পার্থক্য দূর হওয়ার পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশ শ্রেণী-সম্পর্কের রূপান্তর সাধনের অভিজ্ঞতা শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-পার্থক্য জয় করার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য দেখিয়ে দেয় এই অভিজ্ঞতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত গ্রন্থগুলির সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণিত করে যে বর্তমান যুগে সামাজিক প্রগতি সম্ভব হবে কেবল মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান এবং শ্রেণী-নিপীড়ন থেকে মানব সমাজের মুক্তির মারফত। উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রেণী-শোষণের অবসান সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক নবজন্ম আনে; কারণ তা সম্পদ সঞ্চয়ের লালসা, অর্থের ক্ষমতা, শত্রুতা, স্বার্থপরতা, যুদ্ধ, সমরবাদ এবং শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের অপরাপর অনিষ্টের অবসান করে।

এক সময়ে শ্রেণীগুলির উদ্ভব একটা প্রগতিশীল ঘটনা ছিল, কিন্তু এখন শ্রেণীগুলির বিলোপ ঐতিহাসিক প্রগতির একটা শর্ত।

শ্রেণীগুলির উদ্ভব হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং লোকেদের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত ফল হিসাবে। পক্ষান্তরে শ্রেণীগুলির অবসান কেবল সর্বহারার সচেতন শ্রেণীসংগ্রামের ভিতর দিয়েই হতে পারে। এ থেকে তার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় পৌঁছন যায়, যে আধিপত্য সমস্ত শ্রেণী-পার্থক্য দূর করার পথে এক অত্যাবশ্যক অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ।

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রাম অদৃশ্য হয় না, কেবল রূপ পরিবর্তন করে। একথা লেনিন দেখিয়েছিলেন এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে। যতক্ষণ সমাজে এমন সব শক্তি থাকে যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয় ততক্ষণ এ অপরিহার্য।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনগণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ খামারীদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং এই সমস্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার সম্পর্কও আর শ্রেণী-সংগ্রামের নয়, বন্ধুত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীর সম্পর্ক।

শোষক শ্রেণীগুলির উচ্ছেদ এবং সমাজে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার মানে শ্রেণীসংগ্রামের পূর্ণ তীব্রতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরে গেল, যেখানে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতি-যোগিতা পুরোদমে চলছে। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আন্তঃ-সম্পর্ক যে কোনও রূপই নিক না কেন, মূলত তা শ্রেণী সংগ্রামের আওতায়। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রাম সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছিল ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালে গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সময়ে এবং নাৎসী জার্মানি ও তার মিত্রগণ কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সময়ে। নাৎসী জার্মানি ও ফ্যাশিবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদের বর্শাফলক ও তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। নাৎসী জার্মানি ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উপর সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির জয় সূচীত করেছিল।

দুই ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পটভূমিকায় অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব চূড়ান্ত। বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর দায়িত্ব পড়ে ধনতন্ত্রের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করায়। তা করতে হয় শ্রমের উচ্চতর উৎপাদনের ক্ষমতা ও সমগ্র জনসংখ্যার জন্য বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উচ্চতর স্তর অর্জন এবং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করার ভিতর দিয়ে। এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে চলে বিশ্ব-সমাজতন্ত্র ও বিশ্ব-ধনতন্ত্রের শক্তিগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেও সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম কিছুটা প্রতিফলিত হয়, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার চরদের ক্রিয়াকলাপ প্রতিহত করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই হয়। পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি-বোধের অবশেষের বিরুদ্ধে এবং যারা এই সব পোষণ করে তাদের সমাজ-বিরোধী ও দেশপ্রেম-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তখনও দরকার। এই সংগ্রামের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিতরকার শ্রেণীগুলি অথবা সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধ নিহিত নেই, কিন্তু এরও মধ্যে কিছুটা শ্রেণী-আধেয় আছে, কারণ পুরানো দুনিয়ার মতাদর্শগত বিরোধিতা জয় করার প্রয়োজনের সঙ্গে এ সংশ্লিষ্ট।

শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটি স্তর। শ্রেণী-বিভেদ দূর করা একটা ক্রমপরিণতির প্রক্রিয়া। নির্ভুল কর্মনীতি থাকলে এতে শ্রেণী-বিরোধ বা সংঘর্ষ থাকে না। সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে রচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি কৃষকের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী দৃঢ়তর ক'রে, যুক্ত শ্রমে শ্রমিক, যৌথখামারী ও বুদ্ধিজীবীদের আরও ঐক্যবদ্ধ ক'রে, এই বিষয়গত প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। জনগণের সকল অংশের ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হওয়া কমিউনিজমের দিকে সমাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করে। কমিউনিজমেই সমস্ত শ্রেণী-পার্থক্য তিরোহিত হবে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রত সম্পাদিত হবে।

অতএব সমাজের বিকাশ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই প্রতিজ্ঞা সত্য প্রমাণিত করে যে শ্রেণী-বিভাগ ঐতিহাসিকভাবে সাময়িক চরিত্রের। এ কথা বোঝা গিয়েছে যে কয়েক সহস্র বৎসর আগে আদিম কমিউনভিত্তিক

সমাজকে স্থানচ্যুত করেছিল যে শ্রেণী-সমাজ তা মানব-সমাজের জীবনের শাশ্বত রূপ নয়, তার প্রাক-ইতিহাস মাত্র, আরও বোঝা গিয়েছে যে এর পরই আসবে প্রকৃত মানবিক ইতিহাস যা সকল রকম নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবে এবং মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার পূর্ণ প্রস্ফুরণের ব্যাপক সুযোগ দেবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানব গোষ্ঠির ঐতিহাসিক রূপসমূহ : ট্রাইব, অধিজাতি, জাতি

আমরা দেখেছি যে বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন পদ্ধতি সকল সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে। এই সামাজিক সম্পর্কগুলি সমাজের কাঠামো, সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ধরন এবং সেই সংগে মানব গোষ্ঠীর কমবেশি স্থায়ী ঐতিহাসিক রূপগুলি অর্থাৎ ক্ল্যান (গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী), ট্রাইব (উপজাতি), অধিজাতি (nationality) ও জাতি নিধারণ করে।

১. প্রাক-শ্রেণী সমাজে মানব গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক রূপ হিসাবে ক্ল্যান ও ট্রাইব

প্রাক-শ্রেণী যুগে মানব সম্প্রদায়ের প্রধান রূপ হল ক্ল্যান ও ট্রাইব। নৃতত্ত্ব, নরগোষ্ঠী বিজ্ঞান (এথনোগ্রাফি) ও প্রত্নতত্ত্ব কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে যাযাবর জীবনের জায়গায় ক্ল্যান বা গোত্রভিত্তিক সংগঠন এসে বসল উচ্চতর আদি প্রস্তরযুগে, যখন আধুনিক ধরনের মানুষের প্রথম আবির্ভাব হল।

ক্ল্যানকে প্রাক-শ্রেণী সমাজের একটি প্রাথমিক উৎপাদনক্ষম, সামাজিক ও এথনিক (নরগোষ্ঠীগত) গোষ্ঠী রূপে ব্যাখ্যা করা যায়। এদের উৎপত্তি, ভাষা, প্রথা, বিশ্বাস এবং দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অভিন্ন ছিল। এরা ছিল এমন এক গোষ্ঠী যাদের কার্যকলাপে রক্তের সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কগুলি মুখ্য ভূমিকা নিত। ক্ল্যানের অভিন্ন বসতি ও শিকারের অঞ্চল ছিল।

ক্ল্যানের অর্থনৈতিক ভিত্তি হল আদিম কমিউন ব্যবস্থার সম্পত্তি। ক্ল্যান গঠনকারী মানব গোষ্ঠী সামাজিক মালিকানার এবং নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রীর সমবণ্টনের ভিত্তিতে একত্রে তাদের অর্থনীতি চালাত। তাদের অর্থনৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন ও উন্নয়ন গোত্রভিত্তিক সমাজের সাংগঠনিক ধরনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাত।

ট্রাইব ক্ল্যানের চাইতে বড় মানব-গোষ্ঠী। সাধারণত ট্রাইব কয়েক শত অথবা কয়েক হাজার (হয়ত হাজার হাজার) লোক নিয়ে গঠিত হত। যথেষ্ট উন্নত হলে কয়েকটি ক্ল্যান এর অন্তর্ভুক্ত হত। ট্রাইবের ভিতরে প্রত্যেকটি ক্ল্যানই সামাজিক উৎপাদনের স্বাধীন ইউনিট হিসাবে থাকত, কিন্তু ট্রাইব সামাজিক সম্পত্তির ও সামাজিক সংগঠনের এক নতুন ধরন আমদানি করল। এসময়ে ট্রাইবাল সম্পত্তি এবং ক্ল্যানের সম্পত্তি দুই-ই বিদ্যমান থাকল। ক্ল্যানের এই সম্পত্তি বেশির ভাগই ছিল ভূখণ্ডগত (ক্ল্যানগুলির বসবাসের অঞ্চল, তাদের শিকারের এলাকা, গোচারণ ভূমি ও অপরাপর জমি)। তা থেকে বোঝা যায় যে সমগ্র ট্রাইবের একটি সরকার প্রয়োজন এবং এই কারণেই সর্দার, পুরোহিত, যুদ্ধবাজ দলপতি, ট্রাইবাল পর্ষদ এবং ট্রাইবের যোদ্ধা ও প্রবীণদের সাধারণ সভার মত প্রশাসনিক সংস্থার অভ্যুদয়।

সে সময়ে মানব-গোষ্ঠীর ক্ল্যান ও ট্রাইবাল রূপ হল একমাত্র সম্ভাব্য রূপ যাতে উৎপাদন তথা গোটা আদিম সমাজটাই চলতে পারত ও বিকাশ লাভ করতে পারত। আদিম কমিউন ব্যবস্থার সেই স্তরে মানব জাতির মধ্যে এ ধরনের একটি রূপের এইজন্যই অস্তিত্ব ছিল এবং এই কারণেই তা হাজার বছর বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল।

ক্ল্যান অথবা ট্রাইবাল গোষ্ঠী অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছিল এবং মানুষকে আরও ঘনিষ্ঠতর করে রেখেছিল। এই সব গোষ্ঠী উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির অতি প্রাথমিক জিনিসগুলির সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের জন্য এবং ভাষার উন্নয়ন ও নিখুঁতিকরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। একই সঙ্গে আবার রক্তের সম্পর্কগুলি সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সংখ্যাগত বৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে, বিশেষত মানুষের যাতায়াতকে ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির বিকাশকে ব্যাহত করেছিল।

ঐতিহ্যের যে শক্তি সামাজিক জৈব কাঠামোকে চালু রেখেছিল তা এত প্রবল ছিল যে তা ট্রাইবের জীবনে কোনও বাস্তব পরিবর্তনে বাধা দেয়। ক্ল্যান-ট্রাইব সংগঠনে বিরোধের উদ্ভবই শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীগুলির এই রূপের জায়গায় অপরাপর রূপের স্থান করে দিয়েছিল। সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে বললে

ট্রাইব গঠিত হওয়াতেই ঐক্যবদ্ধ নানা কর্ম সম্পাদক গোষ্ঠীগুলির বিভাজন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ট্রাইব যেহেতু সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মাত্র কয়েকটিই সম্পাদন করত, তাই তা থেকেই শুরু হল এথ্‌নিক গোষ্ঠীর আশু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে সরে যাওয়া। তারপর এল জুটি-ভিত্তিক পরিবার ও পৃথক পৃথক পারিবারিক-বৈবাহিক সম্পর্কের প্রবণতা এবং সাধারণ এথ্‌নিক সম্পর্ক থেকে গোত্র সম্পর্কে যাবার প্রবণতা।

২. শ্রেণীগুলির আবির্ভাব এবং মানব সম্প্রদায়ের রূপগুলির বিকাশ। অধিজাতি। জাতি

সামাজিক শ্রমবিভাগ (কৃষি থেকে পশুপালন পৃথক করা, কারিগরী জ্ঞানের বিকাশ) শুরু হওয়ার এবং দ্রব্য-বিনিময় সম্পর্ক ও অসম সম্পত্তি সম্পর্কগুলির আবির্ভাব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যান-ট্রাইব সংগঠন মানব সম্প্রদায়ের একটি নতুন রূপকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মানব সম্প্রদায়ের এই নতুন রূপটি রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত হয় নি, গঠিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ট্রাইবে সংগঠিত মানুষের মধ্যে কতকগুলি ভূখণ্ডগত সম্পর্ক দ্বারা। তারা অবশ্য তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ-তাদের বাণিজ্যিক অথবা অপরাপর অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির চরিত্র দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। মানব সম্প্রদায়ের এই নতুন রূপটিই হল অধিজাতি।

শ্রেণী শোষণের সম্পর্কগুলি যা আদিম কমিউনের সম্পর্কগুলির স্থান অধিকার করেছে তার ভিত্তিতে গঠিত অধিজাতি হল এমন একটি মানব সম্প্রদায় যারা একটি ভূখণ্ডে বসবাস করে ও এক অভিন্ন ভাষা, মনোবৃত্তি, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাত্রার ধারার দ্বারা এবং প্রথা, নৈতিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে প্রতিফলিত জীবনধারার দ্বারা আবদ্ধ। ট্রাইবাল সংগঠনের সমষ্টির আদিম কমিউনের অর্থনীতির বদলে এই অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে স্থাপিত হয় এবং শোষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটায়। এইভাবেই অধিজাতির গঠন ক্রমশ ব্যাপক মানব সম্প্রদায়ের সঙ্গে অর্থনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিনষ্ট করে ফেলে। ট্রাইবগুলির তুলনায় আরও উন্নত মানব সম্প্রদায় হবার দরুন অধিজাতিগুলি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ও অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ এলাকায়

উৎপাদন, সঞ্চয় এবং উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক সাফল্যগুলির বিনিময়ের বিকাশ ঘটায় এবং ভাষাসহ মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সকল পদ্ধতিগুলির বিকাশ ঘটায়।

কিন্তু কালের গতিপথে মানব সম্প্রদায়ের এই রূপটিও বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন ও বিনিময়ের বিকাশকে ব্যাহত করতে শুরু করে। পিতৃতান্ত্রিক-জীবনধারণের (Patriarchal-Subsistence) অর্থনীতির স্থান গ্রহণ করে পণ্য উৎপাদন। পণ্য-পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবলোপ ঘটায় এবং এক একটি নির্দিষ্ট অধিজাতির মধ্যে এবং অপরাপর অধিজাতিগুলির সঙ্গে বন্ধন শক্তিশালী করে, তাদের মধ্যে অভিন্ন ভাষা ও অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এনে দিতে সাহায্য করে এবং মানুষকে আরও সুস্থিত সম্প্রদায়ে অর্থাৎ জাতিসমূহের মধ্যে একত্রিত করতে সাহায্য করে।

ম্যানিফেস্টো অব দা কমিউনিস্ট পার্টি'তে মার্কস ও এংগেলস জাতিগুলির পুঁজিবাদী উৎপত্তির কথা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। "বুর্জোয়ারা জনসংখ্যার, উৎপাদনের উপকরণের ও সম্পত্তির ছড়ান-ছিটান অবস্থা ক্রমাগত দূর করতে থাকে। এরা জনসংখ্যাকে একত্র করেছে, উৎপাদনের উপকরণকে কেন্দ্রীভূত করেছে ও মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পত্তি জড়ো করেছে। এর স্বাভাবিক ফলাফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। পৃথক স্বার্থ, আইন-কানুন, সরকার ও কর ব্যবস্থা সমন্বিত স্বাধীন অথবা নিতান্ত আলগাভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলিকে এক সরকার, এক আইন-সংহিতা, এক জাতীয় শ্রেণীস্বার্থ, এক সীমান্ত ও এক শুল্কহার সমন্বিত এক জাতির মধ্যে গুঁড়ে দেওয়া হল।"(১)

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া দেখেই মার্কস ও এংগেলস উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। ঐসব দেশে পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলি পরিপক্ক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একই সাথে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবলুপ্তি ঘটে ও মানুষ জাতিতে সংঘবদ্ধ হয়। এই দুটি প্রক্রিয়া একই সংগে ঘটার দরুন এক-জাতিভিত্তিক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হয়; যদিও এই সব রাষ্ট্রের মধ্যেও উপভাষা ও স্থানীয় আচার-আচরণের মধ্যে অথবা এমনকি বহু এক-জাতিভিত্তিক

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১১২-১৩।

রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় সংখ্যালঘু অবশিষ্টাংশ থেকে যাওয়ার দরুন (উদাহরণ স্বরূপ, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) আভ্যন্তরীণ পার্থক্য দেখা দেয়।

কোনও কোনও সময়ে নানা কারণে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকল অধিজাতিগুলি একটি জাতিতে সন্নিবিষ্ট হওয়ার আগেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়ে যায়। এই সব ক্ষেত্রে বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাতে এমন এক বা একাধিক জাতি বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থান লাভ করে যারা অপরাপরদের আগে গঠিত হয়েছিল, যারা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠনে পরিচালক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বহুজাতিক রাষ্ট্র এমন সময়েও দেখা দেয় যখন উদীয়মান একটি জাতির শাসক শ্রেণীগুলি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ক্ষমতা নিজেদের হাতে থাকার ফলে অপরাপর জাতি, যাদের অর্থনৈতিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের, তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এইভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু এক-জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার সময়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এই সব সাম্রাজ্যের জনসমষ্টির মধ্যে রয়ে যায় বহু ধরনের জাতি। সর্বক্ষেত্রেই অবশ্য জাতি গঠিত হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে।

নারদনিক মিখাইলোভস্কি জাতীয় যোগসূত্রগুলিতে ট্রাইবাল যোগসূত্রগুলির সম্প্রসারণ ও সামান্যীকরণরূপে দেখার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদদের অনুগামী ছিলেন। লেনিন তাঁর সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে দেখান যে প্রকৃতপক্ষে প্রদেশ, দেশ ও রাজশাসিত রাষ্ট্রগুলির রুশ জাতির মধ্যে মিলিত হবার ঘটনাটি ঘটে পণ্য-পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে, কারণ এই সম্পর্কগুলির জন্যই সমগ্র রাশিয়াব্যাপী একটি বাজার সৃষ্টি হয়েছিল : "যেহেতু এই প্রক্রিয়ার নেতা ও প্রভু ছিল বণিকেরা, তাই এই সব জাতীয় যোগসূত্র সৃষ্টি বুর্জোয়া যোগসূত্র সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।"(১)

ফলত জাতিগুলির জন্ম হয় সামন্ততন্ত্রের পতন এবং জনগণের অর্থনৈতিক জীবন নির্ধারক সুস্থিত অর্থনৈতিক বন্ধনের বিকাশের ভিত্তিতে পুঁজিবাদ গঠনের প্রক্রিয়ায়। এই ঘটনাই একটি অধিজাতিকে বা একটি অধিজাতির অংশবিশেষকে জাতিতে পরিণত করে অথবা সংশ্লিষ্ট অধিজাতিগুলির একটি

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস. ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৫৫।

একক জাতিতে মিশে যাওয়ার ভিত্তি সৃষ্টি করে। একটি অভিন্ন অর্থনৈতিক জীবন ছাড়া কোনও জাতি হতে পারে না। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি পূর্বেকার প্রাক-পুঁজিবাদী আমলে উদ্ভূত অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে একত্রে মিলেই জাতি তৈরি করে, তবে তার বিকাশ ঘটে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক বন্ধনের ভিত্তিতে। অর্থনৈতিক জীবনে ঐক্য ছাড়াও একটি জাতির মূল মূল বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হল একটি অভিন্ন ভাষা, একই ভূখণ্ড এবং সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রকাশিত জনগণের সামাজিক মনস্তত্ত্বগত কয়েকটি বিশেষত্ব। কিন্তু জনগণের কতকগুলি অভিন্ন অপ্রধান মনস্তত্ত্বগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা ওই জাতির মধ্যেকার পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর সদস্যদের ভিতরের মৌলিক মনস্তত্ত্বগত পার্থক্য বিনষ্ট করে না।

স্তুতরাং একটি জাতি হল একটি সুস্থিত মানব সম্প্রদায় যারা একটি অভিন্ন ভাষা, একই ভূখণ্ড, অর্থনৈতিক জীবনের ঐক্য এবং ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষদের সংস্কৃতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রকাশিত (যা তাদের সংস্কৃতিকে অপরাপর মানুষদের সংস্কৃতি থেকে পৃথক করে) সামাজিক মনস্তত্ত্বের কয়েকটি বিশেষত্ব দ্বারা আবদ্ধ।

জাতি হল উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক মানব সম্প্রদায়ের রূপ। জাতি এই সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ঘটায় এবং রাজনৈতিক বিছিন্নতা দূর করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। জাতিসমূহের গঠন ও জাতীয় আন্দোলনগুলি সামন্ততন্ত্রের অবলোপ সাধনে ও ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

কিন্তু সময়ের গতিপথে ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ওই জাতীয় কাঠামোটিও ধনতন্ত্রের পক্ষে অতি সংকীর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। ধনতন্ত্র একটি জাতীয় বাজার ও সেই সঙ্গে একটি বিশ্ব বাজারও সৃষ্টি করে। এই বাজার একটি জাতিকে শুধু একটি অর্থনৈতিক সম্প্রদায় হিসাবে সংহত করে না, সেই সঙ্গে সকল জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে এবং শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রকে একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত করে।

তার ফলে সৃষ্টি হয় সুগভীর বিরোধ এবং ধনতন্ত্রের আমলে জাতি-গুলির বিকাশের মধ্যে দুটি ঝোঁকের আবির্ভাব। জাতিগুলি গঠনের

সময়কার প্রথম ঝোঁক হল জাতীয় জীবন ও জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব এবং সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা ও প্রাক-ধনতান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ; দ্বিতীয় ঝোঁকটি জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক আদান প্রদান বৃদ্ধি করে এবং "আন্তর্জাতিক" পুঁজির সাহায্যে জাতীয় প্রতিবন্ধকগুলি ভেঙে ফেলে। লেনিন লিখেছেন ঃ "উভয় ঝোঁকই ধনতন্ত্রের সর্বজনীন বিধান। প্রথমটি ধনতন্ত্রের বিকাশের শুরুতে প্রাধান্য লাভ করে, শেষোক্তটি পরিণত ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, যা সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে।"(১)

এই দুটি ঝোঁকের মধ্যেকার বিরোধ সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিরোধের রূপ গ্রহণ করে। উন্নত দেশগুলির বুর্জোয়ারা বিদেশী ভূখণ্ড দখল করে, অপরাপর জাতিকে পদানত করে এবং ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণকামী নীতি অনুসরণ করে। বিপরীত দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শোষিত জাতিগুলির জনগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং নিজেদের মুক্তির জন্য লড়াই করে।

সমাজতন্ত্রের আমলে সামাজিক সম্পত্তির সাধারণ ভিত্তিতে, অভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা ও দেশপ্রেমের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে জাতিগুলির বিকাশ ঘটে ও পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে যেমন অধিজাতি ও জাতি গঠিত হয়, "পুরানো" জাতিগুলিও তেমনি সমাজতন্ত্রের ওই ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং নতুন সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রতিফলন করে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের জাতিগুলিরও বুর্জোয়া সমাজের জাতিগুলির মতই একই গুণাবলী থাকে—সেগুলি হল একই ভূখণ্ড, অর্থনৈতিক জীবন, ভাষা ইত্যাদি। কিন্তু এই জাতিগুলি উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন এবং মূলত অভিন্ন স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ার দরুন ওইসব গুণাবলীর আধেয় মৌলিকভাবে বদলে যায়। সমাজতন্ত্রের অধীনে ধনতান্ত্রিক আমলের মত জাতি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় না। এইজন্যই জাতীয় সম্প্রদায় সামাজিক সম্পত্তি ও যৌথ ক্রিয়াকলাপের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্প্রদায় ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যের সঙ্গে একই বিন্দুতে মিলে

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ২৭।

যায়। এই সব জাতির আরও বিকাশ ঘটে তাদের স্বেচ্ছামূলক এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের মারফতে এবং তা ভবিষ্যতের উন্নত কমিউনিস্ট সমাজে মিশে যাবার পথ প্রস্তুত করে।

অতএব আমরা তিন ধরনের মানব সম্প্রদায় দেখতে পাই। মানব সমাজের ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় এই সম্প্রদায়গুলি একে অপরের স্থান গ্রহণ করেছে ঃ ক্ল্যান অথবা ট্রাইবাল সম্প্রদায়, অধিজাতি ও জাতি। এইসব সম্প্রদায়গুলির একটির জায়গায় অপরটি আসায় ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সময় যে সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ ঘটে ও সামাজিক অগ্রগতি হয় তার দরুন অধিকতর স্থায়িত্বসম্পন্ন এবং দৃঢ়তর বাঁধনসম্পন্ন নরগোষ্ঠীগত সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের ধরনগুলি কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় কেবল মূলতই। ইতিহাসে এ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে যখন সম্প্রদায়গুলির এইসব ধরন একেবারে "বিশুদ্ধ" রূপে দেখা দেয়। অসম অর্থনৈতিক বিকাশের দরুন আমাদের পৃথিবীতে আদিম কমিউনের সম্পর্ক থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক পর্যন্ত সমস্ত রকমের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং এইসব সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ট্রাইবাল গোষ্ঠী থেকে উন্নত জাতি পর্যন্ত সবরকমের ঐতিহাসিক সম্প্রদায় দেখা যায়। জন্মগতভাবে অধিজাতির আগে এসেছে ট্রাইব ও জাতির আগে অধিজাতি, কিন্তু সারা বিশ্বের প্রকৃত ইতিহাসে দেখা যায় এবং একটি মানব সম্প্রদায়ের কাঠামোর মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় যে ওইসব ধরনগুলি পাশাপাশি রয়েছে এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়া করছে। এই কারণেই এশিয়া, আফ্রিকা ও অপরাপর মহাদেশের বহুস্থানে আজও যেসব ট্রাইব ও অধিজাতি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলি নিকট অতীতের ট্রাইব ও অধিজাতিসমূহ থেকে বেশ পৃথক ধরনের। এটা সেই পরিমাণে হয়েছে যে পরিমাণে সেগুলি কোনও না কোনও ভাবে নতুন নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঔপনিবেশিকতা বহু দেশের জাতিসমূহের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যাহত করতে এবং বিশেষত জাতি হিসাবে তাদের আবির্ভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে চূড়ান্ত ভূমিকা নিয়েছিল।

৩. ধনতন্ত্রের আমলে জাতীয় সম্পর্ক

জাতিগুলির গঠন জাতি-সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। ধনতন্ত্রের আমলে এর বিকাশকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়টি হল ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সামন্ততন্ত্রের পতনের যুগ, অধি-জাতিগুলির জাতিতে রূপান্তরণের যুগ। এযুগে এই প্রক্রিয়ার নেতা ছিল সাধারণভাবে বুর্জোয়ারা (মোটামুটিভাবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে।) এই সময়ে মানবজাতি (ইউরোপে) প্রথম দফায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও বিপ্লবের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হল ধনতন্ত্রের বিস্তার লাভ এবং "মুক্ত" ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর (এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে)। এই সময় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি পৃথিবীকে ভাগ করে নেয় ও নিপীড়নের এক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চালু করে। এই যুগটি হল শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুগ। এই সময়ে যে সব জনসমষ্টি তখনও জাতিতে সংহত হয়নি তারা তাদের মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দেয়।

এখন আমরা তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছি। জাতি সমস্যার দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান যুগটি হল সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ধ্বসে পড়ার যুগ, সেই সব জাতির জাতিত্বলাভের যুগ যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পথে নিজেদের মুক্ত করেছে বা করছে। যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই মানব জাতির এক বিরাট অংশের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে তার অস্তিত্ব ঐ প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলছে। জাতিত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে মিলে যায়।

বিষয়গতভাবে উদীয়মান ধনতন্ত্রের জাতীয় আন্দোলনগুলি চরিত্র ও ভূমিকার দিক থেকে ছিল সামন্ততন্ত্র-বিরোধী। এই আন্দোলনগুলি সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের ও জনগণের সংগ্রামে পুঁজিবাদের প্রাধান্যের অন্যতম শর্ত সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদের আমলে আধিপত্যকারী জাতির বুর্জোয়ারা উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জনগনের উপর নিপীড়ন চালায় এবং শেষোক্তরা ঔপনিবেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতার

জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় প্রশ্ন একদিকে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, জাতীয় বুর্জোয়া ও অপরাপর প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিপ্লবী, মুক্তিকামী ও সুগভীর গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের মধ্যে সংঘাত প্রকাশ করে।

জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি শ্রেণীই সমস্যাটিকে নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। উদাহরণ স্বরূপ, জাতীয় বুর্জোয়ারা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জায়গায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই থেকেই এদের অসংগতি, দোদুল্যমানতা এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সংগে আপসের ব্যাখ্যামেলে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সকল ধরনের নিপীড়নের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি দাবি করে (জাতীয় নিপীড়ন সহ); এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী সংগ্রামে তাদের ক্ষেত্রে থাকে সংগতি ও দৃঢ়তা।

ধনতন্ত্রের আমলে সমস্ত সামাজিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ঝোঁকে পরিণত হয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ আপনা থেকেই অবশ্য অবশ্যম্ভাবীভাবে জাতীয় রূপ গ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদের পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য বুর্জোয়াদের সংগ্রামের ক্ষেত্রেই শুধু তা দেখা যায় না, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। এই শ্রেণী তখনই রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়, যখন তাদের আন্দোলন জাতিব্যাপী পরিসর গ্রহণ করে অথবা মার্কস ও এঙ্গেলসের ভাষায় বললে "বহু সংখ্যক স্থানীয় সংগ্রাম শ্রেণীগুলির মধ্যে একটি জাতীয় সংগ্রামে" মিশে যায়। "কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রেণীসংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রাম"(১), শ্রমিকশ্রেণী প্রধানত তাদের নিজেদের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং এই সংগ্রাম নির্দিষ্ট জাতির বিকাশের ঐতিহাসিক স্তর দ্বারা নির্ধারিত রূপ গ্রহণ করে।

জাতি-সমস্যার প্রশ্নটি এই কারণেও রাজনৈতিক যে সম্পর্কগুলি যেখানে রাষ্ট্র ও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এমন একটি পরিস্থিতিতে তা দেশের গঠনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং শাসকশ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত নীতির সংগে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। এর সংগে এই ঘটনাটিও যোগ করতে হবে যে আন্ত-রাষ্ট্রীয়

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১১৬।

সম্পর্কগুলি যা অবধারিতভাবে রাজনৈতিক চরিত্র নেয় সেগুলি সাধারণত জাতীয় সম্পর্কের চরিত্র অর্জন করে।

ধনতন্ত্রের আমলে জাতীয় সম্পর্কগুলি জাতির আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও বিরাট ভূমিকা নেয়। সর্বপ্রকার আত্মিক ক্রিয়াকলাপের, বিশেষত কলার ক্ষেত্রে জাতীয় রূপে পরিগ্রহণ করে। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে মতাদর্শগত জীবনও দুটি ঝোঁকের সংগ্রামের ভিত্তিতে বিকশিত হয় "…যা সারা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের দুটি বিরাট শ্রেণী শিবিরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং জাতির প্রশ্নে দুটি নীতি (না, দুটি বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি) প্রকাশ করে।"(১) এই ঝোঁক দুটি হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা।

একজন জাতীয়তাবাদী কেবল জাতীয় স্বার্থের কিছু সমস্তের অস্তিত্ব এবং সেগুলির রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম থেকে অগ্রসর হয় না। আন্তর্জাতিকতাবাদীর পাল্টা সে ওইসব স্বার্থের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখে। উপরন্তু সে অপরাপর সব সামাজিক স্বার্থকে ওই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে: হয় সেগুলিকে উপেক্ষা করে, নয় জাতীয় স্বার্থের অধীন বলে গণ্য করে। দেশের ভিতর এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত দেখা যায় শ্রেণী ও শ্রেণী-স্বার্থগুলির বিরোধ অস্বীকার করার মধ্যে, বিকাশের পরিচালক শক্তি হিসাবে শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করার মধ্যে। অপরাপর জাতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে (রাষ্ট্র যদি বহুজাতিক হয় তবে তার কাঠামোর মধ্যেকার জাতিসমূহ সহ) জাতীয়তাবাদ সেক্ষেত্রে রক্ষণশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থা, প্রথা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মাত্রাধিক প্রশংসা সহ সামাজিক রাজনৈতিক আদর্শ নির্বিশেষে যা কিছু "আমাদের", যা কিছু জাতীয় সে সম্পর্কে মাত্রাধিক প্রশংসার রূপ নেয়। অপরাপর জাতি ও জাতিসত্তাগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বার্থকে উপেক্ষা করার অথবা সেগুলিকে ঘৃণা করার মধ্যে এবং অপরাপর জাতির হীনতা সম্পর্কেও "আমাদের" জাতি সম্পর্কে প্রকাশ্য অথবা গোপন দম্ভের মধ্যেও জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখা যায়।

জাতীয়তাবাদ অপরাপর জাতির সঙ্গে ব্যাপক সম্পর্ক স্থাপনেরও বিরোধিতা করে; নিজের জাতির সঙ্গে নরগোষ্ঠীগতভাবে যারা ঘনিষ্ঠ তাদের সঙ্গেই কেবল ওই সম্পর্ক মেনে নেয় এবং জাতিগুলির একত্রে মিশে

১। ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২০, পৃষ্ঠা ২৬

যাওয়ার ও কোনও কোনও জাতির অপর জাতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল প্রক্রিয়ায় বিরোধিতা করে। এমন কি যদি এই প্রক্রিয়া বলপ্রয়োগের মারফত অথবা জবরদস্তির ফলে না হয়ে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পথে "স্বাভাবিক"ভাবেও হয় তাহলেও জাতীয়তাবাদ এর বিরোধিতা করে।

জাতীয়তাবাদের উগ্র রূপ হল জাতিদাম্ভিকতা। এক্ষেত্রে অপরাপর জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বার্থের প্রতি বিদ্বেষে ও এমনকি বন্য ঘৃণায় পরিণত হয় এবং তা এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে ঐসব জাতিকে শুধু শৃঙ্খলিত ও শোষণ করার আকাঙ্ক্ষা নয়, তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার বাসনাও দেখা দিতে পারে। জাতীয়তাবাদ যখন বর্ণবিদ্বেষের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন জাতিদাম্ভিকতা এই ধরনের উগ্র ও মানববিদ্বেষী রূপ পরিগ্রহ করে। সাম্রাজ্যবাদের আমলে বর্ণবিদ্বেষ ব্যাপক আকার গ্রহণ করে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যেখানে প্রধানত সাদা মানুষদের বাস, সেই সব দেশের বুর্জোয়ারা বহুসংখ্যক "কৃষ্ণবর্ণের" জাতিকে পদানত করে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা তাদের সমূলে ধ্বংস করার নীতিও গ্রহণ করে।

বর্ণগত পার্থক্য জৈবের বাইরের পার্থক্য। মানুষের জৈব কাঠামোয় সংঘটিত শারীরবৃত্তগত প্রক্রিয়ায় বর্ণের কোনও অপরিহার্য ভূমিকা নেই এবং মানুষের মস্তিষ্কের গঠন অথবা তাদের চিন্তা ও অনুভূতির উপরও কোনও প্রভাব নেই। বাইরের এই জৈব পার্থক্য সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় কোনও ভূমিকাই গ্রহণ করে না। জাতীয়তাবাদের উগ্র রূপগুলির মতই যে কোনও ধরনের বর্ণবৈষম্য সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচাইতে যুদ্ধবাজ, সবচেয়ে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ও পার্টিগুলির মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক হাতিয়ার (নাৎসীবাদ ও ফ্যাশিবাদের অপরাপর রূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কু-ক্লুক্স ক্ল্যান, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদি)।

জাতীয়তাবাদ বিশ্বজনীনতার (Cosmopolitanism) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। বাহ্যিকভাবে এ দুটি পরস্পরবিরোধী। জাতীয়তাবাদ জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাড়িয়ে দেখে, আর বিশ্বজনীনতা ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির তাৎপর্যকে অস্বীকার করে। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজনীনতা ধনতন্ত্রের

আসলে জাতি সমস্যার দুটি মূল প্রবণতার মতাদর্শগত প্রকাশ। বিশ্বজনীনতা বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে, পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে প্রবণতা প্রকাশ করে। কিন্তু এই প্রবণতাটিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে এবং দ্বিতীয় প্রবণতাটির অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যের প্রবণতাটির বিরোধিতা ক'রে বিশ্বজনীনতা অপরাপর জাতিকে অর্থ-নৈতিক (এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক) শৃংখলে আবদ্ধ করাকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করে এবং তা বিশ্বের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির সম্প্রসারণবাদী নীতিগুলির মতাদর্শগত হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বিশ্বজনীনতা বৃহৎ শক্তিগুলির সাম্রাজ্যবাদী জাতিদাম্ভিক উদ্দেশ্যকে সাহায্য করে। বৃহৎ শক্তিগুলি জাতিগত পার্থক্যগুলিকে পরিহার করার নামে অপরাপর দেশের উপর তাদের আধিপত্য, তাদের ভাষা, তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ইত্যাদি জোর করে চাপিয়ে দেয়। বিশ্বজনীনতা জাতীয়তাবাদেরই উল্টো পিঠ।

এতক্ষণ যা বলা হল তা থেকেই দেখা যায় যে "জাতীয়" এবং "জাতিসর্বস্ব" ধারণা দুটি কোনও মতেই এক নয়। জাতীয় ধারণাটি পুঁজিবাদী সমাজের সকল নরগোষ্ঠীগত সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। কোনও শ্রেণীই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করতে পারে না ; প্রত্যেকটি শ্রেণীকেই জাতি-সমস্যা সম্পর্কে তাদের মতামত স্থির করতে হয়। অপরদিকে জাতীয়তাবাদ হল একটি বুর্জোয়া নীতি, বুর্জোয়াদের বিশ্বদৃষ্টি ভঙ্গি এবং জাতি-সমস্যা সম্পর্কে বুর্জোয়া মতাদর্শ। আমাদের কোনও মতেই প্রতি-ক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের সংগে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলির বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। শেষোক্তটির সারমর্ম সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন এবং ফলত সাম্রাজ্য-বাদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরোধী। এই আন্তর্জাতিকতা সমাজে সর্বহারার অবস্থান, তাদের মৌলিক স্বার্থ, তাদের মুক্তি-সংগ্রামের প্রকৃতি ও চরিত্রকে প্রতিফলিত করে এবং জাতি-সমস্যা সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর কর্মনীতি, বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের সারমর্ম প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিকতা থেকে জাতীয়তাবাদে

সামান্যতম বিচ্যুতিরও অর্থ হল সর্বহারার শ্রেণী অবস্থান থেকে বুর্জোয়া অবস্থানে নেমে আসা এবং তা শ্রমিকশ্রেণীর তথা সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামকে ও কমিউনিজমের আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গভীরভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং জাতীয়তাবাদ যে রূপেই গ্রহণ করুক না কেন, তার সর্বপ্রকার অভিব্যক্তির ঘোরতর বিরোধী।

একই সঙ্গে আবার শ্রমিকশ্রেণী জাতি-সমস্যা সম্পর্কে কোনও নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে না। মূলত এই কারণে যে, যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিটি জাতীয় বাহিনীকে সংগ্রাম করতে হয় তাতে জাতীয় সম্পর্কগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

জাতীয়তাবাদী ও বিশ্বজনীনদের বিপরীতে আন্তর্জাতিকতাবাদীরা দেশপ্রেমিক। আন্তর্জাতিকতাবাদ ও দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজনীনতার মতই অবিচ্ছেদ্য। শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের দেশের জনগণের প্রকৃত স্বার্থ এবং প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য দেশের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। তারা দেশের জনগণের ভাগ্যে কি ঘটে সে বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী এবং তাদের উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করে। জাতির প্রকৃত স্বার্থের পক্ষে দাঁড়ান ও তা রক্ষা করার ব্যাপারে এবং সামাজিক প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের জন্য জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের পার্টির চাইতে অপর কোন শ্রেণী বা পার্টি বেশি প্রস্তুত নয়।

শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। সক্রিয় বিপ্লবী শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী প্রত্যেকটি আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক আধেয় উন্মাটন করবে, সমাজ জীবনে আন্দোলনের বিষয়ীগত ভূমিকা দেখবে, আন্দোলনের প্রতি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করবে এবং তখনকার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে হয় তার নেতৃত্ব করবে অথবা বিপরীতক্রমে সেই সব বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ঝোঁক ও গোষ্ঠীগুলির সক্রিয় বিরোধিতা করবে যারা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করে ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে জনগণকে বিপথে চালিত করে (উদাহরণ স্বরূপ, সমসাময়িক কালের জিওনিজম)।

জাতীয় আন্দোলনের পথে বহু ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই

আন্দোলন গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে (আরব জাতিগুলির আন্দোলন) অথবা দক্ষিণ দিকে ঝুঁকতে পারে (উদাহরণ স্বরূপ, ইন্দোনেশিয়াতে); গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় পৃথকীকরণ হতে পারে (দক্ষিণপন্থীরা হয় আন্দোলন ছেড়ে চলে যেতে পারে, নয় তাতে বিভেদ ঘটাতে পারে)। সুতরাং জাতি-সমস্যা সম্পর্কে বিপ্লবী কর্মনীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য প্রকৃত পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করতে হবে। কোনও জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিশীলতার প্রধান মানদণ্ড হল শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ, যা আবার শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের স্বার্থ।

জাতীয় সম্পর্কগুলি সমাজ-জীবনে শ্রেণীগুলির ও শ্রেণীগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কগুলির চূড়ান্ত ভূমিকা দেখিয়ে দেয়। প্রথম নজরেই মনে হবে যে শ্রেণীগুলি জাতির সঙ্গে সংযুক্ত নয়, কারণ শ্রেণীগুলি জাতিকে পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে; আর জাতি বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু বাস্তবে জাতি ও শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

জাতীয় আন্দোলনগুলি সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণীসংগ্রামের বিভিন্ন দিককে উদ্ঘাটিত করে। উপরন্তু প্রতিটি শ্রেণী ও প্রতিটি পার্টি জাতি সমস্যা সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ নীতি নিয়ে চলে।

বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা সাধারণত এই প্রশ্নটি সম্পর্কে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিকে দুর্বোধ্য করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করে। তাদের অধিকাংশই জাতির অর্থনৈতিক বন্ধনের স্থায়িত্ব, অভিন্ন ভাষা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করে। তারা জাতীয় ভাবধারার মধ্যে, জাতীয় একত্বের অনুভূতির মধ্যে ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতির অভ্যুদয়ের উৎস ও কারণ খোঁজে। এই কারণেই তারা "জাতি" ও "জাতীয়তাবাদ" শব্দের মধ্যে এবং "জাতীয়" ও "জাতিসর্বস্ব" শব্দের তফাত বুঝতে পারে না।

জাতির স্থান শ্রেণীগুলির ঊর্ধ্বে—এই যুক্তির অবতারণা ক'রে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলন এবং প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের (যেমন ফ্যাশিবাদের) মধ্যেকার পার্থক্য উপেক্ষা করে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতিগুলিকে বিভক্ত করার জন্য এবং সমাজ-

তান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা জাতীয়তাবাদ ও জাতি-দাম্ভিকতাকে উস্কানর চেষ্টা করে। এই কাজে তারা দক্ষিণ ও বাম শোধন-বাদীদের সাহায্য পেয়ে থাকে। এইসব শোধনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য শোরগোল সৃষ্টি করে এবং এইভাবে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ও বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করে। শোধনবাদীরা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু আসলে তারা তাকে কেবল জাতিগুলির সমান অধিকার ও অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার দাবিতে সীমাবদ্ধ করে এবং এইভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার মৌলিক নীতিকে অর্থাৎ জাতিসমস্যা সম্পর্কে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিকে উল্টে দেয় এবং সমাজতন্ত্রের সাধারণ আদর্শের বিরুদ্ধে কোনও কোনও দেশের স্বার্থকে স্থান দেয়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব জাতি-সমস্যা সম্পর্কে নির্ভুল ও পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ সমাধান দেয়। এই সমস্যাটির সমাধান যেসব গুরুত্বপূর্ণ শর্তাদির উপর নির্ভর করে তার অন্যতম হল শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের জন্য সংগ্রামকে জাতি সমস্যার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া। যে সব কারণে শ্রেণীসমূহের এবং শ্রেণী-পার্থক্যের উদ্ভব ঘটে সেগুলির অবলোপ সাধনই হল জাতিগত পার্থক্যগুলির ক্রমশ বিলীন হবার প্রধান শর্ত। এ হতে পারে কমিউনিজম সম্পূর্ণ বিজয়ী হলে।

৪. কমিউনিজম ও জাতিগুলির ভবিষ্যৎ

ক্ষমতা অর্জনের পর এবং জাতিগত নিপীড়নের অবলোপ সাধন করার পর শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র শ্রমজীবী জনগণ জাতিগত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসমতা, প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত বহু ট্রাইবাল সম্প্রদায় ও অধিজাতির পশ্চাদপদতা ইত্যাদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। অতীতের এই বিপুল বোঝাটি থেকে মুক্ত না হতে পারলে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা যায় না। জাতিগুলির মধ্যে প্রকৃত অসাম্য দূর ক'রেই, অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিগুলি যাতে অপরাপর জাতিগুলিকে সাহায্য করে এ ধরনের ব্যবস্থা ক'রেই, সকল জাতি ও অধিজাতি-গুলির মধ্যে সমতার নীতিকে ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার নীতিকে দৃঢ়ভাবে

অনুসরণ ক'রেই কেবল একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের সকল জাতিকে কমিউনিষ্ট নির্মাণকার্যে টেনে আনা সম্ভব।

জাতিগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা ও শোষণের অবলোপ সাধনের ফলে প্রত্যেকটি জাতি সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশের জন্য তার নিজস্ব নির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, তার অর্থ হল যে সমাজতন্ত্র জাতিগত পার্থক্যগুলিকে ধ্বংস করে না, বরং জাতিগুলির নবজাগরণ ঘটায়। পুঁজিবাদীদের দ্বারা অবলুপ্তির ও বলপ্রয়োগের ফলে সম্পূর্ণ বিলিন হয়ে যাওয়ার পথের অধিজাতি ও ট্রাইবগুলি নতুন জীবন ফিরে পায় এবং অপরাপর জাতিগুলির সংগে একত্রে তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটায়, নিজেদের ভাষার উন্নতি সাধন করে ও তার লিখিত রূপ দেয়। কোনও কোনও অধিজাতি বা ট্রাইব অপেক্ষাকৃত বড় জাতির জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং তার মধ্যে মিশে গিয়ে একটি একক অধি-জাতি বা জাতিতে পরিণত হয়; কিন্তু তাদের অধিকাংশই নতুন সমাজ-তান্ত্রিক সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে স্বাধীন অধিজাতি বা জাতি হিসাবে নিজেদের সংহত করে।

সমাজতন্ত্রের আমলে সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আন্তর্জাতিকীকরণের প্রবণতা আপনা থেকেই দেখা যায়। সমাজ-তন্ত্র জাতিগুলিকে নিকটতর করে, আরও বেশি বেশি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেয় এবং পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে জাতীয় রূপের চাইতে একটি ব্যাপকতর রূপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে এমন একটি নতুন বহুজাতিক সম্প্রদায় রূপ পরিগ্রহ করে যা তার সকল জাতির শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ঐতিহ্যগুলিকে গ্রহণ করে ও সেগুলির বিকাশ ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ, এইরকম একটি সম্প্রদায় হল ঐক্যবদ্ধ সোভিয়েত জনগণ।

জাতিগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠতর করার দ্বিতীয় প্রবণতাটি প্রথমটির সংগে কোনও সংঘাত সৃষ্টি করে না, বরং দুটি প্রবণতা একত্রেই কাজ করে এবং জাতিগুলি বিকশিত হবার মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ঐক্যের জন্য আলাদা আলাদা জাতিগুলির স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র বহু জাতিক রাষ্ট্রের স্বার্থের একীভবনের একটি ভিত্তি সমাজতন্ত্র যোগায়।

সমাজতন্ত্রের আমলে এক-একটি জাতির বিকাশের বিধানের এই প্রক্রিয়া আলাদা আলাদা বহু-জাতিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই শুধু দেখা দেয় না, সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাটির মধ্যেও দেখা দেয়। এক্ষেত্রে জাতিগুলির মধ্যেকার সম্পর্কগুলি আর কেবল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসাবে থাকে না, সেই সঙ্গে আন্ত-রাষ্ট্র সমস্যা হয়ে ওঠে।

প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণকার্যের সাফল্য দ্বারা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংহতি সাধনে অবদান করে থাকে। কিন্তু এ হল বিষয়টির একটি দিক এবং জাতি সমস্যা সম্পর্কে মাত্র একটি প্রবণতাকেই প্রকাশ করে। এই বিষয়ে অপর দিকটি অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত করার মধ্যে নিহিত (অর্থনৈতিক একীভবন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় সাধন, বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে শ্রমের সামাজিক বিভাগ, বিশেষীকরণ ও সহযোগিতা, বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত ও উৎপাদনগত বিশেষ জ্ঞান বিনিময়, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিরক্ষা ও শান্তি নিরাপদ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তাদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ইত্যাদি)।

ধনতন্ত্র যেখানে একটি জাতিকে অপর একটি জাতির বিরুদ্ধে লাগায় এবং ছোট ও দুর্বল জাতিগুলিকে শৃংখলিত করার উদ্দেশ্যে, এমন কি জাতিগুলির ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতাকে ব্যবহার করার জন্য শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে উৎসাহিত করে, সেখানে তার বিপরীতে সমাজতন্ত্র জাতি সমস্যার ক্ষেত্রে ঐ দুটি প্রবণতার একটি সুসমঞ্জস্য সমন্বয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজতন্ত্র এইরকম একটি সমাধানের সম্ভাবনাকেই উপস্থিত করে, তাকে বাস্তবে পরিণত করার দরকার হয়। আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি সমস্যার মোকাবিলা করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারা শুধু যে তাদের জাতিগুলির জন্য রাজনৈতিক ও আইনগত সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সর্ববিষয়েই তারা প্রকৃত সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

যে সব জাতির ঐতিহাসিক ও জাতিগত পটভূমিকা সম্পূর্ণই ভিন্ন, যে সব জাতি ইতিমধ্যেই স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা লাভ করেছে এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার সমস্যাটির সঙ্গে আরও অনেক বাধাবিঘ্ন জড়িত।

এই পরিস্থিতিতে জাতিসর্বস্ব বদ্ধ ধারণার প্রবল প্রকোপ জাতিগুলির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি অবসানের প্রক্রিয়াটিকে জটিল করে তোলে। এই ধরনের জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে: যথা—সকল প্রশ্ন ও সমস্যাকে একমাত্র নিজেদের দেশের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা, নিজ দেশের বিকাশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেখা ও সেগুলিকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য সকল দেশের পক্ষে অভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে দাঁড় করান, নিজেদের অভিজ্ঞতাকে অপর দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে বিভক্ত করায় উৎসাহ দেওয়া। এই নীতি অনুসরণ করার সময়ে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তির উপর এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পুনর্মিলনের প্রক্রিয়াতে যে সব বাধা আসতে পারে তার উপর নির্ভর করে। এই কারণেই জাতি-সমস্যা সম্পর্কে সমাজের বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অবিচলিত ও নীতিনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক কর্মনীতি গ্রহণ করা এবং দৃঢ়ভাবে সকল ধরনের জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করা বর্তমানে এত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের একটি নীতি ছাড়া ঐক্য অর্জন করা এবং ভবিষ্যতে সকল জাতি ও জনগণের একীভবন অসম্ভব হবে। এই ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম নির্মাণের পথে জাতিগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

সমগ্র বিশ্বে কমিউনিজমের বিজয়লাভ জাতিগুলির একীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও মননগত পূর্বশর্ত যোগাবে। একটি একক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকাশমান একটি কমিউনিস্ট অর্থনীতি এবং অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক একীভবনের স্তর অর্জন ক্রমশ সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হবে। এমন একটি অভিন্ন নৈতিক নিয়মাবলী দেখা দেবে যা প্রত্যেকটি জাতির চরিত্রে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করবে। সকল মানুষের জন্য একটি অভিন্ন ভাষা ও যোগাযোগের একটি অভিন্ন মাধ্যম হবে। মানব জাতি হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ বিরোধমুক্ত এক ঐক্যবদ্ধ, ভ্রাতৃপ্রতিম গোষ্ঠী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন

শ্রেণীসমূহের আত্মপ্রকাশ ও শ্রেণীসংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন সমাজ-জীবনের কাঠামো জটিল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও আইনগত সামাজিক সম্পর্কগুলির নতুন নতুন রূপের উদ্ভব ঘটে। রাজনৈতিক জীবনের পরিধির মধ্যে এমন অনেক সংখ্যক সংগঠন ও সামাজিক সংস্থা গঠিত হয় যা প্রাক-শ্রেণী-সমাজে অজ্ঞাত ছিল। এই সংগঠনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্র, যা শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠন। শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজে রাজনৈতিক দল ও অপরাপর গণ সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। এগুলির উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা দখল করা অথবা রক্ষা করা, কোনও না কোনও শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করা। এই সব সংগঠন ও সামাজিক সংস্থা একত্রে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করে। যে কোনও শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে এ হল শ্রেণী, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেকার রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও সংগঠনসমূহের একটি ব্যবস্থা। সমাজের রাজনৈতিক জীবনের পরিধির মধ্যে পড়ে রাজনৈতিক সংস্থা ও সম্পর্ক, রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ।

১. সমাজের অ-রাজনৈতিক (গোষ্ঠীগত) সংগঠন থেকে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনে উত্তরণ

আদিম ট্রাইবাল সমাজে সামাজিক সম্পর্কগুলি বহু শতাব্দী ধরে একত্রে জীবনযাপন ও কাজকর্মের ফলে উদ্ভূত অভ্যাস, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। সমাজ-জীবনের প্রধান শক্তি ছিল জনসাধারণ।

সামাজিক শ্রম-বিভাগ ও উৎপাদনের উপকরণগুলির ব্যক্তিগত মালিকানার আরও উন্নত রূপসমূহের উদ্ভব ঘটার ফলে নতুন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ট্রাইবাল প্রত্যঙ্গগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। এঙ্গেলস বলেছেন

যে ট্রাইবাল ব্যবস্থাটি "শ্রমবিভাগের দরুন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে এবং তার ফলে সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। রাষ্ট্র তার স্থান গ্রহণ করে।"(১)

ক্ষমতার ট্রাইবাল প্রত্যঙ্গগুলি যেখানে আদিম মানব গোষ্ঠীর অর্থাৎ ক্ল্যান ও ট্রাইবগুলির সামাজিক মালিকানা ও যৌথ স্বার্থের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেখানে রাষ্ট্রের কাজ হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত সম্পর্কগুলি থেকে উদ্ভূত চাহিদা মেটান। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেহেতু ক্রমশ জনসাধারণের ভিতরের এক ছোট গোষ্ঠীর হাতে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল এবং সম্পত্তিকে তারা তাদের ইচ্ছামত গরিব ও অভাবীদের পদানত করার জন্য ব্যবহার করত, সেই জন্য রাষ্ট্র নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে শোষকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত এবং তা রক্ষা করত। শ্রেণী বিরোধগুলি যে ক্ষমাহীন হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের আবির্ভাব তারই ফল ও বিষয়গত লক্ষণ। যখন এই সব বিরোধ মীমাংসার অতীত হয়ে ওঠে, তখন ক্ষমতার এমন একটি বিশেষ সংগঠনের প্রয়োজন হয় যা আর জনগণের সঙ্গে একীভূত থাকে না এবং যার কাজ দাঁড়ায় শোষিত শ্রেণীগুলিকে দাবিয়ে রাখা। ট্রাইবাল প্রশাসনের প্রত্যঙ্গগুলি ছিল সমাজের হাতিয়ার, তার জায়গায় রাষ্ট্র এমন একটি শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হল যেন তা "সমাজের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে" এবং ক্রমশ "সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে"।

রাষ্ট্রকে তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমত, রাষ্ট্র হল ট্রাইবাল সমাজে বিদ্যমান সশস্ত্র মানুষের প্রত্যক্ষ সংগঠনের থেকে পৃথক একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা (public power)। লেনিন ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে পীড়নের ক্ষমতা নয় (যা যে কোনও সমাজে কোনও না কোনও রূপে দেখা যায়), বরঞ্চ সর্বোপরি এর রাষ্ট্রীয় (public) ক্ষমতা এমন অর্থাৎ একটি ক্ষমতা যা সমগ্র জনসংখ্যার সঙ্গে একত্রে মেশে না এবং এক বিশেষ কোটীর লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। একটি স্থায়ী অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা, সশস্ত্র লোকেদের বিশেষ বিশেষ বাহিনী (সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ), রাষ্ট্রের দণ্ড-বিধায়ক ও গোয়েন্দা বিভাগ এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ "বৈষয়িক"

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৩২৬।

উপকরণগুলি অর্থাৎ কারাগার, বন্দীশিবির ও আটক রাখার অপরাপর স্থান ইত্যাদিই হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপরিহার্য উপাঙ্গ ও হাতিয়ার।

দ্বিতীয়ত, সমাজের রাষ্ট্রীয় সংগঠন বললে ধরে নেওয়া হয় যে ক্ষমতার যন্ত্রটির সংরক্ষণের জন্য কর ধার্য করা হবে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিরোধগুলি যত তীব্রতর হয় এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটির কলেবর যত বৃদ্ধি পায় ততই এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা সমাজের সম্পদগুলিকে বেশি বেশি করে গ্রাস করতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্রকে যে একটি বিশালকায় অক্টোপাসের সঙ্গে তুলনা করা হয় যার শুঁড় সকল সমাজকে জাপটে ধরে ও তার রক্ত শুষে নেয় তা অকারণে নয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের প্রজাদের রক্তের সম্পর্ক অনুযায়ী বিভক্ত করা হয় না, ভূখণ্ড অনুসারে বিভক্ত করা হয়। রাষ্ট্রের ক্ষমতা কোনও বিশেষ ভূখণ্ড ও সেখানকার জনসংখ্যার উপর সরাসরি প্রয়োগ করা হয়। জনগণের ভূখণ্ডগত বিভাগ অর্থনৈতিক বন্ধনের বিকাশ ঘটায় ও তার নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। শোষিত শ্রেণীগুলিকে পদানত রেখে রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমানার মধ্যে মূলত শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। দেশের মধ্যে রাষ্ট্রের এটাই প্রধান কাজ। কিন্তু রাষ্ট্র নিজ সীমানার বাইরেও শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। তা করে অপরাপর শোষক রাষ্ট্রের আকস্মিক আক্রমণ থেকে ভূখণ্ড, নিজ সম্পদ ও জনসংখ্যাকে রক্ষা করা অথবা আরও দূরবর্তী প্রতিবেশী বা দেশ যাদের বাধা দেবার মত ক্ষমতা নেই তাদের পরাস্ত করে এলাকা সম্প্রসারণ করার মারফত। এই হল রাষ্ট্রের বহির্বিষয়ক কাজ। এ কাজ প্রধান আভ্যন্তরীণ কাজের অধীন আর সে কাজ রাষ্ট্র চালিয়ে যায়।

অতএব রাষ্ট্র হল একটি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর এক রাজনৈতিক সৌধ। রাষ্ট্র অর্থনীতিতে আধিপত্যকারী শ্রেণীর ক্ষমতার সংগঠন এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে এই শ্রেণী রাজনৈতিক আধিপত্যও অর্জন করে। কাজেই রাষ্ট্রের সারমর্ম নির্ধারিত হয় শাসক শ্রেণী ও অপরাপর শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক দ্বারা। রাষ্ট্র হল শাসক শ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ রক্ষার সংগঠন এবং সর্বোপরি এই শ্রেণী সম্পত্তির যে রূপের প্রতিনিধিত্ব করে তার রক্ষক। শোষণ-ভিত্তিক সমাজে রাষ্ট্রের মূল কাজ হল শোষিত শ্রেণীগুলিকে দাবিয়ে

রাখা এবং এই কাজের জন্য রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ ও পীড়নের অপরাপর প্রত্যঙ্গের উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ অবশ্য এই মূল কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শাসক শ্রেণীর একটি সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্র ওই শ্রেণীর বিভিন্ন সদস্যের মধ্যেকার সম্পর্কও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল বিরোধী শ্রেণীগুলির সংগে সংগ্রামে নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিভিন্ন শোষক শ্রেণীগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক-গুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করে, যেহেতু রাষ্ট্র তাদের কিছু কিছু অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করে। (এইভাবেই সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষত সৈরতন্ত্রের যুগে ভূমিদাস-মালিক সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের স্বার্থ প্রতিফলন করত, আবার সেই সংগে বণিক ও উদীয়মান বুর্জোয়াদের স্বার্থকেও কিছু পরিমাণে রক্ষা করত)। সামাজিক সম্পর্কসমূহের সমগ্র ব্যবস্থাটিকে অর্থাৎ নরগোষ্ঠীগত (যদি রাষ্ট্র বহু-জাতিক হয়), পারিবারিক ইত্যাদি সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও (মূলত আইনগত) রাষ্ট্রের আছে এবং এইভাবে সে একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাকে সংহত করতে পারে। শেষত, রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বহু সমস্যারও মোকাবিলা করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ও বিকাশ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নেতৃত্বের ভারকেন্দ্র সম্পত্তির মালিকের নিজের উপর ও তার প্রতিনিধিদের উপর বর্তিয়ে দেয়। যে সব সমাজ আদিম কমিউনের স্তর পেরিয়ে এসেছে তার প্রায় সব সমাজেই উৎপাদন ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কিছু কিছু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, পৃথক পৃথক শোষকেরা তার মোকাবিলা করতে পারেও না, করার ইচ্ছাও রাখে না। ট্রাইবাল সংগঠনগুলি নয় বরং প্রথম রাষ্ট্রগুলিই বিশেষত ভারত, চীন ও নিকট প্রাচ্যের সৈরতন্ত্রগুলি বাধ্যতামূলক শ্রমের সাহায্যে সেচের জন্য বাঁধ, খাল ও রাস্তা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তখনকার দিনের পক্ষে এগুলি ছিল বিরাট সাফল্য।

ধনতান্ত্রিক সমাজে, বিশেষত ধনতন্ত্রের বিকাশের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এই ক্রিয়াকলাপ আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র প্রধান সম্পত্তি-মালিক ও লগ্নিকারক হয়ে ওঠে। কর হিসাবে জনসাধারণের কাছ থেকে রাষ্ট্র জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত লেভি-রূপে নিয়ে নেয় এবং ওই আদায়ীকৃত কর

রাষ্ট্রীয় ভরতুকি, ঋণ, অস্ত্রসজ্জার জন্য কণ্ট্রাক্ট ইত্যাদি মারফত একচেটিয়াদের অনুকূলে পুনর্বণ্টন করে। বৈষয়িক উৎপাদন প্রক্রিয়া বেশি বেশি জটিল হয়ে ওঠার দরুন ক্রমবর্ধমানভাবে জটিল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ে। এর জন্য কর্মীদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলত তার চাহিদা প্রতিফলিত হয় জনশিক্ষা ব্যবস্থার উপর, যা অংশত অথবা এমনকি বেশির ভাগই রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত হয় ও তার খরচায় চলে।

বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা রাষ্ট্রের কাজকর্মের বহুমুখিনতাকে রাষ্ট্রের শ্রেণী সারমর্মকে অস্বীকার করার একটি যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করে থাকে। তাদের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে প্রধানত কয়েকটি আত্মিক উপাদানের দরুন—সেগুলি হল পারস্পরিক সম্মতি, জনগণের ক্রমবর্ধমান আত্মিক পরিপক্কতা ইত্যাদি। কারণ জনগণ এ বিষয়ে "সচেতন হয়ে উঠেছে" যে রাষ্ট্র ছাড়া সমাজ-জীবন সংগঠিত হতে পারে না। মানব চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, সামাজিক মনস্তত্ত্বের ও নৈতিকতার চাহিদা ইত্যাদিকেও তারা এর মধ্যে ধরে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একথা নিহিত আছে যে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের একবার যখন উৎপত্তি হয়েছে তখন চিরকাল তার অস্তিত্ব থাকবে।

পক্ষান্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতে রাষ্ট্রের চরিত্র ঐতিহাসিক, তা রাষ্ট্র ক্ষমতার শ্রেণী সারমর্মের সঙ্গে যুক্ত।

রাষ্ট্রের কাজকর্ম বহুমুখী হলেও সে সবই তার সেই মূল কাজের অধীন যা তার শ্রেণী সারমর্মকে প্রকাশ করে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রকে আমরা যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, দেখা যায় যে তা শাসক শ্রেণীরই সংগঠন, তাদেরই স্বার্থ রক্ষা করে। শোষণকারী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। তাই খাল, রাস্তা, সেচের বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করে রাষ্ট্র মূলত শোষকদের বর্ধিত মুনাফার স্বার্থেই উৎপাদন ও বিনিময়ের উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজে রাষ্ট্র একচেটিয়াদের ভরতুকি দেওয়া ও তাদের কাছে জিনিসপত্রের অর্ডার দেওয়ার জন্য কর মারফত জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়ীকৃত তহবিল ব্যবহার ক'রে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যের জন্য অর্থ খরচ ক'রে বুর্জোয়াদের শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করার সুযোগ ক'রে দেয়, আর এসবের মারফত কেবল প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের

কারখানাতেই নয়, সামাজিক উৎপাদনের গোটা ব্যবস্থাটা জুড়েই শোষণ চালাতে বুর্জোয়াদের সক্ষম করে। ঐ একই নিরিখে দেখলে বোঝা যায় যে শ্রমজীবী জনগণের দেওয়া কর থেকে জনশিক্ষার জন্য যে খরচ করা হয় তাও আবার মালিকদের জন্য যথেষ্ট দক্ষ শ্রমিক তৈরির কাজেই লাগে।

রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে শাসক শ্রেণীর সম্পত্তি ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি রক্ষা করে।

আদিম কমিউন সমাজে মানবিক সম্পর্কগুলি প্রথা, ঐতিহ্য ও নৈতিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত (সাধারণভাবে গৃহীত আচরণ-বিধি যে কোনও ভাবে লঙ্ঘিত হলে সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হত)। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও সমাজের শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার দরুন সমাজ-জীবন জটিল হয়ে উঠল এবং এমন সব মানদণ্ডের চাহিদা সৃষ্টি করল যা নিপীড়িতদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়।

আইন হল বিভিন্ন আইন কানুনে নির্ধারিত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত আচরণ-বিধির সমষ্টি। এইসব আচরণ-বিধি কোনও ভাবে লঙ্ঘিত হলে হলে রাষ্ট্রের দণ্ডদাতা প্রত্যঙ্গগুলি হস্তক্ষেপ করে এবং লঙ্ঘনকারীর উপর বলপূর্বক আইন প্রয়োগ করে। ষ্ট্র তার আইন-কানুনে এমন সব আচরণ-বিধি ও রীতিনীতি নির্ধারিত করে যা শাসক শ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। শোষকদের আধিপত্য বিঘ্নিত করার মত কোনও গুরুতর ধরনের বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সামাজিক জৈব কাঠামো যাতে চালু রাখা যায় আইনের মারফত রাষ্ট্র তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

আইন হল আইন-কানুনে মূর্ত শাসক শ্রেণীর ইচ্ছা। এই কারণেই রাষ্ট্রের মতই আইনেরও শ্রেণী-চরিত্র রয়েছে এবং শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে আইন হল শ্রমজীবী জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার।

আইন সম্পত্তির মালিকদের নিজেদের ভিতরের সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার মানদণ্ডকেও বৈধতা দেয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির "স্বাভাবিক" কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় বিচার বিভাগীয় নির্দেশাবলী সরবরাহ করে। প্রত্যেকটি সম্পত্তি-মালিক অপরাপর সম্পত্তি মালিকদের সঙ্গে কাজকর্মের সময় নিজের নিজের স্বার্থ নিরাপদে রাখতে চায়, তা বাণিজ্য, আর্থিক সংস্থান বা অন্য যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক না কেন। উত্তরাধিকারী বা অপর কোনও লোকের হাতে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্যও বিধিবদ্ধ আইন দরকার।

এই সব কারণ থেকে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম অংশ বিষয়গত সম্পত্তি-সম্পর্কগুলিকে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা শক্তিশালী করা ও পূর্ণতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হয়। আইন অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও তার উপর নির্ভরশীল সামাজিক সম্পর্কগুলিকে অর্থাৎ শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে সূত্রায়িত করে। (উদাহরণ স্বরূপ, কিছু লোকের কোনও অধিকার থাকবে না, কিছুর থাকবে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, আইনের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে সকলে সমান ইত্যাদি)। আইন পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক, জাতীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থান ইত্যাদিকেও সূত্রাকারে প্রকাশ করে। আইন সকল সামাজিক সংস্থা, সংগঠন ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির আইনগত মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের অবস্থান, অধিকার ও কর্তব্য আইনগতভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়। আইন কিছুমাত্রায় সমাজ-জীবনের সকল দিক, জনগণের সর্বরকম কার্যকলাপ ও সামাজিক সম্পর্কের সবরকম রূপ জুড়ে পরিব্যাপ্ত থাকে।

রাষ্ট্র যেমন আইন ছাড়া চলতে পারে না, আইনও আবার রাষ্ট্র ছাড়া চালু থাকতে পারে না, কারণ রাষ্ট্র আইনগত রীতিনীতিগুলিকে নিরাপদে রাখে। রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গেই আইনের উৎপত্তি হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের সঙ্গেই তা বিলীন হয়ে যাবে। যখন যেসব কারণে এর উদ্ভব ঘটেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই কারণেই মার্কস ও এঙ্গেলস সবসময়েই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও আইনগত সৌধকে একটি একক সংস্থা হিসাবে গণ্য করেছেন।

রাষ্ট্রের গঠন এবং আইনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কগুলির নতুন রূপ দেখা দিল, যা এতকাল অজ্ঞাত ছিল। সে সম্পর্ক হল রাজনৈতিক ও আইনগত। রাজনৈতিক সম্পর্কগুলি মূলত শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক। কিন্তু শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সকল সম্পর্ককে রাজনৈতিক বলা যায় না। শ্রমিকেরা যখন পুঁজিপতিদের নিকট তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে অথবা এমন কি তারা যখন বর্ধিত হারে মজুরির জন্য লড়াই করে তখন এই সম্পর্কগুলি ও এই সংগ্রাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং কোনও ক্রমেই তাকে রাজনৈতিক বলা যায় না। কিন্তু শ্রমিকেরা যদি কোনও একটা

কারখানায়ও পুঁজিপতিদের সমগ্র শ্রেণীর কাছে অথবা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাছে দাবি উত্থাপন করে, তবে তা হবে সচেতন রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক সম্পর্ক।

শ্রেণীগুলির মধ্যেকার রাজনৈতিক সম্পর্কগুলি শ্রেণীগুলির মৌলিক অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহকে ঘনীভূত রূপে প্রকাশ করে। সকল সৌধগত সম্পর্কগুলির মতই এই সম্পর্কগুলি জনগণের চেতনার মাধ্যমে আকার নেয়। রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী এবং রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের ধারণা ও মতামত অনুযায়ী ওই সম্পর্কগুলি গঠিত হয়। একটি শ্রেণীর নীতি হল অপরাপর শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সেই শ্রেণীর (অথবা অন্তত তার অগ্রগামী বাহিনীর) আচরণের মোটামুটি সচেতন ধারা।

আচরণের এই ধারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়, যদিও এই ক্ষেত্রগুলি রাজনৈতিক পরিসীমার বাইরেও হতে পারে। এই ভাবেই আমরা বলতে পারি বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক (বাণিজ্যিক অথবা আর্থিক সংস্থান সংক্রান্ত) নীতির কথা, যা বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রের মাধ্যমে চালায়, বলতে পারি জাতি সম্পর্কিত সম্পর্ক, জনশিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের নীতির কথা। শিক্ষা অবশ্য সংস্কৃতির ক্ষেত্র, রাজনীতির নয়। কিন্তু পুঁজিবাদের আমলে শিক্ষা শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের চাহিদার অধীন। কার্যত এই হল জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া নীতির সারমর্ম।

এ থেকেই একথা বোঝা যায় যে শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজে রাজনৈতিক সম্পর্কগুলি শুধু একটি বিশেষ ক্ষেত্র গঠন করে না, সেই সঙ্গে কোনও না কোনও রূপে অপরাপর সম্পর্কগুলির সঙ্গেও চলে। শব্দটির ব্যাপক অর্থে শ্রেণী, রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের মধ্যেকার রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির মধ্যে আইনগত সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত প্রত্যেকটি আইন, প্রত্যেকটি আইন বলবৎকারী ব্যবস্থা হল রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

রাজনীতি, বিশেষত তার সংগঠিত সামাজিক রূপ কি ভাবে সমগ্র সমাজের উপর কাজ করে? রাজনীতি কি ভাবে অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে?

শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজের রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির সমগ্র ব্যবস্থাটি সর্বোপরি

এই সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে প্রকাশ করে এবং এটাই হল একটি মাত্র রূপ যাতে এই সব সম্পর্ক চালু থাকতে পারে। যেহেতু অর্থনীতি একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছবার পর এই রূপটির বাইরে আর চালু থাকতে বা বিকশিত হতে পারে না, তা থেকেই রাজনীতির জন্ম হয়।

শাসক শ্রেণীর অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমেই অর্থনীতির উপর রাজনীতি প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। শাসক শ্রেণীর এই অর্থনৈতিক নীতি অনুসৃত হয় প্রধানত রাষ্ট্রের মাধ্যমে (রাষ্ট্রীয় ভরতুকি, প্রধান প্রধান সম্পত্তি-মালিক, ব্যবসায়ী ও বণিকদের আর্থিক সাহায্য, আমদানি-কৃত সামগ্রীর উপর সুরক্ষক শুল্ক ইত্যাদি); সামরিক নীতির মাধ্যমে (অর্থনীতির সামরিকীকরণ, বলপূর্বক নতুন ভূখণ্ড দখল, কাঁচা মাল ও বাজারের নতুন উৎস); শেষত বৈদেশিক নীতির সেই সব "অ-সামরিক দিকগুলির" মাধ্যমে যেগুলির উদ্দেশ্য হল ব্যবসায়গত কাজকর্ম, অপরাপর দেশে মূলধন লগ্নি এবং বিদেশের বাজারে মালপত্র রপ্তানির জন্য আরও অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ লাভ। রাজনীতি অপ্রত্যক্ষভাবেও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। রাজনীতি তা করে সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে সমর্থন ক'রে যা একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, অথবা (বিপ্লবী শ্রেণীগুলির রাজনীতির ক্ষেত্রে) এমন নতুন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি ক'রে যা অচল অর্থনৈতিক সম্পর্ক-গুলির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির জয়লাভে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয়।

এঙ্গেলসের মতে অর্থনীতি সম্পর্কে রাজনীতির সক্রিয় ভূমিকা তিনটি প্রধান গতিমুখ ধরে চলতে পারে: হয় রাজনৈতিক উপাদানগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে একই দিকে চলে এবং এই ক্ষেত্রে ঐ উপাদানগুলি অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে; অথবা অন্যথায় সেগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের বিধানগুলির বিরুদ্ধে চলে এবং স্বভাবতই তাকে বাধা দেয়; অথবা শেষত সেগুলি অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির বিকাশের কোনও কোনও দিককার গতিকে মন্থর করে এবং অন্য কিছু দিকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায় (যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, মিশ্র ধরনের প্রভাব)।

উদাহরণ স্বরূপ, ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগে নবীন বিপ্লবী বুর্জোয়াদের নীতি উৎপাদনের বিকাশকে মোটামুটি উৎসাহিত করেছে এবং অর্থনীতির উন্নয়নকে

ত্বরান্বিত করেছে ; যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা পূর্বতন শাসক শ্রেণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেছে এবং এইভাবে অর্থনৈতিক বিকাশ কিছু পরিমাণে ব্যাহত করেছে। অর্থনীতির উপর সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের নীতির প্রভাব প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায়, যদিও অর্থনীতির কয়েকটি শাখায় দ্রুত বিকাশ প্রধানত যুদ্ধের প্রস্তুতি ও রণকৌশলগত অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত। একই সঙ্গে আবার ঔপনিবেশিকতাবাদ অথবা নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের নীতি, নির্ভরশীল দেশগুলির লুণ্ঠন এক-একটা গোটা মহাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশকে বাধা দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। এঙ্গেলস লিখেছেন "অর্থনীতির বিকাশ মোটামুটিভাবে নিজের পথ করে নেয়, কিন্তু তাকে সেই রাজনৈতিক বিকাশের প্রতিক্রিয়ায়ও ভুগতে হয় যাকে সে নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আপেক্ষিক স্বাধীনতায় ভূষিত করেছে…।"(১)

বর্তমানে সমাজ-জীবনে ও সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনীতির, বিশেষত রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা যে অনস্বীকার্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। এর অনেক কারণ আছে, যথা—সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ এবং অর্থনীতি ও সমাজের গতিমুখের ক্রমবর্ধমান পরিসর ; সামগ্রিকভাবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে অর্থনীতির বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র সত্ত্বেও সমাজ জীবনে সচেতন উপাদানগুলির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি বিশেষত ধনতন্ত্রের আমলে সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপগুলির অনুপাত ও গুরুত্ব বৃদ্ধি ; সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রের বর্ধিত অর্থনৈতিক ভূমিকা।

২. রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ ও সমাজ জীবনে এর ভূমিকা

ইতিহাসের গতিপথে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধরন ও রূপের দিক থেকে বদলে গিয়েছে এবং তার সঙ্গে বদলেছে শ্রেণী কাঠামোর ধরন ও শোষণ পদ্ধতি, আর সেই সঙ্গে এনেছে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সম্পর্ক, বিশ্বাস ও সংস্থা, সংক্ষেপে বললে এনেছে সমাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রাজনৈতিক সংগঠন।

দাস মালিকানার সমাজে দাসদের অধিকার বিহীন অবস্থা, সমাজের

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৪৯২।

মুক্ত সদস্যদের বর্গে ও সংরক্ষিত গোষ্ঠীতে বিভাজন (যারা কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করে) আইনে ও আইনগত সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রাষ্ট্র ছিল মূলত দাস-মালিকদের একনায়কত্ব : রাষ্ট্র তাদের সম্পত্তি ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি রক্ষা করত এবং দাস ও জনসাধারণের মধ্যেকার অপরাপর বিরোধী অংশকে বশ্যতা স্বীকার করাত। উপরন্তু রাষ্ট্র ও সৈন্যবাহিনী দখলীকৃত ভূখণ্ডগুলির জনসংখ্যাকে বশবর্তী করে রাখত।

দাস সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসন ছিল : প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র (চীন, ভারত, নিকট প্রাচ্য), সাম্রাজ্য (আলেকজান্ডার দা গ্রেট, জুলিয়াস সিজার) এবং প্রজাতন্ত্র (এথেন্স, গোড়ার যুগের রোম)। লেনিন লিখেছেন : "সে সময়েই রাজতন্ত্র হল ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ছিল। রাজতন্ত্র হল একজন লোকের ক্ষমতা, প্রজাতন্ত্র হল অনির্বাচিত কোনও কর্তৃত্ব না থাকা; অভিজাততন্ত্র হল অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যালঘুদের ক্ষমতা এবং গণতন্ত্র হল জনগণের ক্ষমতা···দাস যুগেই এই সব পার্থক্য দেখা দেয়। এই সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দাস-মালিকানার যুগে রাষ্ট্র, তা সে রাজতন্ত্র অথবা প্রজাতন্ত্র, অভিজাত-তান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক যাই হোক না কেন, সে ছিল দাস-মালিকানার রাষ্ট্র।"(১)

অপরাপর রাজনৈতিক সংগঠন কদাচিত তৈরি হত। যদিও দাস-মালিকদের কতকগুলি রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও সমিতি (যথা—গ্রীস ও রোমে পার্টি-সংগ্রাম) বিদ্যমান ছিল এবং দাসদের মধ্যে গোপন সংগঠন ও লীগ বিরল ছিল না। প্রায় সকল দাস-মালিকানার দেশগুলিতে রাজনৈতিক জীবনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করত।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন এবং নতুন আইনগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আসে। এক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে অপরাপর সহায়ক রূপও যুক্ত হয়। যদিও এখানে শোষকদের শোষিতদের জীবন ও মৃত্যুর উপর কোনও আইনগত অধিকার ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক আইন সমাজের কিছু এস্টেটের জন্য

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যুম ২৯, পৃষ্ঠা ৪৭৯।

কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে এবং অপরদের প্রায় সব অধিকার থেকেই বঞ্চিত রাখে।

দাস-মালিকানা সমাজের রাষ্ট্রের তুলনায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্রের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। সরকারী কর্মচারী, বিচারকবর্গ, স্থায়ী সৈন্যদল ও সৈন্যদলের অফিসারদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে ওঠে যে তার মধ্যেই শাসক শ্রেণীর অনেকখানির অথবা এমনকি বৃহত্তর অংশের হদিশ পাওয়া যায়।

সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল উঁচু থেকে নীচু অনুযায়ী কঠোর বিভাগের ব্যবস্থা ও অধীন সামন্ত সম্পর্ক। দীর্ঘকাল বিভিন্ন প্রদেশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, সে সময়ে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র রাজনৈতিক দিক থেকে শিথিল ছিল। ডিউক, প্রিন্স, ও ব্যারনরা ছিল মূলত স্বাধীন শাসক। তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিজেদের মুদ্রা ইত্যাদি ছিল। কিন্তু বুর্জোয়ারা বেড়ে ওঠার ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা শহরগুলির প্রসার ঘটিয়ে এই সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু ক'রে দেয় এবং ঐ সময় থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ শুরু হয়ে যায়। সরকারের প্রজাতান্ত্রিক রূপ সামন্ততন্ত্রের যুগে খুবই বিরল ছিল এবং মূলত তা দেখা যেত মধ্যযুগীয় শহরগুলিতে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্যমূলক ঘটনা হল রাষ্ট্র ক্ষমতার ব্যবস্থায় গীর্জার বিরাট ভুমিকা, গীর্জা ছিল রাজনৈতিক ও সেই সঙ্গে মতাদর্শগত শক্তি। উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্ম ছিল বিপুল কেন্দ্রীভূত শক্তি এবং তার নিজস্ব সামরিক বাহিনী (অর্ডারস) থাকত; সামন্ত প্রভুদের গীর্জার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে হত এবং প্রায়শই পাদরীদের অধীন থাকতে হত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে রাষ্ট্র, আইনগত সংস্থা ও গীর্জা ছাড়াও ছিল বহু রকমের উঁচু থেকে নীচু অনুযায়ী কঠোর বিভাগে বিভক্ত সংগঠন ও সমিতি। রাজনৈতিক সংগঠন ও পার্টি বলতে বর্তমানে যা বোঝায় তার প্রায় অস্তিত্বই ছিল না।

নিপীড়িত জনগণ সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কৃষক যুদ্ধ ও শহরের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের সময় যেসব সংগঠন তৈরি করত সেগুলি প্রায়শই হত ধর্মীয়।

শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক সংগঠন ধনতন্ত্রের আমলেই বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে ওঠে। ধনতান্ত্রিক সমাজের আইনগত ও রাজনৈতিক সম্পর্কগুলিতে ওই সমাজের উৎপাদন সম্পর্কগুলির বিশেষত্ব প্রতিফলিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক ভুসম্পত্তিগুলির উঁচু থেকে নীচু কঠোর বিভাগ-ভিত্তিক অসাম্যগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে বুর্জোয়া সমাজের আইনগত মানদণ্ডের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল আইনের সামনে সকলের আনুষ্ঠানিক সমতা রয়েছে। আইন আর কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। তা সারা দেশের উপর বলবৎ হয়। অর্থনৈতিক ও অপরাপর সামাজিক সম্পর্কগুলির জটিলতা ও বহুমুখিনতার মতই আইনগত মানদণ্ডগুলিও জটিল ও বহুমুখী হয়ে ওঠে। এই মানদণ্ড শুধু যে শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তা নয়, সেই সংগে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে, বিশেষত পণ্য মুদ্রা ও অর্থসংক্রান্ত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির সকল রূপকে এবং সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্রকেও নিয়ন্ত্রণ করে: অসামরিক ও ফৌজদারী আইনের নিয়মাবলীতে নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পূর্ববর্তী যুগগুলির মতই এই আইন প্রধানত শাসক শ্রেণীর অর্থাৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থ ও অভিলাষই প্রকাশ করে এবং বুর্জোয়া সম্পত্তিকে রক্ষা করে।

সামন্ততন্ত্রের আমলে রাষ্ট্র-ক্ষমতার যে কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা ধনতন্ত্রের আমলে পূর্ণতা লাভ করল। কতকগুলি বহু-জাতিক দেশ সহ জাতীয় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পত্তন হল। সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থান ছেড়ে দিল প্রজাতন্ত্র বা সীমিত রাজতন্ত্রের (বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ও তার কাছে দায়ী সরকার সহ) কাছে। আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাগুলিকে পৃথক করা হল। বেতনভোগী সৈন্যবাহিনীর জায়গায় সাধারণত বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হল। রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রধান প্রত্যঙ্গগুলি অর্থাৎ অসামরিক সরকারি কাজ, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা, ও কারাগার ইত্যাদি আকারে আরও বড়, আরও জটিল হয়ে উঠল।

শ্রেণীসংগ্রামের পরিসর আরও ব্যাপক ও প্রকাশ্য হয়ে ওঠার দরুন

রাজনৈতিক সম্পর্কগুলি এবং সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতি আরও প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলিও রাজনৈতিক সংগঠন ব্যবস্থার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রচণ্ড ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগীয় সম্পর্ক, ভূমিদাসত্ব ও সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তির মালিকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলির অবলোপ সাধন মানবজাতির অগ্রগতিতে এক বিপুল পদক্ষেপ। শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে এ এক বিরাট লাভ। এই সর্বপ্রথম তারা তাদের নিজেদের রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সংবাদপত্র রক্ষার অধিকার অর্জন করল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের তুলনায় এই অগ্রগতি ঘটলেও বুর্জোয়া গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ ও আনুষ্ঠানিক হয়ে রইল। এর কারণ শুধু এই নয় যে ধনতন্ত্র কোনও একটি গণতান্ত্রিক দাবিও সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, সর্বজনীন ভোটাধিকার কোনও ধনতান্ত্রিক দেশেই প্রকৃত সর্বজনীন নয়। যোগ্যতার (সম্পত্তিগত, বাসস্থানগত, শিক্ষাগত ইত্যাদি) ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনগণের বিপুলাংশকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এমনকি, সর্বাপেক্ষা অগ্রসর বুর্জোয়া দেশগুলির অধিকাংশেই স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার নেই। বুর্জোয়ারা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র কোথাও জাতীয় নিপীড়ন পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেনি। কিন্তু আসল কথা হল যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র মানুষকে শোষণ বন্ধ করে না। এই দরুনই এই ব্যবস্থা তার গণতান্ত্রিক চরিত্র ও প্রকৃত মানবিকতা হারায়। উপরন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল এমন একটি রাজনৈতিক রূপ যা বুর্জোয়াদের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থহানি ক'রে নিজেদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি কাজে লাগাবার সব চাইতে ভাল সুযোগ করে দেয়।

এমনকি, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেও প্রকাশ্যে বলপ্রয়োগ করা হয়। এ ব্যাপারে শ্রমিক-বিরোধী আইন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর নির্যাতন ও তাদের বিরুদ্ধে বিচারের প্রহসনের কথা মনে রাখলেই যথেষ্ট। এর সঙ্গে অবশ্য যোগ করতে হবে একচেটিয়াদের দ্বারা উৎসাহিত ও তাদের অর্থে পুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও গ্রুপ এবং প্রগতিশীলদের উপর এদের মারপিট ও এই ধরনের অপরাপর কায়দায় বলপ্রয়োগ। যে কোনও

গুরুতর সংকটের সময়ে বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উপর আরও বাধা-নিষেধ আরোপ করে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওই স্বাধীনতা পুরোপুরিই হরণ করে ও সন্ত্রাসের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রতিক্রিয়ার দিকে হেলেপড়া বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা গিয়ে পৌঁছয় ফ্যাশিবাদে; যা হল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের প্রকাশ্য সন্ত্রাস-বাদী রূপ।

এইসব তথ্য বুর্জোয়া মতাদর্শবিদদের এই দাবির মুখোশ খুলে দেয় যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র তার শ্রেণীচরিত্র হারায় এবং গোটা সমাজের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট ও সংস্কার বাদীদের অবশ্য ওটাই মত।

বার্নস্টাইন ও কাউটস্কি তাঁদের সময়ে কিছু সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্র স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তা করেছিলেন অতীতের প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে। তাঁদের মতে—বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র আর কোনও বিশেষ শ্রেণীর সেবা করে না। এই প্রজাতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জন-গণকে ভোটের যুদ্ধে জয়লাভ করার ও রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের কাজে লাগাবার সুযোগ দিয়েছে। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্র-যন্ত্র ধ্বংস করাটা শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য নয়, তাদের কাজ হল এটাকে দখল করা ও ব্যবহার করা। সংস্কার-বাদীরা বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থাকে অর্থাৎ নির্বাচনের ব্যবস্থা, ক্ষমতা-গুলির পৃথকীকরণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে "বিশুদ্ধ" গণতন্ত্র বলে গণ্য করে।

বাস্তবে নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আপনা থেকেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী সারমর্ম পরিবর্তন করে না অথবা তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের হাতি-য়ারে পরিণত করে না। যদি পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক থাকে, যদি তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় থাকে তবে যে কোনও আইন, এমনকি যেসব আইন শ্রমজীবী জনগণের চাপের ফলে পাশ হয় তাও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে। এই আইনগুলি যাই হোক না কেন, শাসক সংখ্যালঘুরা প্রশাসন ক্ষমতার যন্ত্রটির মারফত তাদের স্বার্থ রক্ষা করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। এই প্রশাসন যন্ত্র বস্তুত জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট থেকে স্বাধীন। এটি গঠিত হয় সরকারী অফিসারদের নিয়ে।

এদের ভোটদাতাদের কাছে জবাবদিহি করার দায় নেই এবং এরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে সব দিক থেকে যুক্ত একটি বিশেষ সুবিধাভোগী পৃথক গোষ্ঠী হয়ে ওঠে। অফিসারদের এই যন্ত্র ও সেনাবাহিনীই রাষ্ট্র চালায়।

এ সম্ভাবনা সবসময়েই থাকে যে বিপ্লবী জোয়ারের মাথায় প্রগতিশীলরা, অথবা এমনকি মার্কসবাদী পার্টি সমাজের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমর্থন পেয়ে নির্বাচনে জিতে যেতে পারে। কিন্তু প্রথমত এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের "গুণের" প্রমাণ ততটা নয় যতটা বিপ্লবী জোয়ারের শক্তির প্রমাণ। দ্বিতীয়ত এ ধরনের জোয়ার ও জনগণের সমাবেশ ছাড়া পার্লামেণ্টে বামপন্থী শক্তিগুলির জয়লাভও কোনও কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না। জনগণের সমর্থন ছাড়া এধরনের একটি পার্লামেন্ট একচেটিয়া সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতি-ক্রিয়াশীল যন্ত্রটির সঙ্গে সংঘাতের সম্মুখীন হয় এবং পরাজিত হয়ে যায়।

ধনতন্ত্রের আমলে গণতন্ত্রের উপর বাধানিষেধ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করে এবং তাদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করে। এ থেকেই উদ্ভব হয় দুটি পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার, যা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কম বা বেশি পরিমাণে অনুভূত হয়ঃ বুর্জোয়া সরকারগুলি গণতন্ত্র সীমিত ক'রে তাদের নীতিকে একচেটিয়াদের স্বার্থের অধীন ক'রে তোলে, আর শ্রম-জীবী জনগণ তাদের পাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করতে ও প্রসার করতে চায়।

সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির বৃদ্ধি, সামরিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব বরাদ্দ, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় ভরতুকি—এইসবই উৎপাদন পরিকল্পনায়, মূল্যনীতিতে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভূমিকা বৃদ্ধি করেছে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বৃদ্ধিকে বহু বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ রাষ্ট্রের কার্যকলাপে একটি "বিপ্লব" বলে মনে করে। কিন্তু "অর্থনৈতিক নেতা ও জনসেবক রূপে" রাষ্ট্রের সংগঠনকারী ভূমিকার তথাকথিত বৃদ্ধি বাস্তবে বোঝায় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শক্তিবৃদ্ধি। তারা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটিকে নিজেদের তাঁবে আনে এবং নিজেদের আরও সমৃদ্ধিশালী করার জন্য যন্ত্রটিকে ব্যবহার করে। একাজ করতে গিয়ে তারা যে শুধু অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি (সরকারী

কর্মচারী, ডেপুটি, মন্ত্রী ইত্যাদিদের উৎকোচ প্রদান) প্রয়োগ করে তাই নয়, সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামও চালায়। বড় বড় পুঁজিপতিরা, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টররা ও কর্পোরেশনগুলির প্রেসিডেন্টরা মন্ত্রিসভায় ও অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয় এবং তারা দেখে যে নীতি যাতে একচেটিয়াদের অনুকূলেই অনুসৃত হয়। "রাষ্ট্রীয়" অর্থনীতি "ব্যক্তিগত" ক্ষেত্রগুলিকে হটায় না, বরং তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করে ও তাদের পরিপূরকের কাজ করে। "রাষ্ট্রীয়" অর্থনীতি ব্যক্তিগত ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির ভিত্তিতেই বিকাশ লাভ করে, আর উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান সামাজিকীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যক্তি পুঁজির অবস্থানকেই শক্তিশালী করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিধানের ভিত্তিতে বিকশিত হয় এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রত্যঙ্গগুলি দ্বারা ততটা নিয়ন্ত্রিত হয় না (পার্লামেন্টের কথা বাদই যাক), যতটা হয় প্রভাবশালী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির দ্বারা।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার রাষ্ট্রের শ্রেণী সারমর্ম নষ্ট করে না, ধনতন্ত্রের আমলে অর্থনৈতিক বিকাশের মূলত স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র দূর করে না। সুতরাং বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টরা যখন দাবি করে যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র সমাজের সকল সদস্যদের স্বার্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সংগঠক হিসাবে এক "কল্যাণ রাষ্ট্র" হয়ে উঠছে, তা ভুল।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে শুধু যে সংস্কারবাদীরা (দক্ষিণ-পন্থী সোশ্যালিস্ট) বিকৃত করে তাই নয়, নৈরাজ্যবাদীরাও (অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট) বিকৃত করে।

ধনতন্ত্রের পেতি-বুর্জোয়া ও ও সোশ্যালিস্ট-ঘেঁষা সমালোচনা থেকে দীক্ষা নিয়ে নৈরাজ্যবাদীরা ধনতন্ত্র ধ্বংস করার কোনও বাস্তব পথ দেখাতে সক্ষম হয় না। নৈরাজ্যবাদ একটি পেতি-বুর্জোয়া ঝোঁক। প্রাক-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের আমলে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রগতিশীল সংগঠক শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীকে না চিনতে পারা, "স্বতঃস্ফূর্ততায়" গা ভাসান, রাজনৈতিক কাজ উপেক্ষা করা অথবা তার গুরুত্ব খাটো করে দেখা এবং জনগণের "সহজাত বিপ্লবী প্রবৃত্তি"কে

সামাজিক বিপ্লবের জন্য পরিকল্পিত প্রস্তুতি ও সংগঠনের কাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করান।

বর্তমান সময়কার নৈরাজ্যবাদীরা সাধারণত রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্বকে অস্বীকার করে না। কিন্তু তারা এখনও শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকাকে এবং জনগণকে সমবেত করার জন্য যে ধৈর্যশীল কাজ করতে হয় তা উপেক্ষা করে। তার বদলে তারা প্রতিনিয়ত বিপ্লবের ডাক দেয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সহ যে কোনও রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে (তাদের মতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনিষ্টকর, অবশ্যম্ভাবী ভাবেই আমলাতন্ত্রের বাহন ইত্যাদি) এবং কেন্দ্রীকতার তাৎপর্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কেন্দ্রিকতাকে তারা স্বায়ত্তশাসনবাদের বিপরীত বলে মনে করে।

বর্তমান যুগে নৈরাজ্যবাদ তার "বিশুদ্ধ" রূপে নিয়ে আবির্ভূত হয় না। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম ও কৌশলের উপর এবং ছাত্র আন্দোলনের উপর ছাপ ফেলে। পুঁজিবাদের বুর্জোয়া অথবা পেতি-বুর্জোয়া "সমালোচকরা" (হার্বার্ট মারাকিউস—ট্রটস্কিপন্থী) প্রায়ই নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবধারা উত্থাপন করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন এই দুটি ঝোঁকই কমিউনিস্ট আন্দোলনে দক্ষিণ ও "বাম" থেকে শোধনবাদ রূপে প্রতিফলিত হয়। সংস্কারবাদীদের মতই দক্ষিণ-পন্থী শোধনবাদীরা বর্তমান সময়কার শ্রেণী-সংঘর্ষকে নরম করে দেওয়ার, গণতন্ত্রের শ্রেণী-আধেয়কে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে "বিশুদ্ধ" গণতন্ত্রের অবস্থানকে মেনে নেয়। তাদের মতে "বিশুদ্ধ" গণতন্ত্র নাকি শ্রেণীর আওতার বাইরে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের সম্মুখীন হলে শোধনবাদীরা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে, অর্থনৈতিক জীবনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকাকে এবং সাধারণভাবে রাজনীতির ভূমিকাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। এই ক্ষেত্রে তারা অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিস্টদের নীতিরই শরিক হয়। অনেক শোধনবাদীর মতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র একটি অপরিহার্য অনিষ্ট এবং যত তাড়াতাড়ি তা বিলীন হয় ততই ভাল। কেন্দ্রিকতাকেও তারা একটি অনিষ্ট বলে মনে করে এবং স্বায়ত্ত শাসিত অর্থনৈতিক শাখায় "শ্রমিকদের" স্বায়ত্তশাসনকে তার পাল্টা হিসাবে হাজির করে। কার্যত শোধনবাদীরা সবকিছুকেই স্বায়ত্ত-শাসিত

কমিউনগুলির প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে পর্যবসিত করে এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির বিরোধিতা করে।

"বাম" শোধনবাদীরা "বামপন্থী" হঠকারিতা, চরম পন্থা ও "অতি-বিপ্লববাদ"-এর নীতি গ্রহণ করে। তারা বিপ্লবী কৌশল নির্ণয়ে বিষয়গত পরিস্থিতির তাৎপর্য স্বীকার করে না, জনগণের মধ্যে সাংগঠনিক ও শিক্ষামূলক কাজের গুরুত্ব অস্বীকার করে এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে একমাত্র সামরিক গেরিলা পদ্ধতিকেই সঠিক বলে মনে করে। তারা চুক্তি ও বোঝাপড়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করে এবং সংগ্রামের একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বুর্জোয়া রাষ্ট্র, পার্লামেণ্ট ও অপরাপর সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে না। এই বিষয়ে "বাম" শোধনবাদীরা নৈরাজ্যবাদীদের সংগে একমত। একই সংগে আবার নৈরাজ্যবাদীরা যেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা অস্বীকার করে, "বাম" শোধনবাদীরা সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নিঃশর্ত করে তোলে এবং রাষ্ট্রের কাজকে মূলত জবরদস্তিতে পর্যবসিত করে। শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের পার্টির নেতৃত্বের মূল কাজ লোককে বোঝান ও শিক্ষিত করে তোলার পদ্ধতির বদলে তারা বসায় হুকুমদারি, জবরদস্তি, জোর করে বাধ্য করা। তারা সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু বাস্তবে তার সারমর্মকেই মানে না। তাদের আরও একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল যে তারা রাজনৈতিক উপায় ও পদ্ধতিগুলির অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং তাদের মতে—অর্থনৈতিক বিধানগুলির গতিবিধি যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক উপায় ও পদ্ধতি তার রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে এই হঠকারী নীতি আজই হোক বা কালই হোক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ঘটায়।

৩. সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন

শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল সমাজের এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করে, যা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের জন্য খুবই জরুরী।

সর্বহারাদের একনায়কত্বের রাষ্ট্র এই রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি। পরাভূত শোষক শ্রেণীগুলির বিরোধিতা দমন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই রাষ্ট্র জরুরী। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রধান উপাদান

বলপ্রয়োগ নয়। শ্রমিকশ্রেণী সকল শ্রমজীবী জনগণকে নেতৃত্ব দেয় ও সমবেত করে এবং তাদের সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে টেনে আনে।

এই কারণেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সর্বোপরি কমিউনিজমের অনুপ্রেরণায় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ও তাদের শিক্ষিত করার একটি হাতিয়ার, একটি নতুন সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। এই রাষ্ট্র এক নতুন ভাবে একনায়কত্বমূলক, কারণ তা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং এক নতুন ভাবে গণতান্ত্রিক, কারণ এই রাষ্ট্র শ্রমজীবী জনগণের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্যেই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণী-সারমর্ম, এ বুর্জোয়া একনায়কত্বের হাতিয়ার বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিপরীত।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক রূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে পারে (সোভিয়েত ধরন, পূর্ব-ইউরোপ, এশিয়া ও কিউবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সর্বহারার একনায়কত্ব; পার্লামেণ্টারি প্রজাতন্ত্র সহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরাপর রূপও সম্ভব)। কিন্তু এই সব রূপগুলিরই সারমর্ম এক ও অভিন্ন; তা হল: শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর একই শ্রেণীর নেতৃত্ব।

সর্বহারার একনায়কত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের কাজকর্মও প্রাক-বিপ্লব রাষ্ট্রগুলি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। শ্রমজীবী জনগণকে দাবিয়ে রাখার একটা হাতিয়ার হয়ে ওঠার বদলে এই রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের নিজেদের ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তার অর্থ হল যে এই রাষ্ট্রের দমনমূলক কাজ বজায় থাকে, কিন্তু আধেয় মৌলিকভাবে বদলে যায়। শোষকশ্রেণী যতকাল টিকে থাকে অথবা তাদের প্রতিরোধ যতদিন পর্যন্ত ভেঙে না দেওয়া যায় ততদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শোষকদের দমন করে রাখে। এই সব দমনমূলক কাজের রূপ ও পদ্ধতি ওই প্রতিরোধের চরিত্র ও মাত্রার উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ যা শোষক রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে থাকলেও তাদের মূল কাজ বলে গণ্য হত না, এখন তা ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান আভ্যন্তরীণ কাজ হয়ে ওঠে। বহির্বিষয়ক কাজকর্মের আধেয়তেও সামাজিক সারমর্মের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সর্বহারার একনায়কত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কোনও আক্রমণাত্মক আকাঙ্ক্ষা থাকে না;

অপরের ভূখণ্ড দখল করার বা অপর দেশের জনগণকে বশ্যতা স্বীকার করানর কোনও অভিপ্রায় থাকে না। এই রাষ্ট্রের বৈদেশিক কাজ হল সমাজতান্ত্রিক দেশকে রক্ষা করা ও শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যকে শক্তিশালী করা, নিপীড়িত জনগণের অথবা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ কবলিত জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সাহায্য করা এবং বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্বাভাবিক করে তোলা।

ক্ষমতার পুরানো যন্ত্রটির অবলোপ সাধন, তার সম্পূর্ণ নবীকরণ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ বিধান। বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে যে সব জিনিস তফাত করে এ ব্যাপারটি তার অন্যতম। প্রশাসনিক ক্ষমতার পুরানো যন্ত্রটিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে বুর্জোয়া বিপ্লব তা বজায় রাখে ও নিখুঁত করে নেয়। অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জনগণকে নিপীড়ন করার রাষ্ট্র-যন্ত্রটিকে (পুলিশ, গোয়েন্দা, পুরানো সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র) ধ্বংস করে। এই যন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলা এবং এর জায়গায় নতুন যন্ত্র বসানর কাজ বহুভাবে হতে পারে। তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর—সোভিয়েট রাশিয়ার মত তৎক্ষণাৎ হতে পারে বা ধীরে ধীরে হতে পারে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র-যন্ত্র ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও শোধনবাদ থেকে মৌলিকভাবে তফাত করে, কারণ শেষোক্তরা দাবি করে যে রাষ্ট্র-যন্ত্রটিকে অক্ষত অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দিতে হবে। একই সঙ্গে আবার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নৈরাজ্যবাদীদের মত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ব্যবহার করতে অস্বীকার করে না। পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ভেঙে ফেলে নতুন রাষ্ট্র গঠনের সময় ঐ যন্ত্রটির কোনও কোনও উপাদান, বিশেষত অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত (ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ইত্যাদি) উপাদানগুলিকে ব্যবহার করার সম্ভাবনা বাতিল করে দেয় না।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র জনগণের বিরোধী একটা আমলাতান্ত্রিক সংস্থা থাকে না। উত্তরণ কালে এবং এমনকি পরবর্তী কালে সমাজতন্ত্রের আমলে আমলাতন্ত্রের যে সব অবশিষ্টগুলি কোনও কোনও

বিভাগে বজায় থাকে তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রের বিরোধী। সমাজতন্ত্র যত আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, জনগণের সংস্কৃতি ও কমিউনিস্ট চেতনা যত বাড়তে থাকে এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও প্রশাসন যত নিজের পায়ে দাঁড়ায় তত ওই সব অবশিষ্টগুলি সাফল্যের সঙ্গে হটিয়ে দেওয়া যায়।

নতুন ধরনের রাষ্ট্র এক নতুন ধরনের আইন চালু করে। সমাজতান্ত্রিক আইন শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে এবং নতুন সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বৈধ করে; আইন সামাজিক সম্পত্তিকে নিরাপদে রাখে এবং রাষ্ট্রীয় প্রত্যঙ্গ ও গণসংগঠনগুলির আইনগত অবস্থান, প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সঠিকভাবে স্থির করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইনগত মানদণ্ডের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং সমাজ-জীবনে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, কারণ রাষ্ট্র সেগুলিকে রক্ষা করে। একত্রে ধরলে ওইগুলি মিলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংবিধানগত ও আইনগত সৌধ গঠন করে।

সমাজতন্ত্রের আমলে রাজনৈতিক সংগঠনের সকল বিভাগেই বিপুল পরিবর্তন ঘটে। ধনতন্ত্রের আমলে শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গঠিত শ্রমজীবী জনগণের গণসংগঠনগুলি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয় এবং তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে জনগণকে টেনে আনে। ওই সব সংগঠনের কয়েকটি (সোভিয়েতগুলির) রাষ্ট্র ক্ষমতার ভিত্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপ হয়ে উঠতে পারে। অপরগুলি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাজ করতে থাকে (উদাহরণ স্বরূপ—ট্রেড ইউনিয়নগুলি কারখানায় শ্রমিকদের রক্ষা করে)। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধরলে শ্রমজীবী জনগণের গণসংগঠনগুলি প্রত্যক্ষ অর্থে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রত্যঙ্গ নয়। যদিও ঐ সংগঠনগুলি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষায় ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্য সংগঠনে রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে। কমিউনিস্ট পার্টি শাসক পার্টিতে পরিণত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমগ্র রাজনৈতিক সংগঠনের পরিচালক ও নেতা হয়ে ওঠে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি রূপের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপগুলির মতই নানা রকমের। কতকগুলি ব্যাপারে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে;

সেগুলি হল—তাদের রাজনৈতিক কাঠামো, বিভিন্ন সংগঠনকে দেওয়া অধিকারগুলির পরিসর, দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্তব্যগুলি থেকে উদ্ভূত কর্মপদ্ধতি, ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল না থাকা বা থাকা ইত্যাদি। কিন্তু তাদের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র, রাষ্ট্র ও সকল গণসংগঠন-গুলির কাজকর্মের পরিচালক কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা, জনগণকে সংগঠিত করার এবং গণসংস্থা ও রাষ্ট্রসংস্থা গঠনের মৌলিক নীতিসমূহ (গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, রাষ্ট্রীয় ও গণসংস্থাগুলির শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদি), মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আনুগত্য—এগুলি সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণ কালে রাজনীতির ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। এ ঘটনা ঘটে কেন? আর তা কি মার্কসবাদের এই প্রতিজ্ঞাটির বিরোধিতা করে না যে রাজনীতি হল সমাজের সৌধের অংশ? সমাজতন্ত্রের যুগে (এবং ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কালে) রাজনীতির বর্ধিত ভূমিকার কারণ এই যে সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি শ্রমিকশ্রেণী এমন একটি শ্রেণী যারা ছিল অতীতে নিপীড়িত এবং এই সর্বপ্রথম ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। শ্রমজীবী জনগণের অপরাপর অংশের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের কর্মনীতিকে শোষকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। এই শোষকরা জনসংখ্যার এক সামান্য সংখ্যালঘু অংশ এবং উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত নয়। একাজ করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক সম্পত্তি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নশীল কেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং তা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌলিক চাহিদাগুলিকে প্রকাশ করে। সামাজিক সম্পত্তি ও কেন্দ্র থেকে অর্থনীতির গতিমুখ নির্ধারণ রাষ্ট্রের উপর ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার, অর্থনীতির উন্নয়ন অর্থসংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক প্রত্যঙ্গগুলির উপর এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উপর সক্রিয় প্রভাবের ভিত্তি গঠন করে। ভিত্তির সঙ্গে একেবারে মিশে না গিয়ে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-নীতি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগের পুরানো রাষ্ট্রের তুলনায় গুণগতভাবে এক নতুন ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। রাষ্ট্র ও তার নীতি নতুন সমাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার রূপে কাজ করে। এই হাতিয়ারগুলি বৈষয়িক উৎপাদনের এবং সামগ্রিক ভাবে সমাজের

উন্নয়নের বিধানগুলির সঙ্গে যত বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হয় রাজনীতি ও সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ততই বেশি হয়।

নতুন সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন দুটি মূল স্তর পার হয়। প্রথমটি ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দ্বিতীয়টি সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কমিউনিজমে পরিণত হওয়ার সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশের দুটি স্তরের মধ্য-কার সীমারেখা টানা যায় উনিশশ পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। যদিও প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণ ঘটেছে প্রকৃতপক্ষে তিরিশের দশকে, যখন সেখানে সমাজতন্ত্র প্রধানত নির্মিত হয়ে গিয়েছিল।(১)

সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে সামাজিক মালিকানার অবিভক্ত শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করে। শোষকশ্রেণী-গুলি বিলীন হয়ে যায় এবং শ্রমজীবী জনগণের সকল অ-সর্বহারা অংশের কার্যকলাপ সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। জনগণ শ্রমিকশ্রেণীকে ঘিরে সমবেত হয় ও একটি একশীল শক্তি সৃষ্টি করে। এসবই সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। শোষকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনগণের অধিকাংশের হাতিয়ার থেকে রাষ্ট্র সমাজের সকল সদস্যদের হাতিয়ারে পরিণত হয়; শোষকদের প্রতিরোধ দমনের হাতিয়ার রূপে আর থাকে না (তারা ইতিমধ্যে অবলুপ্ত হয়েছে) এবং জনগণের ঐক্যের রূপগুলির প্রতীক হয়ে ওঠে। এইভাবেই রাষ্ট্র সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই থেকে যায় এবং সর্বহারা বিপ্লব থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রের সারমর্মের কোনও পরিবর্তন হয় না। এই কারণেই সর্বহারার একনায়কত্ব এবং সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করান ভুল। সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিজয়লাভের সময় থেকে চালু রাষ্ট্রসত্তার এই নতুন স্তর সমাজ-জীবনে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকার উপর হস্তক্ষেপ করে না।

১। প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণ শুধু উত্তরণকালের সমস্যাবলী ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনার সঙ্গে জড়িত নয়; সমাজতন্ত্রকে সংহত ও বিকশিত করতে হবে, কতকগুলি নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে ইত্যাদি সমস্যার সঙ্গেও জড়িত।

এমনকি এই সময়েও রাষ্ট্র সমাজের যে সব সদস্য সমাজের আইন ভাঙে এবং সমাজের ও জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজ করে তাদের জোর করে বাধ্য করার নীতি পরিহার করতে পারে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত বিকশিত হয় এবং নাগরিকদের কমিউনিষ্ট চেতনা যত বাড়ে ততই শিক্ষাদান ও বোঝানর ব্যবস্থা গ্রহণ আরও বেশি গুরুত্ব অর্জন করে। রাষ্ট্রের প্রত্যংগসমূহ গণসংগঠন ও সকল শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র আরও বেশি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নীতি শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা ওই নীতি রচিত হয়, সঙ্গে থাকে প্রধান প্রধান পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় ও তার রূপায়ণ নিয়ন্ত্রণে জনগণের অংশগ্রহণ।

রাষ্ট্রের কার্যকলাপেরও পরিবর্তন ঘটে। দেশের ভিতরে শোষকদের প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার দরুন ওই কার্জটির আর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রের অপর সকল কাজকর্ম বজায় আছে ও বিকশিত হচ্ছে এবং আসলে সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সাফল্যগুলি থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন কাজ সেই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে (উদাহরণ স্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম নতুন কাজ হল অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সহযোগিতা)।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজতন্ত্রের আমলে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন বজায় থাকে এবং সমাজ-জীবনে ক্রমশঃ বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ঘটনা কমিউনিজমের আমলে রাষ্ট্রের ও সাধারণভাবে রাজনীতির বিলীন হয়ে যাবার তত্ত্বের আদৌ বিরোধী নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে এর গভীরভাবে গণতান্ত্রিক আধেয়র মধ্যে এবং এর রূপ ও সাংগঠনিক কাঠামো কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও জনগণের সচেতন শৃঙ্খলাবোধ আরও সুদৃঢ় করার মধ্যে। জনগণ ক্রমশ স্বেচ্ছায় তাদের কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র-বিহীন ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য এ হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের নিখুঁতিকরণ ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট আত্ম-প্রশাসনের পদ্ধতি এই সংগঠনের কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টি করা সম্ভবপর করে

তোলে। এই নতুন পদ্ধতিতে কোনও রাজনৈতিক "আবরণ" আর প্রয়োজন হবে না। "আবরণ" সেকেলে হয়ে পড়বে এবং বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু তা হবে অপেক্ষাকৃত দূর ভবিষ্যতে উন্নত কমিউনিজম পরিস্থিতির মধ্যে। এই প্রক্রিয়ার গতির হার ও রূপ সম্পর্কে আমরা এখনও কোনও অনুমান করতে পারিনে, কারণ তা করলে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চাহিদা পূরণ করা যাবে না।

৪. বর্তমান ঐতিহাসিক যুগ এবং সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন

রাজনৈতিক জীবনের বৈচিত্র্য পূর্বে আলোচিত সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের মূল মূল ধরনগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক সংগঠনের প্রত্যেকটি ধরনেরই বিশেষ দেশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, শ্রেণীশক্তি-গুলির মধ্যেকার সম্পর্ক এবং সরকারে অংশগ্রহণকারী শাসক শ্রেণীসমূহ ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রী ও জোটসমূহের চরিত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বহু রকমের রূপ থাকে।

রাজনৈতিক সংগঠনের রূপের দিক থেকে বর্তমান যুগ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এই যুগটির মূল আধেয় হল বিশ্ব পরিসরে ধনতন্ত্র ও প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কে উত্তরণ। এই যুগে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায় এবং এমন সব ধরনের উত্তরণশীল রাষ্ট্রের জন্ম হচ্ছে যারা বিভিন্ন দেশের জনগণকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও পূর্বতন উপনিবেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে। কারণ ওইসব রাষ্ট্র কোনও না কোনও ভাবে নয়া ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয় এবং সেই কারণে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য শ্রমজীবী জনগণের উপর নির্ভর করতে হয়। এমন সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রও রয়েছে যারা হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে, নয় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই কারণেই হয় সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করে, নয় জনগণের সমর্থন লাভ করে ও গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করে। শেষত,

যে সব দেশ এখনও ধনতন্ত্রের স্তরের মধ্য দিয়ে যায় নি, সেইসব দেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের সবচাইতে প্রগতিশীল অংশ, গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে এমন সব রাষ্ট্র আছে যারা প্রাক-ধনতান্ত্রিক নিপীড়নের রূপগুলির অবলোপ করা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক অধিকার প্রসার করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কার করছে। এই সব রাষ্ট্রের কয়েকটি অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ নেয় এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার অভিমুখী করে নিজেদের কার্যকলাপ পরিচালনা করতে চায়।

কোনও কোনও দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী রাষ্ট্র সৃষ্টি করা সম্ভব। যদিও এইসব রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক নয়, কিন্তু আবার বুর্জোয়াও নয়, এবং কার্যকলাপের চরিত্রের দিক থেকে কিছু পরিমাণে বুর্জোয়া-বিরোধীও হয়ে উঠতে পারে, কারণ সমাজতান্ত্রিক পথের বিকাশের দিকে এই সব রাষ্ট্রের সচেতন গতিমুখ থাকে। এই ধরনের রাষ্ট্র সর্বহারার একনায়কত্বের রাষ্ট্রের দিকে যাওয়ার পাদপীঠ রচনা করে এবং তাতে পরিণত হতে পারে। সর্বহারা ও কৃষক-দের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মধ্যে এবং জনপ্রিয়-বিপ্লবী রাষ্ট্রের মধ্যে লেনিন এই ধরনের রাষ্ট্রের উদাহরণ দেখেছিলেন। এই সব রাষ্ট্র দেশকে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে নিয়ে যায় (সে সময়ে, মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্র)।

যে সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সমাজতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করে তা শুধু যে অর্থনৈতিক পশ্চাদপদ দেশগুলিতেই হতে পারে তা নয়, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টসহ ব্যাপক গণতান্ত্রিক জোটের বিজয়-লাভ ও সরকার গঠনের ভিত্তিতে ওই ধরনের রাষ্ট্র এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দেশেও গঠিত হতে পারে, যারা জনগণের সমর্থন লাভ ক'রে একচেটিয়াদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলিকে সংকুচিত করতে পারে, শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির প্রসার ঘটাতে পারে, ফ্যাশিস্ত-পন্থী ও অপরাপর চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ খর্ব করতে পারে এবং শান্তির জন্য ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এবং যারা যুদ্ধ বাধাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জাতিগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাজ করতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বলিত দেশগুলিতে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংগঠন যতই ভিন্ন ধরনের হোক না কেন, বর্তমান বিশ্বে আকর্ষণের দুটি পরস্পর-বিরোধী কেন্দ্র বর্তমান—সে দুটি হল সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র। এই দুটি ব্যবস্থার লড়াই আমাদের যুগের আধেয় নির্ধারণ করে এবং বিশ্বের সকল দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির উপর তার চিহ্ন রেখে যায়।

এই পর্যন্ত আমরা প্রধানত আলাদা আলাদা দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে অথবা পৃথিবীর বহু দেশে পরিব্যাপ্ত সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের কথা বলার মত যথেষ্ট ভিত্তি আছে।

ধনতন্ত্র নিজেই যখন অর্থনীতির একটি বিশ্ব ব্যবস্থা হয়ে উঠল তখন তাদের রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি সহ আন্তর্জাতিক পরিসরে অর্থনৈতিক ও অপরাপর সম্পর্কগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত মানদণ্ড প্রয়োজন হল এবং তারা আন্তর্জাতিক আইনগত ও রাজনৈতিক সংগঠন ইত্যাদি সৃষ্টি করল। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় ও ভূখণ্ডগতভাবে সীমিত কাঠামোর মধ্যেই কাজ করে। কিন্তু একই সময়ে পুঁজিপতিদের বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থা, আন্ত-রাষ্ট্র জোট ও রাজনৈতিক মৈত্রী (নেটো, সিয়াটো ও অপরাপর সংস্থা) গঠিত হয়েছে, যেগুলি শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় তাই নয়, সেই সঙ্গে সেগুলি তাদের নিজ নিজ দেশের শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক ও অপরাপর সংগঠনগুলি তাদের দিক থেকে নিজ নিজ দেশের মধ্যে নিজেদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং প্রত্যেকটি দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ও আন্তর্জাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে নিজেদের কাজকর্মের এবং সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের আন্তর্জাতিক পরিসরে সমন্বয় সাধনের জন্য যুক্ত প্রয়াস চালায়।

বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তার রাজনৈতিক সংগঠনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ব্যবস্থার সারমর্ম হল—এটি এমন কতকগুলি দেশের একটি ব্যবস্থা যার প্রত্যেকটিরই সর্বহারার

একনায়কত্বের ভিত্তিতে শাসিত হয়। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দেশই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম : তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি হল সমতা, বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধুত্ব ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কার্যকলাপ বহুলাংশে মিলে যায়। তাদের ভিতরে যে পার্থক্য দেখা যায় তা হয় মূলত তাদের অর্থনৈতিক স্তর এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন হবার দরুন। এই সব পার্থক্যের দরুনই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে যেসব অভিন্ন স্বার্থ একত্রে বেঁধে রাখে তার বাইরে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ স্বার্থ থাকে এবং নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে তাদের অভিন্ন স্বার্থের সঙ্গে তাদের নিজস্ব বিশেষ স্বার্থগুলির কোনও বিরোধ নেই।

সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির রাজনৈতিকভাবে এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এত ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে যে আন্তর্জাতিক আইনগত ও রাজনৈতিক সম্পর্কগুলি আর ধনতন্ত্রের শক্তিগুলির আধিপত্যের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে কতকগুলি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয় এবং এগুলি সবই আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ হয়। এই ধরনের চুক্তি ও সন্ধিগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ এগুলি হল বর্তমান সময়কার শক্তিগুলির ভারসাম্যের প্রতিফলন হিসাবে পরস্পরকে দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলির ফল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এই সব চুক্তির সাধারণ আধেয়কে যতখানি গণতান্ত্রিক করে তোলা সম্ভব তার চেষ্টা করে। জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিতে তাদের কার্যকলাপ এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়।

রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থগুলির মধ্যে বিরোধিতা খুবই সুস্পষ্ট এবং সেগুলির মধ্যেকার সংগ্রাম আরও তীব্র হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সংগঠন ও সংস্থাগুলি এই সংগ্রামে বিরাট ভূমিকা নেয়। কাজেই যে কোনও ঐতিহাসিক যুগে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা শুধু আলাদা আলাদা দেশের ভিত্তিতেই নয়, বিশ্ব সম্পর্কগুলির ব্যবস্থার মধ্যেও বিচার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমাজ বিপ্লব

সমাজ বিপ্লবগুলি ইতিহাসের প্রধান প্রধান সন্ধিক্ষণ। বিপ্লবগুলি পুরানো সেকেলে সমাজ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং দ্রুত প্রগতির যুগ শুরু ক'রে দেয়।

বুর্জোয়া দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞান সাধারণত সমাজ বিপ্লবের বিধান-শাসিত চরিত্রকে মানে না। তারা মনে করে এই বিপ্লবগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় "ভাঙন-ধরায়" এবং সমাজের "স্বাভাবিক" বিবর্তনকে বিপথগামী করে। আমেরিকার অধ্যাপক আর্থার এম. শ্লেসিঙ্গার-এর মত কয়েকজন বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ বলেছেন যে "আধুনিক বিজ্ঞান শাসক শ্রেণীকে এমন ক্ষমতা দিয়েছে যা গণবিপ্লবকে সেকেলে করে ফেলেছে।"(১) কিন্তু জীবন এদের এই দাবিকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে। রাশিয়ায় মহান অক্টোবর সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাশিস্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের এক বিরাট ঢেউ ওঠে। বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া এখন আরও বেশি বেশি এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এই সব পরিস্থিতিতে অনেক বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ জনগণের মধ্যে বিপ্লবের ধারণার এই জন-প্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে। তারা নিজেদের "ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব", "আয়ের বিপ্লব" ইত্যাদি সর্বপ্রকার "বিপ্লবে"র প্রবক্তা বলে ঘোষণা করে। তাদের মতে এইসব বিপ্লব ধনতন্ত্রের চরিত্র বদলে দিয়েছে। তাই এখন বিপ্লবকে অস্বীকার না করে তারা চেষ্টা করছে বিপ্লবের সারমর্মকে বিকৃত করতে এবং বিপ্লবের জন্য যা আসল কথা অর্থাৎ সেকেলে সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন তা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই ধরনের ভ্রান্ত চিন্তাধারার মুখোশ খুলে দেয়,

---

১। হারবার্ট আপথেকার, "দি নেচার অব ডেমোক্রাসি, ফ্রিডম অ্যান্ড রেভলিউশন, নিউ ইয়র্ক, পৃষ্ঠা ৭৪।

সমাজ বিপ্লবে ও ইতিহাসে তার ভূমিকার এবং বিপ্লবের অভ্যুদয় ও তার বিকাশের বিধানের একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় পেঁছিতে সাহায্য করে।

১. সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের বিধান হিসাবে সমাজ বিপ্লব

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে সমাজ বিকাশের গতিপথে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপাদন ও যোগাযোগের উপকরণ, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিতে ক্রম-বিবর্তনমূলক পরিবর্তন অথবা উল্লম্ফন দুইই ঘটতে পারে। এগুলির মধ্যে সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনগুলিকে বলা হয় "বিপ্লব"। কিন্তু সমাজ জীবনের কয়েকটি দিকে তাৎপর্যপূর্ণ পবিবর্তন ঘটলেও কেবল সেগুলি থেকে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছে বলে বোঝায় না। সমাজ বিপ্লব বলতে বোঝায় সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাটিতে মৌলিক পরিবর্তন।

একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর বা পর্যায় থেকে অপর একটি স্তর বা পর্যায়ে উত্তরণের সময়ে একই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে গুণগত রূপান্তরও ঘটতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাক-একচেটিয়া ধনতন্ত্র থেকে একচেটিয়া ধনতন্ত্রে বা সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণ এইভাবে ঘটেছে। কিন্তু এ কোনও সমাজ বিপ্লব নয়, কারণ ধনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ও তার মূল খুঁটিগুলি থেকেই যায়। পক্ষান্তরে বিপ্লব "......হল এমন একটি পরিবর্তন যা পুরানো ব্যবস্থাটির একেবারে ভিত্তিমূল ধরে ভেঙে ফেলে।"(১)

সমাজ বিপ্লবের অর্থ হল সমাজের বিকাশের একটি গুণগত উল্লম্ফন, যার ফল হল—একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে অপর একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অপর একটি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একটি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হল সমাজের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, রাজনৈতিক জীবনে, মতাদর্শ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন। এই রূপান্তরগুলি একই সঙ্গে ঘটে না এবং সবসময় একই অনুক্রমেও ঘটে না। এ সবের অনেকগুলি খোদ

১। ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস ভল্যুম ৩৩. পৃষ্ঠা ১১০।

বিপ্লবের মধ্যে পড়ে না, বিপ্লবের প্রস্তুতিতে অথবা বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতিতে সাহায্য করে।

পুরানো সমাজের গর্ভে নতুন নতুন উৎপাদিকা শক্তির আবির্ভাব, অর্থনীতি ও শ্রেণী-শক্তিগুলির বিন্যাসে পরিবর্তন, সমাজ-জীবনের নতুন উপাদানসমূহ ও সেকেলে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি, ব্যক্তি ও শ্রেণীগুলির মধ্যে এই সব বিরোধ সম্পর্কে চেতনা—এ সবই হল সেই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক যা সমাজ বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। বিপ্লব নিজেই সমাজের বিকাশের একটি পর্যায়, যখন, লেনিনের ভাষায়, "তথাকথিত শান্তিপূর্ণ বিকাশের পর্যায়গুলিতে ধীরে ধীরে জমে ওঠা বহু সংখ্যক বিরোধের সমাধান হয়।"(১)

এই সব বিরোধগুলি কি কি? প্রথমত, নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও সেকেলে উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যে বিরোধ; দ্বিতীয়ত, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় (তার ভিত্তিতে) নতুন উপাদানগুলি এবং পুরানো সংবিধানগত ও আইনগত সৌধের মধ্যে বিরোধ, এবং ওই সৌধেরই বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার বিরোধ।

সমাজ বিপ্লবের গভীরতম কারণ নিহিত রয়েছে নতুন উৎপাদিকা শক্তিসমূহ এবং সেকেলে উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যেকার বিরোধের ভিতরে। নতুন উৎপাদিকা শক্তিগুলির চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদন সম্পর্কগুলি সাধারণত পুরানো ব্যবস্থার গর্ভেই জন্মলাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ও শিল্পকারখানা যখন দেখা দিল, তখন পুঁজিবাদী সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর মধ্যেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের বিকাশ সেকেলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতর থেকেই তাকে ক্ষয় করে ফেলে। কিন্তু শেষোক্তটি আপনা থেকেই অদৃশ্য হয়ে যায় না, কারণ তার পিছনে থাকে সেই সব সেকেলে শ্রেণী যারা নিজেদের অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালায়। উদাহরণ স্বরূপ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পচন ধরেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জমিদার শ্রেণী, যাদের হাতে ছিল বিশাল বিশাল

১। পূর্বোক্ত, ভল্যুম ১৩, পৃষ্ঠা ৩৭।

ভূসম্পত্তি, অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা; তারা ব্যবস্থাটিকে জীইয়ে রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করেছিল। পুরানো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যে ব্যবস্থাটি নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও বুর্জোয়া সম্পর্কগুলির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছিল, তাকে বিদায় করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল বিপ্লবের।

এইজন্যই উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যেকার সংঘাত শ্রেণীগুলির সংঘাতের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। কিছু কিছু শ্রেণী সেকেলে উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে এবং ঐসব সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে দাঁড়ায়, অপর শ্রেণীগুলি চায় ঐ ব্যবস্থার অবলোপ। বিপ্লবী শ্রেণীগুলি সেকেলে রাজনৈতিক সৌধটিকে ধ্বংস করে, পুরানো রাষ্ট্রশক্তির অবলোপ সাধন করে ও নতুন রাষ্ট্রশক্তি সৃষ্টি করে। পুরানো উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য এবং নতুন উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য তারা এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে।

সমাজ বিপ্লবের কর্তব্য হল সমাজ জীবনের, অর্থনীতির ও রাজনীতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে মৌলিক রূপান্তর ঘটান। বিপ্লব সমাজের মনন-জগতে ও সংস্কৃতিতে কম বা বেশি পরিমাণে সুগভীর পরিবর্তন আনে। একথা অনস্বীকার্য যে সব বিপ্লবই সব সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করতে পারেনি। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবের গতিপথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সব সময় এক থাকে না।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য হল উন্নয়নশীল উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যেকার বিরোধের সমাধান করা, পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে একটি নতুন ও উচ্চতর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য প্রধান প্রয়োজন হল উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা সম্পর্কগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন। "যখনই শ্রেণীগুলি একে অপরকে স্থানচ্যুত করেছে, তখনই তারা সম্পত্তি সম্পর্কগুলিকে পরিবর্তন করেছে।"(১)

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সেকেলে রাজনৈতিক সৌধ এবং উন্নয়নশীল নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিণত চাহিদাগুলির

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস' ভল্যুম ৩০, পৃষ্ঠা ৪৫৭।

মধ্যেকার বিরোধের সমাধান করে। বিপ্লব জরুরী সামাজিক-অর্থনীতিক গঠনকে শক্তিশালী ও বিকশিত করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও আইনগত সৌধ সৃষ্টি করে।

বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এক শ্রেণী থেকে অপর এক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। বিপ্লব ও সবরকমের ক্যু দেতা অথবা প্রাসাদ বিপ্লবগুলির মধ্যে তাই হল মৌলিক পার্থক্য। কারণ শেষোক্তগুলি কোনও শ্রেণীর ক্ষমতাকে উৎখাত করে না, শুধু শাসক-গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তি বিশেষ বদল করে।

অবশ্য এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে সর্বক্ষেত্রেই বিপ্লব বলা যায় না। যদি সাময়িকভাবে প্রাধান্য অর্জন ক'রে কোনও সেকেলে শ্রেণী ক্ষমতাসীন হয় তবে তা বিপ্লব নয়, তা হবে প্রতি-বিপ্লব অথবা পুরানো শাসন ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

বুর্জোয়া দর্শনে ও সমাজ-বিজ্ঞানে সাধারণত এই মৌলিক পার্থক্যটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চিম জার্মানিতে দর্শনের একটি অভিধানে বিপ্লবের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, বিপ্লব হল বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ পরিবর্তনের পাল্টা অকস্মাৎ হিংস্র পরিবর্তন।(১) যদিও বিপ্লব বিবর্তনের প্রকৃতই বিপরীত, তবু এই ব্যাখ্যার মৌলিক ত্রুটি হল এই যে বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের মধ্যে কোনও পার্থক্য টানে না। এই ব্যাখ্যার অথবা এই ধরনের অপরাপর ব্যাখ্যার অপর একটি ত্রুটি হল যে সেগুলি বিপ্লব এবং "হিংস্র পরিবর্তন" (যার মধ্যে নিহিত আছে সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখল) তাকে সমান করে দেখে।

সেকেলে শ্রেণীগুলি স্বেচ্ছায় কখনও ক্ষমতা ত্যাগ করে না, তাই যে কোনও বিপ্লব ওই শ্রেণীগুলিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে এবং সেই অর্থে কোনও না কোনও ধরনের বলপ্রয়োগ ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে তা দেখা গিয়েছে। কিন্তু বল বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং সশস্ত্র সংগ্রামই অপরিহার্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। যে পরিস্থিতির মধ্যে বিপ্লব হবে সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপরই সব কিছু নির্ভর করে।

১। এ ডিকশনারি অব ফিলজফি (জি. শিমিড কর্তৃক সম্পাদিত), মস্কো, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৫০০ (রুশ সংস্করণ)।

সাধারণভাবে বিপ্লবের ধারণাটিকে "সশস্ত্র অভ্যুত্থান" অথবা "গৃহযুদ্ধের" ধারণার সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয়। যদিও অধিকাংশ বিপ্লবেই শ্রেণী-গুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটেছে। তবুও ইতিহাসে এমন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধের নজীর আছে (উদাহরণ স্বরূপ ইংলণ্ডে ওয়ারস্ অব রোজেজ) যেগুলিকে বিপ্লব বলা যায় না, কারণ নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কোনও উদ্দেশ্য সেগুলির ছিল না। অপরপক্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থান অথবা গৃহযুদ্ধ ছাড়াই বিপ্লব সম্ভব।(১)

সমাজ বিপ্লব বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্জিত হতে পারে, কিন্তু এর আধেয় সব সময়ই হল সেকেলে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন এবং তার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

শ্রেণীসংগ্রামের গতিপথ, কোন্ কোন্ শক্তি তাতে আধিপত্য অর্জন করতে পারে এবং বিপ্লবের বাস্তব পরিণতির জন্য বিপ্লবী শ্রেণীগুলি তাদের ঐতিহাসিক লক্ষ্য অনুসরণে কতখানি সক্ষম তার উপরই বিপ্লবের বিকাশ নির্ভর করে। ইতিহাসে বিপ্লবের উত্থান-পতনের, বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়; আবার প্রতিক্রিয়ার সাময়িক জয় ও পুরানো শাসন-ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্যায়ের নজীর আছে। ফ্রান্সের ইতিহাস হল এর লক্ষণীয় উদাহরণ। সেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রূপান্তরের কর্তব্যগুলি সম্পূর্ণ হতে প্রায় এক

১। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা অনেকগুলি ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছিলেন। ১৮৭২ সালে আমস্টারডামের একটি সভায় কার্ল মার্কস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। হল্যাণ্ডেও সে সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। (কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ২৯৩ দেখুন)। ওইসব দেশের সর্ব-হারারা ইতিমধ্যেই যে সব গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছে তা ব্যবহার করার এবং তাদের ক্ষমতা ও সংগঠনের সঙ্গে সে যুগে ঐ সব দেশে শক্তিশালী সামরিক-আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র না থাকার ঘটনাটিকে যুক্ত করে দেখে মার্কস ওই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। লেনিন মনে করেছিলেন, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে এবং ১৯১৭ সালের জুলাই ঘটনাবলীর আগে দ্বৈত ক্ষমতার আমলে রাশিয়াতে বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ ও শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব। (ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২৪, পৃষ্ঠা ৪০, ২৩৬-৩৭ দেখুন)।

শতাব্দী লেগেছিল। শুরু হয়েছিল ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ সালের বিপ্লব থেকে এবং শেষ হয়েছিল ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে।

আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বিরোধগুলির পারস্পরিক ক্রিয়াও প্রতিক্রিয়ার দ্বারাও বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ আরও জটিল হয়ে যায়। পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধই হল বিপ্লবের প্রধান উৎস, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বাইরের বিরোধগুলি অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিরোধগুলির কোনও গুরুত্ব নেই। শেষোক্তটি সর্বদাই আভ্যন্তরীণ বিরোধগুলিকে কোনও না কোনও ভাবে প্রভাবিত করে, সেগুলিকে তীব্রতর করতে পারে এবং বিপ্লবী সংকটের বিকাশের গতিকে দ্রুততর অথবা মন্থর করতে পারে। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির মত কতকগুলি বিপ্লব আছে যাদের লক্ষ্য নির্দেশিত বিদেশী শোষকদের এবং তাদের মিত্র ও সামাজিক দোসর দেশের ভিতরকার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির দ্বৈত নিপীড়নের বিরুদ্ধে, তারা চায় আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় এই উভয় বিরোধেরই সমাধান।

চরিত্র ও পরিচালিকা শক্তিগুলির দিক থেকে বিপ্লবগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

একটি বিপ্লব কোন্ কোন্ সামাজিক বিরোধের নিষ্পত্তি করে এবং কোন্ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার দ্বারাই তার চরিত্র নির্ধারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লবের নেতা বুর্জোয়া ছিল না, ছিল সর্বহারারা. তাসত্ত্বেও সে বিপ্লব চরিত্রের দিক থেকে বুর্জোয়া ছিল কেন? কারণ হল, ওই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলির অবশেষের ধ্বংসসাধন এবং এগুলি হল বুর্জোয়া বিপ্লবের লক্ষ্য।

বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তিসমূহ হল সেই সব শ্রেণী যারা বিপ্লব করে, বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সেকেলে শ্রেণীগুলির প্রতিরোধকে পরাজিত করে। পরিচালিকা শক্তিগুলি শুধু বিপ্লবের চরিত্রের উপর নির্ভর করে না, সেই সঙ্গে যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে বিপ্লব হয় তার উপরও নির্ভর করে। অনেক বিপ্লব একই ধরনের বা একই চরিত্রের হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পার্থক্যের জন্য বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চিম ইউরোপে

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির পরিচালিকা শক্তিগুলির মধ্যে ছিল কৃষক, শহরাঞ্চলের জনসাধারণের দরিদ্রতম অংশ, উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণী ও বড় বড় শহরের পেতি-বুর্জোয়ারা। বুর্জোয়ারা শুধু একটি পরিচালক শক্তি ছিল না, তারা এই বিপ্লবগুলির নেতাও ছিল। কিন্তু রাশিয়ার ১৯০৫-০৭ সালের এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের নেতা তো ছিলই না, এমনকি পরিচালিকা শক্তিগুলির মধ্যেও ছিল না। সর্বহারাদের নেতৃত্বে সর্বহারা ও কৃষকেরাই ছিল রাশিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তি।

সমাজ বিপ্লবগুলি ইতিহাসের প্রকৃত উৎসব এবং ঐ বিপ্লবগুলি সমাজ বিকাশের গতিকে প্রভূত পরিমাণে ত্বরান্বিত করে। শান্তিপূর্ণভাবে বিবর্তন-মূলক বিকাশের সময়ে বহু বছর ধরে সমাজ-জীবনে যতখানি পরিবর্তন হয়, তার তুলনায় জনগণ বিপ্লবের সময়কার কয়েক বছরে বা কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সমাজ-জীবনে ঘটায়। মার্কস একে ইতিহাসের রেল-ইঞ্জিন বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

কিছু কিছু বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ দাবি করে যে বিপ্লব জনগণ করে না, করে জনগণের মধ্যেকার একদল সংখ্যালঘু অংশ, বিপ্লবীদের ছোট ছোট কতকগুলি গোষ্ঠী। পেতি-বুর্জোয়া অতি-"বাম" বিপ্লবীদের চিন্তাধারার সঙ্গে এই মতবাদ মিলে যায়, কারণ এই পেতি-বুর্জোয়ারা বিপ্লবের প্রস্তুতিকে বিপ্লবী সংখ্যালঘুদের ষড়যন্ত্রের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। সক্রিয় বিপ্লবী সংখ্যা লঘুরা অবশ্য বিপ্লবের অনুঘটক হতে পারে, কিন্তু জনগণের সমর্থন ছাড়া বিপ্লব বিশেষ গোষ্ঠীর সশস্ত্র ক্ষমতাদখল (পুশ) অথবা ক্যু দেতা-তে পরিণত হয়। জনগণ বিপ্লব সম্পূর্ণ করবার আকাঙ্ক্ষায় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

কোনও কোনও বুর্জোয়া বিপ্লবে জনগণ নিজেদের স্বতন্ত্র দাবি উপস্থাপিত করে এবং তাদের সংগ্রামে বিপ্লবী ঘটনাবলীর গতিপথে গভীর ছাপ ফেলে; এই ধরনের বিপ্লবকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়। অপরাপর বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি থেকে এই বিপ্লবের পার্থক্য চরিত্রের দিক থেকে নয়, এই পার্থক্য হল সক্রিয় ও স্বাধীনভাবে সংগ্রামে জনগণের অংশ গ্রহণের মাত্রায়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯০৫-০৭ এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল এই ধরনের। এরকম বুর্জোয়া বিপ্লবও হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ, ১৯০৮ সালে

তুরস্কে ও ১৯১০ সালে পর্তুগালে) যেখানে জনসাধারণ কোনও সক্রিয় বা স্বাধীন ভূমিকা নেয়নি। সাধারণত এই ধরনের বিপ্লব ইতিহাসে কোনও গভীর ছাপ ফেলে না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিপ্লব "উপরের তলার" বিপ্লবরূপে শুরু হবার পর তার বিকাশের গতিপথে ব্যাপক জনগণের জড়িত হয়ে পড়ার দরুন তা সুগভীর ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হতে পারে।

জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হলে পুরানো ব্যবস্থাটিকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের সম্যক উপলব্ধি থাকতে হবে। বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে অবিলম্বে সমাধানের প্রয়োজন এমন সব ঐতিহাসিক সমস্যাবলীর প্রতিফলনকারী নতুন নতুন বিপ্লবী চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। এইসব চিন্তাধারা জনগণকে সংগঠিত করতে সাহায্য করে এবং সেকেলে শ্রেণীগুলির প্রতিরোধ চূর্ণ করতে সক্ষম একটি রাজনৈতিক সেনাবাহিনীতে তাদের সমবেত করে। ফলে সাধারণত রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে এক মতাদর্শগত বিপ্লব ঘটে, যা জনগণের চেতনা ও মনোভাবে সুগভীর পরিবর্তন আনে। উদাহরণ স্বরূপ, মানুষের মনে এই ধরনের বিপ্লব ঘটেছিল রাশিয়ায় মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে, যখন "সোভিয়েতগুলির হাতে সকল ক্ষমতা" এই আওয়াজ কোটি কোটি শ্রমজীবী জনসাধারণের চেতনাকে অধিকার করেছিল।

এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে সামাজিক বিরোধগুলির সমাধানের জন্য বিপ্লব অপরিহার্য কি না। সংস্কার, শাসকশ্রেণীগুলির তরফ থেকে আংশিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান মারফত অথবা ক্রমশ পরিবর্তন করার মারফত ঐ বিরোধগুলির কি সমাধান করা যায় না? বিপ্লবের বিরোধীরা সংস্কারকে বিপ্লব থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় বলে গণ্য করে। তারা বিপ্লবের বিধান-শাসিত চরিত্রকে অস্বীকার করে এবং বিপ্লবকে মনে করে যেসব শাসক চক্র সময়মত বিপ্লবীদের সুযোগ-সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয় তাদের ভুলের ফল। উইনস্টন চার্চিল ফ্রান্সের ১৭৮৯ সালের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলেন যে এর কারণ হল যে রাজতন্ত্র দেশের প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনতে পারেনি। চার্চিলের মতে মিরাবোর মৃত্যু না হলে ও ষষ্ঠদশ লুই ভুল না করলে "চরমপন্থীরা" ক্ষমতা দখল করতে পারত না এবং বিপ্লব সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হত।

সংস্কারের মারফত সমাজে বিরোধগুলি সাময়িকভাবে কমান বা ঝিমিয়ে ফেলার সম্ভাবনা কোনও মতেই বিরোধের উৎসকে সরাতে পারে না, সমাজের মৌলিক বিরোধগুলির সমাধান করতে পারে না, শুধু চূড়ান্ত সমাধান স্থগিত রাখে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অপর একটি ব্যবস্থায় উত্তরণ সারমর্মের দিক থেকে হল বিপ্লব, যদিও তা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে ও ভিন্ন ভিন্ন পথে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের ভিতর এক আপসের মধ্যে, আর ফ্রান্সে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের মারফত সামন্ততন্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

নিজেদের পতন এড়াবার জন্য পুরানো ব্যবস্থার সমর্থকরা যদি সংস্কারকে ব্যবহার করে, তবে তার অর্থ কি এই যে বিপ্লবীদের সংস্কারের বিরোধী হতেই হবে? নিশ্চয়ই নয়। সংস্কার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সংস্কার-বাদীরা ও দক্ষিণ-পন্থী সোশ্যালিস্টরা সংস্কার ও বিপ্লবকে সমভাবে দেখে এবং সংস্কারকেই শেষ কথা বলে গণ্য করে, আর এইভাবে সংস্কারের মারফত শ্রম-জীবী জনগণকে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে সরিয়ে আনতে এবং বিপ্লবের শক্তিগুলিকে দূষিত করতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা ধনতন্ত্রের আমলের সংস্কারগুলিকে বিপ্লবী সংগ্রামের উপজাত হিসাবে দেখে এবং সংস্কারগুলিকে বিপ্লবের মূল কর্তব্যের অধীন ক'রে ঐ সংগ্রামের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য ব্যবহার করে।

আমাদের কালে যখন বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় আকার নিয়েছে এবং বিশ্বের ইতিহাসের গতিপথের উপর ক্রমশ বেশি বেশি প্রভাব ফেলছে, যখন ধনতন্ত্র যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে সেই সময় সমাজ-বিপ্লব সম্পর্কে ভয় বুর্জোয়াদের কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে কিছু কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য করে। বহু দেশে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে যে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছে, যার পরিসর ও তাৎপর্য সাধারণ সংস্কারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই ঘটনা আরও অগ্রগতি সহজ করে তোলে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করতে সাহায্য করে।

লেনিন দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের বিজয়লাভের পর সংস্কার ও বিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্কে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। বিজয়ী বিপ্লবী শ্রেণী যে সব কর্তব্যের মুখোমুখী হয় তার মোকাবেলা করার জন্য সংস্কার ও বিপ্লবী পদ্ধতি উভয়কেই ব্যবহার করে। অবস্থার দরুন যখনই বিপ্লবী শ্রেণীর আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য হাতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, বিপ্লবের শত্রুদের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং দোদুল্যমানদের স্বপক্ষে টেনে নেওয়া বা নিরপেক্ষ করে দেওয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় তখন সংস্কার সে সুযোগ দিতে পারে।

যেসব কারণের দরুন সমাজ-বিপ্লবের জন্ম হয় এবং যা বিপ্লবকে একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় পরিণত করে তা আমরা আলোচনা করেছি। এর ফলে এই প্রশ্নটির জবাব দেওয়া যায়ঃ বিপ্লব কি সব সময়েই হবে ?

ঠিক যেমন শ্রেণী, শ্রেণীসংগ্রাম ও রাষ্ট্র চিরস্থায়ী হবে না, তেমনি সমাজের বিকাশ সর্বদাই সমাজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে হবার প্রয়োজন হয় না। ১০০ বছরেরও আগে মার্কস দা পভার্টি অফ ফিলজফি লেখার সময় একথা বুঝতে পেরেছিলেন "যেখানে শ্রেণী বা শ্রেণী-বিরোধ থাকবে না সেই রকম একটা ব্যবস্থার মধ্যেই সামাজিক বিবর্তনগুলি আর রাজনৈতিক বিপ্লব হয়ে উঠবে না।"(১)

সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে সব বিরোধ দেখা দেয় সমাজ-বিপ্লব ছাড়াই সে সবের মীমাংসা করা হয়। অবশ্য এর দ্বারা সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে গুণগত উল্লম্ফন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বাতিল হয়ে যায় না; এসব হবেই, কিন্তু এর জন্য কোনও রাজনৈতিক অভ্যুত্থান বা সামাজিক বিপ্লব হবে না।

প্রযুক্তিবিদ্যায় বিপ্লব এবং সামাজিক সম্পর্কগুলিতে বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু ঐ দুই বিপ্লবকে অভিন্ন বলে গণ্য করা ভুল হবে। সংস্কারবাদীরা এই ভুল করে থাকে। বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদদের কথার পুনরুক্তি করে তারা বলে যে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটি নতুন শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে। ইংল্যাণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের শিল্প-বিপ্লবের মতই এই বিপ্লব একই সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কগুলিতেও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তারা জোর গলায় বলে যে এই নতুন শিল্প-বিপ্লব বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীগুলির

১। কে. মার্কস, দা পভার্টি অব ফিলজফি, পৃষ্ঠা ১৬৮।

"তিরোভাব" ঘটাবে, আর তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আর প্রয়োজন হবে না।

এই তুলনা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে গুলিয়ে ফেলার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে। ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে ও অপরাপর বেশির ভাগ দেশেই বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির জয়লাভের পর অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে। বুর্জোয়া বিপ্লবগুলিই ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্বাধীনভাবে বিকাশের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। শিল্প-বিপ্লব ধনতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি সৃষ্টি করে এবং সেই সঙ্গে আবার ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যোগায়।

বর্তমানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। এখানে বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় একটা বিপ্লব শুরু হয়েছে, যা সমাজ-বিপ্লবের পরে হচ্ছে না, বরং তার আগে হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিপ্লবের অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ফলাফল হতে বাধ্য। কিন্তু সমাজ-বিপ্লব ছাড়া এই বিপ্লব আপনা থেকেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে পারে না। ধনতন্ত্রের আমলে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি শুধু পুঁজির আরও ঘনীভবন এবং জয়েন্ট-স্টক ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সমাহারের আরও বিকাশ ঘটায়। কিন্তু ব্যক্তিগত পুঁজিপতিই হোক আর যৌথ-পুঁজিপতিই হোক, পুঁজিপতিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সমাজ-বিপ্লব হতেই হবে,—আর সে বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হতে হবে।

২. *বিপ্লবের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধরন*

একটি সামাজিক গঠন থেকে আর একটি সামাজিক গঠনে উত্তরণ সব সময়েই তার নিজস্ব বিশেষ পথে হয় এবং তা নির্ভর করে কোন্ গঠন মৃত্যু মুখে ও কোন্ গঠনের জন্ম হচ্ছে। বিপ্লবের ঐতিহাসিক ধরনগুলি সেই অনুযায়ী পৃথক পৃথক হয়। বিপ্লবগুলিকে বিভিন্ন ধরনে ভাগের ভিত্তি নির্ভর করে—প্রথমত, যে ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে তার চরিত্রের উপর (কোন্ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করবে ও কোন্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে) তার উপর; দ্বিতীয়ত, তার শ্রেণী আধেয়ের উপর। বিপ্লবের

ধরনের প্রশ্নটি আলোচনার সময় আমরা সর্বদাই কোন্ শ্রেণী বিপ্লব করছে ও কাদের স্বার্থে হচ্ছে সেকথা আলোচনা করি। একই ধরনের (অথবা চরিত্রের) বিপ্লবগুলি তাদের রূপ, পরিচালিকা শক্তি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে দেওয়ার ক্ষমতার মাত্রা ইত্যাদি ব্যাপারে ভিন্ন হতে পারে।

একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন থেকে অপর একটি গঠন প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘটনা হল আদিম কমিউন ব্যবস্থা থেকে দাস-মালিকানা ব্যবস্থায় উত্তরণ (পরবর্তীকালে কয়েকটি দেশে সরাসরি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ)। এই উত্তরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রাক-শ্রেণী সমাজের স্থানে শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ লুইস হেনরী মরগান (যাঁর লেখাকে মার্কস ও এঙ্গেলস যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করতেন) সহ বেশ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মতে এই পরিবর্তন বিবর্তনমূলকভাবে ঘটেছিল অর্থাৎ বিপ্লব দেখা দেয়নি। কিন্তু এঙ্গেলস তাঁর লেখা "দা অরিজিন অব ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এ্যান্ড দা স্টেট" নামক পুস্তকে এই প্রশ্নের একটি ভিন্ন জবাব দেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আদিম কমিউন ব্যবস্থার গর্ভেই শ্রেণী-বিভাগ ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল এবং পরিশেষে তা থেকে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে ও তা অবশিষ্ট 'ট্রাইবাল' সম্পর্কগুলি ভেঙে দেয়। পরস্পর অনেকগুলি সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে 'ট্রাইবাল' অভিজাতদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। যেখানে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় রূপান্তর ঘটেছে, সেখানে সমাজের বিকাশ হয়েছিল দ্রুত, আর 'ট্রাইবাল' ব্যবস্থার অবশিষ্টগুলি যেখানে রক্ষা করা হয়েছিল ও সেগুলি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, সেখানে সামাজিক সম্পর্কগুলি সাধারণভাবে থমকে গিয়েছিল।(১)

১। এথেন্সের সোলন ও ক্লাইসথেনেস সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছিলেন : সোলন "তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবের পরম্পরা শুরু করেছিল সম্পত্তি বেদখল করে।" "ক্লাইসথেনেসের বিপ্লব-এর (গোত্রের অভিজাতবর্গ, সম্পাদক) চূড়ান্ত পতন আনল ; আর তার সঙ্গে গোত্র-ভিত্তিক গঠনের শেষ অধিকারগুলিরও পতন ঘটল।" প্রাচীন রোমের পূর্ণ-বিকশিত নাগরিক ও অধিকার-বঞ্চিত দরিদ্রদের (প্লিবিয়াম) মধ্যে সংগ্রামে এঙ্গেলস সেই বিপ্লবের উৎস দেখেছিলেন "......যে বিপ্লব প্রাচীন গোত্রভিত্তিক গঠনকে শেষ করল।" (কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ২৮০, ২৮২, ২৯২)

আদিম কমিউন ব্যবস্থার জায়গায় যে দাস-মালিকানার সমাজ প্রতিষ্ঠা হল তাতে দাস-মালিক ও দাসদের মধ্যেকার মূল বৈরীভাবাপন্ন বিরোধের সঙ্গে যুক্ত হল বড় বড় ভূস্বামী ও মহাজন এবং কৃষক ও গ্রাম্য কারিগরদের মধ্যেকার বৈরীভাবাপন্ন বিরোধ। এই বিরোধগুলিই কৃষক ও ছোট ছোট সম্পত্তির অধিকারী মানুষদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টি করে। প্রায়শই এই আন্দোলনগুলির ফল দাঁড়াত কিছু সংস্কার, যা শাসক শ্রেণীগুলি স্বীকার করতে বাধ্য হত।

দাস-মালিকানার জগতে বিপ্লবী আন্দোলনের অপর একটি প্রবাহ হল নিপীড়কদের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম। সাধারণত সবচাইতে বড় বড় আন্দোলনগুলির সঙ্গে গরিবদের আন্দোলনও যুক্ত হয়ে পড়ত। এর উদাহরণ সিসিলিতে দাসদের অভ্যুত্থান, এশিয়া মাইনরে অ্যারিস্টোনিকুসদের অভ্যুত্থান, বসফরাস কিংডমের সাভমাকদের অভ্যুত্থান ও চীনে "রেড ব্রাউজ" অভ্যুত্থান, ইত্যাদির মধ্যে মেলে। অতীত কালের বৃহত্তম অভ্যুত্থান হল স্পার্টাকুস আন্দোলন (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪—৭১)। এই অভ্যুত্থানে ১ লক্ষ দাস অংশ গ্রহণ করেছিল। দাস ও গরিব মানুষদের বিপ্লবী আন্দোলনগুলি দাস-মালিকানা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলে, কিন্তু এমন কোনও বিজয়ী বিপ্লবে পরিণত হয় না যা এই ব্যবস্থাটিকে হটিয়ে দিতে পারে ও অপর কোন উচ্চতর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের জন্য অতীত কালের সমাজে পূর্বশর্তগুলি বর্তমান থাকলেও বিপ্লব সম্পাদন করার মত বিপ্লবী শ্রেণী না থাকায় ঐ সমাজ এগোতে পারেনি।

এই কারণেই কয়েকটি রাষ্ট্রে দাস-মালিকানা ব্যবস্থায় সংকটের দরুন সাধারণত তারা আরও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের দখলে চলে যায়, যে রাষ্ট্রগুলি আবার পরবর্তীকালে সংকটের মধ্যে পড়ে। এই রাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তম রোম সাম্রাজ্য দাসদের ও কৃষকদের বিদ্রোহের দরুন আভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চারপাশের বর্বর 'ট্রাইব'দের আক্রমণে ধসে পড়ে।

এই সব আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও দাস-মালিকানা ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের মধ্যে এই সাধারণ প্রতিজ্ঞাটির সমর্থন মেলে যে একটি সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনের বদলে অপর একটি সামাজিক

অর্থনৈতিক গঠন প্রতিষ্ঠা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয় না; বরং প্রয়োজন হয় সেকেলে ব্যবস্থাটির সমূল ধ্বংসসাধন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে দাস-মালিকানা সমাজের নীচুতলার লোকদের ভিতর থেকে সাহায্য পেয়ে বর্বর ট্রাইবগুলি সেকেলে ব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসেও দেখা যায় এমন অনেকগুলি বিপ্লব ঘটেছে যা বিজয়ী সমাজ-বিপ্লবে পরিণত হয়নি। সামন্ততন্ত্রের উদয়ের সময়-কার প্রায় সব কৃষক-যুদ্ধ ও বিদ্রোহগুলির ওই হালই হয়েছিল। ওয়াট টাইলরের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের কৃষক বিদ্রোহ (১৩৫৮), ফ্রান্সে "জ্যাকুইরি" নামে খ্যাত কৃষক আন্দোলন (১৩৫৮) এবং ইতালিতে দোলসিনো অভ্যুত্থান (১৩০৪-০৭) এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

দাসদের আন্দোলনের তুলনায় কৃষক আন্দোলনগুলি বিকাশের উচ্চতর স্তরে উঠেছিল, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা ও সংগঠনের অভাবই ছিল এগুলিরও দুর্বলতা। সামন্ততন্ত্রের বদলে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় তখনও পরিণত হয়ে ওঠেনি। কৃষকদের নেতৃত্ব করার মত কোনও শ্রেণী ছিল না। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা চূড়ান্ত বিদ্রোহগুলিতে শুধু নিপীড়িত কৃষকরাই শামিল হয়নি, সেই সঙ্গে শহরাঞ্চলের নীচুতলার লোকেরা, শিক্ষানবিশেরা ও গরিবরাও শামিল হয়েছিল। কিন্তু শহরের গরিবেরা কৃষকদের নেতা হবার পক্ষে ছিল দুর্বল, অসংগঠিত ও অজ্ঞ।

সমাজ বিপ্লবের জন্য যে শ্রেণীর প্রয়োজন তাদের আবির্ভাব ঘটল কেবল তখনই যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি আকার নিতে শুরু করল। উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের পথে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিবন্ধক হয়ে উঠল এবং এই ব্যবস্থা এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়ল। এই পর্যায়েই (সময়ানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে) বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলি পরিণত হতে শুরু করল।

সামন্ততন্ত্রের সংকট ও ধনতন্ত্রের বিকাশ শুরু হওয়ার যুগের বিপ্লবগুলি শহরাঞ্চলের বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ঘটেছিল। সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের সঙ্গে আপস করে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়, আর অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের জন্য সংগ্রাম চলে। শহরের গরিব মানুষদের সঙ্গে একত্রে কৃষকেরা ছিল এই সব বিপ্লবের সংগ্রামী শক্তি।

সুতরাং এই ধরনের বিপ্লবগুলি বিকাশের শিখরে ওঠার পর বুর্জোয়াদের দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যসীমা ছাড়িয়ে আরও অগ্রসর হয়।

বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল যে এই বিপ্লবগুলির অপেক্ষাকৃত দ্রুত তালে এগোয়। এগুলির মূল্য লক্ষ্য হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে ইতিমধ্যেই অঙ্কুরিত অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক সৌধ প্রতিষ্ঠা এবং ধনতন্ত্রের অব্যাহত বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা। এই কারণেই বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্যেই সাধারণত এই বিপ্লবগুলির পরিসমাপ্তি ঘটে।

অসম ঐতিহাসিক বিকাশের দরুন বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ঘটে। এর ফলে বুর্জোয়াদের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, কখনও বিপ্লবী হতে পারে, কখনও আবার প্রতি-বিপ্লবীও হতে পারে, বুর্জোয়ারা সাধারণত বিপ্লবী জনগণকে ভয় করে এবং এই ভয়ের দরুনই তারা সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম এড়িয়ে যেতে চায়। পরবর্তীকালের বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির সময়ে যখন বিপ্লবী সর্বহারাদের আবির্ভাব ঘটল এবং তারা তাদের নিজস্ব দাবি উপস্থিত করতে লাগল তখন বুর্জোয়াদের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই সব পরিস্থিতিতে সর্বহারাদের বিপ্লবী চেতনার ভয়ে বুর্জোয়ারা ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ করতে পারে না; তাদের ভয় থাকে যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির উপর জনসাধারণের ব্যাপক আক্রমণ ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির উপর আক্রমণের গৌরচন্দ্রিকা হয়ে উঠতে পারে।

ঐতিহাসিক বিকাশের অসমতার আরও একটি ফল দেখা যায়। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যেখানে বুর্জোয়ারা প্রতিবিপ্লবী শক্তি হয়ে ওঠে, তাদের বাইরে অনেক অনুন্নত দেশ আছে যেখানকার বুর্জোয়ারা তাদের দ্বিধা ও অসংগতি সত্ত্বেও তখনও সাম্রাজ্যবাদ ও দেশের অভ্যন্তরের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত বিপ্লবী শক্তি হিসাবে কাজ করলেও করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটায় এবং এই বিপ্লব মৌলিকভাবে এক নতুন ধরনের বিপ্লব। এর উদ্দেশ্য এক ধরনের

শোষণ ব্যবস্থা থেকে আর এক ধরনের শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নয়, শোষণ ব্যবস্থারই অবসান ঘটান এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজকে শ্রেণীহীন সমাজে রূপান্তরিত করার পথে নিয়ে যাওয়া।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলি পূর্ববর্তী অপর বিপ্লবগুলির তুলনায় অধিকতর জটিল ও সুগভীর। এই কারণেই আগেকার যে কোনও বিপ্লবের তুলনায় এই বিপ্লব অনেক বেশী সংখ্যক জনতাকে সক্রিয় করে। বিপ্লবের নেতা সর্বহারারা, শ্রমজীবী জনগণের বহুবিধ অংশ ও শোষিত জনসাধারণ হল এই বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তি। সর্বহারারা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কাজে নেতৃত্ব করে ব্যাপকতম জনসাধারণের সঙ্গে, বিশেষত শ্রমজীবী কৃষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীস্থাপন ক'রে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় বসায় এবং তাদের একনায়কত্ব (রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ) স্থাপন করে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ শুধু যে বুর্জোয়াদের সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয় তাই নয়, সেই সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণকে নিপীড়নের জন্য তৈরি সমগ্র পুরানো রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটিকেও ধ্বংস করে এবং তার জায়গায় মৌলিকভাবে ক্ষমতার নতুন এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেই সমাজতান্ত্রিক সব বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় না। এ শুধু বিপ্লবের শুরু। সমাজের এবং সমাজের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে মৌলিক রূপান্তর ঘটানর জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়। নতুন রাষ্ট্রক্ষমতা আগেকার বিপ্লবগুলির মত শুধু সেকেলে ব্যবস্থা ধ্বংসই করে না, সেই সঙ্গে একটি নতুন সমাজও নির্মাণ করে।

লেনিন লিখেছেন, "বুর্জোয়া-বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যগুলির অন্যতম হল, বুর্জোয়া-বিপ্লব, যা সামন্ততন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়, তার ক্ষেত্রে পুরানো ব্যবস্থার গর্ভে নতুন অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সব দিকগুলিকে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করা হয়। বুর্জোয়া-বিপ্লবের সামনে থাকে মাত্র একটি কর্তব্য—তা হল পূর্ববর্তী সামাজিক ব্যবস্থার সব শৃঙ্খল ভাঙা, সরিয়ে ফেলা ও ধ্বংস করা। এই কর্তব্য সম্পাদন ক'রে বুর্জোয়া-বিপ্লব তার কাছে যা কিছু চাহিদা তা পূরণ করে; ধনতন্ত্রের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

"সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একেবারেই ভিন্ন অবস্থানে থাকে……ধ্বংস করার কর্তব্যগুলির সঙ্গে নতুন অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন কর্তব্য, সাংগঠনিক কর্তব্য যুক্ত হয়।"(১)

সর্বহারারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণ শুরু হয়। উপরন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যদি এমন সব দেশে বিজয়লাভ করে যারা পুরানো ব্যবস্থার পশ্চাদপদতার উত্তরাধিকারী হয়েছে (বর্তমানে যে সব দেশ বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন করেছে তার বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই যেমন ঘটেছে), তাহলে সেই সব দেশে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্তব্যগুলি মোকাবেলা করার সঙ্গে আর একটি কর্তব্য যুক্ত হয়—তা হল বৃহদাকার শিল্প সৃষ্টি করা এবং তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা : বৃহদাকার শিল্পই সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি।

অর্থনীতির রূপান্তর ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টির ও নিজস্ব বুদ্ধিজীবী গঠনের জরুরী কর্তব্যের সম্মুখীন হয়। যে সব দেশ পুরানো ব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা পেয়েছে সে সব দেশের একই সংগে জনগণের সাধারণ সাংস্কৃতিক স্তর উন্নয়নের কর্তব্যও সম্পাদন করতে হয় (নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাধারণ শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি)।

কয়েক সপ্তাহে বা কয়েক মাসে অথবা হয়ত কয়েক বছরে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব হতে পারে, কিন্তু অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সময় (সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯১৭ সালে বিপ্লব বিজয়ী হবার পর প্রায় দুই দশক লেগেছিল)। সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই বিপ্লবের কাজ নয় বুর্জোয়া সমাজসহ সমগ্র মানবজাতি কর্তৃক সৃষ্ট মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদগুলি ফেলে দেওয়া, বরং তার কাজ হল সেগুলি আয়ত্ত করা। অতীতের সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ সেগুলির গুণাগুণ উপলব্ধি করে সর্বহারারা তার ভিত্তিতে তাদের নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করে এবং নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষিত করে তোলে।

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২৭, পৃষ্ঠা ৮৯।

অতীতের বেশির ভাগ বিপ্লবই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের বিষয়গত আধেয় এবং বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ীগত আকাঙ্ক্ষা ও মোহের মধ্যে বিরোধে ভুগেছে।

বৈজ্ঞানিক মতাদর্শে ও বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অনুশীলনে বলীয়ান ও বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে ক্রিয়াশীল মার্কসবাদী পার্টির কল্যাণে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির তুলনায় চূড়ান্ত কর্তব্য সম্পর্কে অনেক বেশি সংযত ও বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে। কিন্তু যে জনগণ মোহ ও কাল্পনিক ধারণা থেকে মুক্ত নয়, তারাও এই বিপ্লবেরই অংশ। বর্তমানকালে বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিপুল প্রসারের মধ্যে বহু পশ্চাদপদ দেশ বিজড়িত হচ্ছে ও অ-ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের পথ ধরেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে পেতি-বুর্জোয়া ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক কৃষকেরা সমাজতন্ত্রের পতাকা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ও সমাজতন্ত্র অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের এক ধরনের ধারণা যা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র থেকে অনেক দূরে এবং প্রায়শই নৈরাজ্যবাদী, "অতি-বাম" ও অতি-বিপ্লবী মনোভাবে পূর্ণ। এ সবই বিপ্লবের বিকাশে দারুণ বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে। সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মার্কসবাদী পার্টির পক্ষ থেকে অবিরত মতাদর্শ-গত সংগ্রাম ও ক্রমাগত বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা সম্ভব।

৩. *বিপ্লবের বিষয়গত পরিস্থিতি ও বিষয়গত উপাদান*

বিপ্লব তখনই কেবল সফল হতে পারে যখন বিষয়গত পরিস্থিতির পরিপক্কতার সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংগ্রামরত প্রগতিশীল শক্তি ও শ্রেণীগুলির সোৎসাহ কার্যকলাপ একত্রে মেশে।

বিপ্লবের জন্য বিষয়গত পরিস্থিতির অস্তিত্বের অর্থ হল যে বিপ্লব কয়েকটি বিধান অনুযায়ী অগ্রসর হবে। সামাজিক বিপ্লব "হুকুম মাফিক" হয় না। কোনও বিপ্লবী পার্টি বা গ্রুপ তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিপ্লব ডেকে আনতে পারে না। একমাত্র র‍্যাডিকপন্থীরা, নৈরাজ্যবাদীরা ও অপরাপর

অতি-"বামেরা" কল্পনা করে যে বিপ্লব যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে করা যেতে পারে।

বিপ্লবের জন্য বিষয়গত পরিস্থিতি সমূহের অন্যতম হল পুরানো ব্যবস্থায় সংকট, ব্যবস্থাটির মধ্যেকার সর্বপ্রকার বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি। বিপ্লবের বিষয়গত পূর্বশর্তগুলি শুধু অর্থনৈতিক নয়। পূর্বশর্তগুলির মধ্যে পড়ে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সর্বোপরি শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি, শ্রেণীশক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক। বিপ্লবের বিষয়গত পূর্বশর্তগুলি নিছকই অর্থনৈতিক এই ধারণা ইতর অর্থনীতিবাদে নিয়ে ফেলে। 'বাম'দের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মতই এই সুবিধাবাদী নিষ্ক্রিয়তাও ভুল, এ থেকে এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে বিপ্লবী পরিস্থিতির পরিপক্কতা উৎপাদিকা শক্তি-গুলির বিকাশের মাত্রা দ্বারা আপনা থেকেই নির্ধারিত হয়।

বিপ্লব তখনই সম্ভব হয় এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে যখন শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধ অত্যন্ত তীব্র হয়। কাজেই উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যেকার বিরোধের দরুন বিপ্লব আপনা থেকেই উদ্ভূত হয় না। প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই বিরোধ বহুদিন ধরে বিদ্যমান, কিন্তু তা থেকে একথা বলা যায় না যে বিপ্লবের জন্য বিষয়গত পরিস্থিতি ঐ সব দেশে রয়েছে। বিপ্লব সম্ভব করতে হলে বিপ্লবী পরিস্থিতি থাকতেই হবে এবং এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী।

বিপ্লবী পরিস্থিতি বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই পরিস্থিতির লক্ষণগুলি ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ধরে নিতে হবে যে পুরানো ব্যবস্থায় গভীর সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। লেনিন এই লক্ষণগুলির নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন: (১) "উচ্চতর শ্রেণীগুলির" মধ্যে সংকট, যখন কোনও রকম পরিবর্তন না করে শাসক শ্রেণীগুলির পক্ষে তাদের শাসন বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন শাসক শ্রেণীগুলির নীতিতে সংকট; (২) নিপীড়িত শ্রেণীর দুঃখকষ্ট ও অভাব সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক তীব্র আকার ধারণ করেছে; (৩) উপরোক্ত কারণগুলির ফলে যে জনগণ "শান্তির সময়" বিনা অনুযোগে নিজেদের লুণ্ঠিত হতে দেয়, কিন্তু ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ে সমস্ত পরিস্থিতির

দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনে লিপ্ত হয় তাদের কাজ-কর্মে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা বৃদ্ধি।(১)

যদিও বিপ্লবী পরিস্থিতির লক্ষণগুলি জনগণের বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে (যথা তাদের প্রবর্ধিত ক্রিয়াকলাপ) কিন্তু বিপ্লবী পরিস্থিতি হল বিপ্লবের বিষয়গত শর্ত। এই কারণেই বিপ্লব হওয়াটা কোনও গ্রুপ বা পার্টি অথবা এমনকি সমগ্র শ্রেণীগুলির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সর্বহারাদের পার্টির সংগ্রাম যদিও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির কৌশলে চলার সুযোগ সীমিত করে দেয় তা সত্ত্বেও তাদের পার্টি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পুরানো ক্ষমতায় সংকট সৃষ্টি করতে পারে না। পার্টির কাজ-কর্ম নিঃসন্দেহে জনগণের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করতে বিরাট ভূমিকা নেয় এবং পুরানো ব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্টি ইচ্ছামত জনগণের ক্রিয়াকলাপে সেই উল্লম্ফনের মত বৃদ্ধি আনতে পারে না যা বিপ্লবী পরিস্থিতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং যা রাজনৈতিক সংকটের সমগ্র আবহাওয়ার মধ্যে সৃষ্টি হয়।

"বাম" মতের কিছু প্রবক্তারা বলে থাকে যে বিপ্লবীদের কেবল ছোট ছোট দলের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে (যথা—কোনও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে) গেরিলা যুদ্ধ ঘোষণা করে বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু গেরিলা বাহিনীগুলি যতই সাহসী ও আত্মত্যাগী হোক না কেন, তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তারা ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন পাবে কিনা তার উপর। বিপ্লবীদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম বিপ্লবী পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে ওঠাকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা তখনই কেবল যোগাতে পারে যদি "দাহ্য পদার্থ" যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয়ে থাকে এবং যদি তদনুযায়ী বিষয়গত পরিস্থিতি বর্তমান থেকে থাকে।

বিপ্লবী পরিস্থিতি বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে : অর্থনীতিতে ভয়ংকর ধাক্কা, সরকারী নীতিতে ব্যর্থতা (যথা—হঠকারী সামরিক অভিযানের বিপর্যয়), জাতীয় বা বর্ণগত সংঘাতের দরুন সামাজিক বিরোধগুলির দারুণ তীব্রতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহের দরুনও বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে (উদাহরণস্বরূপ রাশিয়াতে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের

১। ভি আই লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস ভল্যুম ২১ পৃষ্ঠা ২১৩-১৪।

বিপ্লব), যদিও যুদ্ধ কোনও মতেই বিপ্লবী পরিস্থিতির জন্য অপরিহার্য শর্ত নয়।(১)

বিপ্লবী পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় বর্তমান যুগে বহু নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের পক্ষে শক্তির ভারসাম্যে সাধারণ পরিবর্তন, বিশ্ব-ধনতন্ত্র দুর্বলতর হওয়া এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া এই প্রক্রিয়াকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করছে। একদিকে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিষয়গতভাবে ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়াচ্ছে ও বিপ্লবী পরিস্থিতির বিকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করছে এবং অপরদিকে এই ব্যবস্থা উদাহরণ সৃষ্টি করে বিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদানের বিকাশকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও প্রত্যেকটি দেশের পরিস্থিতি পরিপক্ব হয়ে ওঠা সে দেশের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-বিরোধ ও বাহির্বিষয়ক বিরোধ দ্বারাই মূলত নির্ধারিত হয়।

কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমজীবী জনগণ সংগ্রাম করে কয়েকটি সামাজিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছে, যা তাদের অধিকার বাড়িয়েছে এবং তাদের বৈষয়িক অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটিয়েছে (শ্রম-ঘণ্টা হ্রাস, মজুরি বৃদ্ধি,সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি)। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের উদাহরণ বুর্জোয়াদের বাধ্য করে শ্রমজীবী জনগণকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে, যদিও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লবের ফলাফলগুলির ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন তাদের চাল খেলার আরও বেশি সুযোগ দেয়।

এ থেকে কি এই অর্থ দাঁড়ায় না যে বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিরোধগুলির যে তীব্রতা বৃদ্ধি বিপ্লবী পরিস্থিতির জন্ম দেয় তার ভিত্তি চলে যাচ্ছে?

না, তা ঠিক নয়। বর্তমানকালের সংস্কারবাদী ও শোধনবাদীরা যদি এই

১। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদিও অতীতে কয়েকটি যুদ্ধ বিপ্লব ও নতুন সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ ত্বরান্বিত করেছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে যখন অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংসাত্মক শক্তি ভয়ংকর প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। যদিও আর একটি যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল হবে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস, কিন্তু তাপপারমাণবিক যুদ্ধে ফল দাঁড়াবে জাতিকে জাতির সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং এমন ক্ষয়ক্ষতি যা মানব জাতিকে তার বিকাশের পথে অনেক পিছিয়ে দেবে।

সিদ্ধান্তই করে থাকেন, তবে তা ভুল। মার্কসবাদীরা অবশ্যই স্বীকার করে যে "গভীর অর্থনৈতিক চাহিদা" দিয়ে অনুপ্রাণিত জনগণই কেবল বিপ্লব করতে পারে"।(১) কিন্তু শোষকরা নিপীড়িত জনগণের দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টকে সম্পূর্ণ ভিখারির পর্যায়ে নামিয়ে আনে না। তারা জানে যে শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রাম করে সম্পূর্ণ ভিখারিতে পর্যবসিত হওয়ার ঝোঁককে সফলভাবেই প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও আপেক্ষিক দারিদ্র্য থাকে। লেনিন বলেছেন "...দারিদ্র্য দৈহিক অর্থে নয়, সামাজিক অর্থে অর্থাৎ বুর্জোয়াদের ভোগের স্তরের সংগে সমগ্র সমাজের ভোগের স্তরের এবং শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মানের স্তরের ক্রমবর্ধমান পার্থক্যের অর্থে বাড়তে থাকে"।(২) পরিশেষে, দারিদ্য শুধু সামাজিক অর্থে নয়, প্রত্যক্ষ দৈহিক অর্থেও অনেকগুলি দেশে (বিশেষত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত) ও বিভিন্ন জেলায় এবং শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বজায় রয়েছে (এমনকি সবচাইতে উন্নত দেশেও)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ এবং নিগ্রো পরিবারগুলির প্রায় অর্ধেকই হল গরিব পরিবার।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব উৎপাদন সম্ভাবনার বৃদ্ধি ঘটালেও তা শ্রমজীবী জনগণের জীবনে আরও নতুন দুঃখকষ্ট নিয়ে আসে। স্বয়ংক্রিয়করণ বেকার বাড়ায় এবং শ্রমিকদের অবস্থানকে স্থিতিহীন করে তোলে ; কর্মরতদের উপর শোষণের তীব্রতা বাড়ায়। এসবের ফলেই সেই জিনিসের উদ্ভব হয় যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংগ্রামের অত্যন্ত দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ বলে অভিহিত করেছে।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি উৎপাদন বৃদ্ধির হার বজায় রাখতে পারে এবং এমনকি অর্থনীতির সামরিকীকরণ ক'রে সংকটের কিছু কিছু ঘটনাকে এড়াতে পারে। আধুনিক ধনতন্ত্রের এ একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার লেখক আপটন সিনক্লেয়ার লিখেছেন : "বিগত দেড়শ বছর যাবৎ আমাদের (আমেরিকার—সম্পাদক) ইতিহাসের মূল ঘটনা হল সমৃদ্ধি

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যুম ১১, পৃষ্ঠা ৪২৩।

২। ভি. আই. লেনিন, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৪, পৃষ্ঠা ২০১।

ও মন্দার চক্র……দেড়শ বছরের এই সমৃদ্ধি ও মন্দার মধ্যে আমাদের মুনাফা ব্যবস্থাটিকে থাকার একমাত্র কারণ হল যুদ্ধ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি…কোনও ব্যবসায়ী কি একথা ভেবে দেখেছেন যে আমাদের যদি প্রকৃত শান্তি স্থাপন করতে হয় এবং ওই সব ব্যয় বন্ধ করতে হয় তবে কি হবে? যে কোনও লোককে প্রশ্ন করুন, দেখবেন সে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমাদের অর্থনীতি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে।"(১) কিন্তু ধনতন্ত্রের "পরিত্রাণের" এই পদ্ধতি তার জনবিরোধী চরিত্রকেই শুধু প্রকাশ করে। ধনতন্ত্র তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিরোধগুলি থেকে নিজে নিজে মুক্ত হতে পারে না এবং ওই বিরোধগুলি এড়ানর জন্য ধনতন্ত্র যে কোনও উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন, তা শেষ পর্যন্ত বিরোধগুলিকে বাড়িয়েই তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে বলা হয়েছে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা ধনতন্ত্রকে একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সুস্থিত করে তোলে না। সেইজন্যই বর্তমান সময়ের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও বিপ্লবী পরিস্থিতির বিকাশের ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায় না।

সমাজ বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী পরিস্থিতি অপরিহার্য, কিন্তু তাই-ই যথেষ্ট নয়।

বিপ্লব হওয়ার জন্য, বিশেষত বিপ্লবের বিজয়ের জন্য শুধু বিষয়গত পরিস্থিতি থাকলেই হবে না। লেনিন বলেছেন, রাশিয়াতে ১৮৫৯-৬১ এবং ১৮৭৯-৮০ সালে বিপ্লবী পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু বিপ্লব হয় নি। ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে বিপ্লবী পরিস্থিতি হয়েছিল, কিন্তু যে বিপ্লব হল তার পরাজয় ঘটেছিল।

বিপ্লবের পরাজয়ের নানারকম কারণ আছে—এর মধ্যে একটি হল শ্রেণী শক্তিগুলির প্রতিকুল ভারসাম্য। কিন্তু এই ভারসাম্য বিপ্লবের অনুকুলে থাকলেও যথেষ্ট পরিপক্ব বিষয়ীগত উপাদান না থাকলে বিপ্লব বিজয়ী হবে না। বিপ্লব বিজয়ী হতে হলে বিপ্লবী শ্রেণীকে যথেষ্ট শক্তিশালী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী সংগ্রাম করার জন্য সক্ষম হতে হবে, কারণ সেকেলে শ্রেণী-গুলির ক্ষমতা কখনই আপনা থেকে ধসে পড়বে না।

১। "রিফ্লেকশনস বাই আপটন সিনক্লেয়ার সোশ্যালিস্ট ডাইজেস্ট, লন্ডন জুন ১৯৫৮ পৃষ্ঠা ২৬।

বিষয়ীগত উপাদানগুলির অন্তর্ভুক্ত হল নিম্নোক্ত বিষয়গুলি :

(১) জনগণের বিপ্লবী চেতনা, সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও দৃঢ়তা ; (২) জনগণ ও তাদের অগ্রগামী বাহিনীর সংগঠন, যার দরুন বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে সক্ষম সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয় এবং বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলে পরিণত হয়ে না পড়ে একত্রে লড়াই করা সম্ভব হয় ; (৩) এমন একটি পার্টি কর্তৃক জনগণের নেতৃত্ব যে-পার্টি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও সংগ্রামে শিক্ষিত এবং সংগ্রামের নির্ভুল রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয়ে ও তাকে বাস্তবে কাজে পরিণত করতে সক্ষম।

অতএব সমাজ বিপ্লবের জন্য বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তাদির ঐক্য প্রয়োজন। লেনিন বলেছেন, সমাজ বিপ্লবের এই বিধান সকল বিপ্লব, বিশেষত বিংশ শতাব্দীর তিনটি রুশ বিপ্লব দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পরাজয়ের প্রধান কারণ সম্পর্কে কমিণ্টার্নের মূল্যায়ণ হল যে ঐসব দেশে যারা যুদ্ধের জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে অভ্যুত্থানে পরিণত করতে সক্ষম গণ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। এই জন্যই কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের পঞ্চম কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে ধনতন্ত্রের সংকট গভীরতর হওয়ার পরিস্থিতির মধ্যে "বিষয়ীগত উপাদান" অর্থাৎ সর্বহারা বাহিনীর ও তাদের কমিউনিস্ট অগ্রগামী বাহিনীর (পার্টিগুলির) সংগঠনের মাত্রা সমগ্র ঐতিহাসিক যুগটির কেন্দ্রীয় প্রশ্ন।(১)

যদিও বিষয়গত পরিস্থিতি ইতিহাসে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে, তবু কোনও কোনও অবস্থায় বিষয়ীগত উপাদান বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। যখনই ও যেখানেই বিপ্লবের বিষয়গত পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিপক্ব হয়ে ওঠে তখনই বিষয়ীগত উপাদান এই ভূমিকা গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গত পরিস্থিতি পরিপক্ব না হয়ে উঠলে প্রগতিশীল শক্তিগুলির তরফ থেকে কোনও প্রচেষ্টাই সমাজের রূপান্তর ঘটাতে পারে না। কিন্তু বিষয়গত পরিস্থিতি যদি থাকে তাহলে সমাজ রূপান্তরের ফলাফল বিষয়ীগত উপাদানের উপর নির্ভর করে।

১। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল ইন ডকুমেণ্টস ১৯১৯-৩২ মস্কো, ১৯৩৩ পৃষ্ঠা ৪০০। (রুশ ভাষায়)

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধীরা কখনও কখনও বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গিকে লেনিনের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। উদাহরণ স্বরূপ, তারা অভিযোগ করে যে মার্কস অর্থনৈতিক বিবর্তনের উপর জোর দিয়েছিলেন, আর লেনিন সংকল্প, চেতনা ও বিপ্লবী সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছেন। বাস্তবে অবশ্য মার্কস ও লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। তাঁরা উভয়েই নীতিগতভাবে বিষয়গত পরিস্থিতি ও বিষয়ীগত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটি সম্বন্ধে একই সমাধান দিয়েছেন। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাত কেবল ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জন্যই।

মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলি পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। প্যারি কমিউনের পরাজয় সেই তথ্যেরই সাক্ষী।(১)

সাম্রাজ্যবাদের স্তরে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পরিপক্ব হয়ে উঠেছে এবং এই বিপ্লব এখন বাস্তবে অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। তাই বিষয়ীগত উপাদানটির ভূমিকা বেড়েছে। এর কারণ হল—প্রথমত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বিষয়গত পরিস্থিতি অধিকতর মাত্রায় পরিপক্ব হয়ে ওঠা এবং দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়াদের সেই রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সৌধ, যার সাহায্যে তারা সাম্রাজ্যবাদের সব বিরোধগুলি তীব্রতর হওয়ার অবস্থার মধ্যে তাদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তার সক্রিয়তা।

নতুন এক ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার সংগ্রামে বিষয়ীগত উপাদানের একটি বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই বিষয়ীগত উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল সর্বহারার একনায়কত্বের তত্ত্ব শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি এই পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের মিত্রদের সংগঠনের তাৎপর্য।

সমসাময়িক কয়েকজন বুর্জোয়া মতাদর্শবিদের আধুনিক যুগে বিষয়ীগত

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৭, পৃষ্ঠা ১৪০-৪১।

উপাদানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার স্বীকৃতির ভিতর দিয়ে বিষয়ীবাদের ন্যায্যতা প্রমাণ হল বলে মনে করে। কিন্তু লেনিনবাদ বিষয়ীগত উপাদানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে স্বীকার ক'রে বিপ্লবের জন্য বিষয়গত শর্তাদির পরিপক্ক হয়ে ওঠার সঙ্গে যুক্ত করে। উপরন্তু লেনিনবাদ এই ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে মার্কসবাদী পার্টির নেতৃত্বে সক্রিয় বিপ্লবী সংগ্রামে জনগণকে টানা ও সংগঠিত করার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে। "বাম" হঠকারীরা অবশ্য বিষয়ীগত উপাদানকেই নিয়ামক ভূমিকা দেয় এবং প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা না করেই বিপ্লবের জন্য আহ্বান জানায়। উপরন্তু তারা বিষয়ীগত উপাদানকে একদল ষড়যন্ত্রকারী বিপ্লবী সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্তরে নামিয়ে আনে এবং তাদের বিবেচনায় এরা ইচ্ছামত যে কোনও সময়ে বিপ্লব করার ক্ষমতা রাখে। বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য বিষয়গত পরিস্থিতি সাধারণভাবে পরিপক্ব হয়ে উঠেছে বললে একথা কোনও মতেই বোঝায় না যে সর্বদাই এমন বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে যা যে কোনও দেশে যে কোনও সময়ে কাজে লাগান যায়। সমাজ-বিপ্লবের মূল বিধানকে উপেক্ষা করা যায় না, এই বিধান সমাজ বিপ্লবের জন্য বিষয়গত পরিস্থিতি ও বিষয়ীগত উপাদানের ঐক্য দাবি করে।

৪. সমসাময়িক বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার চরিত্র

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে এর বিধি-শাসিত ঝোঁক হল একটি বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ায় পরিণত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যটি একে পূর্বেকার যে কোনও বিপ্লব থেকে তফাত করে।

অতীতেও যখন ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে পরিণত হল অর্থাৎ বিভিন্ন জাতীর মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হল তখনও এমন সব বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল যেগুলি বিশ্ব তাৎপর্য অর্জন করেছিল এবং অপরাপর বহু দেশের উপর বিপ্লবী প্রভাব ফেলেছিল। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রতিনিধি স্থানীয় ছিল ফ্রান্সের ১৭৮৯-৯৪ সালের বিপ্লব। এই বিপ্লব ইউরোপ ও আমেরিকার অপরাপর দেশকেও প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পতন সম্ভাবনাময় যুগেই কেবল অগ্রগতির হার ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের বিপ্লবগুলি একটি একক বিপ্লবে ও প্রকৃত বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় মিশে

গিয়েছে, আর এই প্রক্রিয়া বুর্জোয়া ভিত্তিতে নয় সর্বহারার ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ অসমভাবে এগিয়ে চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেখানে একথা ভাবা যেত যে সকল প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশে (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদিতে) একই সময়ে অথবা প্রায় একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটবে, সেখানে বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে বিপ্লব পরিপক্ব হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসমতা দেখা গিয়েছে। অত্যন্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কয়েকটিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিগুলির পরিপক্ব হয়ে ওঠার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে, কারণ বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করতে ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অভিজাতশ্রেণী ও আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। আর অপেক্ষাকৃত কম উন্নত কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের অপরাপর অংশের মানুষেরা দ্বিগুণ বা ত্রিগুন নিপীড়নে উৎপীড়িত হচ্ছে। এইসব দেশে শ্রেণী-সংঘাত ও শ্রেণীসংগ্রাম আরও তীব্র রূপ ধারণ করছে এবং তার ফলে এইসব দেশ বিপ্লবের জন্য রাজনৈতিকভাবে অধিকতর পরিপক্ব। এর দরুন সাম্রাজ্যবাদের শিকলে দুর্বল গ্রন্থি গঠিত হয় এবং এই গ্রন্থি অন্যগুলির তুলনায় আগে ভাঙা যায়। কোন্ কোন্ দেশে এই ধরণের দুর্বল গ্রন্থিতে পরিণত হবে তা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক উভয় উপাদানগুলির উপর (এইসব দেশে বুর্জোয়াদের অবস্থানের দুর্বলতা, শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের শক্তি ইত্যাদি)।

১৯১৫ সালেই লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথমে কয়েকটি দেশে অথবা এমনকি কোনও একটি পৃথক দেশেও জয়লাভ করতে পারে এবং সব ধনতান্ত্রিক দেশে একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভ অসম্ভব। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের দুর্গগুলি দুর্বল হয়ে পড়ার দরুনই বিপ্লবী শক্তিগুলির পক্ষে প্রথমে রাশিয়ায় এবং পরে ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি দেশে সাম্রাজ্যবাদের ফ্রন্ট ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়েছিল।

এই তথ্য ধরেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধীরা দাবি করে যে মার্কস-এর

কথা অনুযায়ী যেসব দেশে বিপ্লব হওয়া "উচিত" ছিল সেই সব দেশে বিপ্লব হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে মার্কস বা তাঁর অনুগামীরা একথা বিশ্বাস করতেন না যে বিভিন্ন দেশে কি পরম্পরায় বিপ্লব হবে তা সর্বকালের 'জন্য বলে দেওয়া যায়। প্রাক-একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমলে মার্কস আশা করেছিলেন যে সর্বাপেক্ষা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লব ঘটবে, কারণ ঐ সব দেশে বিপ্লবের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সবচাইতে বেশি পরিপক্ব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে তখনকার অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ জার্মানিতে যদি সর্বহারারা "কৃষক-যুদ্ধের একটি দ্বিতীয় সংস্করণের" সমর্থন পায় তবে সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদের আমলে যখন ধনতন্ত্রের বিশ্ব-ব্যবস্থাটি সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পরিপক্ব হয়ে উঠেছে, তখন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে সর্বহারাদের বিজয়লাভের সম্ভাবনা প্রসারিত হয়েছে।

রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মতান্ধদের এই উক্তি অসার প্রমাণিত করে দিয়েছে যে কেবলমাত্র উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেই বিপ্লব সম্ভব, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা থেকে "বামেরা" এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে পশ্চাদপদতা বিপ্লবের একটি পরিচালিকা শক্তি। যখন বুখারিন তাঁর ইকনমিকস অব দা ট্রানজিশন্যাল পিরিয়ড নামক বইয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়া নিম্নতম জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি থেকে শুরু হয় এবং বিপ্লব আরম্ভ হবার গতি ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলির পরিপক্বতার সঙ্গে বিপরীত অনুপাতসম্পন্ন, তখন লেনিন ন্যায্যভাবেই এই মতের বিরোধিতা করেন। বুখারিনের বই থেকে উদ্ধৃত দিয়ে তিনি ওই অংশটুকুর নীচে দাগ দেন এবং মার্জিনে লেখেন যে, "নিম্নতম থেকে"-এর বদলে বলা উচিত "উচ্চতম থেকে নয়" এবং "বিপরীত অনুপাতসম্পন্ন"—এর বদলে "প্রত্যক্ষ অনুপাতসম্পন্ন নয়।"(১)

বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিপক্ব হয়ে ওঠার হার ও সেই সব দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ অনুপাত নেই। কোনও দেশে বিপ্লব আরম্ভ হবার গতি শুধু সেই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের

১. লেনিন মিসেলানী, একাদশ, মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯২৯, পৃষ্ঠা ৩৯৮। (রুশভাষায়)

স্তর দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, বরং তা শ্রেণীবিরোধগুলির তীব্রতা বৃদ্ধির মাত্রার উপরই মূলত নির্ভরশীল। অধিকন্তু যদি কোনও কারণে সর্বাপেক্ষা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিলম্বিত হয়, তা থেকে কোনও মতেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে বিপ্লবকে সর্বাগ্রে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশ থেকেই শুরু হতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তখনই কেবল সম্ভব যদি বিপ্লবের মূল পরিচালিকাশক্তি ও নেতা শ্রমিকশ্রেণী উপযুক্তভাবে গঠিত হয়ে থাকে ও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে থাকে। বেশির ভাগ পশ্চাদপদ দেশে এই শর্তটি বিদ্যমান নেই। রাশিয়ার ক্ষেত্রে লেনিন যথেষ্ট সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "ধনতন্ত্রের খানিকটা উচ্চ স্তর ছাড়া আমরা এ কাজ করে উঠতে পারতাম না।"(১)

রাশিয়া ছিল এমন একটি দেশ যেখানে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ছিল মাঝারি স্তরে। সেখানে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র ইতিমধ্যেই কিছু ভিত্তি গড়েছিল এবং বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালের মধ্যেই শ্রমিকদের ৬০ শতাংশ বড় বড় কারখানায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল এবং এই সব কারখানার শ্রমিকরা তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপ ও সংগঠনের জন্য বিখ্যাত ছিল। শেষত রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বহু মিত্র ছিল, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিল শহর ও গ্রামাঞ্চলের আধা-সর্বহারা জনগণ এবং পুঁজিপতি ও ভুস্বামী উভয়ের শোষণে নিপীড়িত শ্রমজীবী কৃষকেরা।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে লেনিন বলেছেন, বিষয়গত অবস্থা ও বিষয়ীগত পূর্বশর্তাদির এক সমগ্র পরম্পরা থাকার দরুন রাশিয়ার পক্ষে পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় বিপ্লব শুরু করা সহজতর ছিল। সেই সঙ্গে আবার তিনি প্রায়ই দেশের পশ্চাদপদতার দরুন যে একটি গুরুতর বিপদ উঁকি দিচ্ছে সে কথাও বলতেন। সে বিপদ হল পেতি-বুর্জোয়া প্রভাবের বিপদ এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্তব্যগুলির মোকাবেলায় গুরুতর বাধাবিঘ্নের বিপদ। "...একটা পশ্চাদপদ দেশ সহজে শুরু করতে পারে কারণ তার প্রতিপক্ষ বাজে হয়ে গিয়েছে; কারণ তার বুর্জোয়ারা সংগঠিত নয়, কিন্তু তাকে যদি চালিয়ে যেতে হয় তাহলে তার

১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৭

তরফ থেকে আরও হাজার গুণ বেশি পরিণামদর্শিতা, সাবধানতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন।"(১)

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্ব, অপরাপর দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সে দেশের সহায়তা দান এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল হয়ে পড়ায় পরবর্তীকালে সেইসব দেশে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে যেগুলিতে প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার তুলনায় অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর নিম্নমানে রয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে গণতান্ত্রিক সমস্যাবলীর সফল সমাধানের পর এই সব দেশের সমাজতন্ত্রের দিকে ক্রমশ যাওয়া খুবই সম্ভবপর হয়, যদি শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাগুলি আরও নববলে বলীয়ান হয় এবং অধিকতর উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা থাকে। অপরপক্ষে চীনের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে যদি নেতৃত্বের জাতিসর্বস্ব অবস্থানের দরুন প্রয়োজনীয় পরিণামদর্শিতা, সাবধানতা ও ধৈর্য না দেখান হয় তবে পশ্চাদগমনের আশঙ্কা থাকে। তখন পেতি-বুর্জোয়ারা প্রাধান্য বিস্তার করে, দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ও শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানগুলিকে দুর্বল করে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে গুরুতর বিপদ সৃষ্টি হয়।

সাম্রাজ্যবাদের ফ্রন্ট যখন একটি দেশে ভেঙে গিয়েছে ও বিশেষত যখন কয়েকটি দেশে ভেঙে গিয়েছে তখন অপরাপর দেশে মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপ্তির শর্তাদি যথেষ্ট বদলে যায়। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ আর তার হৃত ঐতিহাসিক উদ্যোগ ফিরে পেতে পারে না ও বিশ্ব-বিকাশের চাকাও উল্টো দিকে ঘোরাতে পারে না। মানবজাতির বিকাশের মূল লক্ষ্য বিশ্ব-সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও সকল বিপ্লবী শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়।"(২)

এই ঘটনা বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশের জন্য আরও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। এমনকি ছোট ছোট দেশ যাদের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের জন্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় সম্ভবপর হত না তাদের জন্যও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পক্ষে সুযোগ খুলে যায়।

বর্তমান যুগটি শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ নয়। গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্ত বিপ্লবও অনেকগুলি দেশে ঘটছে। অনুকূল অবস্থায় ওই বিপ্লবগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হতে পারে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, এমনকি প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী যুগেও আবিষ্কৃত হয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস এই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন যে যেসব দেশে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলির রূপায়ণ বিলম্বিত হয়েছে এবং ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকশিত হয়েছে সেখানে নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক থেকে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনে উত্তরণ সরাসরি হতে পারে। এই কারণেই ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মানিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন, যদিও পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থেকে দেখা গিয়েছে যে জার্মানির পশ্চাদ্‌পদতা ও সেখানকার বিপ্লবী শক্তিগুলির দুর্বলতার দরুন সেই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি।

গণতান্ত্রিক থেকে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনে সরাসরি উত্তরণ পূর্বে ব্যতিক্রম হিসাবেই বিবেচিত হত। যে সব দেশে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি এখনও অসমাপ্ত, সাম্রাজ্যবাদের যুগে সেখানে এই সরাসরি উত্তরণ সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে।

প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়ে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলির মধ্যেকার নতুন পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই বিপ্লবে বুর্জোয়ারা নয়, সর্বহারারাই নেতৃত্ব করেছিল। বিপ্লবের বিকাশের চালিকাশক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী। কিন্তু এই মৈত্রী সব সময়েই একই ধরনের থাকে না। বিপ্লব যে যে স্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয় সেই অনুযায়ী ঐ মৈত্রীর শ্রেণী আধেয় পরিবর্তিত হয়। লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষকদের সকল অংশই শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে গরিব কৃষকদের উপরই নির্ভর করতে হবে, আর শহর ও গ্রামের আধা-সর্বহারাদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে ধনতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। বিপ্লবের এই দুটি স্তরের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী শক্তি হল সর্বহারার নেতৃত্ব। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ রাজনৈতিক সৌধের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়; বিপ্লবের প্রথম স্তরে প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বে পরিণত হয়।

অতএব সর্বহারারা সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক উভয় বিপ্লবই বিচ্ছিন্নভাবে করে না, করে মিত্রদের সঙ্গে একত্রে। লেনিনের এই সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী নেতাদের ধারণা খণ্ডন করে। এই সুবিধাবাদীরা সর্বহারাদের একনায়কত্ব অস্বীকার করত এবং বলত যে কোনও মিত্র ছাড়াই সর্বহারাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে। এই নীতির ভিত্তিতে আর একটি মত ছিল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তখনই কেবল সম্ভব যখন সর্বহারারা জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে। লেনিন এই যুক্তিও খণ্ডন করেন। লেনিন দেখালেন যে, এমন কি যে সব দেশে সর্বহারারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেসব দেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব খুবই সম্ভব যদি শ্রমজীবী জনগণ ও শোষিত জনসাধারণ, শহর ও গ্রামাঞ্চলের আধা-সর্বহারা অংশ সর্বহারাদের মিত্র হয়। রাশিয়াতে এবং পরবর্তীকালে অপরাপর দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের মধ্যে লেনিনের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ইউরোপ ও এশিয়াতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগেও পরে যে সব বিপ্লব সংঘটিত হল, সেগুলি বহু দিক থেকে রাশিয়ার ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব থেকে পৃথক। এগুলিতে আবার গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরগুলি একই সঙ্গে ঘটার বর্তমান প্রবণতা প্রমাণিত হয়েছে। যে সব ইউরোপীয় দেশে এই বিপ্লব হয়েছে তার অধিকাংশই (জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও চেকোশ্লোভাকিয়া বাদে) ছিল কৃষিপ্রধান দেশ ও ধনতন্ত্রের বিকাশ ছিল মাঝারি স্তরে। অপর কয়েকটি দেশে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলির অবশেষ তখনও যথেষ্ট বজায় ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সব দেশই জাতীয় স্বাধীনতা হারায় এবং হয় ফ্যাশিস্টদের দখলে আসে (চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি) অথবা তাদের মোসাহেবে পরিণত হয়। এই সব দেশের শাসক শ্রেণীগুলির উপরের স্তরের লোকেরা (ভূস্বামী ও বড় বড় বুর্জোয়ারা) জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাশিবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নেয়। এই কারণেই দখলকারী ফ্যাশিস্ত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি

সংগ্রাম আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফ্যাশিবাদের পরাজয় ও এই সব দেশের মুক্তির ফলে ফ্যাশিবাদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ক্ষমতাচ্যুত হল, আর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের বিপ্লবী ফ্রন্ট জনগণতান্ত্রিক রূপের সরকার গঠন করল।

জনগণতন্ত্র সৃষ্টির সংগ্রাম সাধারণ গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফ্যাশি-বিরোধী সমস্যাবলীর (জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, ইত্যাদি) সমাধানের প্রচেষ্টায় বহু সমাজের ব্যাপক অংশকে একত্রিত করেছিল। বেশির ভাগ দেশকেই আবার সমাজতন্ত্র-বিরোধী সমস্যাবলীরও সমাধান করতে হয়েছিল, এবং সেগুলির তাৎপর্যও যথেষ্ট ছিল। জনগণতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক সংস্কার ছাড়াও অনেকগুলি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর (উদাহরণ স্বরূপ, বৃহদাকার শিল্প, ব্যাঙ্ক, পরিবহন ইত্যাদির আংশিক জাতীয়করণ) সঙ্গে সঙ্গেই করে ফেলে। তবে বিপ্লব আরও অগ্রসর হওয়ার পরই কেবল পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি পুরোভাগে আসে।

কিছু কিছু গণতান্ত্রিক আন্দোলন সরাসরি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত হয় না। তাসত্ত্বেও ঐ আন্দোলনগুলি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাধারণ প্রবাহের মধ্যে মিশে যায় এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে। তা কি ভাবে ঘটে?

মুমূর্ষু ধনতন্ত্র গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বৈরী মনোভাব দেখানর দরুনই তা প্রধানত ঘটে থাকে। গণতন্ত্রের লাভগুলি রক্ষায় ও প্রসারে আগ্রহী সমাজের ব্যাপক জনসাধারণ শাসক একচেটিয়া বুর্জোয়াদের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে সর্বহারাদের সঙ্গে মৈত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। একচেটিয়া উপরের স্তরের বিরোধী বিভিন্ন সামাজিক শক্তির মধ্যে মৈত্রী গঠনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বহু দেশে কৃষকেরা ভূস্বামীদের দ্বারাই শুধু শোষিত হয় না, সেই সঙ্গে প্রধানত ব্যাঙ্ক ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারাও শোষিত হয়। তার দরুন কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে লড়ার দিকে যায়। শহরাঞ্চলের পেতি-বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এবং

এমনকি বুর্জোয়াদেরই কোনও কোনও অংশের (বুর্জোয়াদের মাঝারি অংশের) মধ্যে একচেটিয়া-বিরোধী মনোভাবও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তিকে প্রসারিত করে। অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য-নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলি বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম বিষয়গতভাবে আরও বেশি বেশি করে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই মোড় নেয়।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লবগুলির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম চালু থাকে এবং এগুলি বর্তমান যুগে বিরাট ভূমিকা নিচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে এইসব আন্দোলন ছিল সামন্ততন্ত্র ও তার অবশেষের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির অংশ। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সাম্রাজ্যবাদের পতনের সূচনা করার পর এই সব আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সাধারণ বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি হল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের উপনিবেশগুলির বিরোধের, জাতীয় মুক্তিতে আগ্রহী শক্তিগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপাতী শক্তি তথা দেশের ভিতরকার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির বিরোধের ফল। এই সব দেশের বেশির ভাগেরই উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেকার বিরোধ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে ভিন্ন চরিত্রের। এ বিরোধ হল পশ্চাদ্‌-পদতা দূর করার জরুরী প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সেই সব সেকেলে উৎপাদন-সম্পর্কগুলির বিরোধ, যা উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নয়নে বাধা দেয় এবং সাম্রাজ্য বাদ যেগুলিকে দীর্ঘকাল ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। বর্তমানে বহু দেশে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক এই উভয় শোষণ সম্পর্কগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হতে শুরু করেছে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদকে মুখোমুখী আঘাত করে, পদানত ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও বিপ্লবগুলি সেখানে পাশ থেকে ও পিছন থেকে আক্রমণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার খুঁটিগুলিকে দুর্বল করে দেয়।

বর্তমান সময়কার বিপ্লবের এই দুই ধরন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির বিকাশ ও তীব্রতা বৃদ্ধির

উপর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যগুলির নিয়ামক প্রভাব আগেও ছিল এবং এখনও থাকছে।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের এবং তার দ্বারা অর্জিত বিজয়ের যতই তাৎপর্য থাকুক না কেন, শুধু সেগুলি সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে পারে না। এই কারণেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার নেতৃস্থানীয় শক্তি এই ধারণাটি ভুল। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাল্টা হিসাবে দাঁড় করায়।

বস্তুত বিরাট ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বর্তমান যুগের বিকাশের অর্থাৎ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগের মূল ধারা নির্ধারণ করতে পারে না; কারণ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি গণতান্ত্রিক চরিত্রের, সমাজতান্ত্রিক নয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোনও এক বা একাধিক দেশ সাম্রাজ্যবাদের শিকলিতে দুর্বলতম গ্রন্থি বলে পরিগণিত হতে পারে ও প্রায়ই হয়। কিন্তু তা থেকে একথা বোঝায় না যে বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র ঐসব দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমান যুগে "সাম্রাজ্যবাদের শিকলির দুর্বল গ্রন্থি" ও "বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র" এই ধারণা দুটি আর এক জায়গায় মেশে না। রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভ ও বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাব বর্তমানকালের সকল বিপ্লবী শক্তির জন্য আকর্ষণের স্বাভাবিক কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টি করে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের দেশগুলি বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্র-ভাগে চলেছে এবং তারা অপরাপর বিপ্লবী শক্তিকে পথ দেখাচ্ছে ও সাহায্য করছে। এই কারণেই যে সব বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম স্থানে আঘাত হানে তাদের আধুনিককালের মূল বিরোধ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র এই দুই ব্যবস্থার মধ্যেকার বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে দেখা উচিত নয়।

বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ একই সংগে জটিল ও পরস্পর-বিরোধিতা-পূর্ণ। এর একটি বিধান এই যে পরিসর বৃদ্ধির সময়ে এই প্রক্রিয়া আরও নতুন জাতি ও দেশকে টেনে আনে এবং একই সংগে আবার বিপ্লবের ধরন ও রূপের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই লেনিন সকল দেশে বিপ্লবের অগ্রগতি

একই ও একই ধরনের প্যাটার্নে ঘটবে এই মতান্ধ ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। "সমস্ত জাতিই সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে—এ অনিবার্য, কিন্তু সকলে ঠিক একই পথে তা করবে না, প্রত্যেকে তার নিজস্ব কিছু অবদান করবে গণতন্ত্রের কোনও রূপে, সর্বহারার একনায়কত্বের কোনও ধরনে, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বিভিন্ন হারে। 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নামে' ভবিষ্যতের এই দিকটিকে একটা একঘেয়ে ধূসর রঙে আঁকার চেয়ে তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরও সেকেলে এবং ব্যবহারের দিক থেকে আরও হাস্যকর ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ফল সুঝদালের ছবি আঁকার চেয়ে বেশি কিছু হবে না।"(১)

ধনতন্ত্র অথবা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বিভিন্ন ধরন ও রূপের সম্ভাবনা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে ঃ

১। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কম-বেশি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে করা যায় ;

২। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে উৎসারিত হয় অথবা যা মূল সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে তখনও পর্যন্ত অমীমাংসিত কতকগুলি গণতান্ত্রিক সমস্যাবলীরও সমাধান করে (মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) ;

৩। যেসব দেশ বিদেশী দখলের দরুন স্বাধীনতা হারিয়েছে ও সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে, সেই সব দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বা জাতীয় মুক্তি বিপ্লব থেকে উৎসারিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা ফ্যাশিস্ত কবল থেকে মুক্তির ফলে ফ্যাশি-বিরোধী বিপ্লব থেকে উৎসারিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ;

৪। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যা ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিক থেকে অনুন্নত বা অল্পোন্নত দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম বা জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের ভিতর থেকে বেশি উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সমর্থনে বিকশিত হয়।

৫। জাতীয় মুক্তি বিপ্লব যা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার অংশ কিন্তু তখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হয় না ;

১। ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২৩, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

৬। একচেটিয়া চক্রের ক্ষমতা সীমিত করার, ছোট ছোট উৎপাদকদের (কৃষক, কারিগর) ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট, বড় বড় ভূস্বামী ইত্যাদিদের উপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করার, এবং ফ্যাশিস্ত ও অপরাপর অত্যাচারী শাসন উচ্ছেদ করার লক্ষ্য নিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন , এই ধরনের আন্দোলন গণতান্ত্রিক লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু অর্জন নাও করতে পারে অথবা আন্দোলন যদি আরও অগ্রসর হয় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যও অর্জন করতে পারে।

বিপ্লবী প্রক্রিয়াগুলির বিপুল বৈচিত্র্য অপরিহার্যভাবেই প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার ভিতরে ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিরোধের জন্ম দেয়। এই বিরোধগুলি এই ঘটনা থেকেই উৎসারিত হয় যে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত এবং ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্য-সম্পন্ন নানা দেশ বিপ্লবী আন্দোলনের টানে এসে জড়ো হয়। উপরন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং তার প্রসার থেকেও একই ধরনের বিরোধের জন্ম হয়, কারণ সেই বৃদ্ধি ও প্রসার আবার সমাজের নতুন নতুন অংশকে ও নতুন নতুন জাতিকে টেনে আনে। সমাজতন্ত্রের "বিশুদ্ধ" সমর্থকদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের গঠনকে সীমাবদ্ধ রেখে ঐ বিরোধগুলিকে এড়ানর সংকীর্ণ প্রবণতার বিরুদ্ধে লেনিন সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে পেতি-বুর্জোয়াদের অংশ ও শ্রমিকদের পশ্চাদপদ অংশ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনও বিপ্লবই সম্ভব হবে না; আর "···তারা স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনে তাদের কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীল উদ্ভট কল্পনা, তাদের দুর্বলতা ও ভুল বিশ্বাস নিয়ে আসবে। কিন্তু বিষয়গতভাবে তারা পুঁজিকে আক্রমণ করবে এবং বিপ্লবের শ্রেণী-সচেতন অগ্রগামীবাহিনী অগ্রসর সর্বহারারা চিত্রবিচিত্র ও বেসুরো বিচিত্র ও বাহ্যিকভাবে খণ্ড-বিখণ্ড গণসংগ্রামের বিষয়গত সত্যকে প্রকাশ করে তাকে একত্রিত করতে ও পরিচালনা করতে পারবে··· ।"(১)

সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন বাহিনীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং একাজে ঐ সব দেশের মধ্যেকার 'জাতিসর্বস্ব' লোকেদের এবং দক্ষিণ ও "বাম" শোধনবাদীদের ব্যবহার ক'রে বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন ধারায় মিশে

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৩২৬।

যাবার স্বাভাবিক পরিণতির বিরুদ্ধে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল গ্রহণের চেষ্টা করে।

লেনিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন থেকে জাতিসমূহের মুক্তির প্রক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে ও বহুবিধ রূপে ঘটে।

যত আরও বেশি বেশি জাতি সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের পথ গ্রহণ করবে ততই সংগ্রামের রূপের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে। এ হল অভিন্ন শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বহু বিচিত্র পরিবেশের প্রতিফলন, আর বিপ্লবের গতিপথে সামাজিক জীবনের রূপান্তর সাধনে জনগণের সৃজনশীল ভূমিকার প্রকাশ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ

আমরা এখন সমাজ বিকাশের এবং অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির বিকাশের বিধানসমূহের বিশ্লেষণ থেকে সমাজ জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের পরীক্ষায় এগিয়ে যাব। সে ক্ষেত্রটি হল সামাজিক চেতনা।

যখন আমরা সামাজিক চেতনার কথা বলি তখন ইচ্ছাকৃতভাবেই পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে ও ব্যক্তিগত সমস্ত মতামতকে অগ্রাহ্য করি এবং সেই সব মতামত ও ভাবধারাকেই বিবেচনা করি যেগুলি একটা নির্দিষ্ট সমাজের সামগ্রিক অথবা কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। সামাজিক চেতনা যদিও ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয় তবু এ কখনও তাদের একার জিনিস থাকে না, সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এইভাবেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চারুকলার সৃষ্টিগুলি সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি হয়। সমাজ যেমন যে সব মানুষ নিয়ে তৈরি তাদের যোগফল মাত্র নয়, তেমনি সামাজিক চেতনাও ব্যক্তিদের "চেতনার" যোগফল নয়। সামাজিক চেতনা এই যোগফলের বেশি কিছু, এ হল একটা গুণগতভাবে নির্দিষ্ট মননগত ব্যবস্থা। শেষ পর্যন্ত সামাজিক সত্তা দ্বারা সৃষ্ট ও পরিবর্তিত হলেও সামাজিক চেতনার আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন একটা অস্তিত্ব আছে এবং তা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একটা প্রবল প্রভাব ফেলে, ব্যক্তিকে বাধ্য করে সামাজিক চেতনার ঐতিহাসিকভাবে গঠিত রূপগুলিকে অ-বৈষয়িক হলেও বাস্তব একটা কিছু বলে হিসাব করতে।

ঐতিহাসিকভাবে গঠিত রূপে সামাজিক চেতনা সমাজের মননগতসংস্কৃতির একটা অঙ্গীভূত অংশ। কাজেই আমাদের প্রথমে এই ধারণাটির অর্থ বুঝতে হবে।

১. মননগত সংস্কৃতির ধারণা

উৎপত্তিগত অর্থে "সংস্কৃতি" (লাতিন শব্দ <u>কুলতুরা</u> থেকে তৈরি) শব্দটির মানে হল চর্চা, আর সাধারণত এটি ব্যবহৃত হয় প্রকৃতির, অর্থাৎ

জিনিসগুলি মানুষ ও তার শ্রম নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতিতে যেভাবে থাকে তার পাল্টা হিসাবে বোঝাতে। সংস্কৃতি বলতে আমরা সর্বোপরি বোঝাই মানুষের ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি ও ফলাফলকে, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদগুলিকে। সংস্কৃতি সাধারণত বৈষয়িক ও মননগত সংস্কৃতিতে বিভক্ত। এটি একটি প্রথাগত বিভাগ, কারণ মানুষের বৈষয়িক চাহিদা মেটানর জন্য সাধারণত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র তৈরি তার চিন্তার প্রয়োগ ছাড়া অসম্ভব হত। অপরপক্ষে মননগত প্রয়াসের ফলাফল, যথা ভাবধারা, চারুশিল্পের আদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি ও কানুন—এগুলি কয়েকটি বৈষয়িক রূপে, যথা পাণ্ডুলিপি, বই, চিত্র, গান, অঙ্কন ইত্যাদির রূপে বিরাজ করে।

মননগত সংস্কৃতি মানুষের মননগত ক্রিয়াকলাপের ফলাফল নিয়ে তৈরি। এর মধ্যে আছে বিজ্ঞান, দর্শন, চারুকলা, নৈতিক আদর্শ, রাজনীতি, আইন ও সে সবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ (গবেষণা কেন্দ্র, স্কুল, থিয়েটার গ্রন্থাগার, স্মৃতিমন্দির ইত্যাদি) এবং মানুষের মননগত, নান্দনিক ও নৈতিক বিকাশের স্তরও। সংস্কৃতির ধারণাটি মানুষের জ্ঞান ও ক্রিয়ার কোনও না কোনও ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে, সাংস্কৃতিক সম্পদের একটা বিশেষ ব্যবস্থা স্বীকার ও আত্মস্থ করার সঙ্গে এবং ব্যবহারের একটা বিশেষ ছক গড়ে তোলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উদ্ভিন্ন যৌবন থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি একটা বিশেষ সংস্কৃতির—তার লক্ষ্য, ভাবধারা, মূল্যবোধ ও আচরণের মানের প্রভাবে পড়ে। তৎকালীন সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, সমাজ কর্তৃক সঞ্চিত জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা এবং সমাজের মননগত মূল্যবোধ ও আচরণের মান আত্মস্থ করা নিয়েই তার শিক্ষাদীক্ষা তৈরি। শিক্ষাদীক্ষা ও শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থার বিকাশ নিজেরাই একটা নির্দিষ্ট সমাজের সাংস্কৃতিক স্তরের গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

মননগত সংস্কৃতি নির্দিষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনের ও যে শ্রেণীগুলি তা সৃষ্টি করেছে তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ বহন করে। আর এই দিক থেকে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্মিত সৌধের সঙ্গে তা একত্রে মেশে। তবে মননগত সংস্কৃতিকে সৌধের সঙ্গে এক ক'রে দেখা ভুল। সৌধের মধ্যে মননগত সংস্কৃতির অনেকগুলি ব্যাপার অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন

প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ভাষা (যা জাতীয় সংস্কৃতির একটা রূপ), যুক্তিযুক্ত চিন্তার নিয়মাবলী এবং নানাবিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ও বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থকে সাহায্য করতে পারে এমন অনেক ব্যাপার।

বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের মননগত সংস্কৃতি একটা অখণ্ড সমগ্র হয়ে দাঁড়ায় না। "প্রত্যেক জাতীয় সংস্কৃতিতেই যদি কেবল প্রাথমিক রূপেও হয় (তবু) গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদানগুলি বর্তমান। কারণ প্রত্যেক জাতিতেই শ্রমজীবী ও নিপীড়িত জনগণ আছে; যাদের জীবনের পরিস্থিতি অবধারিতভাবে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু প্রত্যেক জাতির একটা বুর্জোয়া সংস্কৃতি আছে (আর বেশির ভাগ জাতির একটা প্রতিক্রিয়াশীল ও যাজকীয় সংস্কৃতিও আছে), সে কেবল "উপাদানের" রূপে নয়, বরং আধিপত্যকারী সংস্কৃতির রূপে।"(১)

তার মানে এই নয় যে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমগ্র আধেয়কে বর্জন করে। নিপীড়ন ও শোষণের পরিস্থিতিতে মানব জাতি সংস্কৃতির যে সব সম্পদ সৃষ্টি করেছে তা আয়ত্ত করার কর্তব্য তারা গ্রহণ করে। "ধনতন্ত্র যা পেছনে ফেলে গিয়েছে তার সমগ্র সংস্কৃতিকে আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং তা দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়তে হবে। সমস্ত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা, সমস্ত জ্ঞান ও চারুকলা আমাদের অবশ্যই নিতে হবে।"(২)

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি মানুষের আত্মিক বিকাশে একটা নতুন স্তর। এর ভিত্তি হল বিগত যুগগুলিতে মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে মূল্যবান অগ্রগতিগুলি আত্মস্থ করা ও সেগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা। ধন-তান্ত্রিক সমাজের পরিস্থিতিতে এর উপাদানগুলি ইতিমধ্যেই দেখা দিচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় আসার পরই কেবল এ আকার গ্রহণ করতে পারে এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক গঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিকশিত হতে পারে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা এই ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন যে মানব সংস্কৃতির ফলগুলি আয়ত্ত করা ও রক্ষা করা ধরে নেয় যে আগে সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্নির্মাণ ও ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২০, পৃষ্ঠা ২৪।
২। উপরোক্ত, ভল্যুম ২৯, পৃষ্ঠা ৭০।

হতে হবে যেখানে "…মানুষের মস্তিষ্ক ও মানব প্রতিভা আর কখনও নিপীড়ন ও শোষণের জন্য ব্যবহৃত হবে না।"(১)

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গতিপথ আঁকতে গিয়ে লেনিন দেখেছিলেন যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই পরিকল্পনার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হবে। এর মানে ছিল মূলত জনশিক্ষায় বিপুল অগ্রগতি, ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক ও অপরাপর জ্ঞান যোগান, বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রসার এবং বুর্জোয়া ও পেতি-বুর্জোয়া মতামত ও জীবনধারাকে কাটিয়ে ওঠা।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মননগত সংস্কৃতির আধেয়তে শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য ছাপ থাকে। তার মানে যে কোনও সংস্কৃতিতে মতাদর্শ একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়। যুগের অথবা অন্য শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সামাজিক মনস্তত্ত্বের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিও সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

২. মনস্তত্ত্ব ও মতাদর্শ

মতাদর্শ কি? সামাজিক মনস্তত্ত্ব কি? বৈষয়িক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, মানুষ যে সামাজিক পরিবেশে বাস করে, তাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়া ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাদের মানসিক ক্রিয়াকলাপের অনুভূতি, মেজাজ, চিন্তা, উদ্দেশ্য অভ্যাসের রূপে প্রতিফলিত হয়। এই গুলিকেই সাধারণত সামাজিক মনস্তত্ত্ব হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিকাশ জনগণের সামাজিক সত্তার পরিবেশ ও ও তাদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। সামাজিক মনস্তত্ত্ব মতামত ও বিশ্বাসের সামান্যীকৃত রূপ নেয় না, বিচার, আবেগ, অনুভূতি, মেজাজ, স্বেচ্ছামূলক কাজকর্ম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সামাজিক মনস্তত্ত্বের স্তরে জনগণের ভাবধারা ও মতামতের কোনও তত্ত্বগত প্রকাশ হয় না, তাদের প্রবণতাটা থাকে অভিজ্ঞতাপ্রসূত হওয়ার এবং তাদের মধ্যেকার মননগত উপাদানগুলি আবেগাশ্রিত উপাদানগুলির সঙ্গে মিশে থাকে।

১। ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস ভল্যুম ২৬ পৃঃ ৪৮১-৮২

সামাজিক মনস্তত্ত্ব জনগণের সাধারণ চেতনার অংশ।(১)

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সামাজিক মনস্তত্ত্ব অবধারিতভাবে একটা বিশেষ শ্রেণীর বৈশিষ্টগুলির ছাপ বহন করে এবং তার জীবনযাত্রার পরিবেশ প্রতিফলন করে। কোনও শ্রেণীর চেতনা মতাদর্শ দ্বারা রঞ্জিত হবার আগেও তার মনস্তত্ত্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে যা যে শ্রেণী তার বিরোধী তার চেতনা থেকে এর সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত করে।

যে সব শ্রেণীর সম্পর্ক পরস্পর-বিরোধী নয় তাদের মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য থাকে। যথা—ধনতান্ত্রিক সমাজে সর্বহারা ও মেহনতী কৃষকের মনস্তত্ত্বের মধ্যে তফাত আছে। এই পার্থক্যগুলির ভিত্তি হল মেহনতী কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ও সর্বহারার তা না থাকা, তাছাড়া তাদের শ্রমের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও ফলত শহরে ও গ্রামে তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশের পার্থক্য। বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক মর্যাদা ও তাদের কাজের চরিত্র অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্বেরও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। এই সব বৈশিষ্ট্য ও ফলস্বরূপ সামাজিক মনস্তত্ত্বে পার্থক্যগুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজে ক্রমে ক্রমে মুছে যায়। এ হয় শোষক শ্রেণীগুলির বিলোপ-সাধন এবং পুরানো শ্রমবিভাগের (অর্থাৎ শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বিরোধ এবং মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যেকার বিরোধের) অবসানের মারফত। এর অর্থ হল জনগণের মনস্তত্ত্বে শ্রেণী সংকীর্ণতার দিকগুলি আর থাকে না। সীমাবদ্ধ শ্রেণী-মনস্তত্ত্বসম্পন্ন লোকের বদলে দেখা দেয় কমিউনিস্ট সমাজের পূর্ণ বিকশিত, আত্মিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত গ্রন্থগুলি জনগণের সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রতি, বিশেষ করে বিপ্লবী তরঙ্গোচ্ছ্বাসের পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দিতে শিক্ষা দেয়। শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার অবিচার সম্পর্কে জনগণের চেতনা যে বিপুল ভূমিকা নেয় সেদিকে এগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই চেতনা যদিও একটা নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বৈজ্ঞানিক

১। মার্কসবাদী সাহিত্যে "সাধারণ চেতনা" কথাটা "সামাজিক মনস্তত্ত্ব" কথাটার চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। "সাধারণ চেতনা" কেবল সামাজিক পরিবেশের প্রতিফলন নয়, মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সব জ্ঞান লাভ করে, শ্রমের প্রক্রিয়ার যে সব জ্ঞান ও দক্ষতা ইত্যাদি লাভ করে তার ফলাফলও বটে।

প্রমাণ হিসাবে কাজ করতে পারে না, তবু জনগণ যে পুরাতন ধারায় আর বাস করতে চায় না এবং বর্তমান অবস্থা যে অসহ্য হয়ে উঠেছে, ও তা বদলান দরকার এ তার একটা প্রকাশ। একটা বিপ্লবী পার্টি জন-চেতনাকে বুঝতে চেষ্টা করে এবং তাকে রাজনৈতিক চেতনার স্তরে তুলতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ জনগণকে সামাজিক প্রক্রিয়ার একটা সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন দিতে ও তাদের সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করতে চেষ্টা করে।

বিশ্ব-ইতিহাস বিভিন্ন দেশের, জনগণের ও জাতির ইতিহাস। কোনও একটি বিশেষ দেশের, বিশেষ জনগণের ইতিহাসের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সেই দেশের সমগ্র জনসংখ্যার, তার সকল শ্রেণীর মনস্তত্ত্বের ছাপ বহন করে।

এক বা অপর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বিশিষ্ট পার্থক্য জাতীয় ইতিহাসের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রভাবিত। এই পার্থক্য মানসিক গঠনের কিছু ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণেই ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর উপর আইরিশ শ্রমিকদের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে এঙ্গেলস আইরিশ অভ্যাগমন সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে এই অভ্যাগমন ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর ভিতরে "আবেগপ্রবণ, হঠাৎ ওঠা-পড়া আইরিশ মেজাজ···আমদানি করে।"(১) একটা জাতির নির্দিষ্ট মনস্তত্ত্ব এবং জাতির বিভিন্ন অংশের দৈনন্দিন জীবনের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতি চারুকলার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। চারুকলা বাস্তবের কলাসম্মত উপলব্ধি ও জনগণের ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা নান্দনিক রুচিকে প্রকাশ করে। কিন্তু কোনও শ্রেণী, জাতি অথবা বর্ণ তথাকথিত জন্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতে কোনও বিশেষ প্রতিভায় বিশিষ্ট হয় না। এই রকম কোনও পার্থক্যের অস্তিত্ব নেই ; এক বা অন্য সম্প্রদায়ের ভিতরকার পৃথক পৃথক ব্যক্তির মধ্যে তফাত অবশ্যই থাকে এবং তা বিভিন্ন রকম যোগ্যতা ও প্রতিভার রূপে প্রতিফলিত হয়। বিশেষ প্রতিভাধর জাতির তত্ত্ব অথবা এলিট-এর (জাতির মধ্যে বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের একটি বিশেষ স্তরের) তত্ত্ব নিতান্তই ভিত্তিহীন। কিছু জাতি ও সামাজিক গোষ্ঠীর অপরের উপর আধিপত্য করার এ একটা অছিলামাত্র।

সামাজিক চেতনা যেখানে জনগণের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ ও আদান-

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, অন ব্রিটেন, মস্কো ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১৫৭।

প্রদানের প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে গঠিত হয়, সেখানে মতাদর্শ হল মতামত প্রতিজ্ঞা ও ভাবধারার (রাজনৈতিক, দার্শনিক, নৈতিক, নান্দনিক ও ধর্মীয়) একটা মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা।

অবশ্য সাধারণ চেতনার স্তরেও একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ধারণা ব্যবহার করে এবং বিধান ও যুক্তির রূপে অনুযায়ী সেগুলিকে ঢালাই ক'রে বিচারে পরিণত করে, কিন্তু এই স্তরে সে অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী চিন্তা করে, যা তাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ও তার আশু পরিবেশের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে পারে না। পক্ষান্তরে মতাদর্শ ব্যাপকতর (সামান্যীকৃত) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত জটিল ধারণা নিয়ে কাজ করে। এই অভিজ্ঞতাও থাকে ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক উভয় প্রকার। সাধারণ চেতনা আপনা থেকে, মানুষের জীবন, ক্রিয়া ও পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে, আর তা চারপাশের দুনিয়া সম্পর্কে মানুষের আশু উপলব্ধির ফল। কিন্তু মতাদর্শ হল প্রধানত সচেতন ক্রিয়ার ফল যার জন্য মতাদর্শবিদদের বিশেষ চেষ্টার দরকার হয়।(১) বুর্জোয়াদের মতাদর্শের চরিত্রায়ণ ক'রে মার্কস ও এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন যে… "এই শ্রেণীর মধ্যে একাংশকে মনে হয় শ্রেণীর চিন্তাবিদ (তার সক্রিয়, উপলব্ধিসম্পন্ন মতাদর্শবিদ)…" ।(২)

তাদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে একথা বলা যায় যে কোনও বিশেষ শ্রেণীর মতাদর্শবিদদের সেই শ্রেণীর লোক হতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু কোনও একটি শ্রেণীর স্বার্থকে মতাদর্শের ভাষায় প্রকাশ ক'রে তারা সেই শ্রেণীর সেবা করে ও তাদের বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিগণিত হয়। লেনিনের ভাষায় "…বুদ্ধিজীবীদের এ নামে অভিহিত করা হয় কেবল এই কারণে যে তারা সব চাইতে সচেতনভাবে, সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে ও সবচেয়ে সঠিকভাবে শ্রেণী স্বার্থের

১। আমরা প্রধানত বলছি, কারণ, যেমন ধর্ম আদিম সমাজে আদিম মানুষের অনুরূপ চেতনায় উদিত হয়েছিল, আর তা নিঃসন্দেহে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। পরবর্তী কালেই কেবল ধর্মের মুখপাত্ররা, অর্থাৎ যাজক ও ধর্মতত্ত্ববিদরা এই সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাসকে একটা সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থায় রূপায়িত করেছিল।

২। কে. মার্কস ও এফ এঙ্গেলস, দা জার্মান ইডিওলজি, পৃষ্ঠা ৬১।

এবং সমগ্র সমাজের রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির বিকাশকে প্রতিফলিত ও প্রস্ফুট করে।"(১)

আধুনিক দুনিয়ায় কমিউনিজম ও কমিউনিজম-বিরোধিতার মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম বুর্জোয়া মতাদর্শীবিদদের মধ্যে সাধারণভাবে মতাদর্শকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। সমাজ-জীবনকে "মতাদর্শ থেকে মুক্ত করার" দাবির মধ্যে দিয়ে এর প্রকাশ হচ্ছে।

এই তত্ত্বের অন্যতম উদ্গাতা ডেনিয়েল বেল তো তাঁর বই-এর নামই দিয়ে দিয়েছেন "মতাদর্শের মৃত্যু।" কিন্তু এই তত্ত্বটি নিজেই একটা মতাদর্শ। আমেরিকান বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সমাজতত্ত্ববিদ রাইট মিলস-এর ভাষায় মতাদর্শের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজেরপতনের মতাদর্শ।

"মতাদর্শ থেকে মুক্ত করার" তত্ত্বের প্রবক্তারা ব্যাপারটাকে এইভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা ক'রে, যেন মতাদর্শ সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস-এর মত ও লেনিনের মতের মধ্যে তফাত ছিল, যেন লেনিনই কেবল একটা বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে তার তাৎপর্যের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছিলেন, আর মার্কস ও এঙ্গেলস যে কোনও মতাদর্শকে জনগণের নিজেদের সম্পর্কে যে সব মোহ, ছলনা ও ভুল ধারণা আছে তার মোট যোগফল বলে গণ্য করতেন।

বস্তুত, মার্কস ও এঙ্গেলস মিথ্যা ও মোহময় চেতনা বোঝাতে "মতাদর্শ" কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেটা ব্যবহার করেছিলেন সেই সব মতাদর্শগত তত্ত্ব সম্পর্কে যেগুলি চিন্তা ও ভাবধারাকে স্বাধীন সারমর্ম বলে মনে করে এবং মনে করে যে সেগুলি স্বাধীনভাবে বিকশিত হবে ও কেবল নিজেদের সহজাত বিধান মেনে চলবে। তাঁরা সেই সব মতাদর্শবিদদের কথা বলেছিলেন যারা একথাটা সম্বন্ধে সচেতন নয় অথবা কথাটা স্বীকার করে না যে, যে সব মানুষের মাথায় চিন্তার প্রক্রিয়াটি হয় তাদের জীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতিই শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার নিয়ামক হয়। এই রকম একটা মতাদর্শ, যার মধ্যে ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা নিহিত আছে, তা নিজেই ভুল চেতনা এবং তা ছলনা ও মোহের জন্ম দেয়। আর যে মতাদর্শ শ্রমিকশ্রেণীকে, সমগ্র মেহনতী মানুষের নেতাকে পরিচালিত করে

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৭, পৃষ্ঠা ৪৫।

ম্যানিফেস্টো অব দা কমিউনিস্ট পার্টি-তে নিম্নলিখিত ভাষায় তার চরিত্রায়ণ করা হয়েছে : "কমিউনিস্টদের তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি কোনও মতেই এমন সব ভাবধারা ও নীতি নয় যা এক বা অপর হবু। সর্বজনীন সংস্কারক কর্তৃক উদ্ভূত বা আবিষ্কৃত।

তারা সাধারণ কথায় একটা চলতি শ্রেণীসংগ্রাম থেকে, আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচরে চলমান একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত প্রকৃত সম্পর্ক-গুলিকে প্রকাশ করে মাত্র।"(১)

কাজেই বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ, যা বৈষয়িক-সামাজিক সম্পর্কের একটা সঠিক প্রতিফলন, এবং সেই মতাদর্শ যা এইসব সম্পর্ককে একটা ছলনাময়, বিকৃত ও এমনকি অত্যদ্ভুত রূপে প্রতিফলিত করে এ দুয়ের মধ্যে আমাদের অবশ্যই একটা পার্থক্য করতে হবে।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে একটা বিশেষ শ্রেণীর মতাদর্শের মধ্যে কতখানি সত্য আছে তার নিয়ামক উপাদান হল সমাজের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে তার জরুরী প্রয়োজনগুলি মেটাতে সেই শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা। একটা প্রগতিশীল শ্রেণীর মতাদর্শ এই সব চাহিদার মোটামুটি সঠিক প্রতিফলন করতে সক্ষম এবং গভীরতা ও সঙ্গতিপূর্ণতার বিভিন্ন মাত্রায় হলেও বৈজ্ঞানিক মতামত আয়ত্ত করতে সক্ষম। এই মাত্রা অবশ্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে ওই সব চাহিদার চরিত্রের উপর এবং সামাজিক বিকাশের সংশ্লিষ্ট স্তরের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির উপর।

বুর্জোয়াদের উত্থানের পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিকাশের বিষয়গত গতিপথ তার মতাদর্শে—দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, আইন ইত্যাদিতে—যথাযথ-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। আবার সেই মতাদর্শে বেশ কিছু মোহ ছিল, যথা—এই ধারণা যে ঐতিহাসিকভাবে ক্ষণস্থায়ী বুর্জোয়া ব্যবস্থাটা শাশ্বত এবং মানুষের "স্বাভাবিক অধিকার", তার চরিত্র ও তার যুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শই কেবল সমস্ত মোহ থেকে মুক্ত হতে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। এরকম হতে পারল কারণ অতীতে যে সমস্ত শ্রেণী ঐতিহাসিকভাবে সমাজের নেতৃত্ব

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১২০।

করেছিল তারা নিজেদের শাসন চিরস্থায়ী করতে চেষ্টা করত। পক্ষান্তরে সর্বহারার ঐতিহাসিক ব্রত হল সমাজে সমস্ত শ্রেণী-বিভাগের অবসান ঘটান এবং তার জন্য সর্বহারার মতাদর্শের স্রষ্টারা সামাজিক বিজ্ঞানের জন্ম দিতে সক্ষম হলেন। এই সামাজিক বিজ্ঞান হল সামাজিক বিকাশের বিধানসমূহের বিজ্ঞান।

সামাজিক চেতনার অংশ হিসাবে মতাদর্শও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করে। একটা নির্দিষ্ট বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপাত্তগুলির তত্ত্বগত সামান্যীকরণ করা যায় না। বুর্জোয়া ও সর্বহারা গঠিত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদির কথা বলা অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব সেই সব প্রশ্নে শ্রেণী-অবস্থান বা শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া যেগুলি শ্রেণীগুলির স্বার্থের দিক থেকে নিরপেক্ষ। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ দেখিয়ে দিচ্ছে যে তারা দর্শন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নয়, তারা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রামের ক্ষেত্র; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাফল্যগুলি প্রায়ই শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণীগুলির মতাদর্শবিদদের দ্বারা জ্ঞানের পদ্ধতি বিজ্ঞানগত সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে দুদিকে রওনা দেওয়ার জায়গা হিসাবে কাজ করে।

সার সংকলন করলে মতাদর্শের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়ঃ মতাদর্শ হল এমন একটা মতামত ও ভাবধারার ব্যবস্থা যা সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত করে, একটা নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর অবস্থান, স্বার্থ ও লক্ষ্যগুলিকে প্রকাশ করে এবং যার উদ্দেশ্য হল বিরাজমান সামাজিক কাঠামোর সংরক্ষণ বা পরিবর্তন।

এখন সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও মতাদর্শের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটি বিচার করা যাক।

সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও মতাদর্শ দুই হিসাবেই সামাজিক চেতনা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত। এই সম্পর্কগুলি প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সমাজে মূলত আত্মপ্রকাশ করে কতকগুলি সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থ হিসাবে। কিন্তু স্বার্থগুলি কি?

প্রথম নজরে মনে হবে যে স্বার্থ একজন লোকের কিছু বৈষয়িক বা আত্মিক সামগ্রী বেছে বেছে করায়ত্ত করার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত

এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সাড়ার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এ থেকে আমাদের স্বার্থের চরিত্র সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। স্বার্থ বিষয়গতভাবেও বিরাজ করে, এই দিক থেকে যে স্বার্থ মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে, তার জীবন-যাত্রার পরিস্থিতি ও তার চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ সেই সবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেগুলি বিভিন্ন মূল্য সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গির এবং তার মনস্তাত্ত্বিক সাড়ার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যে কোনও একটা গোটা সমাজের, যে কোনও শ্রেণী বা জাতির বিষয়গত স্বার্থ আছে। লোকে কিভাবে কাজ করবে এবং তার সামাজিক ফলাফল কি হবে তা নির্ভর করে তারা তাদের শ্রেণী-স্বার্থ অথবা জাতীয় স্বার্থ কি তা জানে কিনা তার উপর। ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে যখন শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব হল তখনও পর্যন্ত সে একটি "আপনাতে আপনি শ্রেণী" ছিল এবং তার শ্রেণী লক্ষ্য বুঝত না। যখন সে তার নিজস্ব মতাদর্শ আয়ত্ত করল তখন সে আর "আপনাতে আপনি শ্রেণী" রইল না, "আপনার জন্য শ্রেণী"তে পরিণত হল। নিজস্ব মতাদর্শ তাকে সর্বহারা আন্দোলনের পরিস্থিতি, গতিপথ এবং সাধারণ ফলাফলের একটা বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি দিল এবং সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করল।

ফলত একটা শ্রেণীর চেতনায় মতাদর্শ প্রবর্তিত হয় প্রায় সর্বক্ষেত্রে তার তত্ত্ববিদদের দ্বারা, মতাদর্শবিদদের দ্বারা। এ সামাজিক মনস্তত্ত্ব থেকে বেড়ে ওঠে না, আর কিছু লোক যে একে "মনস্তত্ত্বের ঘনীভবন" হিসাবে ধরে নেয় সেভাবেও একে দেখা যায় না। যদিও এ সামাজিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রভাবিত।

একটা শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব ও তার মতাদর্শের অভিন্ন সামাজিক মূল রয়েছে। কাজেই একটা শ্রেণীর জনগণকে সেই শ্রেণীর মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত করার বিষয়গত সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এই সম্ভাবনাকে রূপায়িত করা যায় মতাদর্শগত সংগ্রামের পরিস্থিতিতে।

সর্বহারার সামাজিক পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে তার বিপ্লবী চেতনাকে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে। উৎপাদকদের মধ্যে উচ্চ বিকশিত সামাজিক যোগাযোগ সমন্বিত বৃহদাকার উৎপাদন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যৌথতাকামী মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য

করে। সেই সঙ্গেই আবার ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সর্বহারাদের কিছু অংশ নিজেদের শ্রেণীর বিষয়গত প্রয়োজন ও লক্ষ্যের বিরোধী কিছু মতামত দ্বারাও সংক্রামিত হয়। এই ধরনের বেশির ভাগ মতামতই ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতার মনস্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত। ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদের আমদানিকারক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির দ্বারা এই স্বার্থপরতা উৎসাহিত হয়।

শাসকশ্রেণী নিপীড়িতদের শ্রেণী-চেতনা দমানর জন্য জাতীয় মনোভাবকেও ব্যবহার করে। দেশপ্রেম হল নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথক পৃথক দেশের অস্তিত্বের দ্বারা দেশপ্রেম পরিপুষ্ট হয়েছে। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর ক'রে এ জনগণের স্বার্থসাধন করতে পারে, কিন্তু আবার তাদের প্রতিকূলেও ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে যে তখনকার ছলনাময় রণধ্বনি "পিতৃভূমিকে রক্ষা করা" ইউরোপের জাতিগুলিকে একটা দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিমজ্জিত করেছিল, এই যুদ্ধের আসল কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির শ্রেণী-স্বার্থ।

ব্যক্তিগত স্বার্থকে শ্রেণী অথবা সামাজিক স্বার্থের থেকে তফাত হতেই হবে এটা তার চরিত্রগত নয়। ঠিক যেমন জাতীয় স্বার্থ জাতিগুলির অস্তিত্ব যতকাল বজায় থাকবে তত কালই থাকবে, কিন্তু তাই বলে তাকে আর একটা জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। চূড়ান্ত বিচারে এই সমস্ত বিরোধ ও সংঘাতের জন্মদাতা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব। বুর্জোয়ারা ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং জাতির প্রতি ব্যক্তির অনুরাগ নিয়ে ফাটকা খেলে এবং জনগণের মনোযোগকে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের মধ্যে সংগ্রামে এবং জাতি ও বর্ণগুলির মধ্যে সংগ্রামের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

এই জন্যই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের এত গুরুত্ব। এই মতাদর্শ বিপ্লবী শ্রেণীর চেতনার বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও জাতীয় সংকীর্ণতাবাদের দ্বারা দুষ্ট হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করে এবং যৌথতা ও আন্তর্জাতিকতার, সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমের ভাবধারার প্রবর্তন করে।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে মতাদর্শ ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যটা এমন একটা প্রক্রিয়া নয় যাতে এক পক্ষ সক্রিয় এবং অপর পক্ষ কেবল গ্রহণ করছে। লেনিন মনে করতেন যে জনগণের পেছনে পেছনে থাকা ভুল হবে; তা সত্ত্বেও তাদের কথা শুনতে হবে। জনগণের শ্রেণী-চরিত্র যদিও এক ও অভিন্ন, তবু তারা একটা সামগ্রিক ও পার্থক্য না করার মত অভিন্নতার ছবি উপস্থিত করে না। সব সময়ে তাদের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বা অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ অংশ থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্য নির্ধারিত হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর শ্রেণী-চেতনার স্তরের ও জীবনের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপাদান দিয়ে। মতাদর্শ, মতাদর্শের বিকাশ এবং তার সমৃদ্ধতর ও নির্দিষ্টতর প্রকাশের পক্ষে শ্রেণীর অগ্রসর অংশের অভিজ্ঞতা বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রেণীসংগ্রামের গতিপথে এবং পরবর্তীকালে সুগভীর সামাজিক রূপান্তর এবং জনগণের ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধির ভিত্তিতে, সংস্কৃতির উন্নয়ন ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের প্রসারের ভিত্তিতে শ্রমজীবী জনগণের মনস্তত্ত্বে সুগভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং জাতীয় সংকীর্ণতার মনস্তত্ত্ব ও মতাদর্শের অবশেষগুলি অবলুপ্ত হয়, ধর্মীয় ও অপরাপর কুসংস্কার পরাস্ত হয়। সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে জনগণের যে নতুন মনস্তত্ত্ব ও নতুন চেতনা, বিকশিত হয় তার অত্যাবশ্যক সারমর্ম হল কমিউনিজম-এর প্রতি নিষ্ঠা; যৌথতার চেতনা, সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা, শ্রমের প্রতি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল রূপের মানবিক নিপীড়নের প্রতি অসহিষ্ণুতা।

৩. সামাজিক চেতনার রূপসমূহ, তাদের সামাজিক ভূমিকা ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য

শ্রেণী-সমাজে সামাজিক চেতনা বিভিন্ন রূপ নেয়; সামাজিক-রাজনৈতিক ও আইনগত তত্ত্ব ও বিশ্বাস, দর্শন, নীতিবোধ, চারুকলা ও ধর্ম। সামাজিক সত্তাকে প্রতিফলিত করতে গিয়ে এবং তাকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করতে গিয়ে এইসব রূপের প্রত্যেকটির নিজস্ব বিশেষ লক্ষ্য এবং প্রতিফলনের

বিশেষ ধরন থাকে, প্রত্যেকটি রূপে সামাজিক সত্তা ও জনগণের চেতনাকে নিজস্ব বিশেষ কায়দায় প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজস্ব নির্দিষ্ট ভূমিকার দ্বারা চরিত্রায়িত হয়।

সমাজের বিকাশের গোড়ার স্তরগুলিতে সামাজিক চেতনা বিভিন্ন রূপে বিভক্ত ছিল না। বৈষয়িক উৎপাদনের অত্যন্ত নিম্নস্তরসম্পন্ন আদিম মানুষের কঠোর অস্তিত্বের চেতনা ছিল তদনুযায়ী আদিম ও পার্থক্যবিহীন। তখনও মানসিক শ্রম কায়িক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং জনগণের চেতনা "মানুষদের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল।"(১) কিন্তু এমন কি প্রাক-শ্রেণী সমাজেও শ্রম ক্রিয়াকলাপের একটা বিশেষ স্তরে চারুকলা, নৈতিকতা ও ধর্ম প্রভৃতির মত সামাজিক চেতনা রূপগুলির কিছু উপক্রমণিকার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রমের আরও বিভাগ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী ও রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়ে সামাজিক জীবন হয়ে উঠল জটিল এবং সেই সঙ্গে জটিল হল সামাজিক চেতনাও। কায়িক ও মানসিক শ্রমে শ্রমের বিভাজন, এবং শাসক-শ্রেণী কর্তৃক মানসিক শ্রমে একচেটিয়া দখল মানুষের বৈষয়িক আচরণ থেকে চেতনার ক্রমশ বেশি বিচ্ছেদ সূচিত করল। চেতনা সামাজিক সত্তা থেকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন হয়ে গেল। তখন চেতনাকে সত্তা থেকে সম্পূর্ণ হিসাবে এবং এমনকি সত্তার তুলনায় মুখ্য বলে গণ্য করা গেল এবং চেতনা "নির্ভেজাল' তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি গঠনে এগিয়ে যেতে" পারল।(২) বাস্তবে চেতনার এইসব 'নির্ভেজাল' রূপগুলি কোনও না কোনও ভাবে শ্রেণী-সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি অথবা সম্পর্কগুলিকে প্রকাশ করত এবং কিছু কিছু শ্রেণীর স্বার্থের মতাদর্শগত প্রতিফলন হিসাবে কাজ করত।

এখন আমরা সংক্ষেপে সামাজিক চেতনার পৃথক পৃথক রূপ তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকাকে পরীক্ষা করব যেসব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও সামাজিক চাহিদা তাদের জন্ম দিয়েছিল সেইগুলির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে।

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস. দা জার্মান ইডিওলজি, পৃষ্ঠা ৩৭।
২। উপর্যুক্ত পৃষ্ঠা ৫৩।

(ক) রাজনৈতিক ও আইনগত চেতনা।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে যেখানে আমরা শ্রেণীসমূহ, সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন ও বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেখানে রাজনৈতিক ও আইনগত চেতনার প্রশ্নটিও মোটামুটি বিবেচিত হয়েছে। এখানে আমরা কেবল চেতনার এই দুই রূপের নির্দিষ্ট চরিত্র বিচার করব অর্থনৈতিক কাঠামোকে কিভাবে তারা প্রতিফলিত করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

রাজনৈতিক মতাদর্শ হল সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন, রাষ্ট্রের রূপ, শ্রেণীসমূহ ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক, সমাজের জীবনে তাদের ভূমিকা, অপরাপর রাষ্ট্র ও জাতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে একটা বিশেষ শ্রেণীর মতামতের প্রণালীবদ্ধ তাত্ত্বিক প্রকাশ। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে, একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলির রক্ষণ, যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধিতে এ একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হল আইনগত মতাদর্শ এ হল একটা শ্রেণীর আইনগত চেতনার প্রণালীবদ্ধ তাত্ত্বিক প্রকাশ। কোনও শ্রেণীর আইনগত চেতনা বলতে বোঝায় আইনগত সম্পর্ক; রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র সম্বন্ধে, আইন প্রণয়ন, বিচারালয়, প্রকিউরেটরের অফিস (সরকারের মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত দফতর) ইত্যাদি সম্বন্ধে সে শ্রেণীর মতামত। কোনও শ্রেণীর আইনগত মতাদর্শের উদ্দেশ্য হল সেই শ্রেণীর স্বার্থানুগ আইনগত ব্যবস্থার সমর্থন বা প্রতিষ্ঠা।

তত্ত্বগত চেতনার যে কোনও রূপের মত রাজনৈতিক ও আইনগত মতাদর্শগুলি তাদের প্রতিজ্ঞাগুলিকে যুক্তিযুক্ত রূপে প্রকাশ করে এবং জ্ঞানের এই সংশ্লিষ্ট শাখার পূর্ববর্তী বিকাশগুলির উপর নির্ভর করে; রাষ্ট্র ও আইনের তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে সেগুলি প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে আমাদের কেবল রাজনৈতিক মতবাদ ও তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামালেই চলবে না; রাজনৈতিক কর্মসূচী ও মন্ত্র, রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশল নিয়েও মাথা

থামাতে হবে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপের দৃষ্টান্ত দিয়েই এগুলির সারমর্ম সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই পার্টিগুলির কর্মসূচী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকে দেখিয়ে দেয়। তাদের রণনীতি দীর্ঘতর অথবা হ্রস্বতর পর্যায়ের জন্য আন্দোলনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির ক'রে দেয়, কর্মসূচীর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রতিযোগী শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে বিবেচনার মধ্যে রাখে। তাদের রণকৌশল যে কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য আচরণের একটা নির্দিষ্ট ধারা স্থির করতে সাহায্য করে। শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ও মঞ্চে, তাদের রণনীতি ও রণকৌশলে যে সব লক্ষ্য উপস্থাপিত হয় সেগুলি সেই সব শ্রেণীর স্বার্থে ও আকাঙ্ক্ষাকে, জীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতির দ্বারা স্থিরীকৃত তাদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস বুর্জোয়া আইন-গুলির নিম্নলিখিত চরিত্রায়ণ করেছেন: "তোমাদের বিচার-বিজ্ঞান হল কেবল তোমাদের শ্রেণীর ইচ্ছাকে সকলের জন্য আইনে পরিণত করা, এ ইচ্ছার আসল চরিত্র ও গতিধারা তোমাদের শ্রেণীর অস্তিত্বের অর্থনৈতিক শর্তগুলি দ্বারা নির্ধারিত।"(১) সোভিয়েত আইন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে প্রকাশ করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বৈধতা ও আইনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করায় এবং সমস্ত নাগরিকদের সমাজতান্ত্রিক যৌথ জীবনের আইন-কানুন ও নিয়মাবলী মেনে চলার মনোভাবে শিক্ষিত করায় আগ্রহী।

বর্তমান কালে সামাজিক জীবনের উপর কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ও আইনগত ভাবধারা ক্রমশ বেশি ক'রে প্রগতিশীল প্রভাব ফেলছে। তারা সামাজিক বিকাশের মৌলিক চাহিদা অনুযায়ী জনগণের চেতনা ও ইচ্ছাকে গঠিত করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কেবল বিভিন্ন মতাদর্শগত ধারণার (যথা—রাজনৈতিক, আইনগত ইত্যাদি ধারণার) শ্রেণী সারমর্ম উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করেনি, এ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও আইনগত

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১২৩।

মতাদর্শগুলিকে, তার সমগ্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(খ) নৈতিকতা।

রাজনীতি ও আইনের মত নৈতিকতাও মানুষের আচরণের একটা নিয়ন্ত্রক।

একেবারে প্রাথমিক ধরনের নৈতিকতা, এমন কি আদিম সমাজেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। ব্যক্তিকে তার ট্রাইবাল শৃংখল থেকে মুক্ত ক'রে এবং জটিলতর সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এনে ফেলে শ্রেণী-সমাজ ব্যক্তির আত্ম-সচেতনতার বিকাশকে উৎসাহ যোগাল এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের একগাদা নতুন সমস্যা ব্যক্তির সামনে উপস্থিত করল। এই সব সমস্যা হল এই নতুন সামাজিক সম্প্রদায় সম্পর্কে, কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের সম্পর্কে, রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গি হবে। এগুলির এমন একটা তাৎপর্য ছিল যা ক্ল্যান বা ট্রাইবের পূর্ববর্তী রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেল। ভাষান্তরে বললে আচরণের নতুন আদর্শের প্রয়োজন হল এবং এই সব নতুন আদর্শ ও পুরানো রীতিনীতি ও ঐতিহ্য উভয় সম্পর্কেই নানাবিধ বিশ্বাসের জন্ম হল।

সমাজের নৈতিক জীবন যত জটিলতর হল তত নির্দিষ্ট নৈতিক বিধি (মৌলিক আদর্শ, নিয়মকানুন ও অনুজ্ঞার সমাহার) এবং মতবাদের উদ্ভব হল; অনেক কাল পর্যন্ত সেগুলি মূলত ধর্মীয় চরিত্রের রইল। দর্শনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা দার্শনিক জ্ঞানের একটা শাখা হয়ে গেল এবং সেইভাবে নীতিশাস্ত্র সৃষ্টি হল।

উন্নত নৈতিক চেতনা—দৈনন্দিন জীবনে অপরাপর লোকের সঙ্গে নিজের সংযোগ সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতনতা হল ব্যক্তির সাধারণ বিশ্ব-দৃষ্টি-ভঙ্গির অঙ্গ এবং মানুষের সারমর্ম, চারিপাশের দুনিয়ায় তার অবস্থান ও ভূমিকা, জীবনের এবং ভাল ও মন্দের অর্থ, নৈতিক আদর্শ ও নৈতিক মূল্যগুলি সম্বন্ধে তার ভাবধারা প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত। ক্রিয়ার গতিধারা নির্বাচন এবং তার মূল্যায়নের সঙ্গে প্রায়ই এই সব ক্রিয়ার নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে জটিল ধ্যান-ধারণা ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা জড়িত থাকে। একটা কোনও নৈতিকতার মনো-

ভাবে দীক্ষিত একজন লোক নিজেই তার নৈতিক কর্তব্য (অর্থাৎ অপরাপর লোক ও কোনও বিশেষ সম্প্রদায় সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা) সম্বন্ধে সচেতন, সে নিজেই তার ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ন করতে পারে এবং ভুল পথ বাছার জন্য বা নিজের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে স্খলিত হওয়ার জন্য নিজেকে নৈতিকভাবে নিন্দা করতে পারে। মানুষের নৈতিক আত্ম-সচেতনতা, নিজের আচরণের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে নিজের সচেতনতা, নিজের আচরণের মূল্যায়ন—এ সমস্ত বিবেকের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের একটা উপায় হিসাবে নৈতিকতার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে তা নৈতিক মান চালু রাখার জন্য কোনও বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে না (আইনের সঙ্গে এখানে সুস্পষ্ট পার্থক্য, রাষ্ট্রের আইন কার্যকর করার ক্ষমতা আইনকে মদত যোগায়)। নৈতিকতা বুঝিয়ে রাজী করান, দৃষ্টান্ত, জনমত, শিক্ষা ও ঐতিহ্যের শক্তি দ্বারা, ব্যক্তি, সংগঠন অথবা প্রতিষ্ঠানের নৈতিক কর্তৃত্বের শক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। সেই কারণে নৈতিক মানগুলি বিচার সম্পর্কিত বা সংগঠনগত আদর্শগুলির মত অত বিস্তারিতভাবে ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। তবে এগুলো আবার মানুষে মানুষে এমন সব সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত যা কোনও রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা সামাজিক সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় (বন্ধুত্ব, কমরেড-সুলভ প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি)।

ব্যবহারের নৈতিক বিচারকে একটা ক্রিয়ার সামাজিক এবং নৈতিক উভয় পরিণামকেই (অর্থাৎ কোনও বিশেষ সম্প্রদায়, শ্রেণী বা সমাজের পক্ষে পরিণামকে) বিবেচনা করতে বাধ্য হতে হয়, কারণ ব্যক্তির ভিতরকার অভিপ্রায় যাচাই করার আর কোন বিষয়গত পথ নেই। কিন্তু ব্যক্তির ভিতরকার অভিপ্রায় তার ব্যক্তিত্বের নৈতিক মূল্যায়নে একটা বিপুল ভূমিকা নেয়। তা হয় বিশেষত এই কারণে যে বাইরে থেকে দেখতে অনুরূপ ক্রিয়া আসলে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ের ফল হতে পারে। তাই ব্যক্তির ভিতরকার অভিপ্রায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন রকম নৈতিক গুণাগুণ উদ্ঘাটিত করে।

প্রশাসনিক, আইনগত ও অপরাপর যে সব আদর্শের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য

একটা বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাকে সৃষ্টি ও সংহত করা নৈতিকতা তাদের মত নয়। নৈতিকতা প্রধানত মানুষের অন্তর্জগৎ ও আচরণ নিয়ে ব্যস্ত। নৈতিকতার সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য হল তার শিক্ষাগত ভূমিকা। ব্যক্তিকে, তার মনস্তত্ত্ব ও চেতনাকে প্রভাবিত ক'রে নৈতিকতা আচরণের নিয়ন্ত্রক হিসাবে তার ভূমিকা পালন করে এবং কার্যক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনে ও সামাজিক আদান-প্রদানে রত মানুষদের মধ্যে তদনুযায়ী নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নৈতিকতার যে সামাজিক (শ্রেণী) চরিত্র আছে সেকথা অথবা নৈতিক মান ও বিচার সমগ্র যৌথ সংস্থাগুলির (শ্রেণী, জনগণ, রাষ্ট্র প্রভৃতি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রসারিত সেকথা এর দ্বারা খণ্ডিত হয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নৈতিক চেতনা ক্রিয়ার একটি শক্তিশালী উদ্দীপক। সেই কারণে নৈতিক চেতনা গড়ে তোলার বিষয়ে একটা বিপ্লবী পার্টির আগ্রহ থাকতে বাধ্য। পতনোন্মুখ ব্যবস্থার বিপ্লবী সমালোচনার ভিতরে তার নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকারের মুখোশ খোলাই নিহিত থাকে। এর উদ্দেশ্য হল ওই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ জাগিয়ে তোলা, নিজেদের শক্তির উপর এবং নতুন ব্যবস্থার জয়ের উপর বিশ্বাসে তাদের উদ্দীপিত করা।

যা বলা হল তা থেকে নৈতিকতার সংজ্ঞা নিম্নোক্ত রূপে নির্ধারণ করা যেতে পারে: নৈতিকতা হল ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, অপরাপর জনগণ বা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তির ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন সম্পর্কে, জনগণকে শিক্ষিত করার উপায় সম্পর্কে, কতকগুলি নৈতিক গুণ ও সম্পর্ককে শক্তিশালী করা সম্বন্ধে মতামত, ভাবধারা, আদর্শ ও বিচারের একটা ব্যবস্থা। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে নৈতিকতা আনুষ্ঠানিক আদেশের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বোঝান ও দৃষ্টান্তের শক্তির উপর, ব্যক্তিদের নৈতিক কর্তৃত্বের উপর অথবা কোনও একটা সম্প্রদায়ের জনমতের উপর। নৈতিকতা তার আদর্শ ও বিচারগুলিকে ভিতরকার অভিপ্রায়ে, নৈতিক অনুভূতি ও গুণে, ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতায় রূপান্তরিত করে।

বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মতাদর্শবিদদের দ্বারা রচিত নীতিশাস্ত্রগত

ব্যবস্থাগুলি তাদের নৈতিকতার মতই তাদের কালের ছাপ এবং সেই সব শ্রেণীর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির ছাপ বহন করে। অতীতকালে নীতিশাস্ত্র প্রধানত আগ্রহী ছিল নৈতিক (ধার্মিক) আচরণের ভিত্তিগুলি নিয়ে। তথাকথিত শাশ্বত "মনুষ্য স্বভাব" থেকেই নৈতিক আচরণের চাহিদাগুলির উদ্ভব ধরে নিয়ে প্রাক-মার্কসবাদী নীতিশাস্ত্র এই "মনুষ্য স্বভাব"কে হয় পরার্থপর অথবা দাম্ভিক বলে গণ্য করত। সেই অনুযায়ী হয় ব্যক্তির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত (সুখ, প্রমোদ, আনন্দ); সাধারণত সেগুলিকে আদর্শরূপে উপস্থিত করা হত, নয় সাধারণ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত, সাধারণ স্বার্থও সর্বজনীন নৈতিক বিধানের আদর্শায়িত রূপ নিত আর সেই নৈতিক বিধানের কাছে মানুষের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই নতিস্বীকার করাতে হবে বলে মনে করা হত, প্রাক-মার্কসবাদী নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের, সুখ ও কর্তব্যের, স্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগের সমন্বয় সাধনের উপায় খুঁজেছিল, কিন্তু বের করতে পারেনি। সমস্যাটাই উপস্থিত করা হয়েছিল এই সত্যের তোয়াক্কা না রেখে যে শ্রেণী-সমাজের মৌলিক বিরোধ ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বার্থের মধ্যে নয়, শ্রেণীগুলির মধ্যে, যার প্রত্যেকটি তার নিজস্ব নৈতিকতা, ভালমন্দ সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা গড়ে নেয়।

বিকশিত শ্রেণী-সমাজে আমরা দেখি অন্তত দুই বা কখনও কখনও বেশ কয়েকটি নৈতিক ব্যবস্থা, যার প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক সামাজিক তাৎপর্য আছে। যেমন বিগত শতাব্দীর শেষে ইউরোপের বুর্জোয়া দেশগুলিতে এঙ্গেলস তিন ধরনের নৈতিকতা লক্ষ্য করেছিলেন: ফিউডাল-খ্রিশ্চিয়ান, বুর্জোয়া ও সর্বহারা। প্রথমটি বুর্জোয়া সমাজ মধ্যযুগ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, দ্বিতীয়টি ছিল বিরাজমান ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রধানত চালু নৈতিকতা, এবং তৃতীয়টি ভবিষ্যতের স্বার্থের প্রকাশ করত। নৈতিকতার প্রথম দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ কি। প্রধান সংযোগ এই যে সমাজের স্তম্ভ হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর উভয়েই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির খাপ খাইয়ে নেওয়াই অনিবার্য। আমেরিকান সমাজতত্ত্ব-বিদ জেরোম ডেভিস ব্যাপারটা এইভাবে উপস্থিত করেছেন: "...ধনতান্ত্রিক স্বার্থগুলি দ্বারা ধর্মের উপর পারস্পরিক গ্রন্থিবন্ধ নিয়ন্ত্রণের ফল হয়েছে এই

যে খ্রিশ্চান সম্প্রদায়ের নীতিশাস্ত্রগত মানগুলি বহুল পরিমাণে ধনতন্ত্রের নীতিশাস্ত্রগত মানের অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল।"(১)

অনেক সময়ে প্রশ্ন ওঠে যে শ্রেণী সমাজে কি এমন কোনও নৈতিক মান আছে যা কোনও মানব সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক ? হাঁ, এরকম মান আছে। মানবিক নৈতিকতার কিছু সরল মান আছে যা সকল জাতির সমগ্র ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়। সেগুলি সম্প্রদায়কে বিপন্ন করতে পারে এমন বাড়াবাড়িগুলি (শারীরিক হিংসা, অপব্যবহার) থেকে সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য, সেগুলি প্রাত্যাহিক আদান-প্রদানের সততার দাবি করে, ইত্যাদি। এ সবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানুষের সমাজজীবনের মানগুলিকে (যথা—মানবিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা, জাতিতে জাতিতে শান্তি) কমিউনিস্টরা এবং সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক মনে করে।

যতক্ষণ মানুষ মানুষের দ্বারা শোষিত হবে, যতক্ষণ জাতিগুলিকে নিপীড়ন এবং লুণ্ঠনের নীতিসহ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততক্ষণ অবশ্য নৈতিকতা ও সুবিচারের সরল মানগুলি অবধারিতভাবে লঙ্ঘিত হবে। বুর্জোয়ারা এগুলির প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু বাস্তবে অগ্রাহ্য করে। ফ্যাশিস্ত বর্বরতা, মৃত্যু-শিবিরগুলিতে এবং গ্যাস ভর্তি ঘরে গণহত্যা প্রভৃতি প্রাথমিক নৈতিক মানের সবচেয়ে বর্বর লঙ্ঘন। একমাত্র সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতার সাধারণ মানবিক মানকে জীবনের অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়মে পরিণত করে। সি.পি.এস.ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত সমাজে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় সোভিয়েত জনগণকে কাজের প্রতি ও সামাজিক সম্পত্তির প্রতি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষিত করার জন্য, সচেতন শৃঙ্খলাবোধ ও সংগঠনকে দৃঢ় করার জন্য, তাদের সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্বন্ধে একটা গর্বের অনুভূতি জাগানর জন্য, এবং "জনগণের প্রতি একটা শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল মনোভাব, সততা, নিজের ও অপরদের কাছে থেকে কঠোর দাবি, বিশ্বাস ও কঠোর দায়িত্ববোধের সমন্বয় এবং সামাজিক

১। জেরোম ডেভিস, ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ইটস কালচার, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৪০০।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে, কাজে ও প্রাত্যহিক সম্পর্কে প্রকৃত কমরেড-সুলভ মনোভাব"(১) জাগানর জন্য।

কমিউনিস্ট নৈতিকতা সমসাময়িক সমাজের শ্রমিকশ্রেণী ও প্রগতিশীল শক্তিদের পৃথিবীতে মানুষে মানুষে প্রকৃত মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার মানবতাবাদী ব্রতকে প্রতিফলিত করে। মানুষের নৈতিক প্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্যগুলির এ মূর্ত প্রকাশ এবং এই ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত যা আয়ত্ত হয়েছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর। এর সবচেয়ে সাধারণ নীতিগুলি কমিউনিজম-এর প্রতি, শৃঙ্খলা-বোধের প্রতি ও নতুন সমাজ গঠনের সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের সংহতির প্রতি নিষ্ঠাবান। এই নতুন সমাজের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমজীবী জনগণ নতুন মানুষের জন্য, নতুন নৈতিক আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে। নতুন মানুষের নৈতিকতার একটা শ্রেণী-চরিত্র আছে, কিন্তু এর লক্ষ্য হল মানবজাতিকে সব রকমের নিপীড়ন ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। এই সমস্যার যখন সমাধান হয়ে যাবে তখন আর নৈতিকতার শ্রেণী-চরিত্র থাকবে না। এঙ্গেলস-এর ভাষায় "…শ্রেণী-বিরোধের এবং তার কোনও স্মৃতির ঊর্ধ্বে দাঁড়ায় যে নৈতিকতা তা সমাজের এমন একটা স্তরেই কেবল সম্ভব হয় যা শ্রেণী-বিরোধ কাটিয়ে উঠেছে; শুধু তাই নয়, বাস্তব জীবনে তা ভুলেও গিয়েছে।"(২)

(গ) চারুকলা।

বিজ্ঞানের মত চারুকলাও সমসাময়িক সমাজজীবনে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব অর্জন করছে।

চারুকলা হল সামাজিক চেতনার সবচেয়ে প্রাচীন রূপগুলির অন্যতম। প্রাক-শ্রেণী-সমাজের সময় থেকে এর অস্তিত্ব ছিল। আদিম সংস্কৃতির অনুশীলন থেকে দেখা যায় যে আদি প্রস্তর যুগ থেকে মানুষ ক্রমশ নিজেদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার তৈরি করতেই শুধু শেখেনি, চারুকলা সৃষ্টি করতেও শিখেছিল। শ্রম মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতাকে উন্নত করেছিল, চিন্তাকে বিকশিত করেছিল, হাতকে খেলিয়েছিল, অনুভূতিগুলির মধ্যে পার্থক্য এনে দিয়েছিল এবং সূক্ষ্ম কাজ, ছন্দ ও সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল। শ্রম

সামান্যীকরণের ক্ষমতা এবং বস্তু ও ঘটনাবলীকে উপমার রূপে পুনঃপ্রকাশ করার ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল। হাজার হাজার বছরের শ্রমক্রিয়ার ফল হিসাবে চারুকলা পৃথিবী সম্বন্ধে নান্দনিক উপলব্ধির একটি রূপ হয়ে উঠতে পেরেছিল, এমন একটা ক্রিয়া হয়ে উঠতে পেরেছিল যা ভূমি কর্ষণ বা পশু শিকারের জন্য জিনিস তৈরি করত না, মানুষের সৃজনশীল কল্পনা, তার ভাবধারা, আর অনুভূতিকে মূর্ত করার মত জিনিস তৈরি করতে পারত। চারুকলা যে চাহিদা পূরণ করত তা হল সৌন্দর্যের চাহিদা, মানুষকে উল্লসিত করতে পারে এমন জিনিস তৈরির চাহিদা। এই চাহিদাটাও উঠল মানুষের সৃজনশীল ক্রিয়ার অন্যতম রূপ হিসাবে শৈল্পিক ক্রিয়ার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। শৈল্পিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট নান্দনিক যোগ্যতা দাবি করল, নান্দনিক অনুভূতি, রুচি, মূল্যায়ন, অভিজ্ঞতা ও ভাবধারার চর্চা জাগাল। এগুলি হল মানুষের বিশ্বরূপ দর্শনের এক-একটা নির্দিষ্ট রূপ।

শ্রেণী-সমাজে চারুকলা হয়ে দাঁড়াল বৈষয়িক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। "বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে শৈল্পিক প্রতিভার একান্ত কেন্দ্রীভবন এবং ব্যাপক জনগণের মধ্যে তার দমন (যা এর সঙ্গেই বাঁধা ছিল) শ্রম বিভাগের একটা ফল।"[১]

চারুকলা হয়ে দাঁড়াল বহুল পরিমাণে সংস্কৃতিবান এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর—কবি, শিল্পী, স্থপতি, সংগীতকার ইত্যাদির বৃত্তি। এর বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শুরু হতে লাগল। এক নতুন দার্শনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব হল—সে হল নন্দনতত্ত্ব—সৌন্দর্য, তার সারমর্ম ও বিধানগুলি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধির অনুশীলন। চারুকলার বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন শুরু হল। বৃত্তিগত ক্ষেত্রের বাইরে কলা বিকশিত হল লোককলার রূপে (পুরাণ, লোকগীতি ইত্যাদি)। প্রাক-শ্রেণীসমাজে লোককলার গভীর মূল নিহিত ছিল এবং অনেক শতাব্দী ধরে লোককলা অম্লান শৈল্পিক মূল্যের সৃষ্টি ক'রে এসেছিল।

নন্দনতত্ত্বের এবং কলার অনুশীলনের অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন হল বাস্তবের সঙ্গে নান্দনিক চেতনার (সুন্দর, কুৎসিত ইত্যাদির ধারণা) ও কলার

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দা জার্মান ইডিওলজি, পৃষ্ঠা ৪৩১।

সম্পর্কের প্রশ্ন। দার্শনিক, কলাতত্ত্ববিদ ও শিল্পীদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের নানারকম জবাব মিলেছে। নন্দনতত্ত্বের বস্তুবাদী তত্ত্বগুলি বলে থাকে যে নান্দনিক চেতনা গঠনে বাস্তবতাই নিয়ামক উপাদান। পক্ষান্তরে ভাববাদী তত্ত্ব মনে করে নান্দনিক চেতনা ও কলা হল সামাজিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ।

তবে নান্দনিক ধারণাগুলির ঐতিহাসিক বিকাশ এ সাক্ষ্য দেয় যে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন যুগের লোকেদের মধ্যে এ ধারণাগুলির রীতিমত তফাত হয়। নারীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাসদের ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে নিকোলাই চের্নিশেভস্কি কতকগুলি সুগভীর মন্তব্য করেছিলেন। ভেনাস দ্য মিলোর মধ্যে মূর্ত সৌন্দর্যের প্রাচীন আদর্শের "তর্কাতীততার" (অর্থাৎ সমস্ত যুগের পক্ষে প্রযোজ্যতার) দাবির জবাবে প্লেখানভ মন্তব্য করেছিলেন যে, আদিম শিল্পীদের যে সব ছবিটিকে আছে তার অনেকগুলি থেকে বিচার করলে মনে হয় তারা এই মূর্তিতে কোনও সৌন্দর্য আবিষ্কার ক'রে উঠতে পারত না, আর মধ্যযুগীয় কলাও এই আদর্শকে স্বীকার করা থেকে বহু দূরে ছিল।

কিন্তু আদিম মানুষদের আঁকা ছবিতেও আমরা এমন একটা কিছু পাই যা আমাদের নান্দনিক আনন্দ দেয়। প্রাচীন কলা (বিশেষ করে গ্রীসের) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্কস লিখেছিলেন যে এই সময়কার সৃষ্টিগুলি "এখনও আমাদের নান্দনিক আনন্দ দেয়, এবং কতকগুলি দিক থেকে এগুলিকে মান হিসাবে ও আয়ত্তের অতীত আদর্শ হিসাবে গণ্য করা যায়।"(১) এর কারণ হিসাবে তিনি মনে করেছিলেন যে গ্রীক কলা ছিল মানুষের অপূর্ব শৈশব, যার আর কোনও দিন পুনরাবৃত্তি হবে না নিজেদের বিকাশের এমন একটা স্তর হিসাবে এ আমাদের চিরকাল মুগ্ধ ও উল্লসিত করবে। এর এমন সব বৈশিষ্ট্য ছিল যেগুলি সর্বজনীন মানবিক তাৎপর্যসম্পন্ন।

পক্ষান্তরে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন যদিও প্রাচীনদের চেয়ে অনেক উচ্চতর

কৃৎকৌশলগত স্তরের, তবু মার্কস-এর ভাষায় তা "…আত্মিক উৎপাদনের কতকগুলি শাখার প্রতি, যথা কলা ও কাব্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।(১)

ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপের মহান লেখকদের (যথা—স্তেঁধাল, বালজাক, হিউগো, ডিকেন্স প্রভৃতির) রচনা ধনতান্ত্রিক ভূমিতে জন্মেছিল কেবল সেই সমাজের পরিস্থিতিগুলি (অর্থের দাপট, স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতির মোহজালে লুকোন জঙ্গলের নৈতিকতা, ইত্যাদি), যেগুলি মানুষকে বিকৃত করে ও তার ব্যক্তিত্ব হরণ করে, তার প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ প্রকাশ হিসাবে।

কাজেই সামাজিক পরিস্থিতির উপর কলার ও নান্দনিক মতামতের নির্ভরশীলতা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। পরিস্থিতি এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থ ও তার শৈল্পিক প্রতিফলনের মধ্যে অনেকগুলি অন্তর্বর্তী গ্রন্থি আছে।(২) সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং চেতনার নানাবিধ রূপের মধ্যে তার প্রতিফলন এবং সেই সঙ্গে সমাজের কতকগুলি অংশের মনস্তত্ত্ব এদিক থেকে একটা বিরাট ভূমিকা নেয়। শিল্পীর নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তার প্রতিভা ও দক্ষতা, তার বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এবং কলা সম্পর্কিত যে চিন্তাধারার সে অংশীদার তার দ্বারা, কতকগুলি ঐতিহ্যের সঙ্গে তার যোগাযোগ ইত্যাদির দ্বারাও বাস্তবের শৈল্পিক পুনরুৎপাদন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়।

এ-কথাকে কলার বিকাশের সাধারণ বিধান হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তিগুলি, যেগুলি মানব সংস্কৃতির রত্নভাণ্ডারের অংশ, সেগুলি জীবন্ত সত্যের, কোনও এক যুগের মানুষের

প্রগতিশীল আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত শৈল্পিক প্রকাশ। কলার জাতীয় রূপ শিল্পীদের সাহায্য করেছে তাদের কালের অগ্রসর ভাবধারাকে প্রকাশ করতে, অবশ্য যতক্ষণ সে শিল্পী তার নিজের দেশের জনগণের সাচ্চা সন্তান থেকেও অপরাপর জাতির সাফল্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেনি ততক্ষণই তা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতি পরস্পরের উপর যে প্রভাব ফেলে তা বিবেচনা করতে যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে অতীত ও বর্তমানের সংস্কৃতিতে এমন অনেক জিনিস থাকবে যা উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম হব না। প্রগতিশীল কলা একই সঙ্গে তার নিজের দেশের জনগণের ও মানবজাতির স্বার্থসাধন করতে পারে, আপন কালের ও ভবিষ্যতের সেবা করতে পারে।

জনগণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে কলা তা সামাজিক প্রগতিতে একটা শক্তিশালী উপাদান। এই কলা তার ভূমিকা পালন করে বিশ্বের শৈল্পিক উপলব্ধির মারফত, মানুষের নান্দনিক চাহিদা মেটানর মারফত। শৈল্পিক ভাবমূর্তির ভিতর এ বাস্তবকে প্রতিফলিত করে এবং সেগুলির মারফত জনগণের চিন্তা ও অনুভূতিকে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্রিয়া ও আচরণকে প্রভাবিত করে। যেহেতু কোনও না কোনও বৈষয়িক মাধ্যমের ভিতরে তার প্রকাশ ঘটে তাই শিল্পকীর্তিগুলি এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে অর্পিত হয় এবং সামাজিক জীবনকে জানার উপায় ও তরুণ প্রজন্মগুলির মতাদর্শগত, নান্দনিক ও নৈতিক শিক্ষার উপায় উভয় হিসাবেই কাজ করে।

নান্দনিক চিন্তায় এমন সব তত্ত্ব ছিল ও আছে যেগুলি কলার সামাজিক ভূমিকা অস্বীকার করে এবং তাকে "আপনাতে আপনি সমাপ্ত" বলে মনে করে। এই সব তত্ত্ব সাধারণত নিজের সামাজিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শিল্পীর বনিবনার অভাবকে প্রকাশ করে এবং কতকগুলি অবস্থায় তাকে এমন পথ দেখায় যাতে সে কোনও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করা থেকে সরে যায় ও বহিরঙ্গঘটিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে একপেশে উৎসাহে ডুবে থাকে।

কলার ইতিহাস ও আমাদের কালে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের যুগে তার বিকাশ দেখিয়ে দেয় যে কলা ও বিজ্ঞান বাস্তবকে জানার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে।

অবশ্য কলা ও বিজ্ঞানের নিজস্ব নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। বাস্তবতার এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেগুলি কলার পরিসরের বাইরে, কিন্তু জীবনের এমন কতকগুলি দিকও আছে যার প্রতিফলনে বিজ্ঞানের চেয়ে কলার বেশি সুযোগ আছে। মানবিক নৈতিক আদর্শ, অনুভূতি, মেজাজ, আবেগ, চরিত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষত সত্য।

শৈল্পিক প্রকাশের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হল সমাজের জীবন, বিশেষ ক'রে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কলা প্রকৃতিকেও চিত্রিত করে। কিন্তু এমনকি সে ধরনের চিত্রণের মধ্যেও সব সময়ে কিছু মানবিক অনুভূতি, আবেগ, মেজাজ, চরিত্র ইত্যাদি নিহিত থাকে। শিল্পী প্রকৃতির ছবি তোলে না, তাকে নান্দনিক উপলব্ধি দিয়ে আত্মস্থ করে। প্রকৃতির মধ্যে কোনটা সুন্দর সমুজ্জ্বল অথবা কুৎসিত সে সেটা কেবল বস্তুগুলির প্রকৃত গুণের ভিত্তিতে বিচার করে না, বিচার করে তার নিজস্ব নান্দনিক "মানদণ্ড" প্রয়োগ করে। কোনও লোক যখন এক বা অপর বস্তুকে চমৎকার বলে (যথা উচ্চ পর্বতকে), তখন সে বস্তুর চরিত্র এবং মনের উপর যে ছাপ ফেলছে উভয়কেই প্রকাশ করে। বালজাক লিখেছিলেন "কলার কর্তব্য কেবল প্রকৃতির নকল করা নয়, তাকে প্রকাশ করা······কোনও শিল্পী, কবি বা স্থপতির উচিত নয় তার ছাপকে তার উৎস থেকে পৃথক করা, কারণ তারা অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের অংশ।"(১) উপরন্তু বালজাক কেবল একটা ক্ষণিক, বিষয়ীগত ছাপের কথা ভাবেননি, ভেবেছেন "বস্তু ও সত্তার অন্তর্নিহিত মনোভাব, আত্মা ও চেহারার মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশের কথা।(২)

জনগণ, তাদের অন্তর্লোক ও সামাজিক আদান-প্রদানের চিত্রণ সম্পর্কে এ দাবি আরও বেশি প্রযোজ্য। সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে কুৎসিত ও সুন্দর, দুঃখজনক ও হাস্যকর, বীরোচিত ও তুচ্ছের চিত্রণের পূর্বশর্ত হল সামাজিক বাস্তবতা, তার বিকাশ ও অর্থ সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান। বাস্তবতার পরিমাপ করার জন্য শিল্পী যে নান্দনিক "মানদণ্ড" ব্যবহার করে তা কেবল

১। বালজাক অন আর্ট, মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯৪১, পৃষ্ঠা ১৬৪ (রুশ ভাষায়) থেকে উদ্ধৃত।

২। উপরোক্ত।

তার বিষয়ীগত ইচ্ছার একটা প্রকাশ নয়। মানব জাতির সমগ্র সামাজিক-ঐতিহাসিক ব্যবহারের প্রক্রিয়ায় এ গঠিত হয়।

কাজেই কলায় জ্ঞানীয় (সেই সঙ্গে রাজনৈতিক, নৈতিক, শিক্ষাগত ইত্যাদি) তাৎপর্যকে বিচার করতে হবে তার মতাদর্শগত ও নান্দনিক ভূমিকার সংশ্লেষে। শিল্পী যখন ভাবমূর্তির রূপে বাস্তবকে পুনরুপস্থিত করে তখন সে বাস্তবের একটা মতাদর্শগত ও নান্দনিক মূল্যায়ন করে, অর্থাৎ বাস্তব সম্বন্ধে নিজের নান্দনিক অনুযায়ী, সুন্দর সম্পর্কে নিজের ধারণা অনুযায়ী সে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। এর থেকে বোঝা যায় যে বাস্তবের বিষয়গত গুণাবলীর সঙ্গে এই সব ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার এবং বাস্তবের বিকাশ ও রূপান্তরের পথ সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধির উপর এগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গুরুত্ব কতখানি। শিল্পকর্মের জন্য বিষয় বাছার ব্যাপারেও শিল্পীর "বিশেষ ঝোঁক থাকে", আর এ কথা তো বলাই বাহুল্য যে সে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে রায় দেয়, একটা জিনিসকে প্রশংসা ও অন্য একটা জিনিসকে নিন্দা করে, কতকগুলি অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে।

শিল্পী চেষ্টা করে জীবনের একটা সামান্যীকৃত প্রতিফলন দিতে; বাস্তবের অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি (যথা—জনগণ, তাদের সম্পর্কসমূহ) তুলে ধরতে। শৈল্পিক ভাবমূর্তি ও বৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য এই যে ভাবমূর্তিতে সামান্যীকরণটা দেওয়া হয় ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এমন একটা জীবন্ত ও নির্দিষ্ট সমগ্র হিসাবে। উদাহরণ স্বরূপ, রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্বন্ধীয় একটা বৈজ্ঞানিক রচনায় পুঁজিপতি পুঁজির ব্যক্তিরূপ মাত্র, পুঁজিপতির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কোনও গুরুত্ব নেই। কিন্তু শৈল্পিক রচনায় পুঁজিপতি সামান্যীকৃত, কিন্তু আবার পৃথকীকৃতও, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় এমন একটি ভাবমূর্তি, অন্তর্লোকসহ এবং নির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত কর্ম ও ক্রিয়াকলাপ সহ একটা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

যে সব কথা বলা হল তা থেকে কলার সংজ্ঞাকে আমরা নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করতে পারি : কলা হল <u>সামাজিক চেতনার এবং বাস্তবকে আত্মস্থ করার, শৈল্পিক দিক থেকে তাকে জানান ও মূল্যায়নের একটা নির্দিষ্ট রূপ; মানুষের সৃজনশীল ক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট</u>

রূপ। যে সব শিল্পকর্ম বাস্তবকে (যথা—সামাজিক সংঘর্ষ; মানুষের বিভিন্ন ধরন ও চরিত্র; তাদের ক্রিয়া ও আচরণ ইত্যাদিকে) সঠিকভাবে পুনরুৎপাদিত করে সেগুলি সমসাময়িক কালের মানুষদের উপর এবং পরবর্তী বহু প্রজন্মের উপরও বিপুল মতাদর্শগত, নান্দনিক ও নৈতিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। কলার বিশেষ গুণ হল মানুষকে নান্দনিক আনন্দ দেওয়া এবং মানুষের মধ্যে ভাবধারা; অনুভূতি ও আবেগ "সংক্রামিত" করা।(১)

লেনিনের মতে; কলার উচিত আপন কালের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি হওয়া ও লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আনন্দ ও অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া, তাদের অনুভূতি চিন্তা ও ইচ্ছাকে ঐক্যবন্ধ করা, আত্মিকভাবে তাদের সমৃদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যেকার শিল্পীকে জাগিয়ে তোলা। সোভিয়েত সমাজ যত কমিউনিজম-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে সোভিয়েত ব্যক্তির বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের নৈতিক সাফল্য ও মননগত সংস্কৃতির গঠনে সাহিত্যের ভূমিকা সেই অনুপাতে বাড়ছে।

কলা মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত এবং সমাজতন্ত্র সেই লক্ষ্য পূরণ করতে চেষ্টা করে। সমাজতন্ত্র যদিও শিল্পীর উপর এমন কোনও কঠোর দাবি আদৌ করে না যা তার চিন্তা বা কল্পনার পাল্লাকে সীমাবন্ধ করে, তবে সমাজতন্ত্র মনে করে শিল্পীর কর্তব্য হল যে লক্ষ লক্ষ মানুষ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করছে তাদের সাহায্য করা। এর মধ্যেই নিহিত আছে কলার পক্ষভুক্ততা এবং তার সত্যকারের স্বাধীনতা। এ রকম কলাকে কখনও মুষ্টিমেয় উন্নাসিক লোকের অথবা আদিম রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না। লেনিন বলেছিলেন শ্রমিক ও কৃষকেরা এক বাস্তব ও মহৎ কলার অধিকার অর্জন করেছে।

(ঘ) ধর্ম।

ধর্ম ও দর্শন, সামাজিক চেতনার সেই রূপ যা জনগণের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে, তাকে মার্কস ও এঙ্গেলস অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী বলে মনে করতেন।

১। যদিও সাহিত্য, সংগীত, চিত্র প্রভৃতি শিল্পকর্মের কোনও উপযোগগত তাৎপর্য নেই কলার কতকগুলি রূপ (যথা—স্থাপত্যবিদ্যা, অলংকরণের কলা আধুনিক শিল্পের নকশা প্রভৃতি) নান্দনিক মূল্যের সংগে উপযোগগত উদ্দেশ্যের সমন্বয় ঘটায়।

ধর্মের উদ্ভব দর্শনের চেয়ে আরও অনেক প্রাচীন। প্রাক-শ্রেণী সমাজে ধর্মের উদ্ভব উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের অভাব দ্বারা প্রভাবিত হত। মার্কস লিখেছিলেন "তারা (উৎপাদন সম্পর্কগুলি—সম্পাদক) তখনই কেবল উঠতে ও বিরাজ করতে পারে যখন শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা একটা নিম্নস্তরের বেশি ওঠেনি এবং ফলত যখন বৈষয়িক জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক তদনুযায়ী সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণতা প্রাচীন কালের প্রকৃতি পূজার মধ্যে এবং জনপ্রিয় ধর্মের অপরাপর উপাদানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।"(১)

ধর্মের গোড়ার দিককার রূপগুলি প্রাকৃতিক শক্তি, বৃক্ষ ও প্রাণীর উপর দেবত্ব আরোপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সব রূপের অবশিষ্ট (অ্যানিমিজক বা জড় বস্তুতে প্রাণ আরোপে বিশ্বাস), টোটেমিজম বা গোত্রচিহ্ন হিসাবে প্রাণীর প্রতিকৃতি (অর্থাৎ টোটেম) ব্যবহার করায় বিশ্বাস এমনকি পরবর্তী ধর্মগুলির মধ্যেও টিকে ছিল। যেমন গ্রীক দেব জিউস-এর আকৃতি যদিও মানুষের মত ছিল তবু তিনি ষাঁড়, ঈগল বা রাজহাঁসে রূপান্তরিত হতে পারতেন। মিশরীয় দেব আনুবিস-এর দেহ ছিল মানুষের মত আর মাথাটা কুকুরের। প্রকৃতির উপাদানগুলিতে দেবত্ব আরোপ ও সেগুলির পূজা থেকে মানুষ সামাজিক শক্তিগুলিতে দেবত্ব আরোপ করায় পেঁছিল, এর ফলে দেবতাদের ভূমিকায় তদনুযায়ী পরিবর্তন এল। প্রাচীন গ্রীক পুরাণে মারস (মঙ্গল) প্রথমে ছিলেন গাছপালার দেবতা, পরে হলেন যুদ্ধের দেবতা। হেফায়েসতস গোড়ায় ছিলেন অগ্নির দেবতা, পরে হলেন কামারশালের দেবতা।

ধর্মের ইতিহাস এ কথাও দেখায় যে কোনও লোকেদের মধ্যেই ধর্ম একেশ্বরবাদ (এক ঈশ্বরের মতবাদ) দিয়ে শুরু হয়নি, যদিও কিছু কিছু ধর্মতত্ত্ববিদ এরকম দাবি করে থাকে। বরঞ্চ একেশ্বরবাদের আগে এসেছিল বহু-ঈশ্বরবাদ যার মধ্যে অনেক দেবতার পূজার ব্যবস্থা ছিল।

জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের সময়ে পরাজিতদের দেবতারা বিজয়ীদের দেবতাদের কাছে নতিস্বীকার করত, বিজয়ীদের দেবতারা অনেক সময়ে

১। কে. মার্কস, ক্যাপিটাল ভল্যুম ১. মস্কো ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৭৯।

পরাজিতদের দেবতাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করত। ট্রাইব ও জাতিসত্তাদের একত্রিত হওয়া অনেক সময়ে তাদের দেবতাদের ও অপরাপর পূজ্য বস্তুর সমন্বয় বা এমনকি মিশ্রণ ঘটাত। ট্রাইবগুলির সমাহারের এবং গোড়ার ধরনের রাষ্ট্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল বহু ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব। এ সব সমাহার বা রাষ্ট্রে সাধারণত অনেকগুলি দেবতার মধ্যে থেকে একজন সর্বোচ্চ দেবতা উঠে আসত। যখন সম্রাট-ভিত্তিক বড় বড় রাজ্যের পত্তন হল তখন বহু ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গা নিল একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পূজা, আর সেই ঈশ্বরই তখন আর সমস্ত দেবতার গুণগুলি আত্মসাৎ করল। এঙ্গেলস লিখেছিলেন "এক (ও একমাত্র) ঈশ্বর কখনই জন্ম নিত না এক (ও একমাত্র) রাজা ছাড়া। …ঈশ্বর, যে বহুবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিবদমান প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে একত্র রাখে, তার একত্ব কেবল এক প্রাচ্য স্বৈরাচারীর প্রতিফলন, যে দৃশ্যত অথবা প্রকৃতপক্ষে সংঘর্ষসংকুল স্বার্থসহ বিবদমান ব্যক্তিকে একত্র রাখে।"(১)

স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত সামাজিক সম্পর্কগলি, যেগুলি মানুষদের নিজেদের বৈষয়িক ও আত্মিক ক্রিয়ার ফল, শ্রম বিভাগের বিকাশ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীসমূহের আবির্ভাবের পর যেগুলি মানুষের উপর বিশেষ ক্ষমতা আয়ত্ত করল।

বাস্তবের কল্পনাপ্রসূত প্রতিফলন হিসাবে ধর্ম ততক্ষণ অনিবার্যভাবে বর্তমান থাকে যতক্ষণ মানবিক শ্রমের উৎপন্নগুলি উৎপাদকদের উপর আধিপত্য করে। ঠিক যেমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অসহায়তা অতিপ্রাকৃতিক সত্তার উপর বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল তেমনি সামাজিক বিকাশের অন্ধ শক্তিগুলির সামনে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের জনগণের অসহায়তা অনুরূপ এক বিশ্বাসের জন্ম দেয়। লেনিনের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজে "…শ্রমজীবী জনগণের সামাজিকভাবে পদদলিত অবস্থা এবং ধনতন্ত্রের অন্ধ শক্তিগুলির সামনে আপাতদৃষ্টিতে তাদের সম্পূর্ণ অসহায়তা"(২) হল ধর্মের গভীরতম মূল। এই সব শক্তির সামনে মানুষ এক হতভাগ্য প্রাণী, দেবতার দাস, সর্বশক্তিমানের কাছে দয়ার ভিখারী।

১। মার্কস/এঙ্গেলস, ভেরকে, খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা ৫৭।
২। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৫, পৃষ্ঠা ৪০৫-০৬।

অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস এবং পৃথিবী ও মানুষ সম্পর্কে কল্পনাপ্রসূত ধারণা ছাড়াও সমস্ত ধর্মে একটা প্রধান ভূমিকা নেয় ধর্মীয় উপাসনা। কতকগুলি ধর্মীয় আচার নিয়ে এই উপাসনা তৈরি, যে আচারগুলির মূলে নিহিত আছে আদিম যাদুবিদ্যার মধ্যে। আদিম মানুষ যেমন কিছু যাদুঘটিত আচার (দেবতাদের আহ্বান, বলিদান ইত্যাদি) অনুষ্ঠান ক'রে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা পূরণ করানর চেষ্টা করত, তেমনিই বর্তমানের ধর্মবিশ্বাসী লোকেরা কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সাহায্যে এবং আধুনিক ধর্মগুলি কর্তৃক আরোপিত কিছু নিষেধ মেনে চ'লে ঈশ্বরের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করে।

আদিম সমাজে ওঝা, ডাইনি-চিকিৎসক প্রভৃতি ছিল জনগণ ও গূঢ় শক্তিগুলির ভিতরে মধ্যস্থ। শ্রেণী-সমাজ ধর্মের সেবকদের এক বিশেষ পেশাদার গোষ্ঠীর জন্ম দেয়, তারা হল যাজক। গীর্জা মানুষের মনের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। এর মতাদর্শগত প্রভাব আরও শক্তিশালী হয় রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের মারফত এবং একটি বিশেষ ধর্মবিশ্বাস রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মারফত। ধর্মীয় উপাসনার আরও উন্নতি হয় এবং গান-বাজনা সহ ধর্মীয় উপাসনার অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুভূতি জাগাতে ও বিশ্বাস বাড়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

ধর্মের তিনটি উপাদান, অর্থাৎ (১) ধর্মীয় ধারণা, (২) ধর্মীয় অনুভূতি, (৩) উপাসনা ও আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর ক'রে তাদের গুরুত্বের তারতম্য হয়। ধর্ম হল সবচেয়ে রক্ষণশীল মতাদর্শগত রূপ এই দিক থেকে যে সে তার শিক্ষাগুলিকে ঈশ্বরের নামে টিকিয়ে রাখে।

সেই সঙ্গে ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় যে বিরাট বিরাট সামাজিক অভ্যুত্থানের প্রভাবে এক-একটা ধর্ম অপরাপর ধর্মকে স্থানচ্যুত করে। দাস সমাজের পতনের পর্যায়ে প্রাচীন ধর্মগুলি খ্রিস্টান ধর্মের কাছে পরাজিত হয়েছিল। উপরন্তু খ্রিস্টান ধর্ম পুরানো ধর্মগুলির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল, যথা—ইহুদী ধর্মের ওল্ড টেস্টামেন্টকে স্বীকৃতিদান এবং প্রাচ্য জাতিগুলির দেবতাদের যন্ত্রণা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত পৌরাণিক আখ্যানের স্বীকৃতিদান। শেষোক্ত সবগুলি

একত্রে মিশ্রিত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ছিল গ্রীক দর্শনের, বিশেষত স্তোইকদের দর্শনের বিকৃত সংস্করণ।

রোমক সাম্রাজ্যে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের ধর্ম হিসাবে উদ্ভূত হয়ে ক্রিশ্চান ধর্ম পরবর্তীকালে শাসকশ্রেণীর সরকারী মতাদর্শে পরিণত হল এবং গোড়ার দিককার ক্রিশ্চান ধর্মের অনেকগুলি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলল, হারাল তার গণতান্ত্রিক মনোভাব, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপত্তি ইত্যাদি। সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে "...ক্রিশ্চান ধর্ম তার ধর্মীয় পরিপূরক হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল, সঙ্গে রইল অনুরূপ সামন্ততান্ত্রিক যাজকতন্ত্র।"(১) ষোড়শ শতাব্দীতে বুর্জোয়াদের উদ্ভব ও শক্তি সঞ্চয়ের ভিত্তিতে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম তার ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অব্যবহিত যোগাযোগের ধারণা, ব্যক্তির প্রতি তার আবেদন, মিতব্যয়িতা, অধ্যবসায় প্রভৃতির মত গুণগুলির শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ক্যাথলিক গীর্জার থেকে পৃথক হয়ে গেল। ধনতন্ত্রের বিকাশ ক্যাথলিক ধর্মকে বাধ্য করল তার অনড় মতবাদ বজায় রেখেও নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সমঝোতা ঘটান, ঔপনিবেশিকতাবাদের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ ইত্যাদি লক্ষ্যসহ তার নিজস্ব সামাজিক মতবাদ গড়ে তুলতে।

বর্তমানে ক্রিশ্চান ধর্মের সকল শাখা ও অপরাপর ধর্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ এবং সমাজের জীবনে সুগভীর বিপ্লবী প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। সমাজতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলির অগ্রগতি, পারমানবিক যুদ্ধের বিপদ ও শান্তির জন্য ব্যাপক জনগণের শক্তিশালী আন্দোলন কিছু ধর্মীয় নেতাদের উৎসাহিত করেছে (তাদের প্রথাসিদ্ধ প্রধান প্রধান অনড় মতবাদগুলিকে বজায় রেখেও) শান্তি, মৌলিক মানবিক অধিকার, সকল জাতির মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা, ইত্যাদির জন্য সংগ্রামরত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সহযোগিতা করতে। মূলত অবশ্য ধর্ম একটা নবীকরণে সক্ষম, সৃজনশীল সামাজিক শক্তি হিসাবে কাজ করতে

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

পারে না। ধর্ম কেবল প্রচলিত প্রথা; প্রতিরোধ ও রক্ষণশীলতার শক্তিই হতে পারে। এর কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

পূর্বোক্ত কথাগুলি এ সত্যকে কোনও মতেই খণ্ডন করে না যে কতকগুলি সময়ে (উদাহরণ স্বরূপ—মধ্যযুগে) বিপ্লবী জনগণ তাদের দাবিকে একটা ধর্মীয় রূপ দিয়েছিল "...আর সব কিছু ছেড়ে ধর্ম দিয়ে জনগণের ভাবাবেগকে পরিপুষ্ট করা হয়েছিল; সেই কারণে একটা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য তাদের নিজস্ব স্বার্থকে ধর্মের ছদ্মবেশে উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তা ছিল।"(১)

কিন্তু ইতিবাচক সামাজিক আধেয়, যা কতকগুলি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ধর্মীয় চেতনার রূপ নিয়েছিল, তা এই মৌলিক প্রতিজ্ঞাকে নস্যাৎ করে না যে ধর্মীয় চেতনা একটা পশ্চাদগামী চেতনা, আর সেই কারণেই ধর্ম কখনও জনগণের জরুরী স্বার্থ ও মানব-জীবনের অর্থ প্রকাশ করার উপযুক্ত রূপ হতে পারে না। ধর্ম সব সময়েই "জনগণের আফিম", অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণের আত্মিক দাসত্বের একটা উপায় হিসাবেই ছিল ও থাকবে।

মার্কসবাদ পুরানো বস্তুবাদীদের কাছ থেকে জঙ্গী নিরীশ্বরবাদের পতাকা তুলে নিয়েছিল এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারগুলির ভিত্তিতে তাদের ধর্ম সম্পর্কিত সমালোচনাকে দাঁড় করিয়েছিল। মার্কসবাদ শ্রেণী-সমাজে ধর্মের মূলগুলিকে উদ্ঘাটিত করেছিল এবং দেখিয়েছিল যে গোড়ার দিককার বস্তুবাদীরা যে মনে করেছিল ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জনগণকে শিক্ষিত করার ব্যাপার, আসলে ব্যাপারটা কেবল তা নয়। একে সর্বোপরি সেই সব পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে যা থেকে ধর্মের জন্ম হয় ও তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। একমাত্র সেই ভিত্তিতেই বাস্তবিক ফলপ্রসূ নিরীশ্বরবাদী জ্ঞান প্রসারিত হতে পারে। বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার কাজের এ এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কমিউনিস্ট সমাজ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জনগণকে চিরকালের জন্য মুক্তি দেবে। নতুন সমাজ গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা অবশ্য দেখিয়ে দেয় যে ধর্মীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির সামাজিক মূলগুলি হীনবল হওয়ার এবং গীর্জার প্রাক্তন রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ভূমিকা হারানর পরও ধর্ম কতখানি নাছোড়বান্দা

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস্, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

হতে পারে। এই পরিস্থিতিতেও ধর্ম টিকে থাকে কতকগুলি কারণে, তার কিছু কারণ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য, আর কিছু আছে যা শুধু এক বা অপর দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। জনসমষ্টির কতকগুলি অংশ যারা উৎপাদনের সবচেয়ে পশ্চাদপদ রূপগুলির সঙ্গে জড়িত অথবা সমাজ-জীবনে যারা অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা নেয় তাদের মধ্যে শতাব্দী-প্রাচীন প্রথাগুলির (বিশেষত ধর্মীয় আচার-সংক্রান্ত প্রথাগুলির) টিকে থাকা, ব্যক্তিগত জীবনে বাধাবিঘ্ন ও দুর্ভাগ্য (বিশেষত যুদ্ধের সময়কার অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন), শ্রম ও সামাজিক সেবামূলক কাজের সংগঠনে ত্রুটি-বিচ্যুতি, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব—এই সমস্ত ও আরও কিছু কারণ পশ্চাদপদ লোকেদের মধ্যে ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে জিইয়ে রাখে এবং গীর্জার প্রভাবকে মদত যোগায়। সেই কারণে নতুন সমাজের সচেতন নির্মাতাদের কর্তব্য হল সামাজিক অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর ক'রে নিয়মিত নিরীশ্বরবাদী প্রচার চালান।

সমাজ-চেতনার এই বিচারের সময় আমরা অবশ্য এর অন্যতম নির্দিষ্ট রূপ হিসাবে দর্শন নিয়ে আলোচনা করছি না, কারণ পূর্বেকার পরিচ্ছেদে আমরা দর্শনের বিষয়টি এবং সমাজ-জীবনে তার স্থান ও ভূমিকার বিষয়টি আলোচনা করেছি।

৪. *সামাজিক চেতনার আপেক্ষিক স্বাধীনতা। এর রূপগুলির যোগাযোগ ও পারস্পরিক প্রভাব*

সামাজিক চেতনা সামাজিক সত্তা দ্বারা নির্ধারিত হয়; তবু এর কিছুটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা থাকে। অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যখন মৌলিক পরিবর্তন আসে তার অর্থ এই নয় যে সামাজিক চেতনায় তদনুযায়ী পরিবর্তন আপনা থেকেই এসে যাবে।

সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও মতাদর্শ উভয় ক্ষেত্রেই চেতনার বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিকাশের ধারাবাহিকতা এবং পারস্পরিক ক্রিয়াও থাকে।

প্রথমত জনগণের চেতনায়, বিশেষত সাধারণ প্রাত্যহিক চেতনায় ঐতিহ্য ও অভ্যাসের বিপুল ভূমিকার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

অবশ্য যে সব ঐতিহ্য ও অভ্যাস জীবনের নতুন রূপ ও নতুন চেতনাকে বাধা দেয় তাদের থেকে যে গুলিকে রক্ষা করা ও উৎসাহিত করা উচিত তাদের তফাত করতেই হবে। প্রগতিশীল ঐতিহ্য ও অভ্যাস (বিপ্লবী ও শ্রম সংক্রান্ত ঐতিহ্য, যৌথ জীবনের কিছু নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস ইত্যাদি) আত্মস্থ করা সামাজিক প্রগতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক চেতনার সংস্কারের প্রক্রিয়া বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সব সময়ে সমান স্বাচ্ছন্দ্য ও দ্রুততার সংগে এগোয় না। এমনকি সোভিয়েত সমাজেও কিছু ব্যক্তির অথবা সমাজের কিছু কিছু অংশের চেতনার মধ্যেও আমরা নেতিবাচক মনোভাবের সম্মুখীন হই। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে উদ্ভূত হতবুদ্ধি চেতনার কথা বলতে গিয়ে লেনিন লিখেছিলেন "লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে অভ্যাসের শক্তি এক ভয়ংকর শক্তি।"(১) এই ধরনের অভ্যাস, জনগণের চেতনায় অতীতের রেশ তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তির অবলোপের পরও টিকে থাকে। এর উদাহরণ হল লোভ, ঘুষ, মাতলামি, অলসতা, মুনাফাখোরি, আমলাতন্ত্র, ইত্যাদি। এই সব নেতিবাচক উপাদানের বিরুদ্ধে সমাজ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রগতিশীল, রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিকরা নির্মম সংগ্রাম করছে এবং তা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।

মতাদর্শ বিকাশের আপেক্ষিক স্বাধীনতা একটা বিশেষ ভূমিকা নেয়। এর ইতিহাস এই সত্যের দ্বারা চিহ্নিত যে মতাদর্শ হল ভাবধারাগুলির একটা প্রণালীবদ্ধ সমাবেশ। যদিও এর বিকাশ শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিকাশ দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবু মতাদর্শের প্রতিটি রূপের ও সামাজিক চেতনার প্রতিটি রূপের নিজস্ব ধারাবাহিকতা আছে। যথা—দর্শনের তুলনায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তির উপর নির্ভরশীলতার মাত্রা বেশি; দর্শন ভিত্তিকে কম প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত করে, ফলত তার বিকাশের স্বাধীনতা আপেক্ষিকভাবে বেশি।

অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত বিকাশের সঙ্গতির অভাব মতাদর্শের প্রত্যেক ক্ষেত্র থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান যায়। যথা—দর্শনের ইতিহাস থেকে

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩১, পৃষ্ঠা ৪৪।

আমরা জানি যে যদিও অর্থনৈতিক বিকাশে ফ্রান্স ইংল্যান্ডের চেয়ে পিছিয়ে ছিল, তবু ফরাসী বস্তুবাদ ইংরেজ বস্তুবাদের তুলনায় বিকাশের উচ্চতর স্তরে উঠেছিল। রাশিয়া যদিও ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড উভয়ের তুলনায়ই কম উন্নত ছিল, তবু রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বস্তুবাদ ফরাসী বস্তুবাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর ও বেশি বিকশিত। ফরাসী বুর্জোয়ারা ইংরেজ বুর্জোয়াদের তুলনায় যে বেশি অগ্রসর চিন্তাসম্পন্ন ছিল এবং রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা যে জারতন্ত্রী রাশিয়ার সুগভীর বিরোধগুলি দেখতে পেয়েছিল এবং শোষিত কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পেরেছিল সেকথা একদিক থেকে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একথাটাও গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়ার বস্তুবাদ তার নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখেও ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তার উপর নির্ভর করতো এবং তাকে আরও বিকশিত করেছিল। কাজেই আধুনিক কালের বস্তুবাদ যদিও মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক তরঙ্গোচ্ছ্বাসের দ্বারাই আহৃত হয়েছিল তবু তার বিকাশে সে অর্থনৈতিক নয় এমন উপাদানের উপর নির্ভর করত, যেমন দার্শনিক চিন্তার বিকাশের আভ্যন্তরিক ধারাবাহিকতা এবং তার নিজস্ব আভ্যন্তরিক চাহিদা, যার মধ্যে কতকগুলি দার্শনিক সমস্যা উপস্থাপন ও তার সমাধান নিহিত ছিল।

অগ্রসর মতাদর্শ সামাজিক বিকাশের জরুরী প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করে এবং এই অর্থে তার বিষয়গত গতিধারাকে আগে থেকে দেখাতে পারে, কিন্তু এর ব্যাখ্যা এমন হওয়া উচিত নয় যে চেতনা আর সত্তার দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে না। বিষয়টা এই যে চেতনা সামাজিক সত্তার বিকাশের কতকগুলি প্রবণতাকে উদ্ঘাটিত করে এবং সেগুলিকে মোটামুটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। বিকাশের প্রবণতা ও প্রক্রিয়াগুলিকে আগে থেকে বুঝতে সক্ষম হওয়ার দরুন এ প্রগতিশীল সামাজিক ভাবধারাগুলির রূপান্তর ঘটানর ক্ষমতাকে ব্যবহার করা সম্ভবপর করে এবং সামাজিক বিকাশে সেগুলির সক্রিয় ভূমিকার সাক্ষ্য দেয়।

সামাজিক চেতনার আপেক্ষিক স্বাধীনতা তার রূপগুলির আন্তঃসম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রভাবের ভিতরেও প্রকাশিত হয়। এর অর্থ হল মতাদর্শগত রূপ, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তার কোনও এক বা অপর রূপের ইতিহাসে কতকগুলি প্রশ্ন ওঠে এবং

অপরাপর মতাদর্শগত রূপের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে সেগুলির সমাধান হয়।

চেতনার কতকগুলি রূপ, যা একটা নির্দিষ্ট সমাজের (মূলত তার নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর) চেতনার পূর্ণতম কেন্দ্রীভবনের সুযোগ দেয়, প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগেই তা সামনে এগিয়ে আসে। আমরা জানি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসে দর্শন ও কলা থিয়েটার, ভাস্কর্য, স্থাপত্য) সামাজিক চেতনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপে দর্শন, নৈতিকতা, কলা এবং রাজনৈতিক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর ধর্মই প্রধান প্রভাব ফেলেছিল। মধ্যযুগীয় দর্শন ছিল ধর্মতত্ত্বের ক্রীতদাসী। সে যুগে এমনকি বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী চিন্তাও কেবল ধর্মতাত্ত্বিক ছদ্মবেশেই হাজির হতে পারত। ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিস্থিতিতে মানুষের হৃদয় ও মনের উপর ধর্ম অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব ফেলে। ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের দার্শনিক, রাজনৈতিক ও আইনগত বিশ্বাস ও তত্ত্বসমূহের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, আর ধর্মকে এগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে।

কতকগুলি সময়ে সামাজিক চেতনার বিভিন্ন রূপ (ধর্ম, দর্শন, কলা) রাজনৈতিক সংগ্রামের উপায় হিসাবে রাজনৈতিক ভাবধারা প্রচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। এই কারণেই আন্দ্রে বনার্দ-এর মতে চিরায়ত ট্র্যাজেডিতে "…ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভাগ্যহত নায়কের সংগ্রাম পুরাকাহিনীর ভাষায় বর্ণিত খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ থেকে ৫০০ সালের মধ্যে নিপীড়ক সামাজিক বাধানিষেধগুলির কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়।…"(১)

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জার্মানিতে, ১৮০৪ সাল থেকে ১৮৭০ সালে রাশিয়ায় দর্শন ও সাহিত্য সেই সব প্রগতিশীল শক্তিগুলির রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল যারা মানুষের আপন বিকাশ ও মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে মুক্তিসহ সামাজিক বিকাশের জরুরী সমস্যাবলীর সমাধানে আগ্রহী ছিল, রাজনৈতিক সংগ্রামে দর্শন ও সাহিত্যের ভূমিকা কেবল এই সব দেশের অর্থ-

১। আন্দ্রে বনার্দ সিভিলিজেশন গ্রেক। দে লাল্লিয়াদে অ পার্থেনন লজান ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ১৮৩।

নৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত হয় নি, প্রগতিশীল দর্শন; প্রগতিশীল কলার সঙ্গে জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতার অঙ্গাঙ্গী সংযোগ থেকেও হয়েছিল।

দর্শন ও কলার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক কেবল তাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কলার মহান সৃষ্টিগুলির মধ্যে সর্বদা পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে সুগভীর দার্শনিক ধ্যান স্থান পায় (গ্রীক ট্র্যাজেডি; শেক্সপীয়ার; গ্যেটে, পুশকিন, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি)। ইতিহাস এমন বহু রচনার দৃষ্টান্ত যোগায় যাতে দার্শনিক চিন্তা ও শৈল্পিক সৃজনশীলতার সমন্বয় ঘটে, যেখানে দার্শনিক লেখক বা কবি হয়ে ওঠে। ভলতেয়ারের দার্শনিক কাহিনীগুলি, দিদেরোর কিছু কিছু রচনা (লে নেভ্যু দ্য র‍্যামিও) এবং চের্নিশেভস্কির হোয়াট ইজ টু বি ডান ? এরই উদাহরণ।

দর্শনে ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্কের কথা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এ কথাটা যোগ দেওয়া যেতে পারে যে ভাববাদী দর্শন যে কেবল প্রায়ই ধর্মের সংগে জোট বাঁধে (বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে) তাই নয়, প্রত্যক্ষভাবে একটা ধর্মীয় দর্শনেও পরিণত হয় ও ধর্মের সংগে মিশে যায় (কিয়েরকেগার্দ; কিছু এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট অর্থাৎ অস্তিত্ববাদী ও পার্সোনালিস্ট অর্থাৎ ব্যক্তিত্ববাদী)। কতকগুলি ক্ষেত্রে একটা দার্শনিক ব্যবস্থার বেশ কিছু উপাদান নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠায় অবদান করেছে।

ধর্ম ও কলার মধ্যে এবং ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া স্মরণাতীত কাল থেকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে আসছে। এখনও পর্যন্ত আমরা এ দাবি শুনি (প্রধানত ধর্মতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে) যে কলা ও নৈতিকতা উভয়েরই মূলে ছিল ধর্ম। আদিম ইতিহাসের অনুশীলন অবশ্য দেখিয়ে দেয় যে কলা ও নৈতিকতার (আর ধর্মেরও) উদ্ভব ও বিকাশ হয় কতকগুলি সামাজিক পরিস্থিতি ও চাহিদা থেকে, সেগুলির কথা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি। বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম মানবজাতির আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নৈতিক শিক্ষাদাতা হয়ে ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে নৈতিকতা "ধর্মের ভিত্তিতে" উঠেছিল অথবা ধর্ম ছাড়া টিকতে পারে না। ধর্মীয় উপজীব্য নিয়ে তৈরী বহু ছবি ও ভাস্কর্যের নান্দনিক মূল্য ওই উপজীব্য থেকে এসেছে

তা নয়। প্রখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা সেগুলি সৃষ্ট হয়েছিল এবং পার্থেনন ও গথিক গীর্জাগুলির মতই তারা শৈল্পিক সৃষ্টি হিসাবে বিরাজ করে এবং ধর্মীয় অনুভূতি নিরপেক্ষভাবে আমাদের নান্দনিক আনন্দ দেয়।

সামাজিক চেতনার সকল রূপ ও সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা জনগণের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় অবদান করে। শ্রেণী-সমাজের ইতিহাসের সমগ্র কালে ধর্ম ও দর্শন নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান থেকেই বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক প্রশ্নগুলির জবাব দিয়েছে। রাজনৈতিক ও আইনগত মতাদর্শগুলি জনগণের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে (কতকগুলি অবস্থায় এই প্রভাব ধর্ম ও দর্শনের প্রভাবের চেয়েও বেশি হয়)। পুরানো সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি আধিপত্য করেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তাদের মত নয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পূর্ণ সুসমন্বিত বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কার, বদ্ধ ধারণা, প্রতিক্রিয়া ও নিপীড়নের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন। মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ একদিকে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার এবং অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার মধ্যেকার ফাঁক ঘুচিয়েছে, এই ফাঁকটা ছিল পুরানো সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। (পুরানো সমাজে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অগ্রসর দার্শনিক চিন্তাবিদরা প্রায়ই ব্যভিচার এবং তথাকথিত ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত হত)। কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে কমিউনিস্ট বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার গোটা মতাদর্শগত ও শিক্ষাগত কর্তব্যটির পক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারায় জনগণকে শিক্ষিত করা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর লক্ষ্য এই যে এই ভাবধারা জনগণকে অধিকার করুক এবং নতুন সমাজ গঠনে, জনগণের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপনে এবং কমিউনিস্ট নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সৃজনশীল ভূমিকা নিতে তাদের উদ্দীপিত করুক।

সামাজিক চেতনার বিভিন্ন রূপের পারস্পরিক ক্রিয়ার জটিলতা বোঝাতে অনেক কিছু বলা হয়েছে। কাজেই বিকৃত অর্থনৈতিক বস্তুবাদ, যা সমস্ত মতাদর্শগত ব্যাপারকে অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে প্রত্যক্ষভাবে টানতে চেষ্টা করে, তার ভুল এড়ানোর জন্য আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। ভিত্তি ও মতাদর্শগত সৌধের মধ্যেকার যোগাযোগ অত সরল নয়। এ কার্যকর হয়

সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সম্পর্ক; শ্রেণীসংগ্রাম; সামাজিক চেতনার রূপগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক ও ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যেকার পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে।

৫. সামাজিক ও ব্যক্তিগত চেতনা

সমাজকে যদিও একটি সামাজিক দেহযন্ত্র এবং সমাজে একজন ব্যক্তিকে একটি জৈবিক দেহযন্ত্রের মধ্যে কোষের সঙ্গে সমান ক'রে দেখা যায় না; তবে অবশ্য যে সব লোক নিয়ে সমাজ গঠিত তারা ছাড়া সমাজ অচিন্তনীয়; আর সেই কারণেই ব্যক্তিদের চেতনা ছাড়া সামাজিক চেতনা অচিন্ত্যনীয়।

কোনও জনগণ যে সামাজিক পরিবেশে বাস করে তার সাধারণ অবস্থা তাদের মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ঐক্য নির্ধারণ করে; এই ঐক্য তাদের স্বার্থের ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি একটা ঐক্যমতের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রকাশ দেখা যায়। অন্যদের সঙ্গে একই সামাজিক উৎস ও মর্যাদার অংশীদারত্ব ব্যক্তিকে তদনুযায়ী সামাজিক ঝোঁকের কেবল সম্ভাবনা দেয়, কোনও মতেই নিঃশর্ত নিশ্চয়তা দেয় না।

বিষয়টা এই যে ব্যক্তিগত চেতনার একটা জীবনচরিত আছে যা সামাজিক চেতনার জীবনচরিত থেকে পৃথক।

সামাজিক চেতনা সামাজিক বিধানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর ইতিহাস স্বভাবতঃই সামাজিক সত্তার ইতিহাসকে অনুসরণ করে এবং সামাজিক চেতনায় যে কোনও পরিবর্তন হয় (বিবর্তনাত্মক বা বিপ্লবাত্মক) তা শেষ পর্যন্ত সামাজিক সত্তায় অনুরূপ পরিবর্তন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ব্যক্তিগত চেতনা ব্যক্তির নিজের সঙ্গেই জন্মায় ও মারা যায়। এ তার জীবনের পথের অনন্য বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষত্ব এবং নানাবিধ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাবকে প্রকাশ করে।

ব্যক্তিগত চেতনার পক্ষে যে বিষয়গত পরিবেশ তার গঠনকে প্রভাবিত করে তা হল বৃহৎ পরিবেশ—সামাজিক সত্তা (শ্রেণী-সমাজে একটা শ্রেণীর জীবন-যাত্রার পরিস্থিতি), এবং ক্ষুদ্র পরিবেশ—একটা শ্রেণী বা একটা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটা বিশেষ অংশের জীবনযাত্রার পরিস্থিতি এই উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া, তা ছাড়াও আশু পরিবেশ (পরিবার; বন্ধু, পরিচিত) এবং

শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবন। ব্যক্তিগত চেতনা ব্যক্তির বিকাশের স্তর, তার ব্যক্তিগত চরিত্র ইত্যাদির মত উপাদান দিয়েও প্রভাবিত হয়। অন্যান্য সব পরিস্থিতিই সমান থাকলে ব্যক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট পথ তার আত্মিক জগৎ ও অপরাপর ব্যক্তির আত্মিক জগতের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে এবং মানবিক স্বাতন্ত্র্যসমূহের এক সম্পদ সৃষ্টি করে।

সামাজিক চেতনা ও ব্যক্তিগত চেতনা অবিরত পরস্পরের উপর ক্রিয়া করছে ও পরস্পরকে সমৃদ্ধ করছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমগ্র জীবন ধরে অপরাপর লোকের সঙ্গে সম্পর্কের মারফত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের মারফত সামাজিক চেতনার প্রভাব অনুভব করে, যদিও এই প্রভাবের প্রতি তার মনোভাব নিষ্ক্রিয় নয়—সক্রিয় এবং বাছবিচারসম্পন্ন।

সমাজ কর্তৃক ঐতিহাসিকভাবে বিরচিত চেতনার আদর্শগুলি ব্যক্তিকে আত্মিকভাবে পুষ্ট করে, তার বিশ্বাসগুলিকে পুষ্ট করে এবং তার নৈতিক শিক্ষা নান্দনিক ধারণা এবং অনুভূতিগুলির উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক চেতনা কেবল ব্যক্তির মনে প্রবেশ করে না, এ একটা যৌথ মন, পৃথক পৃথক মনের এক অনন্য ও জটিল সমন্বয়। এঙ্গেলস-এর মতে মানবিক চিন্তা "কেবল বহু শত কোটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা হিসাবে বিরাজ করে।…সমস্ত মানুষের মোট চিন্তা!"(১) একজন ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত কিছু বিশ্বাস ও ভাবধারা সমাজের সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে ও হয়, একটা সামাজিক শক্তির তাৎপর্য লাভ ক'রে যখন সেগুলি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সাধারণ চেতনার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, অন্যান্য লোকের বিশ্বাস ও আচরণের মান তৈরি করে। সেই কারণেই ব্যক্তির বিকাশ, তার প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলার জন্য সমাজের মনোনিবেশের প্রয়োজন হয়।

সামাজিক ব্যবস্থার চরিত্রের একটা নিয়ামক প্রভাব আছে সামাজিক চিন্তার ফলশ্রুতিকে ব্যক্তির আত্মস্থ করার উপর এবং তার নিজস্ব সামাজিক "সাড়া"র উপর। যেখানে শিক্ষার উপর শাসকশ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার সেখানে ব্যাপক জনগণ তাদের মানসিক দিগন্তকে প্রসারিত করার ক্ষমতা থেকে এবং তাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে বিকশিত করার ক্ষমতা থেকে

১। এফ. এঙ্গেলস, অ্যান্টি ড্যুরিং, পৃষ্ঠা ১০৫।

কার্যত বাণ্ডত হয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই শ্রমজীবী জনগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের সৃজনশীল উদ্যোগ দেখাবার সুযোগ অর্জন করে এবং সেইভাবে সমাজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভিন্ন ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

আমরা পরে দেখতে পাব যে সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক সমাজে শাসকশ্রেণী জন-চেতনা ও জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য সর্বপ্রকার মাধ্যম ব্যবহার করে, কিন্তু সমাজের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি জনমত গঠনে নিজেদের ভূমিকা বাড়ায়, উদ্দেশ্য থাকে একচেটিয়াদের সর্বময় ক্ষমতা, সমরবাদ ও যুদ্ধ, বর্ণগত নিপীড়ন ইত্যাদির রিরুদ্ধে লড়াই করা। কাজেই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে জনমত অবধারিতভাবে শ্রেণী-স্বার্থ ও মতাদর্শের প্রতিফলন করে।

সোভিয়েত সমাজের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য। তার মানে অবশ্য এ নয় যে বিভিন্ন প্রশ্নে মতের কোনও সংঘাত নেই। কিন্তু মতামতের সংঘাত এবং বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক কর্মসূচী ও মৌলিক নীতিসমূহের সংঘাতের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে 'মতপার্থক্য মতাদর্শের মূল প্রশ্নগুলিকে স্পর্শ করে না, সেগুলি সামাজিক জীবনের এখনও পর্যন্ত সমাধান না হওয়া কিছু প্রশ্নের সংগে জড়িত, যেগুলির আলোচনা দরকার। শ্রমজীবী জনগণকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মধ্যে টেনে এনে এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গড়ে তুলে সমাজতন্ত্র প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক জীবনের যে কোনও প্রশ্নের উপর তার মতামত প্রকাশ করতে সুযোগ দেয়।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মতের প্রত্যেকটি সংঘাতই মতাদর্শগত সংঘাত নয়। অবশ্য মতাদর্শগত সংগ্রাম সমাজের জীবনে, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

৬. বর্তমান যুগে ভাবধারার সংগ্রাম

সমাজের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তার বিকাশে ভাবধারার কি ভূমিকা রয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে এই ভূমিকায় গুরুত্বের তারতম্য হয়েছে। এ নির্ভর করে—(১) সামাজিক সম্পর্কগুলির চরিত্রের উপর, কি ভিত্তির উপর সেই ভাবধারা দাঁড়ায়, (২) যে শ্রেণী সেই ভাবধারার জন্ম দেয় তার ঐতিহাসিক

ভূমিকার উপর, (৩) তাদের নির্ভুলতার মাত্রার উপর, সামাজিক বিকাশের পরিণত চাহিদাগুলিকে সে কত সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে তার উপর; (৪) জনগণের মধ্যে সেই ভাবধারার প্রসারের উপর, জনগণের মধ্যে তার প্রভাবের উপর প্রভাব সব সময়ে সঠিকতা অনুযায়ী হয় না। আসন্ন ও প্রকৃত সুগভীর সামাজিক পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল ভাবধারার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, এমনকি যখন এই ভাবধারাগুলি সামাজিক বিকাশের চাহিদাগুলিকে বৈজ্ঞানিক রূপে প্রকাশ করে না, যথা—জন-চেতনার অঙ্গীভূত হয়েছে যে সুবিচার তার বিমূর্ত দাবির রূপে প্রকাশ করে। এই ধরণের ভাবধারা সম্বন্ধে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক অর্থে ত্রুটিপূর্ণ হলেও এগুলিতে বিশ্ব-ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু সত্য থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ভাবধারার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং সমাজ-জীবনে সেগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ভাবধারা সমাজের বিকাশকে আপনা থেকে প্রভাবিত করে না; করে মানুষের ক্রিয়াকলাপের মারফত। "ভাবধারা কখনও পুরানো বিশ্ব-ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে যেতে পারে না।···ভাবধারা আদৌ কোনও কিছুকে কার্যকর করতে পারে না। ভাবধারাকে কার্যকর করতে হলে জনগণের দরকার হয়, তারা কিছু ব্যবহারিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।"(১)

বিরোধী শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে সমাজের ইতিহাস ভাবধারার সংগ্রামেরও ইতিহাস; প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রাম বিশেষত তীব্র হয় মোড় ঘোরার সময়ে; যখন পুরানো সমাজের ভিত্তি ধসে যাচ্ছে এবং নতুন সামাজিক শক্তি, প্রগতিশীল শ্রেণীসমূহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিপটে উদিয়মান হচ্ছে। বর্তমান যুগে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রের শক্তিগুলির সংগ্রামের যুগে মতাদর্শগত সংগ্রাম অভূতপূর্ব তীব্রতা অর্জন করেছে।

বুর্জোয়াদের ও তাদের তত্ত্ববাগীশদের চলতি লক্ষ্য হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন ও তার মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দা হোলি ফ্যামিলি, পৃষ্ঠা ১৬০।

করা। ফ্যাশিবাদের পরাজয়ের পর থেকেই ধনতান্ত্রিক দুনিয়া কমিউনিজম-এর শক্তিগুলিকে আক্রমণ করেছে "স্বাধীনতা", "গণতন্ত্র" ও "মানবতাবাদ"-এর মেকি পতাকার তলায় থেকে। কিন্তু কতকগুলি পরিস্থিতিতে (যখন ব্যাপক জনগণ প্রকৃত স্বাধীনতা কায়েম করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করে তখন) তারা ভিড়ে পড়ে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক চক্রের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ও পুলিশি হিংসার পক্ষে—যা শ্রমজীবী জনগণের একেবারে প্রাথমিক অধিকারগুলিকেও পদদলিত করে।

বুর্জোয়াদের মতাদর্শবাদীরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে ধনতন্ত্র আর ধনতন্ত্র নেই, তাই তারা ক্রমাগত আরও সম্মানজনক ও আরও গ্রহণযোগ্য নতুন নতুন নামে ধনতন্ত্রকে ভূষিত করার চেষ্টা করছে; যথা—"জনগণের ধনতন্ত্র", "যৌথ ধনতন্ত্র", "কল্যাণ রাষ্ট্র", "পরিণত সমাজ", "শিল্পোন্নত সমাজ", "শিল্পোত্তর সমাজ" ইত্যাদি।

এই প্রক্রিয়ার গতিপথে জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য সযত্নে বাছা পৃথক পৃথক কায়দা ব্যবহৃত হয়, যেগুলির ভিত্তি ততটা যুক্তি নয়, যতটা আবেগ। জনগণের মতাদর্শগত মস্তিষ্ক-ধোলাইয়ের জন্য বিপুল ব্যবস্থা, মূলত গণ প্রচার মাধ্যম (যথা—সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র) দেশে ও বিদেশে কোটি কোটি মানুষের উদ্দেশ্যে চালিত হয়। এই সমস্ত মাধ্যম একটা বিশেষ সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, একচেটিয়া ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পক্ষে অনুকূল আচরণ, মতামত ও যুক্তির একটা বাঁধাধরা মানের প্রতি জনগণের মুখ ঘোরাতে সাহায্য করে এবং এমন এক ধরনের ব্যক্তি সৃষ্টি করে যাকে ঘোরান-ফেরান সহজ।

আধুনিক ধনতন্ত্র কর্তৃক মণ্ডিত যে তথাকথিত "গণ"-সংস্কৃতি তা জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার কোনও সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষার সূচক নয়। "গণ"-সংস্কৃতিকে জনগণের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অথবা প্রকৃত পেশাদার কলার সংগে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। এর অধিকাংশই হল ব্যবসায়ের দিক থেকে লাভজনক কৃত্রিম আমোদ-প্রমোদ দিয়ে তৈরি, আর সামাজিক জীবনের আসল সমস্যাবলী থেকে মানুষের মনকে অন্য দিকে চালানোর এ একটা উপায়।

তবে সমসাময়িক একচেটিয়া ধনতন্ত্রের পক্ষ থেকে মতাদর্শগত প্রভাব

বিস্তারের এই বিরাট বহর সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমজীবী জনগণ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যুক্তিযুক্ততা ও তার "মূল্যগুলি" সম্পর্কে ক্রমশ সন্দেহ পোষণ করছে, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব বাড়ছে এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

এই রকম একটা অবস্থায় সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বিপুলভাবে বেড়েছে। বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্নটি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব অর্জন করেছে। এ হল জনগনের হৃদয় ও মনের জন্য সংগ্রাম, ইতিহাস কি গতিধারা নেবে তার জন্য সংগ্রাম।

সমাজতন্ত্রের দেশসমূহ ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত সংগ্রামের মূল আধেয় হল বিভিন্ন রূপে কমিউনিস্ট বিরোধিতা ও সোভিয়েত বিরোধিতা, এর মধ্যে সবচেয়ে স্থূল ও আদিম রূপ থেকে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও জটিল সব রকমের রূপই আছে। "মতাদর্শমুক্তি", "বিরোধী মতাদর্শগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান"; "এক বিন্দুতে এসে মেলা" ইত্যাদির তত্ত্বগুলি এই সংগ্রামে ব্যবহৃত হয়। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা দক্ষিণ ও "বাম" উভয় রকমের শোধনবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ভিতর থেকে দুর্বল করার উপর খুব জোর দিচ্ছে। বুর্জোয়া দুনিয়ায় সম্প্রতি বহু দিন হল যার মুখোশ খুলে গিয়েছিল সেই সব পেতি-বুর্জোয়া ট্রটস্কিপন্থী মতামতগুলির ও তথাকথিত "নয়া বাম" ভাবধারা ও মতামতগুলির একটা পুনরুত্থান হয়েছে, এগুলি নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে জোট বেঁধে চলে এবং সোচ্চার মেকি-বিপ্লবী শ্লোগানের আড়ালে থেকে কাজ করে। মাওবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন বহু রকম মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ঝোঁকের একটা বিষয়গত সংযোগ রয়েছে। বর্তমান যুগের জটিল মতাদর্শগত পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ও তার আরও সৃজনশীল বিকাশের জন্য সংগ্রাম সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে।

ভাবধারার সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রামের অন্যতম রূপ। এ এমন একটা সংগ্রাম যেখানে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া তার নীতি ও মূল্যগুলিকে বুর্জোয়া দুনিয়ার নীতি ও মূল্যগুলির বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। কাজেই সামাজিক সম্পত্তি ও

সামাজিক কল্যাণের নীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতির বিরোধী ; সংহতি ও যৌথতার নীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার নীতির বিরোধী ; আন্তর্জাতিকতার ও সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমের নীতি জাতীয়তাবাদ ও জাতিদম্ভের নীতির বিরোধী, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের নীতি মস্তিষ্ক-ধোলাই ও ব্যক্তিস্বলুণ্ঠনের নীতির বিরোধী হিসাবে দাঁড়ায়। ভাষান্তরে বললে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত মানবতাবাদকে ও তার মতাদর্শকে ধনতন্ত্র ও তার মতাদর্শের অমানুষিক ও মানবতাবিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করান হয়।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের তত্ত্বগত ক্রিয়াকলাপকে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত প্রগতিশীল মানবজাতির প্রতি একটা আন্তর্জাতিক কর্তব্য বলে মনে করে। তারা তত্ত্ব ও বিপ্লবী ব্যবহারের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগের উপর এবং সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট নির্মাণের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানের উপর জোর দেয়। নতুন সমস্যাগুলির প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্ষমতা, অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সৃজনশীলভাবে বিকশিত করার ক্ষমতা কমিউনিস্ট নির্মাণের তত্ত্ব ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শোধনবাদী আক্রমণের সমালোচনাকে বিশেষ ক'রে প্রত্যয়জনক ও ফলপ্রসূ করে।

নবম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান, সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানের স্থান ও ভূমিকা

সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। এখন বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যাপারটি বিচার ক'রে দেখা যাক। বিজ্ঞান সমাজের সমগ্র বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সমাজের বিকাশে সদাই ক্রম-বর্ধমান ভূমিকা পালন করে।

১. সমাজ-জীবনের একটি বিশেষ ব্যাপার হিসাবে বিজ্ঞান

সমাজ যখন পরিণতির একটি বিশেষ স্তরে পেঁছয় তখনই কোনও বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে এবং বিজ্ঞানের পরিস্থিতি সমাজের অগ্রগতির একটি মূল সূচক হয়। বর্তমান সময়ে সমাজের বিকাশে বিজ্ঞানের ভূমিকা এত বিরাট যে বিংশ শতাব্দীকে প্রায়শই "বৈজ্ঞানিক শতাব্দী" বলা হয়। এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু এর কিছু যৌক্তিকতা যে আছে তা দেখা যাবে যদি আমরা একথা বিবেচনা করি যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়া বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যাগত বিপ্লব অসম্ভব হত এবং সমাজ সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান ছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক রূপান্তর অসম্ভব।

কিন্তু বিজ্ঞান কি? এক কথায় এর কোন উত্তর হয় না, কারণ বিজ্ঞান একটা বহুমুখী সামাজিক ব্যাপার যার মধ্যে মননগত ও বৈষয়িক উভয় উপাদানই সমন্বিত হয়। তথাপি বিশ্বের জ্ঞানের একটি ব্যবস্থা হিসাবে বিজ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে শুরু করা যায়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসহ সব জ্ঞানকেই প্রকৃতি ও সামাজিক সত্তাগুলির প্রতিফলন হিসাবে দেখতে হবে। বিনা ব্যতিক্রমে প্রকৃতি ও সমাজ-জীবনের সকল প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হতে পারে। এ হল একটি বিষয় যা বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক বা আইনগত মতাদর্শ অথবা নৈতিকতার মত সামাজিক চেতনার রূপগুলি থেকে পৃথক করে। শেষোক্তগুলি কেবল সামাজিক সম্পর্কগুলিকে প্রতিফলিত করে।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ভিন্ন কাঠামো আছে। এই দুটি মূলত পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার। ধর্ম বাস্তবতার মিথ্যা ও বিকৃত প্রতিফলন। আর সামগ্রিকভাবে দেখলে বিজ্ঞান প্রকৃতি ও সমাজের প্রকৃত প্রতিফলন যোগায়। বিজ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে ভ্রান্ত অনুমান ও তত্ত্বসমূহ উদ্ভূত হয় তা বিষয়টির সারবস্তুকে বদলে দেয় না, কারণ বিজ্ঞানের ভুল হয় প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের চাপের ফল, নয় সত্য অন্বেষণ থেকে উপজাত। ধর্ম যুক্তির ঘোরতর বিরোধী। আর সেখানে বিজ্ঞান মানবিক যুক্তির উচ্চতম সাফল্য এবং তার শক্তি ও কার্যকারিতার মূর্ত রূপ।

ব্যবহারিক সাফল্যের খুব নীচু স্তরে ধর্মের আবির্ভাব ঘটে বিজ্ঞানের আগেই। ওই সময়ে মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিগুলির অধীন ছিল এবং মানুষ তখন ঐ শক্তিগুলিকে বুঝতে ও নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তন করতে একেবারেই অক্ষম ছিল। অপরদিকে বিজ্ঞানের জন্ম হল মানুষের বর্ধিত ব্যবহারিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফল। বিজ্ঞানের বিকাশ এবং প্রকৃতি ও সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিগুলির উপর মানুষের ক্রম-বর্ধমান আধিপত্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এঙ্গেলস বলেছেন, "……প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে মানুষ যতখানি শিখেছে তার জ্ঞান ততখানিই বৃদ্ধি পেয়েছে।"(১) সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যেকার বিরোধ বিচার-বিবেচনা ক'রে বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে বিজ্ঞান হল ব্যবহারের সামান্যীকরণ করে বিষয়গতভাবে সত্য জ্ঞানের একটি ব্যবস্থা, যা ব্যবহার থেকেই উদ্ভূত এবং ব্যবহারের দ্বারাই পরীক্ষিত। কিন্তু এ থেকে আরও অগ্রসর হতে হলে বিজ্ঞান ও সাধারণ দৈনন্দিন জ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা এবং বিজ্ঞান ও চারুকলার মধ্যেকার পার্থকের কথা মনে রাখতে হবে।

ব্যবহার থেকে প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞানের বিজ্ঞান ছাড়াই এবং বিজ্ঞানের বাইরেও অস্তিত্ব থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, পুরাকালের মানুষেরা জানত যে রাত্রির পরে নিয়মিত দিন আসে, লোহা কাঠ থেকে ভারী ইত্যাদি। এমনকি বর্তমান কালেও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ দেশগুলির কৃষক ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের কারিগরেরা

১। এফ. এঙ্গেলস, ডায়েলেকটিকস অব নেচার, পৃষ্ঠা ২৩১।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান দিয়েই কাজ চালায়। এই ধরণের জ্ঞানও দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, শিশুর শরীরে কম্পন দেখা দিলে তার মা বুঝতে পারে যে শিশুটি অসুস্থ।

এই ধরনের প্রাক-বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানকে যা পৃথক করে তা হল বিজ্ঞান শুধু বিষয়বস্তুর পৃথক পৃথক দিকগুলির এবং তাদের মধ্যেকার বাইরেকার সম্পর্কগুলির জ্ঞানই যোগায় না, সেই সঙ্গে সর্বাগ্রে সেই সব বিধানগুলির কথা বলে যা প্রকৃতি ও সমাজকে পরিচালনা করে। লোহা যে কাঠ থেকে ভারি এই জ্ঞান বিজ্ঞান ছাড়াই অর্জিত হতে পারে, কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্বের ধারণাটি (কাঠের তুলনায় লোহার বেশি আপেক্ষিক গুরুত্ব থাকার কারণের কথা বলাই বাহুল্য) পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের বিষয়বস্তু। রাত্রির পরে দিন আসে এই তথ্যটি অভিজ্ঞতাজনিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের চেতনায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া আমরা দিন ও রাত্রির পর পর আগমনের এবং বছরের মধ্যেকার দিনগুলির নিয়মিত ব্যবধানে বড় ও ছোট হওয়ার কারণগুলি কখনই ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। অসুস্থতার লক্ষণ হিসাবে জ্বরকে বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই ধরা যায়, কিন্তু জীববিদ্যা ও রসায়নের উপর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যেই সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় এবং প্রয়োজনীয় ঔষধাদির ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায়।

সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মতই চারুকলাও জ্ঞানীয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। বাস্তবধর্মী চারুকলা বিজ্ঞানের মতই সুগভীর সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে ও একটি বিশেষ শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। কিন্তু কলা সবসময়েই ব্যক্তিগত ও নির্দিষ্টের মাধ্যমে সাধারণকে প্রকাশ করে। বিজ্ঞানের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য হল যে বিজ্ঞান সাধারণকে প্রকাশ করে বিমূর্ত যুক্তিবিদ্যারূপে, ধারণা ও কোটীসমূহের মাধ্যমে।

সার সংকলন করলে বলা যায় যে বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট চরিত্র নিহিত রয়েছে এই তথ্যের মধ্যে যে বিজ্ঞান হল বাস্তবতার সব ঘটনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করায় সক্ষম ব্যবহারের সর্বোচ্চ সামান্যীকরণ, আর ঘটনা ও প্রক্রিয়ার সারমর্ম সম্পর্কে এবং প্রকৃতি ও সমাজের বিধানগুলি সম্পর্কে বিমূর্ত ও যুক্তিসম্মতরূপে বিজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান যোগায়।

বিজ্ঞানের কাঠামো খুবই জটিল, কিন্তু তাকে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল তিনটি মূল উপাংশ হিসাবে দেখান যায়।

প্রথমত, বিজ্ঞানের মধ্যে অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান থাকে, এবং শুধু সেই জ্ঞানই থাকে না যা বিশ্লেষণ ও সামান্যীকরণের উদ্দেশ্যে সাধারণ চেতনা থেকে নেওয়া হয়, সেই সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানও থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নতুন তত্ত্বগত ক্ষেত্র সাধারণত উন্মুক্ত হয় সেই সব নতুন নতুন তথ্যের পরীক্ষালব্ধ আবিষ্কার দ্বারা যেগুলি বর্তমান তত্ত্বসমূহের কাঠামোর মধ্যে "খাপ" খায় না এবং কিছুকালের জন্য যাদের সন্তোষজনক কোনও তত্ত্বগত ব্যাখ্যাও হয়ত পাওয়া যায় না। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারের বেলায় তাই-ই ঘটেছিল ; ২০ বছর পেরোবার পরই একে রাসায়নিক উপাদানগুলির রূপান্তর প্রাপ্তিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। ১৯৬০-এর দশকে আবিষ্কৃত "পুলসারস্" নামে পরিচিত মহাকাশে বিকীরণের শক্তিশালী উৎসের প্রকৃতি সময়কালে পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে আর রহস্য থাকবে না। এইভাবে নতুন নতুন তথ্য তত্ত্বের বিকাশে উদ্দীপনা যোগায়।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান তত্ত্বগত জ্ঞানের একটি ক্ষেত্র। তত্ত্বের কাজ হল তথ্যগুলিকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা, অভিজ্ঞতাজনিত বিষয়ের বিধান-গুলির ক্রিয়া আবিষ্কার করা এবং এই সব বিধানগুলিকে একটি একীভূত ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তথ্য সঞ্চিত হওয়ার প্রক্রিয়া, তাড়াতাড়ি হোক বা দেরিতে হোক, জ্ঞানের একটি ব্যবস্থারূপে তত্ত্ব সৃষ্টিতে নিয়ে যায় এবং এটি একটি নিশ্চিত চিহ্ন যে জ্ঞানের ওই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি শব্দের প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান হয়ে উঠছে। নিউটনের কল্যাণে বলবিদ্যা বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পদার্থের গতির মূল বিধানগুলি আবিষ্কার করেন এবং সেগুলিকে একটি ব্যবস্থা হিসাবে দাঁড় করান। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শক্তির নিত্যতা ও অবস্থান্তর প্রাপ্তির বিধান এবং এনট্রপির (অর্থাৎ বস্তুর তাপবলবিদ্যাগত অবস্থার নির্ধারক অন্যতম পরিমাণগত উপাদানের) বিধান আবিষ্কারের দরুন তাপের তত্ত্ব তাপবলবিদ্যায় পেঁছয়, এবং বৈদ্যুতিক শক্তির তত্ত্ব তখনই কেবল প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত হয় যখন ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের

একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব খাড়া করেন। ওই একই সময়ে দেখা যায় মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞানে পরিণত করার বিরাট অবদান।

একটি তত্ত্বগত ব্যবস্থা হিসাবে বিজ্ঞানের অপরিহার্য উপাদান হল এর বিধানগুলি, যেগুলি অস্তিত্বের কোনও না কোনও ক্ষেত্রে ঘটনাবলীর বিষয়গত-ভাবে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সম্পর্কগুলি প্রতিফলিত করে। বিজ্ঞানের বিধানগুলিকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব যদি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবস্থাটির অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিচার করা হয়। তত্ত্বগত বিজ্ঞানের অপর একটি অংশ হল অনুমান; তাছাড়া বিজ্ঞান বিকশিত হতে পারে না এবং তা বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে বর্জিত হয়, নয় সংশোধিত হয়; ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয় ও তত্ত্বরূপে গৃহীত হয়।

তৃতীয়ত ও শেষত, বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল এর দার্শনিক ভিত্তি ও সিদ্ধান্তসমূহ। এই সবের মধ্যে তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা ও চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সর্বজনীনতার মাত্রা থাকতে পারে এবং সর্বজনীনতার মাত্রা যত বাড়বে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব তত কাছাকাছি আসবে। সুতরাং এটা কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাংশ্লেষিক তত্ত্বগুলি চরিত্রের দিক থেকে স্পষ্টত দার্শনিক। উদাহরণ স্বরূপ শক্তির নিত্যতা ও অবস্থান্তর প্রাপ্তির বিধানগুলির ও এনট্রপির বিধান যা তাপবলবিদ্যার ভিত্তি সৃষ্টি করে, তার ব্যাখ্যা পদার্থ ও গতির নিত্যতা ও অসীমত্বের দার্শনিক প্রশ্নাবলীর এবং পদার্থ ও গতির সংখ্যাগত ও গুণগত অবিনশ্বরত্বের দার্শনিক প্রশ্নাবলীর বিশদ আলোচনা ছাড়া করা অসম্ভব। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব স্থান, কাল ও পদার্থের মধ্যে সম্পর্ক উদ্ঘাটিত করে, আর কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণের মধ্যেও (মাইক্রোকসমের মধ্যেও) নিরবচ্ছিন্নতা ও ছেদের ভিতরে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং এগুলি কেবল পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক সমস্যা নয়, সেই সঙ্গে দার্শনিক সমস্যাও বটে। এতক্ষণ যা বলা হল তা জীববিদ্যা ও জ্যোতি-র্বিদ্যার তত্ত্বগুলির সামান্যীকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্বের ক্ষেত্রে এমনকি আরও বেশি প্রযোজ্য।

পদার্থ বিজ্ঞানে মতাদর্শগত উপাদানগুলির ভূমিকা থাকে তথ্যগুলির ব্যাখ্যায় অর্থাৎ তত্ত্বের স্তরে, পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ওই উপাদানগুলি সাধারণত তত্ত্বগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যার স্তরে কাজ করে। এই কারণেই বিজ্ঞানের সঙ্গে মতাদর্শের নিঃশর্ত বিরোধ, যা সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শন ও সমাজতত্ত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তা সমালোচনার ধোপে টেকে না। তথাপি বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা বিজ্ঞানকে মতাদর্শ "থেকে মুক্ত করার" প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিরাট হৈচৈ করেন। তাঁদের আসল অভিপ্রায় হল সমাজবিজ্ঞানকে মার্কসবাদ থেকে মুক্ত করা এবং সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া মতাদর্শের অধীন করা।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পজিটিভিজম (দৃষ্টবাদ, অর্থাৎ স্পষ্ট দৃষ্ট বস্তুকেই একমাত্র সত্য বলে গণ্য করা) ও ধর্মীয় দর্শন উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হলেও তাকে সম্পূর্ণভাবে "মতাদর্শমুক্ত" করার উপর জোর দেয়। ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসের (সেপ্টেম্বর ১৯১৯) "দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান"-এর সমস্যা সম্পর্কে বিতর্কের সময়ে নয়া-পজিটিভিস্ট এ. জে. আয়ার ও নয়া-টমপন্থী জোসেফ মুয়েরেরস তাঁদের বক্তৃতায় এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান "শুধু পরিমাণ মাপতে" পারে। আয়ারের মতে তাই হল সাধারণভাবে জ্ঞানের শেষ, কিন্তু মুয়েরেরস-এর মতে—প্রকৃতির ঘটনাবলীর নির্যাস শুধু দর্শন ও ধর্ম দ্বারাই জানা সম্ভব। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে দর্শন থেকে "মুক্ত" করা যায় ও তা করা উচিত। এই ভাবে ওই উভয় দার্শনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে দুর্বল করেন ও তার কার্যক্ষেত্রের পরিধি সীমাবদ্ধ ক'রে দেন। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান সর্বদাই ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলির আরও গভীরে প্রবেশ করছে এবং ক্রমাগত ব্যাপকতর বিশ্বপটকে আয়ত্তে আনছে, আর এই কারণেই বিজ্ঞানের দার্শনিক আধেয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিজ্ঞান সমাজের আত্মিক অথবা মননগত জীবনের ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও তা আবার সমাজের বৈষয়িক জীবনের ক্ষেত্রেও মূর্ত। বিজ্ঞান তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক এই উভয় দিক থেকেই মানুষের কার্যকলাপের একটি বিশেষ ক্ষেত্র। বিজ্ঞানের বিকাশের একেবারে গোড়ার পর্যায়ে বৈজ্ঞানিকরা শুধু যে প্রকৃতি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করেছেন তাই নয়, তাঁরা প্রকৃতির উপর ক্রিয়াও

করেছেন ; তাঁরা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছেন, নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং এইভাবে বিজ্ঞানের জন্য নতুন নতুন তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ গ্রীকদের আবিষ্কার নোমন্ (সূর্য-ঘড়ির কাঁটা ইত্যাদি) নামে পরিচিত প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক যন্ত্রের কথা বলা যায়। এটি অনুভূমিক (হরাইজন্টাল) সমতলের উপর উল্লম্ব (ভারটিকাল) একটি দণ্ড। গ্রীকরা শুধু চক্রবাল থেকে সূর্যের উচ্চতাই নির্ণয় করতেন না, সেই সঙ্গে ভৌগোলিক অক্ষাংশও নির্ণয় করতেন।

বর্তমানকালে যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ও বিশেষত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মত বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক রূপগুলি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং বর্তমানে এমন কোনও বিজ্ঞান নেই যা দৃঢ় প্রায়োগিক বনিয়াদ ছাড়া কাজ করতে পারে। বিজ্ঞানের অনেক শাখায় এই বনিয়াদগুলির জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগতভাবে এ যে কোনও ধরনের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। বিশাল প্রোটন সিনক্রোট্রন (আহিত কণার গতিবর্ধক), মহাকাশযান ও রকেট, অতি সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি যা অমোদের মাইক্রো-কসমের মধ্যে স্থান ও কাল পরিমাপ করতে সাহায্য করে সেই সবই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায়োগিক বনিয়াদ তৈরি ক'রে দেয়। এই সরঞ্জামটির সৃষ্টি ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারিক কার্যকলাপের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিজ্ঞানের বহু শাখায় তত্ত্ব ও ব্যবহারের মধ্যেকার বিভাগ দাবি করে বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রম বিভাগ। উদাহরণ স্বরূপ, প্রায়োগিক পদার্থবিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রাপ্ত উপাত্তের (data) প্রাথমিক সামান্যীকরণ করেন, আর তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রায়োগিক উপাত্ত সামান্যীকরণে ও তত্ত্ব রচনায় সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করেন।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজকর্মের প্রধান পরিচায়ক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তা জ্ঞান অর্জনের ও তত্ত্বের বিকাশের অধীন। বলা বাহুল্য যে বৈষয়িক ও আত্মিক উপাদানগুলি শুধু বিজ্ঞানেই পরস্পরে জড়িত নয়, মানুষের উদ্যমের যে কোনও ক্ষেত্রেই তা পরস্পরে জড়িত। ওই উপাদানগুলির যে কোনও একটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার সময়ে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক ক্রিয়ার ডায়েলেকটিকস্‌কে হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। যেমন আত্মিক উপাদান ছাড়া বৈষয়িক উৎপাদন ও কাজের অস্তিত্ব থাকতে পারে না,

তেমনি বৈষয়িক উৎপাদন ছাড়া কোনও ধরনের সামাজিক চেতনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, কারণ বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবহারিক কাজকর্মের (পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ) কতকগুলি বিশেষ ধরন নিহিত আছে এবং সেগুলি প্রায়শই "ফলিত বিজ্ঞান" রূপে পরিচিত। কিন্তু "ফলিত বিজ্ঞানে"র অস্তিত্বকে অবশ্য সমাজের আত্মিক জীবনের একটি বিষয় হিসাবে, সামাজিক চেতনার একটি বিশেষ রূপ হিসাবে বিজ্ঞানকে মূলত দেখার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে ধরা উচিত হবে না।

২. *বিজ্ঞানের বিকাশের ঐতিহাসিক বিধান। প্রাকৃতিক ও সমাজ বিজ্ঞান*

বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথে জ্ঞানের পরিমাণগত সঞ্চয়ের সুগভীর গুণগত রূপান্তর ঘটে; সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে।

আদিম সমাজের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল অতি প্রাথমিক ধরনের। বিজ্ঞানের বিকাশ জড়িত থাকে কায়িক শ্রম থেকে মানসিক শ্রমের পৃথকীকরণ এবং লিখিত ভাষায় আবির্ভাবের সঙ্গে। লিখিত ভাষা জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করা, রক্ষা করা ও পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবপর করে। প্রথম আবির্ভাবের পর থেকেই সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের এই ধরনটিকে বিজ্ঞান ও ব্যবহারের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের কথা বিবেচনা করেই কেবল উপলব্ধি করা সম্ভব।

বিজ্ঞান প্রথম পর্যায়েই বাস্তব চাহিদায়, প্রধানত উৎপাদনের চাহিদায় সাড়া দিয়েছে। সেচ, নৌচলাচল এবং পিরামিড, মন্দির ইত্যাদি বিশাল বিশাল পূর্তকর্মের প্রয়োজনে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও বলবিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন যে "একেবারে শুরু থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।"(১) কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয়

১। এফ. এঙ্গেলস, ডায়েলেকটিকস অব নেচার, পৃষ্ঠা ১৮৪।

অঞ্চলের পুরানো দুনিয়ায় এবং অপরাপর প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে বিজ্ঞান ছিল শৈশবাবস্থায়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সামাজিক তাৎপর্য খুব ধীর গতিতে এগিয়েছে এবং কখনও কখনও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যাহত হয়েছে। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে পশ্চিম ইউরোপে প্রাচীন দুনিয়ার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনেকগুলিই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানের বিকাশ অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে হওয়ার কারণ হল উৎপাদনের বদ্ধ অবস্থা; অর্থাৎ কৃষিতে, পশুপালনে, হস্তশিল্পে ও নির্মাণে উৎপাদনের মূল প্রক্রিয়া আদিম হস্তচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রচলিত অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চলত বলেই এই ধীরগতি। সমাজের প্রশাসনেও বিজ্ঞানের অল্প কিছু ব্যবহার হত, বাণিজ্য ও কর আদায়ের উদ্দেশ্যে অবশ্য পাটীগণিতের প্রয়োজন হত; তবে সাধারণ আইনগুলি একত্রে লিপিবদ্ধ হওয়ার ভিতর দিয়ে আইন সংক্রান্ত বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছিল, রোমে তা খুব উচ্চ স্তরে উঠেছিল এবং প্রাচীনদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক নিবন্ধগুলি ছিল সামাজিক গতিমুখ প্রভাবিত করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। সে সময়ে ইউরোপে আধুনিক প্রায়োগিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে এবং একই সংগে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের এবং দর্শনের বিপুল অগ্রগতি ঘটে। এই জোয়ারের মূল কারণ হল সামন্ততন্ত্রের গর্ভে নতুন বুর্জোয়া সমাজ কাঠামোর ভ্রূণ সৃষ্টি। এঙ্গেলস লিখেছেন, "মধ্যযুগগুলির কালরাত্রি অবসানের পর স্বপ্নাতীত শক্তি নিয়ে বিজ্ঞান যদি সহসা সমুত্থিত হয়ে থাকে, অলৌকিক গতিতে বিকশিত হতে থাকে, তবে এই অত্যাশ্চর্যের জন্য আবার আমরা উৎপাদনের কাছে ঋণী।"(১) এই সময়টাকে তিনি বিজ্ঞানের ত্বরিত বিকাশের শুরু হিসাবে দেখেছিলেন যা "শুরুর বিন্দু থেকে দূরত্বের (সময়ের দিক থেকে) বর্গফলের অনুপাতে প্রবল হচ্ছিল।"(২)

১। এঙ্গেলস, ডায়েলেটিকস অব নেচার, পৃষ্ঠা ১৮৪-৮৫।

২। এঙ্গেলস, ডায়েলেকটিকস অব নেচার, পৃষ্ঠা ১৮৫ ৮৬।

সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা বৃদ্ধি বিজ্ঞানের প্রবল অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে; উপরন্তু বিজ্ঞান ও উৎপাদনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার নির্ধারক ভূমিকা নিঃসন্দেহে শেষোক্তটির। ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীগুলিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের; বিশেষত বলবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতি উৎপাদন, নৌচলাচল ও বাণিজ্যের চাহিদার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিল এবং তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পথ সুগম ক'রে দিয়েছিল। মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনে উত্তরণ আবার বিজ্ঞানকে নতুন কৃৎকৌশলগত বনিয়াদ দিল এবং বিজ্ঞানের আরও বিকাশের জন্য শক্তিশালী উদ্দীপক যোগাল।

প্রকৃতির বিধানগুলির সচেতন প্রয়োগ ছাড়া বৃহদাকার মেশিন শিল্প অসম্ভব। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার এবং পরবর্তীকালে আভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন (Internal Combustion Engine)-এর আবিষ্কারের দরুন প্রয়োজন হল তাপ-তত্ত্বের বিকাশ ও প্রয়োগ; বস্ত্রবয়নের তাঁত; ধাতুকাটার লেদমেশিন ও অপরাপর মেশিন-টুল এবং আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশের জন্য প্রয়োজন হল বলবিদ্যার সৃষ্টি ও প্রয়োগ; বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও বৈদ্যুতিক মোটরের আবিষ্কার মানেই বৈদ্যুতিক শক্তির তত্ত্বের সৃষ্টি ও প্রয়োগ, যা আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ধাতুবিদ্যা, কাঁচ তৈরি ও খাদ্য শিল্পের প্রয়োজন রসায়নের জন্ম দিল, আর কোটি কোটি টন কয়লা, অপরাপর খনিজ পদার্থ ও নির্মাণের সামগ্রী উত্তোলনের জন্য খনি-শিল্পের প্রয়োজন ভূতত্ত্বের উদ্ভব ঘটাল। কৃষি উৎপাদন ও ভেষজ উৎপাদনের বিকাশ উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শরীর-সংস্থান বিদ্যা, শারীরবৃত্ত ছাড়া অর্থাৎ জীববিদ্যা চক্রের বিজ্ঞানগুলির বিকাশ ছাড়া হতেই পারত না। এমনকি ডারউইনের তত্ত্বের আবির্ভাব শুধু জীবন্ত জীবসত্তা ও খনিত জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণের কাজেই ঋণী নয়, সেই সঙ্গে কৃষিতে কৃত্রিম নির্বাচনের অভ্যাসের কাছেও ঋণী।

এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীতেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মূলত বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসের সার সংকলন ক'রে মার্কস বলেছেন, "ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপাদানটি এই সর্বপ্রথম

সচেতনভাবে এমন পরিসরে উন্নত করা হয়েছে, প্রয়োগ করা হয়েছে ও সৃষ্টি করা হয়েছে যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী যুগগুলির বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না।"(১)

ধনতন্ত্রের উত্থানের পর্যায়টি সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতির দ্বারাও চিহ্নিত। এই বিজ্ঞান সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের শ্রেণী-সংগ্রামের গতিপথে বিকশিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার অগ্রগতি এই তথ্যের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল যে যেখানে মধ্যযুগীয় কৃষকদের বিদ্রোহ এবং এমনকি পশ্চিম ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি তাদের আশা-আকাঙ্খার মতাদর্শগত ভিত্তি ধর্মের মধ্যে খুঁজতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে গণ আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেণ্ট-এর সামাজিক-রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভাবধারার উপর নিজের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের সর্বোচ্চ সামান্যী-করণ হিসাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী তত্ত্বের সৃষ্টি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে একটি প্রকৃত বিপ্লবকে সূচিত করেছিল। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আবিষ্কার সমাজবিজ্ঞান ও কলাবিভাগের আরও অগ্রগতির জন্য তত্ত্বগত ভিত্তি যুগিয়েছিল। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশে এক গুণগত উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু মার্কসবাদী পদ্ধতির সৃষ্টিশীল প্রয়োগ যা পরে সমগ্র সমাজবিজ্ঞানের রূপান্তর ঘটিয়েছে, তার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছিল।

বিজ্ঞানের বিকাশের তৃতীয় পর্যায় ও বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকার রূপান্তর বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে। এই পর্যায়ে আমরা শুধু বৈজ্ঞানিক প্রগতির আরও গতিবৃদ্ধি দেখতে পাই না, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ব্যবহার-এর মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তনও দেখতে পাই। বিজ্ঞানের বিকাশ এখন ব্যবহারের বৈপ্লবিকীকরণের পক্ষে ও উৎপাদনের নতুন নতুন শাখা সৃষ্টির পক্ষে যাত্রা শুরুর জায়গা হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানের বর্ধিত সামাজিক ভূমিকা সমাজ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ

১। "দ্য রিটন হেরিটেজ অব কার্ল মার্কস" থেকে উদ্ধৃত কমিউনিস্ট নং ৭,১৯৬৮ পৃষ্ঠা ২৩।

বিধান। একই সংগে আবার বিজ্ঞানের বিকাশের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ যুক্তিসিদ্ধ গতি আছে, নিজস্ব সহজাত বিধি আছে।

এক অখণ্ড সমগ্র রূপেই বিজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব ঘটে; উদাহরণ স্বরূপ গ্রীসে বিজ্ঞানকে দর্শন থেকে আলাদা ক'রে দেখা যেত না। কিন্তু এমনকি সে সময়েও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই এক ও অখণ্ড বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র ও দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় ভাগ হতে শুরু করেছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে গণিতশাস্ত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। সমাজ-বিজ্ঞানের তুলনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংগে গণিতশাস্ত্র আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং বহু ক্ষেত্রে গণিতকে অন্যতম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেই গণ্য করা যেতে পারে। অপরদিকে দর্শনকে সামাজিক বিজ্ঞানের সংগে একসংগেই বিবেচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের দু'টি মৌলিক গোষ্ঠীর অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও সামাজিক গোষ্ঠী দু'টির কতকগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সমাজ-জীবনে এদের ভূমিকায় যথেষ্ট তফাত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রম-বর্ধমান প্রয়োগ তথাকথিত ফলিত বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। এগুলি প্রধানত কৃৎকৌশলগত বিজ্ঞান, কৃৎকৌশলগত যন্ত্রপাতি ও বন্দোবস্তের মধ্যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের বিধানগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুশীলন করে। ফলিত বিজ্ঞানগুলির হঠাৎ যত্রযত্র আবির্ভাব শুরু হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, এবং এগুলিই উৎপাদন ও অস্ত্রশিল্পে প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতির আশু পরিচালনা শক্তি হয়ে উঠল। কৃষি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞানও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, এগুলি কৃষিকার্যে ও রোগ চিকিৎসায় জীবন্ত প্রকৃতির বিধানগুলির কাজ ও ব্যবহার নিয়ে অনুশীলন করে। এই সমস্ত বিজ্ঞানই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংগে সংশ্লিষ্ট।

প্রাকৃতিক ও কৃৎকৌশলগত বিজ্ঞানগুলির মৌলিক কাজ হল প্রকৃতির ও মনুষ্য-সৃষ্ট যন্ত্রপাতিগুলির জ্ঞান যুগিয়ে সমাজকে সাহায্য করা এবং নতুন কৃৎকৌশলগত উপায়-উপকরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করা। উৎপাদন ও তার বিকাশে আগ্রহশীল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাগুলির বিধানসমূহকে একইভাবে কাজে লাগায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই সব বিজ্ঞানের মৌলিক আধেয়ের কোনও শ্রেণী-চরিত্র নেই, আর শ্রেণী-

সংগ্রাম এগুলির উপর তখনই কেবল ছাপ ফেলে যখন কোনও দর্শনগত প্রশ্ন জড়িত হয়ে যায়।

সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেকখানি অন্য রকম। তাদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থকে সরাসরি প্রভাবিত করে, কাজেই তাদের মৌলিক আধেয়ের শ্রেণী-চরিত্র আছে। উদাহরণ স্বরূপ, পুঁজিপতিদের মুনাফা, রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর একই দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক বিজ্ঞানের পক্ষেই স্বাভাবিক যে বিভিন্ন মতের সংগ্রাম সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের ক্ষেত্রে তার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামও অন্তর্ভুক্ত। সমাজ-বিজ্ঞানের বিকাশ উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের সঙ্গে নয়, উৎপাদন সম্পর্কসমূহের বিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, কাজেই সামাজিক সম্পর্কসমূহের গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে, সমাজের প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, আর সেই কারণে এই সব বিজ্ঞানের উপর শ্রেণী-স্বার্থ বিরাট প্রভাব ফেলে।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিজ্ঞানের পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে দ্রুত হয়েছে। মৌলিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীব-বিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান) ক্রমাগত অধিকতর সংখ্যক শৃংখলার সমাহারে পরিণত হচ্ছে, এই সমাহারগুলি আবার বিভিন্ন বিশিষ্ট বিজ্ঞানে বিকশিত হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিকে আমরা পরস্পরের উপর পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠতে দেখছি (জৈবরসায়ন, ভূ-পদার্থবিদ্যা, জৈব-পদার্থবিদ্যা, ভূ-রসায়ন ইত্যাদি)। সামাজিক বিজ্ঞানেও এই একই প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

সেই সঙ্গে অবশ্য আর একটি প্রবণতাও কাজ করছে, তা হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একীকরণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে এর প্রকাশ হয় গণিতশাস্ত্রের ও তার পদ্ধতিগুলির এবং তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যারও পদ্ধতিগুলির ক্রমবর্ধমান ভূমিকার মধ্যে। সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে এই একই প্রবণতার প্রকাশ হয় বিনাব্যতিরেকে সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে মার্কসবাদী তত্ত্বের ক্রমাগত জয়লাভের মধ্যে এবং গাণিতিক পদ্ধতিগুলির সামাজিক বিজ্ঞানে প্রবেশের মধ্যে। মার্কসবাদী তত্ত্বের চরিত্র সাংশ্লেষিক। প্রাকৃতিক ও সামাজিক—এই দুই মৌলিক শাখা সহ সমস্ত বিজ্ঞানে সংশ্লেষের দিকে, একী-করণের দিকে প্রবণতা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। এই প্রবণতার মানে অবশ্যই

আদিতে, অর্থাৎ প্রাচীনকালের অবিভক্ত বিজ্ঞানে ফিরে যাওয়া নয়, এ সমস্ত বিজ্ঞানগুলির এক নতুন দ্বান্দ্বিক ঐক্য, ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সূচনা।

বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক স্বাধীনতাও এর বিকাশের অন্যতম সাধারণ বিধানের দরুনই হচ্ছে। সঞ্চিত জ্ঞানের মোট যোগফল যত বাড়ছে নতুন সমস্যাবলী উপস্থাপনে বিজ্ঞানের "চাপ" তত অনুভবনীয়ভাবে বাড়ছে। যদি কেবল এই কারণেও হয় তবু বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সম্পদগুলি তার বিকাশে ক্রমাগত বেশি ক'রে উদ্দীপক যোগাচ্ছে। বিজ্ঞানীকে তার আগে সৃষ্ট সব কিছুকে আয়ত্ত করতে হয়, তার মানে এঙ্গেলস-এর মন্তব্য অনুযায়ী সে "…বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন সামগ্রীর অধিকারী যা পূর্বেকার প্রজন্মগুলির চিন্তা থেকে নিজেকে স্বাধীনভাবে তৈরি করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলির মস্তিষ্কে আপন বিকাশের স্বাধীন গতিধারার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।"(১)

জ্ঞানের মোট যোগফলের বৃদ্ধি বিজ্ঞানের কাঠামোর উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে কারণ তা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমশ বেশি শ্রমবিভাগ দাবি করে। এই উপাদানটি আবার বিজ্ঞানের স্বাধীনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কারণ প্রশ্নের বৈচিত্র্যবৃদ্ধি ও বহুবিধ বিভাগের পটভূমিকায় বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ ও নতুন নতুন যোগান ক্রমশ জটিলতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের স্বাধীনতা আগেও আপেক্ষিক ছিল, এখনও তাই। এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছে ব্যবহারের দ্বারা, উৎপাদনের প্রয়োজনের দ্বারা, সরকারের প্রয়োজনের দ্বারা, সামরিক প্রয়োজনের দ্বারা (যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ আছে), শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও নবীন প্রজন্মের শিক্ষার প্রয়োজনের দ্বারা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র যত ব্যাপক হয়, তার মধ্যে শ্রমবিভাগ যত গভীর হয়, তার বিকাশের অন্তর্নিহিত যুক্তির, প্রগতির সহজাত উৎসের তাৎপর্য তত বাড়ে।

বিজ্ঞানের বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল তার বিভিন্ন প্রবণতা বা চিন্তার মধ্যে এবং পৃথক পৃথক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম।

বিভিন্ন ভাবধারা ও মতের মধ্যে সংগ্রাম বিজ্ঞানকে বরাবর এগিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া ও অবাধ সমালোচনা ছাড়া বিজ্ঞান একটা আপ্তবাক্যে পরিণত হবে, জড় হয়ে পড়বে অথবা বিকাশে পিছিয়ে পড়বে। বিজ্ঞানের স্তর যত উঁচু হয় বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলীর সমাধানে বিভিন্ন মতের সংগ্রামের 'তাৎপর্য' তত বাড়ে, অবশ্য এই সমস্যাবলীও আবার শেষ পর্যন্ত উদ্ভূত হয় ব্যবহারের প্রয়োজন থেকেই।

সমাজের জীবনে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা প্রকাশিত হয় বিজ্ঞানীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, গবেষণার ব্যয়বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারমান ব্যবস্থার মধ্যে।

এক শতাব্দী আগে সারা পৃথিবীতে কয়েক সহস্রের বেশি বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, এখন তাঁদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিজ্ঞানীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। প্রাক-বিপ্লবী রাশিয়াতে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল দশ হাজারের কিছু বেশি। সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বিজ্ঞানীদের সংখ্যা হয়েছিল ৯৮,৩০০; ১৯৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১,৬২,৫০০-তে উঠেছিল; ১৯৬০ সালের মধ্যে উঠেছিল ৩,৫৪,২০০-তে; আর বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯,৩০,০০০-এতে।

বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা অবশ্য কেবল বিজ্ঞানীদের সংখ্যার দ্বারা নির্ণীত হয় না, বিজ্ঞানের জন্য ব্যয়ের দ্রুত বৃদ্ধিরও বিরাট গুরুত্ব থাকে, এই ব্যয় বৃদ্ধি কেবল বিজ্ঞানীদের ও তাদের সহকারীদের পারিশ্রমিক দেওয়াই সম্ভবপর করে না, সেই সব লক্ষ লক্ষ কর্মীর, কৃৎকুশলী ও ইঞ্জিনীয়ারের বেতন দেওয়াও সম্ভবপর করে, যাঁরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেন, বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি প্রকাশ ও বণ্টন ইত্যাদি করেন।

তা সত্ত্বেও পরিমাণগত সূচক থেকে সব কথা বোঝা যায় না। বর্তমানে উৎপাদন ও বিজ্ঞান উভয়ের ক্ষেত্রেই একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ব্যাপক বিকাশ থেকে নিবিড় বিকাশের দিকে যাওয়ার। এর ফলে এই প্রশ্ন গুরুত্ব পাচ্ছে যে বিজ্ঞানে সমাজের লগ্নির কার্যকারিতা বাড়ান যায় কি ভাবে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলপ্রসূতা বাড়ান যায় কি ক'রে।

বৈজ্ঞানিক বিকাশ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ের পক্ষেই এত গুরুত্বপূর্ণ যে তা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার এবং দুটি বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে

প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাক্রম বহুল পরিমাণে নির্ভর করে বিজ্ঞানে ব্যয়বরাদ্দ, তার ফলপ্রসূতার মাত্রা, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের গতিবেগ ও উৎপাদনে তার ফলগুলির দ্রুত প্রয়োগের উপর। এই সব উপাদান দুই বিশ্ব-সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের গতিধারা ও ফলাফলকে বহুল পরিমাণে নির্ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অনুপাত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খরচ হয়। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানে ব্যয়কে কি ক'রে আরও ফলপ্রসূ করা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে সে কর্তব্য সব সময়ে রয়েছে।

বিজ্ঞানে ব্যয়বরাদ্দের কার্যকারিতা নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক কর্মীদের গুণগত মান ও গবেষণার সংগঠনের উপর। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামো এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে শ্রমের সংগঠন ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রীতি-মত আলাদা। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমানে মূলত তিন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান আছে।

প্রথমত, প্রাকৃতিক ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে মৌলিক সমস্যাবলী নিয়ে কর্মরত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ হল বিজ্ঞান আকাদেমি-গুলির (সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির) গবেষণা-কেন্দ্র। দেশের বিজ্ঞানীদের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত গুণী অংশ এগুলিতে কাজ করেন। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দ্রুত বেড়েছে, কারণ প্রকৃতির নতুন নতুন বিধান আবিষ্কার এবং সেগুলির কৃৎকৌশলগত প্রয়োগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমে যাচ্ছে এবং দেশের বৈজ্ঞানিক, কৃৎকৌশলগত ও সামরিক সামর্থ্য সর্বোপরি ও সর্বাগ্রে নির্ভর করছে গবেষণার সংগঠন ও বিকাশের উপর। এই সংগঠনগুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত সম্ভাবনা এবং সেগুলির সামাজিক পরিণতি নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীদের ছোট ছোট দল বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করেন।

দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক কর্মীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়োজিত থাকেন

তথাকথিত সহায়ক অথবা ফলিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, বিশেষত প্রযুক্তিবিদ্যাগত, চিকিৎসা-সংক্রান্ত, কৃষি-বিষয়ক ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং কারখানা-সংলগ্ন গবেষণা-কেন্দ্র ও গবেষণাগারগুলিতে। এই সব বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র ও গবেষক দল প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতির নির্দিষ্ট সমস্যাবলীর সমাধানে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত এবং এগুলি "বিশুদ্ধ" প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও উৎপাদনের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপর কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশে এগুলি শিল্প নির্মাণ, কৃষি ও অপরাপর মন্ত্রক ও বিভাগের অধীন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে উল্লেখিত হয়েছিল যে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য আগে শিল্পেই গবেষণা ও বিকাশের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এর জন্য দরকার কারখানাগুলিতে নকশা তৈরির অফিস ও ব্যাপক গবেষণার সুযোগ ও বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক কর্মীকে শিল্পে আকৃষ্ট করা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য শিল্প-সংশ্লিষ্ট বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ফল দেয়।

যে সব ফলিত বিজ্ঞান, যথা কৃৎকৌশলগত বিজ্ঞান প্রকৃতির বিধানগুলিকে কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতির নকশা করায়, ও নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা রচনায় ব্যবহার করতে চায়, সেগুলির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ পূর্বোক্ত প্রথম ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদনের সঙ্গে অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু গবেষণামূলক উৎপাদনের মত এমন একটি "মধ্যবর্তী" ব্যবহারিক রূপ, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণাও নয় বা যথার্থ অর্থে উৎপাদনও নয়, তার প্রধান কর্তব্য ঠিক পণ্যোৎপাদন নয়, সর্বনিম্ন খরচে পণ্যের গণহারে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তি-বিদ্যার নির্ধারিতকরণ।

তৃতীয়ত, বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন। এখানে বিজ্ঞানের মৌলিক ও ফলিত উভয় সমস্যাবলী নিয়ে কাজই ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, কৃষি-বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ইত্যাদির শিক্ষার

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির শিক্ষকরা বিজ্ঞান আকাদেমিগুলির গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি ও কারখানা-সংলগ্ন গবেষণাগারগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করেন, কল-কারখানাগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন ও তা পূরণ করেন এবং এই সবের ভিতর দিয়ে নিজেদের ছাত্রদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে সক্রিয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আকৃষ্ট করেন।

গবেষণার কার্যকারিতা কেবল অর্থ ও কর্মী সংস্থাপনের উপর নির্ভর করে না, কিভাবে গবেষণা সংগঠিত হয় তার উপর ও নির্ভর করে। পরিকল্পিত অর্থনীতি সহ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই ক্ষেত্রেও তার অধিকতর সুযোগ-সুবিধার পরিচয় দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতির জটিল সমস্যাবলী নিয়ে কাজ সম্পর্কে একথা বিশেষত প্রযোজ্য। জার-শাসিত রাশিয়া থেকে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত গবেষণার পশ্চাদপদতা অপেক্ষাকৃত অল্প ঐতিহাসিক কালের মধ্যেই কাটিয়ে উঠে সোভিয়েত বিজ্ঞান বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনেকগুলি ক্ষেত্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানে উপনীত হয়েছে।

কিন্তু এ আর যথেষ্ট নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে একথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিল। "যে সময়ে আশু উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে বিজ্ঞানের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে, তখন পৃথক পৃথক বৈজ্ঞানিক সাফল্য যত সমুজ্জ্বলই হোক না কেন, সেগুলি আর প্রধান নয়; প্রধান হল সমগ্র উৎপাদনের উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত স্তর।"(১) তার মানে বিজ্ঞানের সংগঠনে, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির প্রয়োগ ও তার গণ-উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সংগঠনে ত্রুটিগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করতে হবে। একদিকে কল-কারখানা ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমুখী হতে হবে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে সেগুলি সর্বাধুনিক মডেল উৎপাদন করতে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত উদ্ভাবনগুলিকে কাজে লাগাতে বাধ্য হয়। কল-কারখানাগুলির পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতির পূর্ণ প্রতিফলন করতে হবে। অপর দিকে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান-

১। টোয়েন্টিফোর্থ কংগ্রেস অফ দা সিপিএসইউ, পৃষ্ঠা ৬৭।

গুলিকে উৎপাদনের সঙ্গে ও ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপনে আরও আগ্রহী হতে হবে।

বর্তমানে অর্থনৈতিক সংস্কারের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের ও গবেষণায় নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের বেতন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বড় রকমের অভিযান চলছে। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃসংগঠনের জন্য আলোচনা চলছে যাতে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে কর্মরত স্থায়ী বিভাগ, শাখা ও গবেষণাগার ছাড়াও ব্যাপক চরিত্রের জরুরী সমস্যাবলী নিয়ে গবেষণা করার জন্য স্বল্প-মেয়াদী বিজ্ঞানীদল গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণাগত ভিত্তি প্রায়ই যথেষ্ট নয়, সে সব জায়গায় গবেষণা সংগঠনের যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন।

এইসব ত্রুটিগুলি দূর হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে সমাজতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে আরও ভালো ক'রে ব্যবহার করতে পারবে। এই সব সুযোগ-সুবিধা সত্যিই অফুরন্ত, কেবল পরিকল্পিত অর্থনীতির কল্যাণেই নয়, সকল অংশের লোকেদের বিজ্ঞানে পৌঁছানর পক্ষে একদা বিরাজমান প্রতিবন্ধকগুলি দূর হওয়ায় কল্যাণে, গবেষণা ও উন্নয়নে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অগ্রসর বিপ্লবী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলনের কল্যাণও বটে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশ এক ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্যের সম্মুখীন, তা হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুযোগ-সুবিধাগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সাফল্য-গুলিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে সমন্বিত করা এবং বিজ্ঞানকে উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা, যা সমাজতন্ত্রে সহজাত, তার বিভিন্ন রূপকে আরও ব্যাপক পরিসরে উন্নত ক'রে তোলা।

৩. বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব এবং দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা

বিজ্ঞানের বিকাশে বর্তমান স্তরের কতকগুলি জরুরী বৈশিষ্ট্য এক শতাব্দীরও বেশী আগে মার্কস কর্তৃক ভ্রূণ অবস্থায় উল্লেখিত হয়েছিল এবং এই সুপরিচিত সূত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে বিজ্ঞান সমাজের এক

উৎপাদিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। মার্কস লিখেছিলেন "প্রকৃতি যন্ত্রপাতি ইঞ্জিন, রেলপথ, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, কাপড়ের কল ইত্যাদি উৎপাদন করে না। এসবই মানবিক শ্রমের ফল, প্রকৃতির উপর আধিপত্যকারী মানবিক ইচ্ছার অঙ্গে (organs) রূপান্তরিত প্রাকৃতিক বস্তু, অথবা প্রকৃতিতে মানবিক ক্রিয়ার ফল। এ সমস্তই মানুষের মস্তিষ্কের অঙ্গপ্রতঙ্গ, মানুষের হস্ত দ্বারা সৃষ্ট, জ্ঞানের বাস্তবায়িত শক্তির দ্বারা সৃষ্ট। স্থির পুঁজির বিকাশ দেখিয়ে দেয় সর্বজনীন সামাজিক জ্ঞান কতটা পরিমানে···প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা শক্তি হয়ে উঠেছে।"(১) এই প্রতেজ্ঞাটির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা আগে যে বলেছিলাম বিজ্ঞান জ্ঞানের একটা ব্যবস্থা, একটা আত্মিক শক্তি, তা যদি হয় তবে তাকে একটা বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তি হিসাবেও কি ক'রে গণ্য করা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের সমাজ-জীবনে বৈষয়িক ও আত্মিক উপাদানগুলির ডায়লেকটিকসকে মনে রাখতে হবে, যা অনুযায়ী উপাদান-গুলিকে শুধু পরস্পরের উপর ক্রিয়া করতে হবে তাই নয়, পরস্পরের মধ্যে প্রবেশও করতে হবে। বস্তুত আত্মিক উপাদান সব সময়েই কোনও না কোনও ভাবে উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে প্রবেশ করে, যেমন শ্রমিকদের চেতনা ও ইচ্ছা শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজ করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন উৎপাদন বৈজ্ঞানিক উপাত্তকে ব্যাপকতরভাবে ব্যবহার করছে, তখন এ প্রক্রিয়া তীব্রতর হচ্ছে।

বিজ্ঞানের বিকাশের বর্তমান স্তরের, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের স্তরের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনে বিজ্ঞানের বিপুলভাবে বর্ধিত প্রয়োগ। এই ব্যাপারে কয়েক দশক আগেকার পরিস্থিতির তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতির একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। এ বিষয়ে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই যে এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞান আগের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হচ্ছিল, তা সত্ত্বেও উৎপাদনের প্রধান শাখাগুলি তাদের প্রথাসিদ্ধ চরিত্র বজায় রেখেছিল। ধাতুশিল্প তখনও ছিল আকর থেকে লোহা ও অপরাপর ধাতু উৎপাদন, খাদ্যশিল্প সীমাবদ্ধ ছিল কৃষিজাত

১। কে. মার্কস, গ্রুনডিসে ডেয়ার ক্রিটিক ডেয়ার পলিটিশেন ইকোনমি, মস্কো ১৯৩৯, পৃষ্ঠা ৫৯৪।

দ্রব্য আধা-তৈরি করার মধ্যে, যদিও পাস্তুরের আবিষ্কারগুলি খাদ্য-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটা বিপ্লব শুরু করেছিল।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে উৎপাদনের এমন সব শাখার উদ্ভব হচ্ছে যেগুলি সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে। এই সমস্ত আবিষ্কার ও তদনুযায়ী উৎপাদনের রূপের আবির্ভাবের মধ্যে সময়ের তফাত ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে সংযোগ ক্রমশ বেশি প্রত্যক্ষ হচ্ছে। রেডিও-শিল্প সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। এই শিল্প হেরৎস ও পোপভ-এর ও পরে লাংমুইর ও অপরাপরদের ভালবে গ্যাসের আধান (charge) সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন তা অর্ধ-পরিবাহী পদার্থবিদ্যার ভিত্তিতে এগিয়ে চলেছে। সাংশ্লেষিক শিল্প সম্বন্ধেও সে কথা সত্য, এ শিল্প সরাসরি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থেকেই নিজের পদ্ধতি সংগ্রহ করে। অ্যান্টিবায়োটিকস ও আগাছা-নাশক, রকেটের সরঞ্জাম ও কম্পিউটর তৈরির শিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যাও বিজ্ঞান কর্তৃক এইরকম প্রত্যক্ষভাবেই নির্ধারিত হয়।

এই সমস্ত ও আরও বহু শিল্প যা সামাজিক জীবনে ক্রমশ বর্ধিত তাৎপর্য লাভ করছে সেগুলির প্রযুক্তিবিদ্যায় এবং সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতিতে বৈজ্ঞানিক প্রগতিই নিয়ামক উপাদান। উৎপাদনের বিকাশের হার এখন প্রধানত নির্ধারিত হয় বিজ্ঞানের বিকাশের হার দিয়ে। শিল্পের "বৈজ্ঞানিক শাখাগুলি" প্রথাসিদ্ধ শিল্পগুলির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব অর্জন করেছে, প্রথাসিদ্ধ শিল্পগুলিও আবার স্থির হয়ে নেই, সেগুলিও আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এগিয়ে চলেছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব যে সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে তার মূল্যায়নের জন্য আগামী কয়েক দশকে শ্রমের বিষয়-বস্তুর, শ্রমের উপকরণের (কার্যকর যন্ত্রপাতি) এবং শ্রমের উপকরণকে চালু করে যে শক্তি তার উৎসের চরিত্রে যে সব পরিবর্তন ঘটতে পারে তা বিবেচনা ক'রে দেখা যাক।

বর্তমানে শিল্প প্রাকৃতিক বস্তুর উপর নির্ভরশীল। এগুলিকে মাটি থেকে নিষ্কাশিত করা হয় এবং যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করা হয়; তা ছাড়া জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক বস্তুও আছে, যথা—কৃষি ও বন থেকে পাওয়া কাঠ, তুলো, পশম, রবার ইত্যাদি। কিন্তু "পূর্ব-নির্ধারিত"

গুণাবলী সমন্বিত সাংশ্লেষিক বস্তু পাওয়ার জন্য রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলিও ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিতে শুরু করেছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বর্তমান স্তরেও শ্রমিকের হাত ও চোখের বদলে কাজ করার জন্য তৈরি যন্ত্রপাতি বৃদ্ধির বিরাটতর সম্ভাবনা পড়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে ওজন কমান ও নকশার উন্নতিসাধনের সমস্যাবলী নিয়ে গবেষকদের বিরাট বিরাট দল কাজ করছেন। এমনকি এখানেও আরও উন্নতির সম্ভাবনা নির্ধারিত হয় প্রযুক্তিবিদ্যায় নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়োগের দ্বারা। স্বয়ংক্রিয়তা, যার উদ্দেশ্য হল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে শ্রমিকের কেবল হাত ও চোখেরই নয়, মস্তিষ্কেরও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করা, তা বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের মূলমন্ত্র হয়ে উঠছে। স্বয়ংক্রিয় অ্যাসেম্বলি লাইন, কর্মশালা ও কারখানা নির্মাণ এখন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হয়ে উঠেছে, এ এখন শ্রম উৎপাদন ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি অর্জন করার মৌলিক উপায়। স্বয়ংক্রিয়তার মধ্যে নিহিত আছে শিল্পে, নির্মাণকার্যে ও পরিবহনে কম্পিউটর ও ইলেক-ট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন। সাইবারনেটিকস (যন্ত্রপাতির যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান) ও ইলেক্‌ট্রনিকস-এর বিকাশ উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয়তা প্রবর্তনের এবং কেবল এক-একটি কারখানায় নয়, অর্থনীতির এক-একটা গোটা শাখায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের হার ও সম্ভাবনা নির্ধারণ করে।

তাপ-বিদ্যুৎ ও জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শক্তিতন্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করা হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু শক্তির নতুন ও অফুরন্ত উৎস বের করার সমস্যার সমাধান করবে মৌলিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি। আনবিক শক্তির উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ইতিমধ্যেই একটা ভূমিকা নিচ্ছে, বিশেষত যে সব এলাকার শক্তির সরবরাহ কম সে সব জায়গার পক্ষে। সেদিন খুব সুদূরে নয় যখন পৃথিবীর "ভাঁড়ার" তছনছ করার এবং মূল্যবান রাসায়নিক কাঁচামাল (কয়লা, গ্যাস, তেল) পোড়ানোর বা জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির জন্য লক্ষ লক্ষ একর মূল্যবান জমি ডুবিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন থেকে মানবজাতি মুক্তি পাবে। এর সমাধান হতে পারে একদিকে সৌর বিকীরণ বা সমুদ্র তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত শক্তির অফুরন্ত নিত্য উৎস ব্যবহারের

দ্বারা, অপর দিকে প্লাজমাকে বশ ক'রে এবং আলোক নিউক্লিয়াসের সংশ্লেষের সময়ে মুক্ত বিপুল শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত ক'রে।

কাজেই প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতির তিনটি মূল ধারাতেই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ্ম কর্তব্য করতে হবে—এক হল উৎপাদনের বর্তমান পদ্ধতিগুলির উন্নয়ন, আর হল মৌলিকভাবে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার; জোর দিতে হবে দ্বিতীয়টির উপর।

যা কিছু বলা হল তা কেবল উৎপাদন সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, যদিও উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগই নিঃসন্দেহে প্রধান প্রবণতা। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রগতি যোগাযোগ, পরিবহন, দৈনন্দিন জীবন, খেলাধুলো ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত। বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যা।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের কর্তব্য সাধনের ক্ষেত্রে যে সমাজ উৎপাদনের উপকরণের মালিক, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ, তার সেই সমাজের তুলনায় মৌলিক সুবিধা রয়েছে যেখানে উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে।

সমসাময়িক ধনতন্ত্রের সবচেয়ে গভীর বিরোধগুলি বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধনতন্ত্র বিজ্ঞানের বিকাশে উদ্দীপনা যোগায়, কারণ বিজ্ঞানকে সে কেবল বর্ধিত মুনাফার উপায় হিসাবেই দেখে না, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় হিসাবেও দেখে। বর্তমানে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের শাসক মহলগুলি তাদের শ্রেণী-আধিপত্য দৃঢ়তর করার জন্য এবং সমাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব ত্বরান্বিত করা ও তার ফলগুলি প্রয়োগ করার উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞানের জন্য ব্যয়বরাদ্দের অধিকাংশ আসে একচেটিয়া-দের কাছ থেকে, যারা বিজ্ঞানকে পুঁজি লগ্নির সবচেয়ে লাভজনক ক্ষেত্র বলে মনে করে; তবে বিজ্ঞানের জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ব্যয়বরাদ্দও বাড়ছে।

সেই সঙ্গে বুর্জোয়া সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রগতির উল্লেখযোগ্য পুনর্মূল্যায়ন ঘটছে। ১৯২৮-১৯৩২ সালের "মহামন্দার" সময়ে অর্থনৈতিক কষ্টের জন্য

বিজ্ঞানকে দায়ী করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বছরগুলিতে হিরোশিমার জন্য এবং মানবজাতির নিউক্লিয়ার ধ্বংসের আশংকার জন্য বিজ্ঞানের উপর দোষারোপ করার চেষ্টা হয়েছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্তও কিছু বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য তত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির পরিণাম সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশবাদী মনোভাব নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এখনও এ প্রবণতা দূর হয়নি, নয়া-টমিস্ট ও এক্সিস্টেনশিয়ালিস্টদের রচনায় এ বিশেষ ক'রে দেখা যায়। কিন্তু ৫০-এর দশকের শেষের দিকে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব বেশ চালু হওয়ার সময় থেকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকদের মধ্যেও একটি পাল্টা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। উপনিবেশ হারানর ক্ষতি পূরণের জন্য, আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংগ্রামকে নিস্তেজ ক'রে রাখার জন্য এবং কেবল টিকে থাকা নয়, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্যও ধনতন্ত্রকে ক্রমশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতির শক্তির উপরই বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্য সমাজতত্ত্ব ক্রমশ তথাকথিত "প্রযুক্তিবিদ্যাতান্ত্রিক" তত্ত্বের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হচ্ছে, এই তত্ত্বের পরামর্শ হল ক্ষমতা "প্রযুক্তিবিদ"দের একটা সংকীর্ণ মহলের হাতে হস্তান্তরিত করা উচিত, অবশ্য আসলে তার মানে হল একচেটিয়া পুঁজির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে রাখা।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব কর্তৃক বিজ্ঞানের ভূমিকার এই পরস্পর-বিরোধী মূল্যায়ন যদিও বাস্তবের একটা বিকৃত ছবি হাজির করছে, তবুও এ তার নিজের কায়দায় ধনতন্ত্রের আমলে বিজ্ঞানের ভূমিকায় সুগভীর বিরোধের সাক্ষ্য দিচ্ছে। মার্কসবাদ বহু আগেই বিরোধের কথা তুলে ধরেছিল। এই বিরোধগুলি কি কি ?

প্রথমত, পুঁজির সংকীর্ণ স্বার্থের চাপে আধুনিক বিজ্ঞান শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে ক্রমশ বেশী ক'রে ব্যবহৃত হচ্ছে। "বিজ্ঞানকে, মানবজাতির তত্ত্বগত প্রগতিকে শোষণ। পুঁজি বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করে না, তাকে শোষণ করে, এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাকে আত্মসাৎ করে," একথা মার্কস এক শতাব্দী আগে লিখেছিলেন। তার ফল হল এই যে "বিজ্ঞান এমন একটা শক্তি হিসাবে গড়ে উঠছে যা শ্রমের প্রতি বিরোধী ও শত্রুভাবাপন্ন

ও তার উপর আধিপত্য করে…।"(১) রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের যুগে এই বিরোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রতি বৎসরে শত শত কোটি ডলার-গ্রাসী অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিপদ একথা প্রমাণ করে যে ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলিকে জনগণের স্বার্থে বিরুদ্ধে খাটায়।

দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া ব্যবস্থা উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে যে পরিমাণে বিকশিত করে সেই পরিমাণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রগতিকেও উৎসাহিত করে। কৃৎ-কৌশলগত প্রগতি ও বৈজ্ঞানিক প্রগতি সঙ্গে সঙ্গে চলে, একটি ছাড়া অপরটি অসম্ভব। কিন্তু ধনতন্ত্র আবার ক্রমশ অধিকতর প্রবল প্রবণতার জন্ম দেয়, যা উৎপাদন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের বিরুদ্ধে কাজ করে। এর অর্থ হল বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও তার প্রয়োগের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে কোনও মতেই পুরো কাজে লাগান হয় না। একচেটিয়ারা শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বহু সাফল্যকে কাজে লাগাতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, কারণ তাতে তাদের স্বার্থহানি হবে।

একথা মনে রাখা দরকার যে ধনতন্ত্রের আমলে মতাদর্শগত বিরোধও ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। ধনতন্ত্রের বিজ্ঞানকে প্রয়োজন কেবল প্রযুক্তিবিদ্যাকে বিকশিত করার একটা উপায় হিসাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের একটা বিশ্ব-দৃষ্টি-ভঙ্গি ছাড়া একটা দার্শনিক ভিত্তি চলে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বস্তুবাদী অবস্থান গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাস্তব তথ্যাবলীর চাপে তারা ক্রমশঃ বিকাশের ও ডায়লেকটিকস-এর ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে আবার বুর্জোয়াদের মতা-দর্শগত প্রয়োজন ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট ভাববাদী দর্শনকে বাঁচিয়ে রাখার দাবি করে। বৈজ্ঞানিকদের বেশির ভাগ যেহেতু তাঁদের জন্ম, শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কাজেই ধর্ম ও তৎ-সংশ্লিষ্ট ভাববাদী দর্শন তাঁদের দার্শনিক মতামতকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের আমলে সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশে বিরোধ আরও তীব্রতর। প্রথম ক্ষমতায় যাওয়ার পর্যায়ে বুর্জোয়ারা ইতিহাসের

১। "দা গ্রিটন হেরিটেজ অব কে. মার্কস", কমিউনিস্ট, ৭নং, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ২২-২৩ থেকে উদ্ধৃত।

বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানে কিছুটা আগ্রহশীল ছিল, কিন্তু ইতিহাস যখন থেকে ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের অনুকূলে যাওয়া বন্ধ করল, তখন থেকে বুর্জোয়ারা ও তাদের তত্ত্ববিদরা বস্তুবাদী বিধান স্বীকার করার বিরুদ্ধে, বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরুদ্ধে একেবারে খড়গহস্ত। এখনও অবশ্য বুর্জোয়াদের ও একচেটিয়া রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের, সাহিত্যিক অনুশীলন ও ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের, দর্শন ও আইন-বিজ্ঞানের দরকার হয়, কারণ এসব ছাড়া তারা সমাজের প্রশাসন চালাতে পারে না অথবা নিজেদের মতাদর্শগত আধিপত্য বজায় রাখতে পারে না। যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ, আইন ব্যবসায়ী অথবা সমাজতত্ত্ববিদ একচেটিয়াদের ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সেবা করে তারা বাজারের অবস্থা, চালু আইনগত অবস্থা, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপ, শ্রমিক সংগঠনের পদ্ধতি শিল্পে মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সমস্যা সমাধান ও এই রকম আরও অনেক বিষয় অনুশীলনের ভিত্তিতে সুপারিশ হাজির করে।

কিন্তু ধনতন্ত্র কর্তৃক সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ব্যবহার দুটি মৌলিক উপাদান দ্বারা সীমিত।

প্রথমত, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের মধ্যে অর্থনীতির সর্বাত্মক দিক-নির্ধারণ ও পরিকল্পনার অবকাশ নেই। বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিদরা শিল্পে মন্দা অথবা মুদ্রা-সংক্রান্ত সংকট সম্বন্ধে কিছুটা সম্ভাব্য ভবিষ্য-দ্বাণী করতে পারে, যদিও তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত এলোমেলো হয়। কিন্তু কোনও পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণীই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে সংকটের অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারে না। এর মানে অবশ্য এ নয় যে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গবেষকদের পূর্বাভাসগুলিকে মার্কসবাদীদের অবহেলা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া সামাজিক বিজ্ঞান যে ব্যবস্থা তার জন্ম দিয়েছে তাকে নানাবিধ উপায়ে ন্যায্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা ক'রে ধনতন্ত্রের বিকাশের বিধান ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে মূলগতভাবে ভুল মূল্যায়ন করছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদই বুর্জোয়া সমাজের জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক চিত্র তুলে ধরছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীতে সমাজতন্ত্র সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্রমশ বেশি ব্যবহার না ক'রে বিকশিত হতে

পারে না। সমাজতন্ত্রের বিকাশের মধ্যেই একটা পরিকল্পিত অর্থনীতি চালু রাখার পদ্ধতিগুলির ক্রমাগত উন্নতি নিহিত আছে, সেই কারণেই সমাজতন্ত্রের বিকাশের মধ্যেই নতুন সামাজিক সম্পর্ক চালু করায় অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম, আইন-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ইত্যাদিকে প্রয়োগ করাও নিহিত আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশের পরিকল্পনার উন্নতি বিধানের মধ্যে এর ব্যবহারিক প্রতিফলন হয়। বাৎসরিক পরিকল্পনা ছাড়াও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং আরও দীর্ঘ সময়ের জন্যও সম্ভাব্য পরিকল্পনা রচনা করা হয়। পরিকল্পনা ক্রমশ বেশ বাস্তবানুগ ও সামগ্রিক হচ্ছে, তার মধ্যে সংস্কৃতির এবং বিজ্ঞানের নিজের বিকাশের সমস্যাবলীরও স্থান থাকছে। পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক স্তর উন্নত হচ্ছে। বর্তমানে পরিকল্পনা হচ্ছে অন্তর্রাষ্ট্রীয় স্তরে: কাউন্সিল অব মিউচুয়াল ইকনমিক অ্যাসিস্টান্স-এর সদস্য দেশগুলি তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে পরস্পরে সমন্বয় করছে; সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক একীকরণের দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যাপক কর্মসূচী রচিত হচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে তাদের অর্থনীতিগুলির ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন, সকলের অর্থনৈতিক বিকাশকে ক্রমে ক্রমে একই স্তরে আনা এবং অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মৌলিক শাখাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তোলা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক বিজ্ঞান জনগণের শিক্ষাগত স্তর ও কমিউনিস্ট চেতনার উন্নয়নে সামাজিক বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হয়ে উঠছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মৌলিক জিনিসগুলিকে শেখানর সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলি বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি, কমিউনিস্ট চেতনা, সক্রিয় নাগরিকত্ব, ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের নৈতিক মানের মূল কথাগুলি শেখায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্র, শ্রবণ ও দর্শন-ভিত্তিক প্রচার, সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রভৃতি সমস্ত গণ-মাধ্যম একটা লক্ষ্যের প্রতিই মন দেয়, তা হল নতুন মানুষ গড়ে তোলা।

রাশিয়ার মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর লেনিন নিম্নোক্ত কথাগুলির মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের মর্যাদায় ও তার সামাজিক ভূমিকায় বিপ্লবের মূল তাৎপর্য বর্ণনা করেছিলেন: "আগেকার দিনে মানুষের

প্রতিভা, মানুষের মস্তিষ্ক প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির সুযোগ-সুবিধা কেবল কিছু লোককে দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্যদের শিক্ষা ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত করার জন্যই সৃষ্টি করত। এখন থেকে বিজ্ঞানের সমস্ত পরমাশ্চর্য কীর্তি এবং সংস্কৃতির সকল সাফল্য গোটা জাতির সম্পত্তি, আর কখনও নিপীড়ন ও শোষণের জন্য মানুষের মস্তিষ্ক, মানুষের প্রতিভা ব্যবহৃত হবে না।(১)

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরও যে সব সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীদের কল্পনাকে অধিকার করেছে, সেগুলি যখন বাস্তব হয়ে উঠবে তখন সমাজতন্ত্রের সুবিধা আরও বেশি ক'রে বোঝা যাবে।

এই বিপ্লব প্রকৃতির মৌলিক রূপান্তরের দ্বার খুলে দেয়। এর ফলে জল-বায়ুর রূপান্তর এক-একটা গোটা ভৌগোলিক এলাকার জল-শাসন, বসবাসের জন্য ও সমাজের স্বার্থে বহুবিধ ব্যবহারের জন্য বিরাট বিরাট মরুভূমি ও জলাভূমির পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। বিশেষ ক'রে গুরুত্বপূর্ণ হল পৃথিবীর মহাসমুদ্রগুলিতে অনুসন্ধান চালিয়ে সমুদ্রকে খাদ্যের ও কাঁচামালের উৎস হিসাবে কাজে লাগান, এ-কাজ এখনও পর্যন্ত অল্পই করা হয়েছে, সমুদ্রচর্চা প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন ক্ষেত্র ও নতুন নতুন শিল্পের জন্ম দেবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ইতিমধ্যে যে সব পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছে তাতে আমরা শহরগুলির ও শিল্পাঞ্চলগুলির চেহারা বদলানর কথা ভাবতে পারি। এগুলি অনেক ক্ষেত্রে দূষিত, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, বাসের অযোগ্য "শহর পিণ্ডে" পরিণত হয়েছে। এগুলির রূপ বদল ক'রে আমরা শিল্পের ও জনসংখ্যার যুক্তিযুক্ত বণ্টন ও পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলি রক্ষা করার কথা ভাবতে পারি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ফলত বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাঁদের কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের দরুন বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর প্রকাশ অনেক বেড়েছে। সাধারণত মনে করা হয় যে বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎ-কৌশলগত খবরাখবর প্রতি ১০ বা ১৫ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল "খবরাখবরের শিল্পের" বিকাশ। এর ফলে বৈজ্ঞানিক খবরাখবর সংগ্রহ, বাছা ও সরবরাহ করার পদ্ধতিতে একটা রীতিমত বিপ্লব আসতে যাচ্ছে। সাইবারনেটিকস

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২৬, পৃষ্ঠা ৪৮১-৮২।

এমন একটা কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা যোগাচ্ছে যা যে কোনও বৈজ্ঞানিক, কৃৎকৌশলগত অথবা রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে খবর দিতে ও নিতে পারে। অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন; প্রশিক্ষণ দেওয়ার যন্ত্রপাতি বসান, এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় আপনা থেকে অনুবাদ হওয়া, সংবাদপত্রের বদলে টেলিভিশন পর্দার প্রবর্তন, ওই একই পর্দাকে "অনুরোধ মত" বৈজ্ঞানিক, কৃৎ-কৌশলগত ও অন্যান্য খবর পাওয়ার জন্য ব্যবহার, এই সব অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কাজের বিরাট পুনর্ব্যবস্থাপনা—এ সমস্ত সমস্যাই বর্তমানে বিজ্ঞানের পাল্লার মধ্যে আসে।

প্রকৃতির ও জীবনধারণের বৈষয়িক পরিবেশের রূপান্তর মানুষের আগে নিজের মধ্যেই পরিবর্তন এনে দেবে। জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন প্রধানত ব্যস্ত মানব-দেহের কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহান্তরে স্থাপনের, জীবাণু-ঘটিত ও কর্কট রোগ দূরীকরণের, মানুষের বংশানুক্রমিকতা নিয়ন্ত্রণের এবং আয়ুবৃদ্ধির সমস্যাবলী নিয়ে। সামাজিক থেকে মানুষকে নিখুঁত করার জন্য দরকার শোষণের অবসান, হিংসা ও যুদ্ধ দূর করা এবং জাতিগত ও বর্ণগত অসাম্য দূর করা।

সমসাময়িক বিজ্ঞান ও ব্যবহার ইতিমধ্যেই এই যে সব চিত্তাকর্ষক কর্তব্য তুলে ধরেছে সেগুলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন শ্রমজীবী জনগণের উপকারার্থে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাফল্যগুলিকে পরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার, আর ধনতন্ত্রের আমলে তা অসম্ভব ; এ ধনতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির পরিপন্থী।

মহৎ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এঙ্গেলস এক শতাব্দী আগে লিখে গিয়েছিলেন যে প্রকৃতির উপর আমাদের, অর্থাৎ মানুষের সমস্ত আধিপত্য "...এই তথ্যের মধ্যে আছে যে আর সমস্ত প্রাণীর চেয়ে আমাদের সুবিধা হল এর বিধান-গুলিকে জানার ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা।"(১) এখনও পর্যন্ত আমরা কেবল প্রকৃতির উপর আমাদের প্রভাবের আশু পরিণামগুলির কথাই বিবেচনা করি; আরও পরিণাম কেবল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি প্রাথমিক ফলাফলের ঠিক উল্টো। এই সব পরিণামগুলিকেও যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে এঙ্গেলস-এর কথামত "কেবল জ্ঞান

১। এফ. এঙ্গেলস, ডায়লেকটিকস অব নেচার, পৃষ্ঠা ১৮০।

ছাড়া আরও কিছু (থাকা চাই)। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের এ পর্যন্ত বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বিপ্লব, এবং তার সঙ্গে আমাদের সমসাময়িক সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থাতেও।"(১) সমাজতন্ত্রের জয়লাভ, তারপর কমিউনিজম নির্মাণ—বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সম্ভাব্য কর্তব্যগুলি সম্পাদন ও তার মাধ্যমে এর আরও অগ্রগতিকে বাস্তবে পরিণত করার এই হল মৌলিক পূর্বশর্ত।

কমিউনিজমের আমলে সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কেন্দ্রীয় স্থান দিতে হবে। অতীতে এই স্থানটি ছিল ধর্মের। সমাজতন্ত্রের আমলে ধর্ম ইতিমধ্যে বিলীন হতে শুরু করেছে, এদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ, আইনগত চেতনা, নৈতিকতা ও দর্শনের মত সামাজিক চেতনার রূপগুলি সুস্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করছে। কালক্রমে যখন রাজনৈতিক ও আইনগত মতাদর্শগুলি বিলীন হবে তখন মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কাজটি সম্পূর্ণ অধিকার করবে নৈতিকতা, যা সামাজিক সম্পর্কগুলির এবং তাদের দ্বারা ব্যক্তির উপর অর্পিত বাধ্যবাধকতাগুলির সারমর্ম সম্বন্ধে সুগভীর বৈজ্ঞানিক ধারণার দ্বারা পরিপ্লুত হবে। বিজ্ঞান ও কলা পৃথিবীকে জানবার দুটি পৃথক পরিপূরক উপায় হিসাবে বিকাশের নতুন শিখরে উঠবে। তাদের আন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া বাড়বে। এখনই বিজ্ঞান ব্যাপক জনগণের নান্দনিক ধারণা ও মূল্যবোধের প্রক্রিয়ার উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করছে।

অতএব সমাজের জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকাবৃদ্ধি কালক্রমে সামাজিক চেতনার সমগ্র ব্যবস্থায় তার অগ্রবর্তী স্থান দখলে পৌঁছে দেবে এবং সামাজিক সত্তার বিকাশের উপর বিজ্ঞান ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলবে।

১। উপরোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮২।

দশম পরিচ্ছেদ

সমাজ ও ব্যক্তি

সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক সামাজিক জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলীর অন্যতম। নতুন সমাজ গড়ে তোলার ব্যবহারিক কাজের পক্ষে এর বিপুল গুরুত্ব আছে। বিশেষত সেই নতুন সমাজের যখন লক্ষ্য হল সমস্ত রকম শোষণ ও বিদ্বেষের অবসান ঘটান এবং ব্যক্তিসত্তার মুক্তি এবং তার স্বাধীন ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। এই পরিচ্ছেদে আমরা ব্যক্তির, তার জীবন ও ক্রিয়ার সামাজিক পরিবেশের এবং সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধনের পক্ষে উপযুক্ত পরিস্থিতির চরিত্র ও সারমর্ম বিবেচনা করব।

১. ব্যক্তি কি?

ব্যক্তির ধারণাটির মানে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে সামাজিক সত্তা হিসাবে মানুষের মর্মার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে, কারণ ব্যক্তির অস্তিত্ব কেবল মানব সমাজের মধ্যেই আছে। মার্কস-এর মতে "মানবিক মর্মার্থ প্রতিটি একক ব্যক্তির মধ্যে সহজাত কোনও বিমূর্ততা নয়। বাস্তবে এ হল সামাজিক সম্পর্কগুলির একটি সমাহার"(১) মার্কস-এর এই প্রতিপাদ্য মূলত ফয়ারবাখের সমালোচনা। মানবিক মর্মার্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফয়ারবাখ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ধারণা থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে সমাজ যাদের নিয়ে গঠিত সেই ব্যক্তিগণ পরস্পরের সঙ্গে "কেবল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বন্ধনে" আবদ্ধ। ফয়ারবাখ দেখতে অক্ষম হয়েছিলেন যে……"যে বিমূর্ত ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করছিলেন সে আসলে একটি বিশেষ ধরণের সমাজেই বিরাজ করে।"(২)

"মানুষ"-এর ধারণাটি একটি বংশগত ধারণা, এর দ্বারা মানবজাতির সহজাত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়। মানবজাতির একজন একক-

---

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৪।

২। কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৪।

সদস্য সাধারণত একজন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত, কিন্তু সে সাধারণ এবং পার্থক্যসূচক উভয় বৈশিষ্টেরই অধিকারী। মার্কস-এর বর্ণনা অনুযায়ী ব্যক্তি হল "এক বিশেষ ব্যক্তি (আর এই বৈশিষ্টই তাকে একটি ব্যক্তিতে এবং প্রকৃত আলাদা আলাদা সামাজিক সত্তার পরিণত করে)……।"(১)

মানুষের মর্মার্থ সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের সমাহার—এই মার্কসবাদী সংজ্ঞা থেকে একথা মোটেই বোঝায় না যে মার্কসবাদ মানুষকে কেবল এই সামাজিক মর্মার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে এবং মানুষের গুণগুলি তার শারীরিক সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মানুষকে যখন আমরা ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করি তখন সে আমাদের সামনে দাঁড়ায় "মানব সত্তার মধ্যে বিরাজমান সেই সব মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের যোগফল হিসাবে যা সে যে কোনও ধরণের ব্যবহারিক মূল্য উৎপাদনের সময়ে ব্যবহার করে।"(১)

কাজেই মানুষ কিছুটা পরিমানে জৈব-সামাজিক সত্তা; সামাজিক, কারণ তার একটা সামাজিক মর্মার্থ আছে। জৈবিক, কারণ এই মর্মার্থের বাহক হল একটি মানবিক জৈব-কাঠামো।

আগে আমরা একথা উল্লেখ করেছি যে ব্যক্তির ধারণাটি মানুষের ধারণার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তবে ব্যক্তির ধারণাটি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ধারণার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও মনস্তত্ত্বগত গুণাবলীর মধ্যে, প্রকাশিত হয় স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, মেজাজ, চরিত্র প্রভৃতি নির্দিষ্ট বৈশিষ্টগুলির মধ্যে, অর্থাৎ মানবিক গুণ ও ক্রিয়াকলাপের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে। চেতনার সমগ্র আধেয়, যথা—মতামত, বিচার, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির যদি বিভিন্ন লোকের একরকমও হয় তবু তার মধ্যে ব্যক্তির একটা "নিজস্বতা" থাকে, একটা বিশিষ্ট রং ও থাকে। প্রত্যেক লোকের চাহিদা ও প্রয়োজনের একটা ব্যক্তিগত রূপ থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যা করে তার উপর নিজ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখে। ব্যক্তিকে তার সাধারণ গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তার সামাজিক, আত্মিক ও শারীরিক গুণাবলীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করা হয়।

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, [illegible], খণ্ড [illegible] (রুশভাষায়)।
২। কে. মার্কস, ক্যাপিটাল, ভল্যুম ১, [illegible], পৃষ্ঠা [illegible]।

কিছু লেখক যারা মনে করে ব্যক্তির ধারণাটির মধ্যে সামাজিক গুণাবলীই নিহিত আছে তারা জোর দিয়ে বলে যে ফলত ব্যক্তি সম্বন্ধে বিচার কেবল সমাজতত্ত্ব দিয়েই করা উচিত, মনস্তত্ত্ব বা অপর কোনও বিজ্ঞান দিয়ে নয়। কিন্তু ব্যক্তিকে প্রধানত যদিও সামাজিক বিজ্ঞানের দ্বারাই বিচার করতে হয়, তবু তাকে আরও নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বিচার করা যায় এবং ফলত সে বিচার দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি অনেকগুলি বিজ্ঞানের পরিসরের মধ্যে এসে পড়ে।

ব্যক্তির সর্বজনীন গুণ হল তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, এ তাকে বাকি পৃথিবী থেকে বিশিষ্ট ক'রে তোলে। মানুষ হল সর্বোপরি কর্মী; নিজের জীবনের পরিবেশের পরিবর্তন-সাধক এক সক্রিয় সামাজিক বিষয়ী। সে কেবল সামাজিকভাবে সক্রিয় নয়, উপরন্তু সামাজিকভাবে চিন্তাশীল ও অনুভূতিশীল সত্তা: আর এই সমস্ত গুণাবলী অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরসংযুক্ত। আমরা যদি একথা বলি যে বিনা ব্যতিক্রমে সকল মানুষের সাধারণ গুণাবলী হল অনুভব করা, চিন্তা করা ও কাজ করা, তাহলে তা অবশ্যই সঠিক হবে। কিন্তু যখনই আমরা এই সব গুণের বিচার করতে যাই তখন আমাদের তদন্ত আর ব্যক্তি বিশেষেদের কেন্দ্র ক'রে হয় না, হয় নির্দিষ্ট সামাজিক-ঐতিহাসিক নমুনার ব্যক্তিদের কেন্দ্র ক'রে যাদের অন্তর্জগৎ, জীবন ও ক্রিয়াকলাপের ধারা বিভিন্ন, এমনকি বিপরীত বৈশিষ্ট্যেও ভূষিত হয়।

সমাজে যখন বুর্জোয়া বলে একটি সামাজিক নমুনা থাকে তখন সেই নমুনাটি প্রত্যেক বুর্জোয়া ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশিত হয়। সমাজতন্ত্রের আমলে নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক, নতুন "বংশানুক্রমিক" জীবনধারা সৃষ্ট হয়, তার ফলে নতুন ব্যক্তিগত জীবনও সৃষ্ট হয়।

কাজেই ব্যক্তির সমস্যার বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের যুগের পরিস্থিতি থেকে, সংশিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামো থেকে এগোতে হবে।

মানুষ ও মানুষের ব্যক্তিত্বের মর্মার্থের মার্কসবাদী সংজ্ঞা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, সুনির্দিষ্টভাবে ঐতিহাসিক, অপরপক্ষে বুর্জোয়া দর্শন ও সমাজতত্ত্ব চরিত্রগতভাবে ঐতিহাসিককতা-বিরোধী।

যথা এমন কিছু তত্ত্ব আছে যা মানুষের জীবনের সমগ্র ক্রিয়াকলাপকে

তার "প্রাকৃতিক" (শারীরিক, জীবতত্ত্বগত) সারমর্মের প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলে। এই সমস্ত তত্ত্ব মানুষের ইতিহাস ও সামাজিক বিকাশের বিধানগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে। ব্যক্তি-মানুষের ও তার ব্যক্তিত্বের গঠন, তার গুণাবলী, সম্পদ ও সামর্থ্যের বিকাশের ধারা ও বিকাশের বাস্তব পরিস্থিতি, তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং আত্মিক ও বৈষয়িক চাহিদা পূরণের জন্য ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির ঐতিহাসিক পরিবেশ বোঝার তারা কোনও সুযোগ দেয় না। এই সমস্ত জীবতত্ত্বগত ও মনস্তত্ত্বগত তত্ত্বগুলির প্রবক্তারা "সম্পত্তির মালিকানার সহজাত প্রবৃত্তি", "সঞ্চয়ের সহজাত প্রবৃত্তি", স্বার্থ-পরতা", "আগ্রাসী মনোভাব" এবং এমনকি "খুনের সহজাত প্রবৃত্তির" কথাও বলে থাকে। মানব চরিত্রের এই ধরনের ব্যাখ্যা বর্ণ ও লিঙ্গের মননগত ও নৈতিক অসাম্যের কল্পনকাহিনীর ইন্ধন যোগায়। ঔপনিবেশিকতাবাদ ও আগ্রাসী যুদ্ধের সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ববাগীশরা নৃতত্ত্বগত ও জীবতত্ত্ব-গত ধারণাগুলির ব্যাপক ব্যবহার করে।

আর কিছু তত্ত্ব আছে যেগুলি সামাজিক উপাদানগুলির প্রতি কিছুটা মনোযোগ দিলেও ব্যক্তির মানসিকতার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের অতীত আবেগের রূপে প্রোথিত ঝোঁকগুলিকেই মানুষের চেতনা ও ব্যবহারের নিয়ন্ত্রক ভিত্তি বলে গণ্য করে। এই রকম একটি ধারণা হল "সংস্কৃত" পুনর্গঠিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (নয়া-ফ্রয়েডবাদ)। এর একজন মুখ্য প্রবক্তা এরিক ফ্রম সরাসরি একথা বলেন যে, আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষমান প্রবণতা-গুলি থেকেই ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার উদ্ভব হয় বলে মনে করতে হবে।(১) ফ্রম প্রশ্নবিহীন আনুগত্য অথবা বিপরীত পক্ষে ক্ষমতা-লালসা, বিরাজমান সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি নিষ্ক্রিয় অন্ধ বশ্যতা (কনফরমিজম) অথবা ধ্বংসাত্মক প্রবণতা ইত্যাদি ঘটনাকে বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক শক্তির ক্রিয়া হিসাবে গণ্য করেন। তাঁর তত্ত্ব হল এই সব শক্তির মূলে রয়েছে যাকে তিনি বলেন "বংশধারাগত প্রবল মানসিক অভিঘাত"। তাঁর মতে—যখন পশু-জগৎ থেকে অভ্যুদয়ের সময়ে মানুষ তার সমগ্র পরিবেশ থেকে নিজের পার্থক্য, প্রকৃতি ও অপর মানুষ থেকে নিজের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে সচেতন হল,

---

১। ই. ফ্রম, এসকেপ ফ্রম ফ্রিডম, নিউইয়র্ক-শিকাগো-স্যানফ্রানসিসকো, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১৪০ দেখুন।

সেই সময়ে ওই অভিঘাত মানুষকে অভিভূত করেছিল। ফ্রম যদিও সামাজিক উপাদানগুলিকেও বিবেচনার মধ্যে রেখেছিলেন, দেখিয়েছিলেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, যথা—ধনতান্ত্রিক দুনিয়া মানুষের বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিকে তীব্রতর করে, তথাপি শেষ পর্যন্ত তিনি মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলির মৌলিক এই ফ্রয়েডীয় বক্তব্যের প্রতিই বিশ্বস্ত ছিলেন।

বস্তুত আমরা কিছু শাশ্বতভাবে স্থির মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার সম্মুখীন নয়, আমরা এই তথ্যের সম্মুখীন যে জনগণ ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ থেকে জাত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। আবার সেই সঙ্গে ইতিহাস তৈরি করে মানুষই। কাজেই জনগণকে যা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করতে পারে তা মনস্তাত্ত্বিক দাওয়াই নয়, তাদের ঐতিহাসিক ক্রিয়া, বিপ্লবী ব্যবহার এবং তার জীবনের সামাজিক পরিবেশের মৌলিক রূপান্তরসাধন।

২. সমাজ, সামাজিক গোষ্ঠী ও ব্যষ্টির স্বার্থ

সমাজ ও ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্ক হল সর্বোপরি তাদের স্বার্থের আন্তঃসম্পর্ক।

সমাজের সামাজিক পৃথকীকরণ শুরু হওয়ার পর থেকেই ব্যক্তি যেহেতু এক বা অপর সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য, সেহেতু ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক সেই ব্যক্তি যে সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য তার স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের আন্তঃসম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। কিন্তু এই সম্পর্কগুলি বিরোধবিহীন সমাজে যা, তা থেকে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে একেবারে পৃথক। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে ঐতিহাসিক ও মূলত শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। মার্কসবাদের অভ্যুদয়ের আগে এই রকম একটি দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই ছিল এই সমস্যার আধিভৌতিক, অবৈজ্ঞানিক বিচারের মূল কারণ।

আমরা যদি সামাজিক চিন্তায় প্রাক-মার্কসবাদী ইতিহাসকে পরীক্ষা করি তা হলে আমরা সেই সব ধারণার সম্মুখীন হই যেগুলি সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করে। প্রাচীন প্রবাদ আছে "হোমো হোমিনি লুপুস এস্ট" অর্থাৎ মানুষ মানুষের কাছে নেকড়ে বাঘ। সপ্তদশ

শতাব্দীতে ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস এই কথাটাকে আবার তুলে ধরেন। এখনও এটি খুবই চলতি। এর প্রবক্তারা বলে থাকেন যে মানব-জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতির কারণ শ্রেণীগুলির বিরোধ ও সংঘর্ষ নয়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার বিরোধ ও সংঘর্ষ, শেষোক্ত সংঘর্ষের "চরিত্রই" এই যে তা নির্মূল করা যায় না।

এই প্রতিজ্ঞা থেকে বুর্জোয়া তত্ত্ববিদরা দুটি চরম সিদ্ধান্ত টানে।

তাদের কিছু কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত দাবিকে নিঃশর্ত ক'রে তোলে, সমাজ থেকে ব্যক্তির সম্পূর্ণ "স্বাধীনতা" দাবী করে (বুর্জোয়া-ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং নৈরাজ্যবাদী ধারণাসমূহ)। পক্ষান্তরে অন্যরা দাবি করে যে ব্যক্তির উচিত স্বাধীনতার ধারণাটাকেই বর্জন করা। যথা—হবস বলেন, রাষ্ট্র হল "একমাত্র ও সার্বভৌম ব্যক্তি" যে নিজেকে ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে স্বীকার করে না। কাজেই মানুষকে তার অধিকার বিসর্জন দিতে হবে এবং নিজের উপর রাষ্ট্রকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দিতে হবে। পরবর্তীকালে নানাবিধ "জৈব" তত্ত্বের প্রবক্তারা এই সব ধারণাকে বিকশিত করেছিল।

এই দুই মতই মনে করে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বৈরিতা আছে। তাদের একমাত্র তফাত এই যে প্রথমটি ব্যক্তির, বিশেষত "প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন" ব্যক্তির অসীম স্বাধীনতার দাবি ক'রে এই বিরোধ এড়ানর চেষ্টা করে, অপরপক্ষে দ্বিতীয়টি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের দমন এবং সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির গ্রাসে তার অবলুপ্তির দাবি করে।

এই সব ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংঘর্ষকে কিছু সামাজিক সম্পর্কের, বিশেষত উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা-ভিত্তিক সম্পর্কের, ফল বলে মনে করে। এই সংঘর্ষের মর্মার্থ এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্যমূলক সমাজের বিকাশ হয় সেই সমাজের অধিকাংশ সদস্যের ক্ষতির মূল্যে। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজের স্বার্থের বিরোধী হয়।

কিন্তু সমাজের স্বার্থ কি ? একে কেবল সমাজের সকল সদস্যের স্বার্থের মোট যোগফল বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। সমাজ বিকাশের সহজাত বস্তুনিষ্ঠ বিধানগুলির ভিত্তিতে সামাজিক দেহযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য যা প্রয়োজন তাই-ই সমাজের স্বার্থ। এই সামাজিক প্রক্রিয়ার মৌলিক ভিত্তি

হল সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান বিকাশ; এবং ঐতিহাসিক-ভাবে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন।

ইতিহাস থেকে অবশ্য দেখা গিয়েছে যে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তি ছিল বলে এই সব পরিবর্তনশীল উৎপাদন পদ্ধতি-গুলি কেবল শোষক সংখ্যালঘুর স্বার্থের সঙ্গেই পুরো সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা সমাজের স্বার্থে; বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্বার্থে ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্রমজীবী জনগণকে শোষণের শিকার ক'রে ফেলল। মানসিক ও কায়িক শ্রমের বিভাগও সমাজের স্বার্থে হয়েছিল। এঙ্গেলস লিখেছিলেন "...যতদিন মনুষ্য-শ্রম এত কম উৎপাদনক্ষম ছিল যে কোনও মতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনের চেয়ে অতি সামান্য উদ্বৃত্ত যোগাতে পারত ততদিন উৎপাদিকা শক্তিগুলির যে কোনও বৃদ্ধি, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, রাষ্ট্র ও আইনের বিকাশ অথবা কলা ও বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন কেবল শ্রমের অধিকতর বিভাগের মধ্যে দিয়েই সম্ভব ছিল। আর এরই প্রয়োজনীয় ভিত্তি ছিল সরল কায়িক শ্রমরত জনগণ এবং শ্রমের ব্যবস্থাপক, বাণিজ্য ও সরকারি কাজকর্মের পরিচালক (এবং পরবর্তীকালে কলা ও বিজ্ঞানের চর্চায় নিরত) সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয়র মধ্যে শ্রমের বিরাট বিভাগ।"(১) কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এ শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশকে আত্মিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলল, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল এবং তাদের মননগত কর্মশক্তি ও ক্ষমতাকে বিচূর্ণ করল।

ইতিহাসের বিষয়গত গতিপথে যে সামাজিক অকল্যাণ সৃষ্টি হল তা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় এখনও বিরাজমান। আধুনিক প্রলেতারিয়েতের জীবনযাত্রার মান আগেকার নিপীড়িত শ্রেণীগুলির চেয়ে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তারা ক্রমশ আরও বেশি মাত্রায় শোষিত হয়, কারণ সামন্ত প্রভু বা দাস-মালিকরা যতটা সম্পদের অধিকারী হতে পেরেছিল বর্তমান শোষকদের আধুনিক প্রলেতারিয়েত তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ যোগায়। সংস্কৃতির সুযোগের অবস্থা নিম্নরূপ: ভূমিদাস বা দাসেরা যেখানে নিরক্ষর ছিল সেখানে

১। এফ. এঙ্গেলস, অ্যান্টি ড্যুরিং, পৃষ্ঠা ২২৭।

যদিও আধুনিক প্রলেতারিয়েত অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন তবু তারা একটা আপাত-বিরোধের শিকার। মার্কস কথাটার উল্লেখ করেছিলেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন যত বেশি বৈজ্ঞানিক উপাত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সাক্ষাৎ উৎপাদক তা থেকে তত দূরে হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লব এবং ফলত উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণ ও কম্পিউটার ব্যবহার একদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে শ্রমিকদের ক্রমশ বেশি সংখ্যায় বিতাড়ণ করে এবং অপরদিকে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকদের অনুপাত বাড়ায়। কিন্তু জনগণের স্বার্থে প্রযুক্ত হলে স্বয়ংক্রিয়করণ কেবল বিশেষজ্ঞদের একটা ক্ষুদ্র অংশকেই চায় না, বরং ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার উচ্চমান দাবি করে। ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য কখনও এ ছিল না, এই ঐতিহাসিক ব্রত এখন সমাজতন্ত্রের উপর বর্তেছে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন বার্নাল ঠিক কথাই বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের যুগকে অবধারিত-ভাবে সমাজতন্ত্রের যুগই হতে হবে।

উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা, কায়িক শ্রম থেকে মানসিক শ্রমকে পৃথক করা, উচ্চতর রূপের ক্রিয়াকলাপের জন্য যারা যথেষ্ট সময় পেত সমাজের সেই "উচ্চতর" অংশের মধ্যেই শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করা ইত্যাদির এক সময়ে অবশ্য সমাজের স্বার্থে ছিল, কিন্তু বর্তমানে সমাজের স্বার্থ দাবি করে উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিরোধ উভয়েরই অবসান। এ আবার দাবি করে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন।

সমাজতন্ত্রের আমলে উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা ও অর্থনীতির ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার জায়গা নেয় সামাজিক মালিকানা ও অর্থ-নৈতিক প্রক্রিয়ার সামাজিক পরিচালনা। কাজেই সেখানে শ্রেণীগুলির মৌলিক স্বার্থ আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্ট হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সকল গোষ্ঠির সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা এবং তা ব্যবহৃত হয় শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণে।

সমাজতন্ত্রের আমলে সমাজ একটা অখণ্ড যৌথ সত্তা হয়ে দাঁড়ায়। বহু গোষ্ঠী নিয়ে এই সমাজ গঠিত (যথা—যৌথ সামাজিক সম্প্রদায়, যৌথ শ্রম-

সংস্থা, নানাবিধ সমিতি) তারা সকলে সমস্বার্থের বন্ধনে আবন্ধ। এই সমস্বার্থ সমগ্র সমাজের বৈষয়িক চাহিদার মধ্যে প্রোথিত।

তবু প্রত্যেক গোষ্ঠির আবার নিজস্ব নির্দিষ্ট স্বার্থ আছে, এর ফলে এই সমস্যা ওঠে যে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটান হবে কি ভাবে? এই স্বার্থ-সমন্বয়ে বিষয়গত ও বিষয়ীগত উভয় দিকই আছে। বিষয়গত দিকটি প্রতিফলিত হয় সেই সব পরিবেশের মধ্যে যা সৃষ্ট হওয়ার ফলে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর চাহিদা মেটান সম্ভবপর হয়। বিষয়ীগত দিকটির প্রতিফলন হয় মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, এই ক্রিয়াকলাপ সামাজিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের সমন্বয়সাধনে সাহায্য করতে পারে, আবার বাধাও দিতে পারে। এ রকম ঘটনা ঘটেছে যখন সমগ্র সমাজের স্বার্থের দোহাই দিয়ে গোষ্ঠী-স্বার্থকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, অথবা উল্টে গোষ্ঠী-স্বার্থের দ্বারা সামাজিক স্বার্থকে আচ্ছন্ন করতে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে এ দুটির সমন্বয়সাধনের পূর্বশর্ত হল এই প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে সংগঠিত করা ও পরিচালিত করা এবং সর্বপ্রকার বিষয়ীবাদী বিকৃতি এড়ান। তবে এমন সব অবস্থারও আমরা সম্মুখীন হতে পারি যখন এই দুই স্বার্থের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা দেয়। সে রকম অবস্থায় একমাত্র সঠিক ও অনিবার্য নীতি হল বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। এর মধ্যে স্বার্থগুলির নীতিস্বীকার ও সমন্বয় উভয়েই জড়িত আছে।

"দা ড্রাফট প্রোগ্রাম অব আওয়ার পার্টি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিবৃতিটিকে একটু ঢেলে সাজান দরকার, তাতে কেবল শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের উল্লেখ না ক'রে সমাজের সমগ্র বিকাশের স্বার্থেরও উল্লেখ থাকা উচিত। "এই রকম বর্ণনা তত্ত্বের দিক থেকেও একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ মার্কসবাদের মূল ভাবধারাগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সর্বহারার স্বার্থের চেয়ে সামাজিক বিকাশের স্বার্থ উচ্চতর—শ্রমিকশ্রেণীর পৃথক পৃথক অংশের স্বার্থের চেয়ে শ্রমজীবী জনগণের সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থ উচ্চতর···(১)"।

সাধারণভাবে বললে সামাজিক স্বার্থ ও গোষ্ঠী-স্বার্থের মধ্যে এমনকি সম্পূর্ণ সুসামঞ্জস্যও একথা বোঝায় না যে তাদের সম্পূর্ণ একত্ব আছে, কারণ

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৪, পৃষ্ঠা ২৩৬।

এ তাদের মধ্যেকার সমস্ত পার্থক্যের এবং ফলত তাদের আন্তঃসম্পর্কের সমস্যার অবলুপ্তি ঘটাবে। যখন সমাজ সামাজিকভাবে সমরূপসম্পন্ন হবে, যখন শ্রেণী-সমূহ, জাতিগুলি ও বুদ্ধিজীবীরা সকলেই বিশেষ সামাজিক বিভাগ হিসাবে অদৃশ্য হবে, তখন ও সমাজ কাঠামোবিহীন হবে না। নানা ধরনের ক্রিয়া-কলাপের তদনুযায়ী যৌথ সংস্থা ও গোষ্ঠী থাকবে এবং তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা থাকবে। চাহিদা সম্পূর্ণ মেটানর নীতি কেবল প্রত্যেক পৃথক পৃথক ব্যক্তি সম্পর্কেই প্রযোজ্য হবে না, প্রত্যেক গোষ্ঠী সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে। তার অর্থ হবে সামাজিক ও গোষ্ঠী-স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য।

কিন্তু এই উচ্চতর যৌথতা অর্জিত হবে পূর্ণ কমিউনিজম-এর যুগে। এ সমাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে এবং তারই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, আর এর পূর্বশর্ত হল বিকশিত ও ক্রমশ শক্তিশালী যৌথ ঐক্য—যা সমাজতন্ত্রের আমলে অর্জিত হয়।

সমাজতন্ত্রের বুর্জোয়া সমালোচকরা প্রায়ই মানুষের নিজের কাছ থেকে মানুষের সারমর্ম, শক্তি ও সম্ভাব্য ক্ষমতার "শাশ্বত বিচ্ছেদের" অনিবার্যতার ধারণাটি আমদানি করে। বর্তমানে বুর্জোয়া দর্শন ও সমাজতত্ত্বে সবিশেষ ফ্যাশান-দুরস্ত এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের প্রকৃত সারমর্ম জীবন্ত ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এই বিচ্ছেদ তথাকথিতভাবে মানুষের অনিবার্য ভাগ্য হয়ে যায়; যা কোনও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই সে আর কখনও কাটাতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে. কিন্তু মানুষ চিরকালের জন্য "বিচ্ছিন্নতা"র অভিশাপে অভিশপ্ত হয় না। বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয় নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকেই; মার্কস-এর ভাষায়—এ হল "ব্যক্তিগত সম্পত্তির নড়াচড়ার একটা ফল।" উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানাই এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে, এর কারণ শ্রমিক যা উৎপাদন করে তা থেকে তার বঞ্চিত হওয়া এবং তার কাজ জবরদস্তি শ্রমে পরিণত হওয়া। এর থেকে সিদ্ধান্ত আসে যে উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানার পত্তনের এবং তার ভিত্তিতে শোষকশ্রেণীর বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের বিচ্ছিনতা অদৃশ্য হয়।

রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কারণ এই যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র এমন একটা শক্তি

যা ক্রমশ বেশি বেশি ক'রে সমাজ থেকে ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। শ্রেণী-চরিত্রের দরুনই বুর্জোয়া রাষ্ট্র শ্রমজীবী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বৈরভাবাপন্ন। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সকল প্রকার ও সকল রূপে শোষণের অবসান করার হাতিয়ার, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ অবশ্য যে পুরানো ব্যবস্থা থেকে উঠেছে তার জন্ম-চিহ্নগুলি থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। এই সব জন্মচিহ্নের মধ্যে আছে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এবং ধর্মের মত বিভিন্ন মতাদর্শগত অবশেষগুলি এখনও জনচেতনায় অবস্থান। এই সমস্ত এবং সমাজতন্ত্রের চরিত্রের সঙ্গে বিরোধী মনোভাবাপন্ন অপরাপর ব্যাপারগুলিকে ক্রমশ বিলুপ্ত করা হচ্ছে, এইভাবে সমাজ বিচ্ছিন্নতার উপাদানগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করছে।

"শাশ্বত বিচ্ছেদের" তত্ত্বটি সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সংঘর্ষের অনিবার্যতার পুরানো ধারণারই একটা রকমফের। সমাজতন্ত্রের বিকাশ এই ধারণাকে বাস্তবে খণ্ডন করে, সমাজ ও ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান ঐক্যকে এবং সামাজিক, গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সমন্বয়ের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে।

৩. যৌথসংস্থা ও ব্যক্তি

ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ তার চাহিদা পূরণ এবং তার প্রতিভা কর্মশক্তি ও যোগ্যতার বিকাশ দাবি করে।

মানুষের দরকার হল খাদ্য, আচ্ছাদন, বাসস্থান, জ্বালানী, দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস, আগুন জ্বালানর উপায়, পরিবহন ইত্যাদি। এর অনেকগুলি চাহিদাই জৈব দেহযন্ত্র হিসাবে টিকে থাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কেবল সামাজিক পরিবেশেই এগুলি ওঠে ও বিকশিত হয় বলে এগুলির জৈব চরিত্রের চেয়ে বরং একটা সামাজিক চরিত্রই থাকে। চাহিদা ও তা পূরণের উপায় দুইই সৃষ্টি করে সমাজ। কিন্তু মানুষের চাহিদার সামাজিক রং এ ছাড়া অন্যভাবেও প্রকাশিত হয়। সমাজের কাঠামো প্রায়ই বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত লোকের চাহিদার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে।

অবশ্য সর্বকালের জন্য চাহিদা নির্ধারণ ক'রে একটা সঠিক রেখা টেনে

দেওয়া অসম্ভব। উৎপাদন বিকাশ লাভ করছে এবং নতুন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করে।

কমিউনিজম-এর শ্লোগান হল : "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।" এই শ্লোগানের মধ্যে একথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের যুক্তিসংগত চাহিদাকে ক্রমশ বেশি ক'রে পূরণ করা হচ্ছে। "যুক্তিসংগত চাহিদা"র ধারণাটি যথেষ্ট নির্দিষ্ট। এর অর্থের মধ্যে একদিকে যে সম্ভাবনাকে বর্জন করা হয় তা হল আত্মসাৎ করা বা চাহিদাপূরণ নিজেই যেন একটা লক্ষ্য না হয়ে ওঠে। উপরোক্ত কমিউনিস্ট শ্লোগানে আপত্তি করতে গিয়ে জার্মান দার্শনিক ম্যাক্স স্টিরনার তাই-ই করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন : "আমার আমিত্ব কি এর দ্বারা তৃপ্ত হতে পারে ?……না, যতখানি আমি আত্মসাৎ করতে সক্ষম, আমার বরং ততখানিই চাই!"(১) অপর দিকে চাহিদার "একটা নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন" বা "নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ পরিমাণ" স্থির ক'রে দেওয়াকেও বর্জন করা হয়।

হস্তগত করার জন্যই নেওয়ার নীতি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে একেবারে অসঙ্গতিপূর্ণ, ঠিক যেমন অসংগতিপূর্ণ পার্থিব জিনিসপত্র থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার মুনিঋষির নীতি। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য হল শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ক্রমাগত পূর্ণতর তৃপ্তিসাধন। নির্দিষ্টভাবে এর অর্থ হল উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমাগত কমিয়ে আনা, সেই সঙ্গে সামাজিক ভোগ-তহবিল থেকে ব্যক্তিগত চাহিদার ক্রমবর্ধমান পূরণ। সমাজ যখন কমিউনিজম-এর নিকটতর হবে, সামাজিক ভোগতহবিলের বৃদ্ধির হার তখন কাজের জন্য ব্যক্তিকে প্রদত্ত পারিশ্রমিকের বৃদ্ধির হারকে অবশ্যই ছাড়িয়ে যাবে। এই সমস্তই চাহিদা অনুযায়ী বণ্টনে উত্তরণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

যখন আমরা বলি "প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী" তখন তার মধ্যে একথা ধরে নেওয়া হয় যে বিভিন্ন লোকের চাহিদা বিভিন্ন। অনুরূপভাবে যখন আমরা বলি "ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেককে" তখন ধরে

১। কে, মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, "দা জার্মান ইডিওলজি", পৃষ্ঠা ২২৭।

নেওয়া হয় যে ক্ষমতার তারতম্য হতে পারে। মার্কস মন্তব্য করেছিলেন ব্যক্তিরা "পৃথক পৃথক ব্যক্তিই হত না যদি তারা অসমান না হত।...(১)

ক্ষমতার অসমতা মানে কি? কিভাবে তা প্রকাশিত হয় এবং কিসের উপর তা নির্ভর করে?

ক্ষমতা কাজকর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, আর ফল দিয়েই কেবল তার বিচার হয়। কর্মশক্তি ও ক্ষমতার অসমতা দুদিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়; হয় কিছু লোক এক ধরনের কাজকর্মে সক্ষম, অপর লোকেরা নয়, অথবা উভয়েই সে কাজে সক্ষম কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায়। ক্ষমতার তারতম্য সম্পর্কে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটিই চাহিদাগুলির চরিত্র সম্বন্ধে, তাদের উৎস ও বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

ক্ষমতা সম্পর্কে একটা মত হল যে সেগুলি প্রকৃতির দান। এ অবশ্য সঠিক হতে পারে না, কারণ এ সামাজিক পরিবেশের ভূমিকাকে অস্বীকার করে এবং মানুষকে কেবল একটা জৈব প্রাকৃতিক সত্তা হিসাবে গণ্য করে, সামাজিক সত্তা হিসাবে নয়। কিন্তু এর বিপরীত মত, যা প্রকৃতির ভূমিকাকে একেবারেই অস্বীকার করে, তাকে সঠিক মনে করা যায় না। কারণ তাতে এ কথাটির ব্যাখ্যা হয় না যে জীবন ও শিক্ষার একই পরিবেশেও কেন ক্ষমতার ব্যক্তিগত তফাত অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হতে পারে।

প্রকৃতি-দত্ত গুণ ক্ষমতা বিকশিত ক'রে তোলার শর্ত মাত্র; ব্যক্তির জীবনে ক্ষমতার বাস্তব বিকাশ হয় প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও আত্ম-শিক্ষার প্রভাবে, তার কাজ ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের গতিপথে। কোনও ব্যক্তির ক্ষমতার চরিত্র সামাজিক জীবনের সাধারণ পরিস্থিতি এবং আশু সামাজিক পরিবেশের (যথা—পরিবার, প্রতিবেশী, কাজের সাথী, পরিচিত ইত্যাদি) দ্বারাও; অর্থাৎ মোট পরিবেশের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ দ্বারাও। এর মধ্যে আবার নানা ধরণের আকস্মিক উপাদানও থাকে, কখনও কখনও সেগুলির হিসাব করা যায় না।

সামাজিক পরিবেশের যে সব পরিস্থিতি ক্ষমতার গঠন ও বিকাশকে উৎসাহিত করে সেগুলি তবে কি? মার্কস ও এঙ্গেলস এ-প্রশ্নের নিম্নলিখিত জবাব দিয়েছেন: "প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রতিভাকে কেবল সম্প্রদায়ের

১। কে, মার্কস ও এফ, এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩ পৃষ্ঠা ১৮।

মধ্যেই (অপরদের সঙ্গে) সর্ব দিকে চর্চা করার উপায় থাকে ; কাজেই সম্প্রদায়ের মধ্যেই কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্ভবপর।”(১) এখানে সম্প্রদায় কথাটি কোনও ছোট, স্থানীয় গোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে না, বরং গোটা সমাজকে, একটা যৌথ ঐক্য হিসাবে বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজকে বোঝাচ্ছে, কারণ তেমন সমাজই কেবল ব্যাপক জনগণের স্বাধীন বিকাশকে প্রতিহত করার মত সামাজিক (শ্রেণী ও গোষ্ঠী) ব্যবধানগুলিকে চূর্ণ করে। বিজ্ঞান ও উৎপাদনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সংযোগ, নানা ধরণের উদ্যোগের বিকাশ, শিক্ষার বিপুল বৃদ্ধি এবং সংস্কৃতির সমস্ত অবদান জনগণের উপভোগ করার সুযোগ—এই সমস্ত ব্যক্তির কর্মশক্তি ও ক্ষমতার বহুবিধ প্রকাশ ও তাকে নিখুঁত ক'রে তোলা সম্ভবপর করে।

মানুষের ক্রিয়াকলাপ, যার মধ্য দিয়েই তার ক্ষমতাগুলি তৈরী হয় ও বিকশিত হয়, তা অপরাপর মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদান ছাড়া অকল্পনীয়। এই সব আদানপ্রদান প্রত্যক্ষও হতে পারে কিংবা অপ্রত্যক্ষ, অর্থাৎ ভাষা ও গণমাধ্যমের সাহায্যে স্থানকাল নির্বিশেষে আদানপ্রদানও (সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা) হতে পারে।

মানুষের ক্ষমতার বিকাশের, তার সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের পক্ষে শেষোক্ত ধরণের আদানপ্রদানের নিঃসন্দেহে বিপুল গুরুত্ব আছে। আবার সেই সংগে একথাও না লক্ষ্য ক'রে আমরা পারি না যে বৈষয়িক ও মননগত সংস্কৃতির বিকাশের সংগে সঙ্গে শ্রমের সহযোগিতার জন্য, প্রত্যক্ষ যৌথ ক্রিয়াকলাপের নানা রূপের বিকাশের জন্যও ক্রমবর্ধমান দাবি ওঠে। বর্তমান কালে এই প্রবণতাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে বাড়ছে।

কাজের যৌথ রূপের কথা বলতে গিয়ে “কাজের ব্যক্তিগত রূপের” ধারণাটিকে যেন আমরা “ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের” ধারণার সংগে ঘুলিয়ে না ফেলি। কাজের যৌথ রূপের প্রসার বস্তুত তার ব্যক্তিগত রূপকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেয় ; কিন্তু যৌথ কাজ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করা দূরে থাকুক, তাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

যৌথসংস্থার মধ্যে এমনকি দুর্বলতর ব্যক্তি ও শক্তিশালী, কারণ যৌথসংস্থা

পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে কাজ করে, কেবল তাই নয়, যৌথ-সংস্থায় কাজ ব্যক্তিকে তার সম্ভাব্য ক্ষমতা, কর্মশক্তি ও যোগ্যতাকে সক্রিয় ক'রে তোলার উদ্দীপনা যোগায়। এই দিকটি লক্ষ্য ক'রে মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে কেবল সামাজিক যোগাযোগই অধিকাংশ শিল্পে এমন একটা প্রতিযোগিতার ভাব জাগায় ও প্রাণীসুলভ উৎসাহ উদ্দীপিত করে যা প্রত্যেক পৃথক পৃথক শ্রমিকের দক্ষতাকে বাড়িয়ে দেয়।(১) সমগ্র যৌথ-সংস্থার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অভিন্ন স্বার্থ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতার ভিত্তিতে দলবদ্ধ কাজের মধ্যে এই ক্ষমতা দুগুণ তিনগুণ হয়ে ওঠে। ক্ষমতার বিকাশের মধ্যে কোনও বিশেষ লক্ষ্য পূরণের ব্যাপারটাও আছে। অপরাপর ক্ষমতার মত ইচ্ছাশক্তিও কেবল প্রকৃতি-দত্ত জিনিস নয়, এও কাজের মধ্যে দিয়েই জন্মায় ও দৃঢ়তর হয়। ব্যক্তিগত বৈষয়িক উদ্দীপকের রূপে ব্যক্তিগত উদ্দীপক অথবা সামাজিক প্রশংসা থেকে আত্মিক তৃপ্তি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, যৌথ কাজের গতিপথে সংহতির ও পারস্পরিক নিষ্ঠার যে মনোভাব জাগ্রত হয় তাই-ই ইচ্ছাশক্তিকে বাড়ায় ও তার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির কর্মশক্তি ও ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

যৌথ প্রয়াসের সমন্বয়ের মাত্রা বহুল পরিমানে নির্ভর করে নীতিনিষ্ঠার উপর। এই নীতিনিষ্ঠা দায়িত্বজ্ঞান এবং বদ্ধধারণা থেকে, ব্যক্তিগত সহানুভূতি বা বিদ্বেষ থেকে মুক্ত কমরেড-সুলভ সমালোচনা দুই-ই দাবি করে। কার্যকর উদ্যোগকে উৎসাহদান ও কাজের যথাযথ বণ্টনের উপরও দলবদ্ধ কাজের উৎসাহ নির্ভর করে। চরিত্রগতভাবেই যৌথসংস্থা হল ব্যক্তিগত কর্মশক্তি ও ক্ষমতার প্রকাশ ও বিকাশের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র।

কমিউনিজম-এর বিরোধীরা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার উৎস হিসাবে যৌথসংস্থা ও যৌথ মনোভাবের মার্কসবাদী ধারণাটির তীব্র সমালোচনা করে। কমিউনিজমকে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য না নিয়েও যারা কোনও না কোনও ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনস্তত্ত্ব ও মতাদর্শের শিকার হয় তারাও এর তীব্র সমালোচনা করে। এই সমস্ত আক্রমণ সাধারণ স্বাধীনতার সমস্যাকে ঘিরেই হয়—স্বাধীনতা কি ও তার

১। কে. মার্কস, ক্যাপিটাল, মস্কো, ১৯৬৩, ভলুম ১, পৃষ্ঠা ৩২৬ দেখুন।

মানদণ্ড কি এই নিয়েই হয়। মার্কসবাদ স্বাধীনতার সংজ্ঞা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে। তার বিরুদ্ধে তুলে ধরা হয় স্বাধীনতার একটা বিমূর্ত ব্যাখ্যাকে যা স্বাধীনতার ধারণাটাকেই অর্থহীন ক'রে তোলে। স্বাধীনতার বিমূর্ত ধারণা নিয়ে এই কূটচালকে লেনিন ভণ্ডামি আখ্যা দিয়েছিলেন। যে কোনও স্বাধীনতার কথাই উঠুক না কেন —সে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক যাই হোক—তার ব্যাখ্যায় লেনিন একটা সুনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করেছিলেন।

বিমূর্ত স্বাধীনতার ধারণাটা মেকি ধারণা কেবল সেই পরিস্থিতিতেই নয় যেখানে বিরোধী শ্রেণীগুলির পরস্পর-বিরোধী স্বার্থগুলির সংঘাত লাগে। এমনকি, শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর ভিতরেও এ প্রযোজ্য নয় যখন তার মধ্যে নিহিত থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যেকার সম্পর্ক, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শ্রেণীর স্বাধীনতার মধ্যেকার সম্পর্ক। যৌথ মনোভাব স্বাধীনতার বিনাশ নয়। বরং কেবল সমাজের মধ্যেই, যৌথ-সংস্থাতেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্ভব। তবে যৌথসংস্থা ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট দাবিও করে, যৌথ সম্প্রদায়ের স্বার্থসাধনের জন্য তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। না হ'লে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ শ্রেণী লক্ষ্যগুলির জন্য যৌথ-সংগ্রাম বা একত্রে জীবন সম্ভবপর নয়। যৌথসংস্থার প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব এবং প্রত্যেক সদস্যের প্রতি যৌথসংস্থার দায়িত্ব এ দুটি সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য।

মানবিকতার ধারণাটি নিয়ে জালিয়াতিও বিমূর্ত স্বাধীনতার ধারণাটি নিয়ে কূট-কচালির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বুর্জোয়া মতাদর্শ ও প্রচারের পক্ষে এ ব্যাপারটা চরিত্রগত। মানবিকতার বিমূর্ত ব্যাখ্যা নিঃশর্ত স্বাধীনতার ধারণাটির মতই ভ্রান্তি উৎপাদক। সামন্ততন্ত্রের বদলে যখন ধনতন্ত্র চালু হল সেই সময় থেকেই বুর্জোয়া মানবিকতার প্রবর্তন দাবি করা হয়। এ ছিল সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের, গীর্জার ও রাজতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ক্যাথলিক মতের বিরুদ্ধে এর জবাব ছিল প্রোটেস্টাণ্ট মত; স্বৈরাচারের জবাবে উদারনীতিবাদ, সামন্ততান্ত্রিক এস্টেটগুলি উঁচু থেকে নীচু অনুযায়ী বিশেষ সুবিধার জবাবে অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা। কিন্তু এই মানবিকতার আসল অন্তঃসার ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার

স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার আকাঙ্খা। ভাষান্তরে বললে এর মাথাব্যথা সর্বোপরি ছিল সেই মানুষের জন্য যে সম্পত্তির মালিক। কাজেই বুর্জোয়া মানবিকতা যখন প্রগতিশীল ভূমিকাও নিচ্ছিল তখনও তা সীমাবদ্ধ ছিল, শ্রমের মুক্তির ধারণা তার মধ্যে স্থান পায়নি। বুর্জোয়া মানবিকতার এই শ্রেণী-সীমাবদ্ধতা রেনেসাঁর যুগে প্রকাশ হয়ে পড়ল, কারণ এই যুগে তার সম্মুখীন হল সেই সব মানবিক ভাবধারা যা জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্খার প্রকাশক। এইসব ভাবধারার বিস্তার ঘটালেন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তারা, শুরুতে টমাস মোর ও ক্যাম্পানেল্লা এবং তারপর ফোরিয়ের, ওয়েল ও সেণ্ট সাইমন।

ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে সর্বহারার আবির্ভাব ও তার বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক মানবতার জন্ম হল। মানবতাবাদী ভাবধারার বিকাশে এ একটা গুণগতভাবে নতুন পর্যায়। এ এমন মানবিকতা যা প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশকে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত বলে মনে করে। এর আবেদন সমাজের একটি ক্ষুদ্র উচ্চাংশের কাছে নয়, সমগ্র জনসমষ্টিরই কাছে, কারণ এ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ, তার কর্মশক্তি ও ক্ষমতার উৎকর্ষকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে গণ্য করে।

সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নেরও একটা মৌলিকভাবে নতুন সমাধান যোগায়। "লক্ষ্য দিয়েই উপায়ের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ হয়"—ম্যাকিয়াভেলির ওই সূত্রের সঙ্গে এই সমাধানের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর সূত্র যে কোন উপায়কেই গ্রহণযোগ্য মনে করে। উপায়কে অবশ্য ঈপ্সিত লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতেই হবে। কিন্তু প্রথমত প্রত্যেক লক্ষ্যই ন্যায্য নয়। লক্ষ্যটাই যদি অমানুষিক হয় (যথা—আগ্রাসী যুদ্ধ) তাতে সমস্ত উপায়ও অমানুষিক হয়। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য যদি ন্যায্যও হয় (যথা—মুক্তিযুদ্ধ) তাতেও একথা বোঝায় না যে উপায় নির্বিচারে বাছতে হবে। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে সোভিয়েত জনগণ নিষ্ঠুর অত্যাচারের আশ্রয় নেয়নি, ফ্যাশিস্টরা তাদের সামরিক রণনীতিতে নিষ্ঠুর অত্যাচারকে একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

"লক্ষ্য দিয়েই উপায়ের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ হয়"—এই বিমূর্ত সূত্র যেমন বিশ্বাস উৎপাদন করে না, তেমনই অকল্যাণকে প্রতিহত করার জন্যও

বলপ্রয়োগ পরিহার করতে হবে—এই ক্রিশ্চিয়ান নীতিও প্রত্যয়জনক নয়। এই তত্ত্বের মধ্যে একটা ভুল চিন্তা আছে, তা হল যে কোনও অবস্থায় যে কোনও অকল্যাণকেই অহিংস উপায়ে মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু সংগ্রামের উপায় কেবল লক্ষ্য দিয়েই নির্ধারিত হয় না, নির্দিষ্ট পরিস্থিতি দিয়েও হয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির একটি হল অন্যায়কারীকে অচল করতে সক্ষম উপায় প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুঝিয়ে রাজী করার উপায়কে বর্জন করে না; আবার সেই সংগে অনিষ্টকারীরা যখন যুক্তিতে কর্ণপাত করে না তখন বলপ্রয়োগকেও তা যুক্তিযুক্ত মনে করে।

স্বাধীনতা ও মানবিকতার সমস্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কর্তৃক স্বীকৃত। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত তাদের শ্রেণীমানদণ্ড অনুযায়ী এগোয়, কিন্তু তার মানে আদৌ এ ধারণার স্বীকৃতি নয় যে প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঠিক হবে। লেনিন এ কথাটির উপর নিরন্তর জোর দিতেন যে বুর্জোয়ারা যেখানে তাদের স্বাধীনতার ব্যাখ্যাকে বিভ্রান্তিকর বুলি দিয়ে ছদ্মবেশ পরাতে বাধ্য হয়, সর্বহারারা সেখানে তাদের স্বাধীনতার দাবি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, আর তা করার পূর্ণ নৈতিক অধিকার তাদের আছে, কারণ তারা প্রকৃত মানবিকতা ও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমাজ সৃজনের জন্য সংগ্রাম করছে।

সামাজিক সমরূপত্বের দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতি, মতাদর্শ ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত, তার রূপ হল যৌথ চেতনার বৃদ্ধি এবং মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের সংহতি বৃদ্ধি। এর ভিতরে আদৌ নৈর্ব্যক্তিকীকরণ ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উচ্ছেদের প্রবণতা নিহিত নেই। বরঞ্চ মানুষের আত্মিক উন্নতির সহগামী বলে কমিউনিজম নির্মাণ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। মানুষ আত্মিকভাবে যত সমৃদ্ধ হয়, তার দিগন্ত যত প্রসারিত এবং জ্ঞান যত বৈচিত্র্যময় হয়, চিন্তায় ও বিচারে সে তত স্বাধীন হয়। কাজেই ক্রমবর্ধমান ও মতাদর্শগত ঐক্য অর্জিত হয় পৃথক পৃথক মনকে জোর ক'রে সমতল ক'রে ফেলার ভিতর দিয়ে নয়, বরং কমিউনিজম নির্মাতাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সকল বৈচিত্র্যকে বিচার-বিবেচনার ভিতর দিয়ে। এর জন্য প্রয়োজন

হয় সামাজিক প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিখুঁতিকরণ এবং প্রত্যেক যৌথ সংস্থার জীবনকে সংগঠন।

শোধনবাদীরা কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের ধারণাগুলিকে বে-ইজ্জত করে এবং সংগঠনকে অস্বীকার করা ও "স্বাধীন" ব্যক্তিগত উদ্যোগের নামে স্বতঃস্ফূর্ততা চালু করার জন্য আহ্বান জানায়। এই সব মত সারমর্মের দিক থেকে বুর্জোয়া ব্যক্তি-সর্বস্বতা থেকে পৃথক কিছু নয়। বুর্জোয়া ব্যক্তি-সর্বস্বতার শ্লোগান হল : লাইজে ফেয়ার, লাইজে পাসার ("যা খুশি কর")। নৈরাজ্য ও বাজারের জন্য প্রতিযোগিতার মৌলিক নীতিসহ বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি থেকেই এ শ্লোগানের আবির্ভাব। কমিউনিস্ট উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিকল্পনা এবং কমরেড-সুলভ সহযোগিতা ও পারস্পারিক সাহায্য। সেই পদ্ধতিতে এ শ্লোগান প্রয়োগ করা নিরর্থক।

সমাজতন্ত্র অত্যন্ত সংগঠিত সমাজ। এ রকম সমাজ কেবল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতেই থাকতে পারে ও উন্নতিলাভ করতে পারে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা একদিকে আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার ও অপর দিকে বুর্জোয়া ব্যক্তিসর্বস্বতা পরিহার করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসত্তা ও সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি থেকে সমুত্থিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট স্বেচ্ছামূলক স্ব-শাসন। এই স্ব-শাসন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে তার সর্বোচ্চ রূপে ভূষিত করবে, যে রূপের মধ্যে যৌথসংস্থা ও ব্যক্তি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য অর্জন করবে।

অতএব সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক যদিও তাদের স্বার্থের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবু তা সমাজের বৈষয়িক চাহিদার এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপর নির্ভর ক'রে ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

সমাজ যখন উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা পরস্পরে একান্ত পৃথক স্বার্থসম্পন্ন বিরোধী শ্রেণীসমূহে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই রকম সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন তার ব্যক্তিগত গুণ-নির্বিশেষে সে কোন্ শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত তাই দিয়েই পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন ধনতন্ত্রের আমলে মানুষের যোগ্যতার

বদলে কত মূলধনের মালিক তাই দিয়েই ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ এবং তার সামাজিকীকরণ সমাজকে আগেকার শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকে পরিবর্তিত করে, যত সামাজিক গোষ্ঠীকে নিয়ে সমাজ তৈরি তাদের সকলের যৌথ ঐক্যে পরিণত করে। শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অসাম্যের, শ্রেণী ও গোষ্ঠীগত বিশেষ সুবিধার অবসান ব্যক্তির ভাগ্যকে ক্রমশ বেশি ক'রে নির্ভরশীল করে তার ব্যক্তিগত গুণের উপর, কাজ সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর। সমাজতান্ত্রিক সমাজ সামাজিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তির স্বার্থের ক্রমবর্ধমান সমন্বয়ের ভিত্তিতে বিকশিত হয়, এ সমাজ কমিউনিজম-এর দিকে যত এগোয় তত ব্যক্তির পক্ষে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের এবং স্বাভাবিক ও অর্জিত ক্ষমতা, কর্মশক্তি ও প্রতিভার প্রয়োগের ব্যাপকতর সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিহাসে জনগণ ও ব্যক্তির ভূমিকা

জনগণ ও ব্যক্তি হল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত দুটি মেরু। বিপুল সংখ্যক জনগণের ক্রিয়াকলাপই ইতিহাস তৈরি করে, আর এই জনগণই একত্রিত হয়ে সমাজ গঠন করে। ইতিহাস হল পর পর প্রজন্মগুলির কাজের ফল এবং কোটি কোটি মানুষ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা নিয়ে এই কাজে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইতিহাস কোনও নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া নয়; জনগণই শুধু ইতিহাস তৈরি করে না, সেই সঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষরাও করেন, বিশেষত করেন সেইসব সুবিদিত ব্যক্তিরা যাঁরা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উপর তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যান। এই কারণেই যদি আমরা পৃথিবীর ইতিহাস, জনগণের ইতিহাস জানতে চাই তাহলে আমাদের একদিকে যেসব শক্তি বিপুলসংখ্যক জনগণকে, সমগ্র জাতিকে সক্রিয় ক'রে কাজে নামায় সেগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং অপর দিকে ইতিহাসের যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিরা ঘটনাবলীকে পরিচালনা করেন তাঁরা এই প্রক্রিয়ার উপর যে প্রভাব বিস্তার করেন তার চরিত্র ও মাত্রা নির্ণয় করতে হবে।

১. ইতিহাসে জনগণ ও ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি

বিশ্ব-ইতিহাসের অনুশীলন আমাদের সামনে শ্রেণী-সংঘাত, বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব, জাতীয় মুক্তি ও আগ্রাসনের যুদ্ধ, শক্তিশালী রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও তার ধ্বংস, এক-একটি সমগ্র জাতির উত্থান, বিকাশ ও পতন এবং এমন কি কখনও কখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জটিল ও পরস্পর-বিরোধী চিত্র উপস্থিত করে। মানবজাতির স্মৃতিতে অর্থাৎ ইতিহাসে রক্ষিত হয়েছে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, রাজা, সম্রাট ও যুদ্ধবাজ দলপতিদের নাম এবং অতীতের সুবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এই সব নামের সঙ্গেই জড়িত। সামন্ততান্ত্রিক ইতিহাসবিদরা এবং সেই সঙ্গে

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ ও ইতিহাসের দর্শনের ছাত্ররা তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ঐসব প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক ব্যক্তিরাই ইতিহাসের স্রষ্টা এবং প্রধান অংশগ্রহণকারী।

বহুকাল এই মতেরই আধিপত্য ছিল। ভাববাদীদের সঙ্গে বহু বস্তুবাদীও এই মত পোষণ করেন। এর সবচাইতে পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বিগত শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও প্রচারবিদ টমাস কার্লাইলের লেখায়। তিনি তাঁর অন হিরোজ, হিরো ওয়ারশিপ অ্যান্ড দা হিরোয়িক ইন হিস্ট্রি নামক পুস্তকে লিখেছেন ঃ"···বিশ্বের ইতিহাস, এই বিশ্বে মানুষ যা কিছু করেছে তার ইতিহাস মূলত হল যেসব মহান ব্যক্তিরা এই পৃথিবীতে কাজ করেছেন তাঁদের ইতিহাস।"(১) কার্লাইল এই সব মহান ব্যক্তিদের কার্যকলাপকে "সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের আত্মা" বলে বিবেচনা করতেন।

১৮৭০-এর দশকের ও ১৮৮০-র দশকের পিওতর লাওরভ, নিকোলাই মিখাইলভস্কি ও অপরাপর রুশ নারদনিকরা ভিন্ন ভিন্ন কারণে হলেও মূলত ওই একই বিষয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন। জনগণ বিপদে পড়লে নারদনিকরা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন, কিন্তু জনগণকে ঐতিহাসিক উদ্যোগ-বর্জিত বলে গণ্য করতেন। প্লেখানভের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদের পক্ষে জনসমষ্টি অসংখ্য শূন্য ছাড়া কিছু নয় : এই সব শূন্য তখনই কেবল একটি ইতিবাচক সংখ্যা হয়ে উঠতে পারে যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষমতা-সম্পন্ন চিন্তাশীল কোনও ব্যক্তি অর্থাৎ কোনও বীর তাদের নেতৃত্ব করেন।

একেবারেই প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্তে পৌঁছানর জন্য কিছু কিছু মতাদর্শ-বিদরাও জনগণ সম্পর্কে ওই সব বিষয়ীবাদী-ভাববাদী মতবাদ ব্যবহার করেছেন। এই ক্ষেত্রে নমুনাস্বরূপ হল জার্মানির দার্শনিক ফ্রিয়েডরিশ নিৎসের মত। তিনি জনগণ সম্পর্কে বর্ণনায় বলেছেন যে এ হল "একটি আকৃতিহীন বস্তু, যা থেকে কোনও জিনিস তৈরি হয়, পাথর যেমন ভাস্করের

১। টমাস কার্লাইল, অন হিরোজ, হিরো ওয়ারশিপ অ্যান্ড দা হিরোয়িক ইন হিস্ট্রি, ১৯০১, পৃষ্ঠা ২।

বাটালির অপেক্ষায় থাকে।"(১) নিৎসে-র কল্পনা অতিমানবের ধারণা আবিষ্কার করে। এই মানুষটি হল এমন একজন বীর যিনি "ভাল ও মন্দের" অতীত, যিনি অধিকাংশের নৈতিকতাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। এই ধরনের একজন ব্যক্তির প্রধান নীতি ও সঞ্চালন শক্তি হল ক্ষমতার লালসা। ক্ষমতার জন্য যে কোনও উপায় নেওয়া যেতে পারে এবং তাঁর প্রতিটি কাজই ন্যায়সংগত। নিৎসের কিছু কিছু ব্যক্তিবাদী তত্ত্ব পরবর্তী কালে নাৎসী মতাদর্শবিদরা গ্রহণ করে। নাৎসীদের দ্বারা শুরু করা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন নাৎসীবাদ "অতিমানবের দর্শন", "যোগ্য ব্যক্তিত্ব"কে ও "ফুয়েরার"কে পূজা ইত্যাদির অন্তর্নিহিত অর্থ কি তা দেখিয়ে দিয়েছে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিষয়ীবাদী ধারণা দীর্ঘকাল ধরে থেকে যায়। এমনকি আজও বুর্জোয়া সমাজবিদ, ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিবিদরা আধুনিক কালের ঘটনাবলীর চাবিকাঠি খোঁজেন কয়েকজন রাষ্ট্রবিদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে। আমেরিকান লেখক সি. সুলৎসবার্গার তাঁর লেখা এ লং রো অব ক্যান্ডলস নামক পুস্তকে লিখেছেন: "ঘটনাবলী ও ঝোঁকগুলির প্রতি মার্কসবাদীদের শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সবচাইতে বেশি ক'রে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি তা হল মানুষই তাদের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ইতিহাসকে প্রভাবিত করে···অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু ভণ্ড দাবিদাররা তার দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে।"(২)

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে বিষয়ীগত-ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের ভূমিকাকে উপেক্ষা করে। এমনকি মার্কসের আগেই অনেক বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ ওই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। ইংল্যান্ড ও ফরাসী বিপ্লবগুলির ইতিহাস অনুশীলন ক'রে রেস্টোরেশন-এর (পুনরুদ্ধারের) ফরাসী ইতিহাসবিদরা (থিয়েরী, গিজো, মিগনেৎ ও অপরাপররা) ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ফরাসী এনলাইটেনারদের মধ্যেকার পূর্বতন প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। শেষোক্তরা সুবিখ্যাত ব্যক্তিদের সচেতন কার্যকলাপের মধ্যেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রধান

১। এফ. নিৎসে, এসে হোমো, মস্কো, ১৯১১, পৃষ্ঠা ১০৮। (রুশ সংস্করণ)

২। সি. এল. সুলৎসবার্গার, এ লং রো অব্ ক্যান্ডলস্, মেময়ারস অ্যান্ড ডাইরিজ, (১৯৩৪-১৯৫৪), এন. ওয়াই. ১৯৬৫, পৃষ্ঠা xv.

পরিচালিকা শক্তি দেখতেন। কিন্তু ফরাসী ইতিহাসবিদরা ভারকেন্দ্রটিকে জনগণের কার্যকলাপের, বিশেষত তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপের উপর স্থানান্তরিত করে। এই চিন্তাধারার একজন প্রবক্তা অ্যাদলফে মনোদ লিখেছেন: "ইতিহাসবিদেরা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক সংস্থাগুলির দ্রুত ও মন্থরগতি, যা হল মানবজাতির বিকাশের প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক ও দীর্ঘস্থায়ী অংশ, যে অংশকে কিছু পরিমাণে বিধানে পরিণত করা যায় ও কিছুমাত্রায় নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের আওতায় আনা যায়, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দেবার বদলে মানুষের কার্যকলাপের প্রতিভাদীপ্ত, যশোমণ্ডিত ও ক্ষণস্থায়ী প্রতিফলনের উপর মনোনিবেশ করায় অতিরিক্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ও ব্যক্তিরা এই সব বিকাশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের চিহ্ন ও প্রতীক হিসাবে বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র-পৃষ্ঠে উত্থিত তরঙ্গের চিরপ্রবহমান স্রোতের সুগভীর ও অবিরত গতির সঙ্গে যে ধরনের সম্পর্ক থাকে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীরূপে পরিচিত ঘটনাবলীর অধিকাংশেরই প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে সেই ধরনের সম্পর্ক থাকে; তরঙ্গগুলি ক্ষণিকের জন্য ঝলক দিয়ে ওঠে, তারপর বালুচরের উপর ভেঙে পড়ে, পিছনে কোনও চিহ্ন রেখে যায় না।"(১)

নিঃসন্দেহে এটা হল ইতিহাসের গতি সম্পর্কে আরও প্রগাঢ় দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু সুবিখ্যাত ব্যক্তিদের ভূমিকাকে কেবল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতীক ও চিহ্নরূপে বর্ণনা করা ঠিক নয়। এই ধরনের অতি-সরলীকরণ ইতিহাস সম্পর্কে এমন এক অদৃষ্টবাদী ধারণায় নিয়ে ফেলতে পারে যে ইতিহাস হল এক পূর্ব-নির্ধারিত প্রক্রিয়া, কিছুই যাকে বদলাতে পারে না।

হেগেলের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছিল। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দার্শনিক-ঐতিহাসিক চিন্তাধারার বিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। হেগেলের মতে—ঐতিহাসিক আবশ্যকতার বাহন হল বিশ্ব আত্মা ও মন, যা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে; বিশ্বের যে আত্মা ইতিহাসের গতিকে পরিচালনা করে তার চাতুর্য এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে তা মহান ব্যক্তিগণ সহ সকল মানুষের স্বার্থ, ভাবাবেগ ও

১। জি. ভি প্লেখানভ, সিলেক্টেড ফিলজফিকাল ওয়ার্কস, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ৩১৩-১৪ (রুশভাষায়) থেকে উদ্ধৃত।

আকাঙ্ক্ষা ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে, অর্থাৎ স্বাধীনতার চেতনায় অগ্রগতি ঘটাবার জন্য।

কিন্তু এই ভাববাদী ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও হেগেলের তত্ত্বে আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ও যুক্তিসংগত বিষয় লুকোন রয়েছে। হেগেল স্বাধীনতা ও আবশ্যকতার মধ্যেকার সম্পর্কজনিত সমস্যাটির একটি দ্বন্দ্বমূলক সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে কতকগুলি সুগভীর মত ব্যক্ত করেন।

হেগেল বলেছেন যে কেবল তাঁরাই হলেন মহান ব্যক্তি, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁদের লক্ষ্য ও কার্যকলাপের মধ্যে সর্বজনীনতা, প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। "তাঁদেরই বীর বলা যায়, যেহেতু তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য ও বৃত্তি শুধু বর্তমান ব্যবস্থা দ্বারা স্বীকৃত শান্ত ও নিয়মবন্ধ বিষয়াদি থেকে কেবল আহরণ করেন না, আহরণ করেন এমন একটি উৎস থেকে, যার আধেয় গুপ্ত ছিল এবং তখনও বর্তমান সত্তায় বিকশিত হয়ে ওঠেনি, আহরণ করেন সেই অন্তরাত্মা থেকে যা তখনও ভূতলে, এবং যে খোলস ভেঙে ফেলতে হবে তার উপর যেমন আঘাত করা হয় সেইভাবে বহির্বিশ্বের উপর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে···।(১)

এই ধরনের ব্যক্তিরা হলেন চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাঁরা বুঝতে পারেন কোন্‌টা প্রয়োজনীয়, কোন্‌টা সময়োপযোগী এবং কোন্‌টা তাঁদের কালে সত্য। অবশ্য হেগেলের মতে···ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা ও সমগ্র জনসাধারণ বিশ্ব আত্মার হাতিয়ার মাত্র। এই আত্মা গোপন থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে ও তাদের মাধ্যমে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ ক'রে চলে। এই কারণেই তাঁর দার্শনিক-ঐতিহাসিক মতামত অদৃষ্টবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদে সম্পৃক্ত।

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি, যাঁরা বিষয়গত ভাববাদ ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী তাঁরা ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে বিষয়ীগত-ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। তলস্তয় তাঁর ওয়ার এ্যাণ্ড পীস নামক উপন্যাসে ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে যা বলেছেন তা এই ধরনের সমালোচনার নমুনা-

১। হেগেল, কালেক্‌টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, মস্কো লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৫, পৃষ্ঠা ২৯, (রুশ সংস্করণ) থেকে উদ্ধৃত।

স্বরূপ বলা যেতে পারে। তলস্তয় ১৮১২ সালের যুদ্ধের জনপ্রিয় চরিত্র বিচার করতে গিয়ে তাঁর প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন জনগণের বিপুল শক্তি, তাঁদের জ্ঞান, বিজ্ঞতা, তাঁদের দেশপ্রেম এবং অফুরন্ত সম্পদের সংস্থান। একই সঙ্গে তিনি যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে সরকারী ইতিহাসবিদের ভাসা-ভাসা দৃষ্টিভঙ্গির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ফরাসী ইতিহাসবিদ থিয়েরস খুব গুরুত্ব দিয়েই বলেছেন যে বোরোদিনোর যুদ্ধে ফরাসী সেনাবাহিনীর জয়ী হতে না পারার কারণ নেপোলিয়নের সর্দি। এই ধরনের যুক্তিকে বিদ্রূপ ক'রে তলস্তয় মন্তব্য করেছেন "···যে খানসামা ২৪শে জুন (যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যার— সম্পাদক) নেপোলিয়নকে তাঁর বর্ষাতি বুটজুতা দিতে ভুলেই গিয়েছিল, সেইই হল রাশিয়ার পরিত্রাতা।"(১) যেসব ইতিহাসবিদরা বড় বড় ঘটনাবলীকে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বিষয় দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের বিষয়ী-বাদী ও উপর-উপর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তলস্তয়ের সমালোচনা সুগভীর ও যুক্তিসঙ্গত হলেও তাঁর ঐতিহাসিক-দার্শনিক বক্তব্যগুলি দ্ব্যর্থবোধক ও অত্যন্ত পরস্পর-বিরোধী। যুদ্ধের প্রকৃত ও নিগূঢ় কারণগুলি উপলব্ধি করতে তিনি আদৌ পারেননি! ঘটনাবলীকে তিনি পূর্ব-নির্ধারিত ঐশ্বরিক ঘটনা, বিধাতার অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ধরনের অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত সব কিছুকেই ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্য বলে গণ্য এবং যে সব বিষয়ীবাদী ইতিহাসবিদেরা সবকিছুকেই প্রায় কোনও কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তির অলৌকিক ইচ্ছাশক্তি বলে মনে করেন, তাঁদের ব্যাখ্যা যেমন প্রকৃত সত্য থেকে অনেক দূরে, তলস্তয়ের ব্যাখ্যাও সেই রকমই।

সমসাময়িক অনেক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ সমাজ-জীবনে জনগণ, শ্রেণী ও ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁরা তথাকথিত সর্বোৎকৃষ্ট (Elite) লোকেদের তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁরা জনগণের মধ্যে দেখেন একটি ধ্বংসাত্মক, নেতিবাচক শক্তি। কেবলমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট লোকেরা, যাঁরা হলেন জনগণের মধ্যে, জাতির মধ্যে অথবা বর্ণের

মধ্যে সবচাইতে বেশি গুণসম্পন্ন লোক; তাঁদের মতে তাঁরাই ইতিবাচক, সৃষ্টিশীল, নীতির বাহক হতে পারেন।

আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিদ আর স্ট্রাউস্‌হেস হুপে তাঁর লেখা দা জোন অব ইনজিফারেন্স নামক পুস্তক লিখেছেন যে মানুষ চিন্তা করে না। যারা ক্ষমতার অধিকারী, মানুষকে তাদের কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। অপর একজন আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ এলি চিনয় জোরের সঙ্গে বলেছেন যে "প্রত্যেকটি সমাজ কিছু কিছু লোককে উৎকৃষ্টতর বলে এবং বাকিদের নিকৃষ্টতর বলে সনাক্ত করে,···প্রত্যেক সমাজেই কিছু লোক শাসন করে ও অপরেরা তা মেনে চলে; যদিও শেষোক্তরা শাসকদের উপর বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। এই সব পার্থক্য অর্থাৎ উচ্চতর ও নিম্নতরদের মধ্যে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, শক্তিশালী ও শক্তিহীনদের মধ্যে পার্থক্য নিয়েই সামাজিক স্তরবিন্যাসের সারাংশ গঠিত হয়।"(১) চিনয়-এর মতে উচ্চতর ও নিম্নতর, শাসক ও শাসিত রূপে সমাজের এই বিভাগ সমাজের অস্তিত্বের শাশ্বত বিধান এবং এর উৎস হল মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতার পার্থক্য।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব সর্বোৎকৃষ্ট লোকের তত্ত্বের কিছুটা রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে সর্বোৎকৃষ্ট কৃৎকুশলীদের তত্ত্বে পরিণত করেছে। এই তত্ত্বের একজন প্রণেতা হলেন আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিদ জেমস বার্নহাম। তিনি তাঁর বহুল আলোচিত দা ম্যানেজারিয়াল রেভলিউশন নামক পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে শ্রমিকশ্রেণী সমাজের প্রশাসন চালাতে অক্ষম। তাঁর মতে—বর্তমান সময়কার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের কাছে, বিশেষত যারা কারখানা; ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশন এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তিবিদ তত্ত্ব সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক সমাজে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই যে সমাজের উপর কর্তৃত্ব করে তা আড়াল করা। আমেরিকান মার্কসবাদী হার্বার্ট আপথেকার তাঁর লেখা লরিয়েটস

১। এলি চিনয়, সোসাইটি, অ্যান ইনট্রোডাকশান টু সোশ্যালিজম, এন. ওয়াই, ১৯৬১. পৃষ্ঠা ১৩১।

অব ইম্পিরিয়ালিজম নামক পুস্তকে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের একজন প্রবক্তা এফ. মার্টিনের মুখর স্বীকৃতি উদ্ধৃত করেছেন: "আমরাই আমেরিকার মালিক; আমরা তা পেয়েছি, ঈশ্বর জানেন কি ভাবে পেলাম। কিন্তু এ মালিকানা আমরা রাখতে চাই, আমাদের সম্পত্তির অখণ্ডতার পথে বিপজ্জনক এমন যে কোনও ব্যবস্থাপক সভা ও রাজনৈতিক মঞ্চ, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য যে কোনও প্রচার অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সমর্থন, আমাদের প্রভাব, আমাদের অর্থ, আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্কসমূহ, আমাদের কেনা সিনেটাররা, মার্কিন কংগ্রেসে আমাদের বুভুক্ষু সদস্যরা, ও আমাদের জনপ্রিয় বক্তাদের বিপুল ওজন পাল্লায় তুলে পারলে এ মালিকানা আমরা রাখতে চাই।"(১) একচেটিয়া অর্থপতিরাই ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রকৃত শাসক। আর এটা এমন একটি বিষয় যা ইতিহাস সম্পর্কে বিষয়ীবাদী-ভাববাদী অথবা বিষয়বাদী-ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব না।

২. *ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি*

এমনকি মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রথম দিককার লেখা দা হোলি ফ্যামিলি, অর দা ক্রিটিক অব দা ক্রিটিকাল ক্রিটিক এবং দা জার্মান ইডিওলজি নামক প্রধান প্রধান রচনায় ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। "একদিকে রয়েছে জনগণ, ইতিহাসের সেই সব জড়, নিষ্ক্রিয়, নির্বোধ ও অনৈতিহাসিক উপাদান। অপরদিকে রয়েছে সক্রিয় উপাদানরূপে আত্মা, সমালোচনা, হের ব্রুন অ্যান্ড কোম্পানি, আর তাদের থেকেই উদ্ভূত হয় সকল ঐতিহাসিক কার্যকলাপ। সমাজের রূপান্তর সাধনের এই প্রক্রিয়াটিকে ক্রিটিকাল ক্রিটিসিজম-এর মস্তিষ্ক প্রসূত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।"(২) এইভাবেই মার্কস তাঁর দা হোলি ফ্যামিলি নামক পুস্তকে ইতিহাস সম্পর্কে

১। হার্বার্ট আপথেকার, লরিয়েটস অব ইম্পিরিয়ালিজম, এন, ওয়াই, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ৫৪।

২। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দা হোলি ফ্যামিলি, পৃষ্ঠা ১১৬।

ইয়ং হেগেলিয়ানদের বিষয়ীবাদী ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বিদ্রূপাত্মকভাবে উপস্থিত করেছেন এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ও বিপ্লবী শ্রেণীগুলির ভূমিকা নির্ধারণে তাঁর নিজস্ব বস্তুবাদী বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ইতিহাসের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের নিরর্থক আবিষ্কার নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সামাজিক ও জ্ঞানের পদ্ধতিগত বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি রয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণকে রাজনীতিতে কোনও চূড়ান্ত অংশগ্রহণ থেকে বাইরে রাখা হত। এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী বিশ্বে এখনও বিদ্যমান। কেবল ইতিহাসের মোড় ঘোরার সময়ে জনগণের অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং তারা সক্রিয় ও স্বাধীনভাবে ইতিহাসে অংশ নিয়েছে, আর এই অংশগ্রহণই শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলীর ফলাফল নির্ধারণ করেছে। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে, তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সময়কালে শাসক ও শোষক শ্রেণীগুলি এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাই "উচ্চ রাজনীতি" নিয়ন্ত্রণ করত। বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব ও লিখিত ইতিহাস তাদের নিজস্ব কায়দায় এই কথা বলে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই তত্ত্ব এখনই লোকচক্ষে ধরা পড়ে না জনগণের এমন সব দৈনন্দিন কার্যকলাপকে উপেক্ষা করে।

কিন্তু এই সব কার্যকলাপই হল জটিল ও পরস্পর-বিরোধী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গভীর অন্তঃপ্রবাহ এবং চলমান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নানা রঙ ও আকৃতির দৃশ্যপটের পিছনে ইতিহাসের ঐ অন্তঃপ্রবাহ ও চূড়ান্ত পরিচালিকা শক্তিকেই খুঁজে বের করতে হবে।

জনগণই ইতিহাসের প্রধান স্রষ্টা ও প্রকৃত বিষয়বস্তু—এই হল, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক প্রতিজ্ঞা। এখন জনগণ বলতে কি বোঝায় তা বিচার ক'রে দেখা যাক। ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করলে তা জনসংখ্যা অথবা জাতির সঙ্গে মিলে যায়, আর সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করলে তার অর্থ হল ইতিহাসের স্রষ্টা জনসাধারণ।

জনসাধারণ অথবা জনসমষ্টির ধারণাটি হল এমন একটি কোটী (category) যা ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তিত হয় ও বিকশিত হয়। এই ধারণাটিকে নির্দিষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক গঠন ও তার বিশেষ সামাজিক

কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে বিচার করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সমাজের ও নির্দিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের নির্দিষ্ট পথের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত হিসাবে বিচার ক'রে দেখতে হবে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। জনসাধারণের শ্রেণী-গঠনের ঐতিহাসিক পরিবর্তনশীলতা যাই হোক না কেন, সর্বদাই এই ধারণাটির অর্থ হল—(১) বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী শ্রমজীবী জনসাধারণ এর অন্তঃসার ; (২) সমাজের জনবিরোধী উপরের স্তর অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির বিরোধী জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এর অন্তর্ভুক্ত, এবং (৩) সমাজের অগ্রগতিতে আগ্রহী সকল সামাজিক স্তর এর অন্তর্ভুক্ত (এই কারণেই কোনও কোনও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জনসাধারণ ও "জনগণ" ধারণাটির মধ্যে কোনও কোনও অশ্রমিক শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ জাতীয় বুর্জোয়ারা, যেহেতু তারা সমাজের প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে)।

ইতিহাসে জনসাধারণের ভূমিকা নির্ণয়ের ধারণাটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞাটির মধ্যে ইতিমধ্যেই বিবৃত হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন হল সমাজের জীবনদায়ী ভিত্তি এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ শেষ পর্যন্ত সকল সামাজিক প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি শুধু যন্ত্রপাতি ও শ্রমের উপকরণ নয়, এই শক্তি সর্বোপরি বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদক শ্রমজীবী জনসাধারণ। শ্রমজীবী জনগণ হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল উৎপাদিকা শক্তি।(১) সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির অননুভবনীয়

১। সেলোভিয়ভের হিস্ট্রি অব রাশিয়া পড়তে গিয়ে তলস্তয় এই বিষয়ে তাঁর অননুকরণীয় মন্তব্য করেন: "যখন আপনি পড়েন যে কিভাবে তারা লুট করেছিল, শাসন করেছিল ও ধ্বংস করেছিল (আর ইতিহাস আমাদের এ ছাড়া আর কিছুই বলে না), তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন: তারা কি লুট ও ধ্বংস করেছিল? আর এই প্রশ্ন থেকে মনটা আর একটা প্রশ্নে চলে যায়: যা ধ্বংস করা হল তা সৃষ্টি করেছিল কারা? কিভাবে ও কাদের কাছ থেকে এই সব লোকের খাদ্য জুটেছিল? জাররা ও বয়াররা যে সব জরি, কাপড় পোশাক ও কারুকার্যখচিত আচ্ছাদন নিয়ে বড়াই করত সেগুলো কারা তৈরি করেছিল? রাজদূতদের যে সব কালো খোয়াল ও সেবলের চামড়া

ও প্রায়শই লুক্কায়িত বিকাশ মানবজাতির প্রগতিশীল ঐতিহাসিক আন্দোলনের নিহিত ভিত্তি, এই আন্দোলন প্রথমে উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং পরে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় বিপ্লবের পথ সুগম করে।

বহু জাতির ইতিহাসে বিধ্বংসী যুদ্ধের কাহিনী দেখা যায়। ঐসব যুদ্ধে শহর ও গ্রাম জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (যেমন—হূন ও তাতার মোঙ্গলদের আক্রমণ কালে)। কিন্তু যখনই কোনও জাতি টিকে গিয়েছে সব কিছুই আবার সৃষ্টি করেছে ও পুনরুদ্ধার করেছে, এবং পশ্চাদপসরণের পর্যায়ের পর সমাজ বিকাশের নতুন উচ্চতর পর্যায়ের দিকে আরও এগিয়ে যাবার জন্য ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে। এইখানেই রয়েছে জনগণের অমোঘ সৃষ্টিশীল শক্তি।

সমাজতান্ত্রিক পরিস্থিতির মধ্যে জনসাধারণের ঐতিহাসিক ভূমিকার নতুন উপাদান এই যে তাদের শ্রম কার্যকলাপ সচেতন সৃজনশীলতা হয়ে ওঠে, শ্রমের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয় অর্থাৎ নিজের জন্য শ্রম, নিজের সমাজের জন্য শ্রম।

ইতিহাসে জনসাধারণ কেবলমাত্র নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করতে পারে—বুর্জোয়াদের এই সব তত্ত্ব যে দেউলিয়া তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছে। অবশ্য একথা উঠতে পারে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার সময় শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে জনগণকে প্রথমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ভাঙতেই হবে এবং শোষণের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কগুলির অবলোপ সাধন করতে হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া হল উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে এবং মানুষের শ্রম দ্বারা সৃষ্ট বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত মাত্র। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ধ্বংসাত্মক নয়, বরং সৃজনশীল কার্যকলাপ। তা হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নতুন ও অভূতপূর্ব রূপসমূহের সৃষ্টি করা এবং সামাজিক সম্পর্কগুলিকে এমনভাবে

উপহার দেওয়া হত সেগুলো কারা ধরত? কারা সোনা ও লোহা খনি থেকে তুলত, কারা ঘোড়া, গরু ও মেষ পালন করত, কারা অট্টালিকা, প্রাসাদ ও গীর্জা তৈরি করত, কারা এই সমস্ত জিনিসপত্র বানাত?" (এল. এন. তলস্তয়, কমপ্লিট ওয়ার্কস, ভল্যুম ৪৮, মস্কো, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ১২৪)। [রুশ ভাষায়]

সংগঠিত করা যা মানুষের উপর শোষণ বন্ধ করতে পারে ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষকে মুক্ত শ্রমিকের মর্যাদা দিতে পারে।

অতীত কালে অর্থনীতির, রাষ্ট্রের ও মতাদর্শগত জীবনের প্রশাসনিক কার্যকলাপ একচেটিয়াভাবে শোষক শ্রেণীগুলিই করত। সমাজতান্ত্রিক সমাজেই জনগণ সর্বপ্রথম নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নেয় এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনের কর্তা হয়ে ওঠে। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দেখা যায় জনগণের জন্য সর্বপ্রকারের ও সব ধরনের সৃজনশীল কার্যকলাপের ব্যাপকতম সুযোগ।

যখন কেবল মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর লোক, জমিদার অথবা উপরের স্তরের বুর্জোয়ারা ইতিহাসের সামনের সারি দখল ক'রে থাকত এবং জনগণের ব্যাপক অংশ "ঐতিহাসিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা"র(১) মধ্যে নিমজ্জিত থাকত, তখন বাস্তবিকই খুবই শ্লথগতিতে এগোত। অপরপক্ষে ব্যাপক জনসাধারণ যখন জেগে উঠেছে, যেমন চরম মুহূর্তগুলিতে, তখন ইতিহাসের চলার গতি দ্রুত হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে গতিশীলতা ও সুগভীর রূপান্তর বর্তমান যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বইতিহাস এই তথ্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যে জনগণ যত ব্যাপক-ভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর তত আরও সুগভীর হয়। আর উল্টোদিকে, ঐতিহাসিক কার্যকলাপের পরিসর ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাতে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা বাড়ে। এ হল পৃথিবীর ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলির অন্যতম।

সমাজের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিয়ামক ভূমিকা তর্কাতীত। কিন্তু আত্মিক জীবনের সদা প্রসারমান ক্ষেত্রটি কি এই নিয়মের ব্যাতিক্রম নয়?

দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও চারুকলার ক্ষেত্রে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। দর্শন ও বিজ্ঞান কি করত দেমোক্রিতুস ও আরিস্তোতল, পিথাগোরাস ও আর্কিমিদিস, কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও, নিউটন ও আইনস্টাইন, ডারউইন ও পাভলভ ছাড়া? চারুকলা কি করত প্রাক্সিতেলিস, ফিদিয়াস, র‍্যাফায়েল, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো,

---

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২৭, পৃষ্ঠা ২১০।

টিশিয়ান, রেপিন, সুরিকভ ছাড়া ; হোমার, দান্তে, সেক্সপীয়ার ও গ্যেটে; বাইরন, বালজাক, পুশকিন, গোগোল, তলস্তয় ছাড়া ; বাখ, বিথোফেন, ভের্দি, শোপ্যাঁ, গ্লিংকা ও চাইকভস্কি ছাড়া ? মানব সংস্কৃতির শাশ্বত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য মানবজাতি তাঁদের কাছে ঋণী।

কিন্তু সকল মহান শিল্পী জনগণের সঙ্গে ও তাঁদের শিল্পকলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ; জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন শিল্পকলা হবে প্রাণহীন ও নীরস। জনগণ বৈজ্ঞানিক, কবি ও লেখকদের ভাষার এক বিরাট ভাণ্ডার যোগায়, বহু শতাব্দী ধরে মানুষ এই ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। জনগণ রূপকথা, লৌকিক উপাখ্যান ও সংগীত সৃষ্টি করে। আর সকল বড় বড় শিল্পী সর্বদাই লোক-কলার এই বিপুল ভাণ্ডার থেকে তাঁদের কলাকে উন্নত করেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কি লিখেছেন, "জনগণ শুধু বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টিকারী শক্তি নয়, তারা আত্মিক মূল্যগুলির একমাত্র উৎস, এ উৎস কখনও নিঃশেষ হয় না, শুকিয়ে যায় না। কাল, সৌন্দর্য ও প্রতিভার দিক থেকে জনগণই প্রথম দার্শনিক ও কবি, যারা শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছে, পৃথিবীর সব দুঃখকে চিত্রিত করেছে, আর তার মধ্যেকার সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কবিতা হল বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাস।"(১)

প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে কি বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন তা আমরা জানি। তথাপি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির কতকগুলি নির্দিষ্ট ছক থাকে ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্বেকার সমগ্র বিকাশধারা আবিষ্কারের পথ সুগম ক'রে দেয়। একজন জার্মান ইতিহাসবিদ লিখেছেন : "যদি পিথাগোরাস ও তাঁর অনুগামীদের অস্তিত্ব না থাকত তবে পিথাগোরাসের উপপাদ্য কি অজ্ঞাত থাকত ? নিউটন ছাড়া কি আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করতে পারতাম না ? স্টিভেনসন রেলগাড়ির ইঞ্জিন আবিষ্কার না করলে কি আমরা এখনও ঘোড়ায় টানা গাড়িতে যাতায়াত করতাম ?(২) তার অর্থ হল যে বিজ্ঞানের ও সংস্কৃতির ভাগ্য কোনও না কোনও প্রতিভাশালী ব্যক্তির দৈবাৎ জন্মগ্রহণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বিজ্ঞান ও চারুকলার বিকাশ একটি বিধি-শাসিত প্রক্রিয়া।

১। এম. গোর্কি, অন লিটারেচার, মস্কো, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ২০। [রুশ ভাষায়]

২। কে. কাউট্স্কি, দা মেটিরিয়্যালিস্টিক আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং অব হিস্ট্রি, ভল্যুম ২, মস্কো লেনিনগ্রাদ, ১৯৩১, পৃষ্ঠা ৭০৪ [রুশ] থেকে উদ্ধৃত।

ইতিহাসে জনসাধারণের নিয়ামক ভূমিকা স্বীকার ক'রে না নিলে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মিল ও ধারাবাহিকতা কখনও বোঝা যায় না। ব্যক্তি বিশেষরা, এমনকি মহান ব্যক্তি বিশেষরাও আসেন ও চলে যান, কিন্তু জনগণ সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য এবং বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যগুলির স্রষ্টা ও অভিভাবকরূপে থেকে যান।

জনগণ অবশ্য একই চেহারার ও সমপ্রকৃতির নয়। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার চরম মুহূর্তগুলিতে, ইতিহাসের মোড় ঘোরার সময়ে যে সব সামাজিক শ্রেণী ও জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তাদের নেতৃত্ব করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সবরকমের নির্দিষ্ট বিশেষত্বের দিক থেকে ইতিহাসের গতি উপলব্ধি করতে হলে ঐ সব ব্যক্তির ভূমিকার যথোচিত বিচার অপরিহার্য।

চূড়ান্ত বিচারে জনগণই ইতিহাসের ভাগ্য স্থির করে। কিন্তু জনসাধারণের ভূমিকাকে বিমূর্তভাবে, শ্রেণী ও পার্টিগুলি থেকে অথবা যে নেতৃবৃন্দ তাদের পরিচালিত করেন তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় না। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও একটি নির্দিষ্ট দেশে কি ধরনের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নেতৃত্ব রয়েছে তার উপরই নির্ভর করে জনসাধারণের ভূমিকা। নাৎসীদের শাসনকালে জার্মানির উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে কোনও কোনও মুহূর্তে সংকটজনক সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা জনসাধারণকে দমন করার ও অত্যাচার করার সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাদের এমন কাজে উত্তেজিত করতে পারে যা তাদের মৌলিক স্বার্থের ও সমাজের অগ্রগতির বিরোধী।

সুতরাং জনগণের ঐতিহাসিক ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে ইতিহাসে সংগঠন ও পার্টিগুলির প্রকৃত ভূমিকা; প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিদের ভূমিকা আমাদের পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা

সমাজ বিকাশের মৌলিক গতিপথ, উদাহরণস্বরূপ সমাজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ অথবা ধনতান্ত্রিক সমাজের বদলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়গত বিধান দ্বারা নির্ধারিত হয়, জনগণের, এমনকি প্রখ্যাতনামা

ব্যক্তিদের ইচ্ছা ও চেতনার উপর তা নির্ভর করে না। ঐতিহাসিক বিকাশের সাধারণ কারণগুলি বিচার করার সময়ে আমরা সাময়িকভাবে ব্যক্তির ভূমিকাকে পৃথক ক'রে রাখতে পারি। বিশেষ বিশেষ কারণ ও পরিস্থিতির প্রক্রিয়া সম্পর্কে একই কথা বলা যায় (উদাহরণ স্বরূপ, কোনও নির্দিষ্ট দেশের বিকাশের স্তর এবং পরিস্থিতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর সেই দেশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রভাব) যে তা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপরও নির্ভর করে না। কিন্তু নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার সময়ে আমাদের ব্যক্তির ভূমিকাকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না, কারণ ওই সব ঘটনাবলী সাধারণ ও বিশেষ কারণের উপর শুধু নির্ভর করে না, সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কারণ-সমূহের উপরও নির্ভর করে। এই জন্যই কোনও একটি দেশের বিপ্লবের গতিপথ এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার যুদ্ধগুলির গতিপথ ও ফলাফল এবং অপরাপর নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলী শুধু প্রধান ও নিয়ামক কারণগুলির উপর নির্ভর করে না, সেই সঙ্গে যে সব ব্যক্তিরা ওইসব ঘটনাবলীর সময়ে নেতৃত্বে থাকেন তাঁদের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি অথবা তার বিপরীতে অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতার মত উপাদানগুলির উপরও নির্ভর করে। এই সব উপাদান-গুলিকে, এই সব নানা ধরনের ঐতিহাসিক আকস্মিকতাগুলিকে হিসাবের মধ্যে না রাখলে জীবন্ত ও বাস্তব ইতিহাস অদৃষ্টবাদী ও রহস্যময় চরিত্রের হয়ে উঠবে।

১৮৭১ সালে মার্কস এল. কুগেলমানকে লেখেন: " 'আকস্মিকতাগুলি' যদি কোনও ভূমিকা গ্রহণ না করে তবে বিশ্ব-ইতিহাস…খুবেই রহস্যময় চরিত্রের হয়ে উঠবে। এই সব আকস্মিকতাগুল স্বাভাবিকভাবেই বিকাশের সাধারণ গতিপথের অংশ হয়ে ওঠে এবং অপরাপর আকস্মিকতাগুলি দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়। কিন্তু গতিবেগ বৃদ্ধি হওয়া অথবা বিলম্বিত হওয়া আন্দোলনে সর্বপ্রথম যে লোকেরা নেতৃত্ব করেন তাঁদের চরিত্রের 'আকস্মিকতা' সহ এই সব আকস্মিকতার উপরই দারুনভাবে নিভরশীল।"(১) যে সব লোকেরা সর্বপ্রথম ঘটনাবলীর নায়ক হন সেই সব লোকেদের ভূমিকার উপর মার্কস এইভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসবাদী অবস্থান লেনিন অত্যন্ত

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ৪২১।

সুস্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করেছেন : "মার্কসবাদ অপরাপর সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের চেয়ে এই দিক থেকে খুবই লক্ষ্যণীয়ভাবে পৃথক যে মার্কসবাদ জনগণের বিপ্লবী শক্তি; বিপ্লবী সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও বিপ্লবী উদ্যোগের গুরুত্বকে এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন ও পার্টি যারা কোনও না কোনও শ্রেণীকে খুঁজে বের করতে ও তার সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম তাদের গুরুত্বকে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে বিষয়গত পরিস্থিতি ও বিবর্তনের বিষয়গত গতিপথের বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক সংযমকে সম্পূর্ণ সমন্বিত করে।"(১)

মানুষ; একমাত্র মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা। যে সব বিষয়গত পরিস্থিতি মানুষের কার্যকলাপ নির্ধারণ করে সে সবের বিচার বিবেচনাই হল সমাজ-জীবনে শ্রেণী ও পার্টি এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ভূমিকাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করার একমাত্র পথ। যে বিষয়টি স্থির করতে হবে তা হল কি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য নিশ্চিত হয় এবং কি অবস্থার মধ্যে এমনকি খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও বিফল হতে বাধ্য।

আমাদের সেরভান্তেসের ডন কুইকসট-এর কথা স্মরণ করলেই হবে, তিনি শৌর্য বীর্যের পরিচায়ক দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। তাঁর মহৎ আবেগে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় বীরত্বের দিনগুলি থেকে একেবারেই ভিন্ন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে তাঁর পরিণতি হয়েছে হাস্যকর, করুণা উদ্রেককর ও বিষাদময়। ইতিহাসে এরকম বহু বীরের কথা আছে যাঁরা কি পরিস্থিতি রয়েছে তা বিচার না ক'রে, কি কি বাধা বিপত্তি আছে তা না বুঝে বীরত্ব দেখিয়েছেন। ইতিহাসে এ ধরনের যুদ্ধবাজ বীরের কথা নথিভুক্ত আছে যিনি বিরাট বিরাট যুদ্ধাভিযান করেছেন, সফল হয়েছেন ও বিরাট সাম্রাজ্যও স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দ্রুত সে সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে ও বিলুপ্ত হয়েছে।

একমাত্র সেইসব ঐতিহাসিক সাফল্যগুলি টিকে থেকেছে ও আরও বিকশিত হয়েছে যেগুলি সে সময়কার বিষয়গত পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যে কোনও ব্যক্তির সাফল্যের চূড়ান্ত

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৩, পৃষ্ঠা ৩৬।

উপাদান হল ওই সব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারা এবং কোন্ কোন্ সামাজিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে, তা নির্ণয় করার ক্ষমতা থাকা।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির কার্যকলাপের পরিসর নির্ধারণ ক'রে দেয়। এমনকি সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও এই কাঠামো এড়িয়ে যেতে পারেননি। উদাহরণ স্বরূপ, নতুন কোনও সামাজিক-অর্থনৈতিক সমাজ-কাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয়। বৈষয়িক পূর্বসর্তাদি অথবা পরিস্থিতি যদি পুরানো সমাজের গর্ভে পরিপক্ব না হয়ে উঠে থাকে তবে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি সেই সমাজ কাঠামো গঠন করতে পারেন না। কোনও একজন ব্যক্তি তাঁর নিজের খুশি মত ইতিহাস তৈরি করতে পারেন না অথবা সামাজিক বিকাশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে পারেন না, যেমন ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে অথবা দাসমালিকানা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না। "জার্মান জাতি"র তাঁকে এক ধরনের দাস ব্যবস্থা ইউরোপের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য হিটলারের উন্মাদের মত প্রচেষ্টা তার আগেকার অপরাপর প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টাগুলির মতই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

মহান ব্যক্তিরা যে সব মহান সামাজিক ভাবধারা সৃষ্টি করেন ও প্রকাশ করেন সেগুলির মতই তাঁরা সাধারণত পৃথিবীর ইতিহাসের অথবা কোনও একটি দেশের ইতিহাসের কোনও এক সংকটকালে উদ্ভূত হন। মহান ব্যক্তিরা যুগান্তকারী ঘটনা সৃষ্টি করেন না বা আবাহন করেন না, পক্ষান্তরে শেষোক্তটিই অনুকূল জমি ও শর্তাদি যোগায় এবং তার মধ্যেই কোনও কোনও ব্যক্তিরা মেধা, প্রতিভা ও সহজাত গুণগুলি পরিপক্ব হয়ে উঠতে পারে ও সফলতা লাভ করতে পারে।

অলিভার ক্রমওয়েল ছিলেন ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের সন্তান ও প্রতিনিধি ; আর এই বিপ্লবের কল্যাণেই রাষ্ট্রবিদ হিসাবে ও সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হতে পেরেছিল। মহান ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লব না ঘটলে ফ্রান্স অথবা পৃথিবী কোনদিনই মিরাবো, সেন্ত-জুস্ত রোবোস্পিয়ার অথবা নেপোলিয়ান ও তাঁর মার্শালরা, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন সাধারণ ঘরের লোক, তাঁদের কাউকেই জানতে পারত না।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনই খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের স্রষ্টা। "অমুক লোকের এবং নির্দিষ্টভাবে সেই লোকটিরই কোনও নির্দিষ্ট সময়ে অভ্যুদয় অবশ্যই একেবারে আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু লোকটিকে সরিয়ে দিন, দেখবেন তার জায়গায় একটা বদলির দাবি উঠবে, আর এই বদলি খুঁজে পাওয়া যাবে। সে ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া যাবে। নিজের যুদ্ধে অবসন্ন রিপাবলিকের যে ওই বিশেষ কর্সিকান নেপোলিয়নকে সামরিক একনায়ক করার প্রয়োজন হয়েছিল তা একেবারেই দৈবাৎ ঘটনা ; কিন্তু যদি একজন নেপোলিয়ন না পাওয়া যেত তবে যে অপর কেউ সেই স্থান পূরণ করত তা এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে প্রয়োজন দেখা দিলেই সেই লোককে সর্বদা পাওয়া গিয়েছে ; যথা—সিজার, অগাস্টাস, ক্রমওয়েল প্রভৃতি।"(১)

একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে কোনও প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি যেসব ঘটনাবলীর নেতৃত্ব করেন তার উপর তিনি তাঁর ছাপ রেখে যান। যদি অন্য কোনও ব্যক্তি নেপোলিয়নের স্থলাভিষিক্ত হতেন তবে হয়ত ফ্রান্স ঐ ধরনের সামরিক সাফল্য অর্জন করতে পারত না এবং ঘটনাবলীর যে প্রকৃত গতিপথ প্রথমে নেপোলিয়নের উত্থান ও পরে পতন ঘটিয়েছিল তা ভিন্নমুখী হত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সাধারণ গতিমুখের কোনও পরিবর্তন ঘটত না।

সমাজের প্রয়োজনের জন্যই মহান ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে—এই প্রতিজ্ঞাটির বিরুদ্ধে কোনও কোনও সময়ে অপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। এই যুক্তি দেওয়া হয় যে এমন অনেক যুগ গিয়েছে যখন মহান ব্যক্তিদের, বীরদের, নতুন ও প্রদীপ্ত আদর্শসমূহের প্রবক্তাদের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাদের আবির্ভাব ঘটেনি। সেইজন্যই সেই সব যুগ ছিল বন্ধ্যতা, অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তার যুগ। সাধারণত মধ্যযুগকে এর উদাহরণ হিসাবে দেখান হয়।

কিন্তু মধ্যযুগগুলি ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে জড়তার যুগ। তার কারণ এই নয় যে সে সময়ে কোনও মহান ব্যক্তি ছিলেন না, বা খ্যাতনামা রাজ-

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৫০৩।

নীতিবিদ ছিলেন না ; এই যুগেও বিপুল সহজাত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু সময় ও পারিপার্শ্বিক তাঁদের প্রতিভাকে কোনও উৎসাহ যোগায় নি। গীর্জা'র ও ইনকুইজিশনের (রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধ-মত দমন করার জন্য বিচারালয়) আধিপত্য এমন একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল যে তখন স্বাধীন চিন্তার আবিভা'ব ঘটতে দেওয়া হয়নি, বা তাকে নস্যাৎ করা হয়েছিল অথবা মঠের নিভৃত কক্ষে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল। মহান কোপার্নিকাস-এর দিন যখন ফুরিয়ে আসছিল তখন মৃত্যুশয্যায় শুয়েই কেবল তিনি সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে পুরানো মতান্ধ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথাপি, এমনকি মধ্যযুগেও ধীরগতি ও গুপ্ত প্রক্রিয়া কাজ ক'রে চলছিল। অবশেষে পেঁৗছেছিল রেনেসাঁর যুগে এবং মহান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, লেখক ও শিল্পীদের এক প্রদীপ্ত সমাবেশের আবিভা'ব ঘটেছিল।

এ থেকে এই সাধারণ বিধানই প্রমাণিত হয় যে মহান ব্যক্তিদের আবিভা'ব হল তাঁদের যুগের প্রয়োজন ও লক্ষ্যের প্রকাশ। এ কথা অবশ্য সত্য যে এই সব লক্ষ্যকে প্রকাশ করা ও উন্নত করায় তাঁদের ক্ষমতার পরিমাপ ও গভীরতা তাঁদের নিজেদের গুণাবলী ও প্রতিভার উপর নির্ভর করে। প্রখ্যাত ব্যক্তির আবিভা'ব কোনও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয় কারণ এক্ষেত্রে আকস্মিকতা প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে পরস্পর গ্রথিত থাকে।

একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তির গুরুত্ব শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে যুগ তাকে যে কর্তব্যের সম্মুখীন করে সেই কর্তব্যের গুরুত্বের উপর। তাই এটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয় যে ইতিহাসে সংঘটিত রূপান্তরগুলির মধ্যে গভীরতম বলে চিহ্নিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক নেতা ও চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। এ হল এমন একটি যুগ যখন নতুন কোটি কোটি মানুষ জেগে উঠেছে ও ইতিহাস সৃষ্টিতে যোগ দিয়েছে এবং যখন এইসব জনগণের নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন হয়েছে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বিপ্লবী চিন্তা ও বৈপ্লবিক-কার্যকলাপ।

৪৷ শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা

প্রত্যেকটি শ্রেণী তার নিজস্ব বীর তৈরি করে। মার্কস ও এঙ্গেলস একটি নতুন শ্রেণীর অর্থাৎ বিপ্লবী সর্বহারার মতাদর্শবিদ ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সর্বহারাদের নতুন পার্টি লীগ অব কমিউনিস্টস-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বব্যাপী সংস্থা 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর সংগঠক। সারা বিশ্বের পক্ষে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মার্কস করেছেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের সৃষ্টি, নতুন বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে সর্বহারাকে আবিষ্কার ও এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠা করা—এই সব বিরাট আবিষ্কারগুলির যে কোনও একটিই আগামী বহু শতাব্দী ধরে মার্কসের স্মৃতিকে জাগরূপ রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কোনও কোনও সময়ে লোকে প্রশ্ন করে: "মার্কস ছাড়া কি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আবিভাব ঘটত?" মানুষের চিন্তার ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সৃষ্টির দিকে নিয়ে গিয়েছে। এঙ্গেলস সে কথা উল্লেখ করেছেন: "মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা আবিষ্কার করেছেন; আর থিয়েরী, মিগনেৎ, গিজো ও ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সকল ইংরেজ ইতিহাসবিদরা হলেন তার সাক্ষী যে ওই বস্তুবাদী ধারণাটির আবিষ্কারের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চলছিল এবং মর্গান কর্তৃক একই ধারণার আবিষ্কার প্রমাণ করে যে এর জন্য সময় পরিপক্ব হয়ে উঠেছিল, আর এ আবিষ্কার হতেই হ'ত (১)।" তথাপি মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিধিশাসিত চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে এঙ্গেলস তার স্রষ্টার প্রতিভাকে কিছুই কম করে দেখান নি: মার্কস-এর স্থান ছিল আরও উচ্চে, আরও বেশী দূরে পর্যন্ত তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং আমাদের বাকিদের তুলনায় তিনি আরও ব্যাপক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এই তত্ত্ব বর্তমানে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাঁকে ছাড়া অতখানি আদৌ এগোতে পারত না। এই কারণে এই তত্ত্ব সঠিকভাবেই তাঁর নাম বহন করে।"(২)

১। কে. মার্কস ও এফ এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৫০৩।
২। ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬১।

মার্কস যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তার উদাহরণ একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি কি করতে পারেন শুধু তাই প্রকাশ করে না, সেই সঙ্গে এও দেখিয়ে দেয় যে তৎকালীন পরিস্থিতি যদি তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ ক'রে দেয় তবে মহত্তম ব্যক্তিও কি কাজ করতে পারেন না। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বিপ্লবী কার্যকলাপ যতই বিরাট হোক না কেন, তাঁদের যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিপূর্ণভাবে পরিপক্ব হয়ে ওঠেনি। কিছু কিছু বিষয়গত পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীও তাদের ঐতিহাসিক লক্ষ্য সাধনের জন্য তখনও পর্যন্ত প্রস্তুত হয়নি। সুতরাং যদিও মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তিগুলির বেশির ভাগ সাধারণ বিধানগুলি আবিষ্কার করেছিলেন, তবু ওইসব আবিষ্কারগুলির বাস্তব রূপায়ণ ভবিষ্যতের কর্তব্য হয়ে রইল এবং আর যে যুগ তখনও আসেনি সেইরকম একটি যুগের করণীয় হয়ে রইল।

লেনিনের কাজ ছাড়া, শোধনবাদী ও মতান্ধদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মার্কসবাদের জন্য তাঁর সংগ্রাম ছাড়া মার্কসের শিক্ষার ঐতিহাসিক ভাগ্য হয়ত ভিন্নপথ গ্রহণ করত। বর্তমান যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্রষ্টা রূপে, বলশেভিকদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা রূপে, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা রূপে এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা রূপে ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে লেনিনের আবির্ভাব ইতিহাসের গতিপথে বিপুল প্রভাব ফেলেছে।

ইতিহাসে একথা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে যে যখন পুরানো সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক শর্তাদি পরিপক্ব হয়ে ওঠে, যখন ওই সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরিক বিরোধগুলি তীব্র হয়ে ওঠে, যখন এমন সামাজিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে যারা বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ঐ সব বিরোধগুলির সমাধান করতে সক্ষম তখন বিষয়ীগত উপাদান প্রভূত গুরুত্ব অর্জন করে—এইসব বিষয়ীগত উপাদানগুলি হল বিপ্লবী সংগঠন অথবা পার্টির কার্যকলাপ এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেইসব অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপ যাঁরা সাহসী বিপ্লবী কার্যকলাপে জনগণকে সংগঠিত করতে ও উৎসাহিত করতে সক্ষম।

সর্বহারার নেতা হিসাবে লেনিনের শক্তি তাঁর তত্ত্ব ও বিপ্লবী আচরণকে

সমন্বিত করার ক্ষমতা এবং সৃষ্টিশীল চিন্তায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার মধ্যে ও বিপ্লবী কার্যকলাপ সংগঠনে তাঁর সংকল্পের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

লেনিন ছিলেন সর্বহারা বিপ্লবের অনতিক্রান্ত দক্ষ রণনীতিজ্ঞ ও সংগঠক। ইতিহাসের গতিপথে সম্ভাব্য সর্পিল পথ ও অপ্রত্যাশিত দিক পরিবর্তন বিজ্ঞানসম্মতভাবে আগে থেকে অনুমান করার, শত্রু ও দোদুল্যমান ব্যক্তিদের আচরণ বুঝতে পারার এবং একই সঙ্গে নতুন ধরনের মার্কসবাদী পার্টির সমর্থনে একটি বিপ্লবী বাহিনী গঠনে ও সর্বহারার জন্য মিত্র জোগাড় করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। লেনিন শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস করতেন।

মার্কস-এর মতই তিনি ব্যক্তি-পূজার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ব্যক্তি-পূজাকে তিনি তাঁদের শিক্ষার সমগ্র তাৎপর্য ও সারমর্মের মৌলিকভাবে বিপরীত বলে গণ্য করতেন।

লেনিনের জীবন ও কাজের উদাহরণ সর্বহারা ও শ্রমজীবী জনগণের নেতৃবৃন্দের বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা দেখিয়ে দেয়। এই ভূমিকা এত বিরাট হওয়ার দরুনই বুর্জোয়ারা কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং তার নেতৃবৃন্দের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ করে। সর্বপ্রথমে তারা চেষ্টা করে আন্দোলনের শিরশ্ছেদ ঘটাতে। এক্ষেত্রে কার্ল লিবনেখৎ, রোজা লুক্সেমবুর্গ, এরনস্ট থেলমান ও অপরাপরদের কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট।

সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ও অপরাপর প্রচার মাধ্যমের মারফত আন্দোলনকে ভয় দেখিয়ে আতঙ্কিত করার প্রচেষ্টা হল আর একটি ধূর্ত পদ্ধতি। উচ্চ বেতনের আরামের চাকরি দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের কোনও কোনও নেতাকে উৎকোচও দেওয়া হয়। পরিশেষে যে সব নেতৃবৃন্দ কোনও না কোনও ভাবে বিপ্লবী মার্কসবাদের নীতিগুলিকে পরিহার করেছেন, জাতীয়তাবাদ বা শোধনবাদের বশীভূত হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দুর্বল করছেন তাঁদের তোষামোদ ও প্রশংসা করা হয়। বহুদিন পূর্বে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির অন্যতম নেতা অগাস্ট বেবেল লিখেছেন কত স্পষ্টভাবে তিনি এই ধরনের কৌশলের পিছনকার মতলব ধরতে পেরেছিলেন। জার্মান বুর্জোয়ারা যখন তাঁর ভূয়সী প্রশংসা শুরু করল তখন বেবেল বিস্ময় প্রকাশ

ক'রে বললেন: "ওহো, বুড়ো বেবেল, শত্রুর প্রশংসার যোগ্য হওয়ার মত কি বোকামি করেছ!" তখনকার মত আজও শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় ও স্থির-সংকল্প নেতাদের প্রতি বুর্জোয়ারা ভিন্ন মনোভাব পোষণ করে—তাঁদের তারা ঘৃণা করে ও নির্যাতন করে। স্তালিনের ব্যক্তিত্বের পূজা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনার সময়ে সমাজতান্ত্রিক দেশ, আর সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি এবং তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের প্রচার অভিযান বিশেষভাবে তীব্র হয়ে উঠেছিল। তারা ব্যক্তি-পূজাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহজাত একটা কিছু, লেনিনবাদী নীতি ও পার্টি সম্পর্কে তার শিক্ষা থেকে উদ্ভূত একটা কিছু বলে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের এই দাবির সঙ্গে সত্যের কোনও সম্বন্ধ নেই। ব্যক্তি-পূজা হল খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের দেবতার আসনে বসানর ঘটনা অতীতে ও বর্তমানকালে বহু সময়ে ঘটেছে। মাইকেল ভেরেৎ তাঁর লেখা থিয়োরী এৎ পলিতিক নামক পুস্তকে বলেছেন যে বিগত ১৬০ বছরের মধ্যে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, তৃতীয় নেপোলিয়ন, দ্য গল প্রমুখ বেশ কয়েকটি নামের সঙ্গে ব্যক্তি-পূজা যুক্ত ছিল। এই ঘটনাই ইঙ্গিত দেয় যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি-পূজার আবির্ভাবের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের নিজেদের উদ্যোগে স্তালিনের ব্যক্তিত্বের পূজাকে সমাজতন্ত্রের চরিত্রের ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কর্মনীতির বিপরীত এবং আন্তপার্টি জীবনে লেনিনবাদী মান থেকে বিচ্যুত একটা কিছু বলে কঠোর সমালোচনা করেছে। যে পরিস্থিতির মধ্যে এই ব্যক্তি-পূজা গড়ে উঠেছিল তার একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সুবিদিত প্রস্তাবে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে দেখান হয়েছে যে ব্যক্তি-পূজা বিশেষ বিষয়গত পরিস্থিতি ও বিষয়ীগত উপাদান এই উভয় দ্বারাই সৃষ্ট হতে পারে। বিষয়গত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চাদপদতা দূরীকরণের কর্তব্যের অসুবিধা ও জটিলতা, দেশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী-

সংগ্রামের তীব্রতা, যার জন্য প্রয়োজন হয় নেতৃত্বের সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ ও পার্টিতে কঠোর শৃঙ্খলা এবং এর অনিবার্য ফলস্বরূপ প্রয়োজন হয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সংকোচন।

প্রযুক্তি বিদ্যাগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সোভিয়েত দেশ পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় ৫০ থেকে ১০০ বছর পিছিয়ে ছিল। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে এই ব্যবধান দূর করার প্রয়োজন হয়েছিল। শুধু আভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভর ক'রে একটি বিশাল দেশে শিল্পস্থাপন ও বৈদ্যুতিকরণ করতে হয়েছিল, দেশের পশ্চাদপদ কৃষিতে পুনরুজ্জীবিত করতে হয়েছিল ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে তার পুনর্গঠন করতে হয়েছিল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করতে হয়েছিল। বিপ্লবের পূর্বে দেশের ৭২ শতাংশ লোক ছিল নিরক্ষর, কাজেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল অপরিহার্য।

পার্টির মধ্যে লেনিনবাদের প্রতি বিরূপ প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল ক'রে তুলেছিল। সে সময় পার্টির মধ্যে ট্রটস্কির নেতৃত্বে বিরোধীরা বলতেন যে রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি হয়ে কোনও একটি দেশে, বিশেষত একটি পশ্চাদপদ দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা অসম্ভব কাজ। দক্ষিণ-পন্থী সুবিধাবাদীরা শিল্পায়নের দ্রুত হারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁরা কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিরোধিতা করলেন এবং কৃষির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। পার্টিতে যদি ট্রটস্কি ও বুখারিনের তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক মত জয়লাভ করত তবে সোভিয়েত দেশের কি দশা হত? এর ফলে হয়ত সোভিয়েত ক্ষমতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ ধ্বংস হয়ে যেত। কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত এই উভয় দিক থেকেই ট্রটস্কিবাদ ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে পরাস্ত করতে হয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বিজ্ঞানসম্মত হার নিরূপণ করতে হয়েছিল। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে সংগ্রামও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৩০-এর দশকে পার্টি ও জাতি কর্তৃক অর্জিত সাফল্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে স্তালিনের ব্যক্তিত্বের পূজার উদ্ভব ঘটেছিল। এই সাফল্যগুলি অভূতপূর্ব—সেগুলি কাঠের লাঙল ও তেলের কুপি থেকে ট্রাক্টর, মোটরগাড়ি

ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এক বিরাট উল্লম্ফন চিহ্নিত করেছে। এই বছরগুলিতে স্তালিন পার্টিতে ও জনগণের মধ্যে বিপুল মর্যাদা অর্জন করেন। কিন্তু একটি বিশেষ পর্যায়ে এই মর্যাদা তাঁর ব্যক্তিত্বের পূজাতে পরিণত হতে শুরু করে। জনগণ ও পার্টির কাজকর্মের দরুন যা কিছু অর্জিত হয়েছিল তার সবকিছুই ভ্রান্তভাবে একজনের উপর আরোপিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াতে নিঃসন্দেহে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে বিষয়ীগত উপাদানগুলি, স্তালিনের নিজস্ব চরিত্রের নেতিবাচক লক্ষণগুলি। ১৯২২ সালের শেষভাগে এবং ১৯২৩ সালের শুরুতে পার্টি-কংগ্রেসের কাছে লেখা চিঠিতে লেনিন স্তালিনের ওই স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন—সেগুলি হল অশিষ্টতা, কমরেডদের প্রতি আনুগত্যহীনতা, সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে বিনয় তার অভাব।

কিন্তু এই ব্যক্তি-পূজার দরুন যৌথ নেতৃত্ব, আন্তপার্টি গণতন্ত্র ও সোভিয়েত আইন লঙ্ঘিত হবার কারণে যতই নেতিবাচক ফলাফল দেখা দিক না কেন, তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্র বদলাতে পারেনি অথবা সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করতে পারেনি। যে সব বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক রূপান্তর অর্জিত হয়েছিল তার অত্যাবশ্যক উপাদান ছিল জনগণ, দেশব্যাপী বীরত্ব, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক সৃষ্টিশীলতা।

ব্যক্তি-পূজার নেতিবাচক ফলাফলগুলি দূর করার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি পার্টির মধ্যে ও সমগ্র দেশের মধ্যে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। যৌথ নেতৃত্বের যে লেনিনবাদী মান ও নীতি একজন ব্যক্তির হাতে মাত্রাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা অথবা তার পক্ষে পার্টি ও জনগণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া অসম্ভব করে তোলে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তির পরোয়ানা ক'রে সকল স্তরে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার সর্বাত্মক বিকাশও ব্যক্তি-পূজার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির উদাহরণ দেখিয়ে দেয় যে মার্কসবাদী ধারায় শিক্ষিত পার্টিই এ ধরনের ব্যক্তি-পূজা এবং তার নেতিবাচক-ফলাফল থেকে মুক্ত হওয়ার শক্তি পেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ও

অপরাপর দেশে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা প্রমাণ করে যে বিজয়লাভের নিশ্চয়তা হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতির প্রতি, বিপ্লবের ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিষয়গত বিধান সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার প্রতি, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার নীতির প্রতি আনুগত্য। এইসব নীতি থেকে বিচ্যুতি, পার্টির ভূমিকা এবং যৌথ নেতৃত্বের লেনিনবাদী মানের তাৎপর্যকে খাটো করা শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক বিরাট ভুল ও বিপদের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে; এর দরুনই সমাজতন্ত্রের আদর্শের পক্ষে গুরুতর বিপদের উদ্ভব হয়, যেমন হয়েছে চীনে।

ইতিহাসে জনগণ ও ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ কমিউনিস্টদের সব কাজকর্মে জনগণের উপর আস্থা রাখতে এবং তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষা দেয়। তার জন্য প্রয়োজন জনগণের উদ্যোগে পরিপূর্ণ উৎসাহ যোগানর ক্ষমতা ও সেই উদ্যোগকে যা কিছু সংকুচিত করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষতা। পরিশেষে সর্বস্তরের সব নেতাদের পক্ষে একাজ বাধ্যতামূলক যে তাঁদের ওই ভূমিকার সংযত ও বিষয়গত মূল্যায়ন করতে হবে, দম্ভ ও অহমিকা পরিত্যাগ করতে হবে এবং লেনিন প্রদর্শিত কাজের পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করতে হবে।

জনগণের জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও জনগণের নেতৃত্ব করার ব্যাপারে পার্টির অভিজ্ঞতাকে সামান্যীকরণ ক'রে লেনিন লিখেছিলেন:

"জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখ

"তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও

"তাদের মেজাজ বোঝ

"তাদের সব কিছু জান

"জনগণকে বোঝ

"তাদের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হও

"তাদের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন কর

"যে জনগণের নেতৃত্ব করেন তাদের থেকে নেতৃবৃন্দকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না, অথবা অগ্রগামী বাহিনীকে শ্রমিকের সমগ্র বাহিনী থেকে—(বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না)

"জনগণকে তোষামোদ ক'র না; তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এস না" (১)

এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ কথার মধ্যে জনগণ, শ্রেণী, পার্টি ও তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অত্যাবশ্যক নীতিগুলি রয়েছে।

১। ভি. আই. লেনিন, কমপ্লিট ওয়ার্কস, পঞ্চম রুশ সংস্করণ, ভল্যুম ৪৪ পৃষ্ঠা ৪৯৭-৯৮।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের অগ্রগতি

ইতিহাসের অগ্রগতির সমস্যাটি সমাজ-বিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল ক'রে আছে। এই সমস্যাটিকে নিয়ে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম রয়েছে, কারণ এর যে কোনও ব্যাখ্যার মধ্যেই মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের এবং তার বিকাশের স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মূল্যায়ন নিহিত। মানবজাতি কি সমাজ-জীবনের উচ্চতর রূপের দিকে, আরও আলোকপ্রাপ্ত ও মানবিক সামাজিক সম্পর্কের দিকে, উচ্চতর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক চেতনার দিকে যাচ্ছে? অথবা উল্টো দিকে, তাপপারমাণবিক ধ্বংসের দিকে, জনসংখ্যায় বিপর্যয়কারী আধিক্যের দিকে, মানুষের জৈবিক অধঃপতন ইত্যাদির দিকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে? আমরা দেখি যে এই যুক্তিগুলিই ঐতিহাসিক অগ্রগতির অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলে। অগ্রগতির সারমর্ম কি, এর পরিচালিকা শক্তিগুলি কি? সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোন্‌টি প্রগতিশীল আর কোন্‌টি পশ্চাদ্‌গামী তা বাছতে কোন্‌ মানদণ্ড সাহায্য করে? এইগুলি হল বিবেচনাধীন সমস্যাটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১. ইতিহাসের অগ্রগতির সারমর্ম

অষ্টাদশ শতাব্দীর অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজ চিন্তাবিদ টুর্গট, কনডোরসেট ও হারডার-এর দ্বারা সূত্রায়িত অগ্রগতির ধারণাটি উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধান হয়ে ওঠে। ঐ সময়টা ছিল ধনতন্ত্রের দ্রুত উত্থানের সময় এবং বহু বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকের কাছে সামাজিক প্রগতির ধারণাটি প্রায় স্বয়ংসিদ্ধ বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু প্রাক-মার্কসবাদী দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা ইতিহাসের অগ্রগতির বিধান ও পরিচালিকা শক্তিগুলির প্রকৃত সারমর্ম উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। ভাববাদের অবস্থান থেকে শুরু ক'রে তাঁরা আধ্যাত্মিক নীতির মধ্যে নিজেকে নিখুঁত ক'রে গড়ে তোলার জন্য মানুষের মনের অসীম ক্ষমতা (টুর্গট ও

কনডোরসেট) অথবা অনপেক্ষ পরমাত্মার (হেগেল) স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশের মধ্যে মানবিক বিকাশের কারণ খোঁজেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা অগ্রগতির মানদণ্ডকেও দেখেন আধ্যাত্মিক চরিত্রের বিষয়ের মধ্যে, সামাজিক চেতনার একটি বিশেষ রূপের বিকাশের স্তরের মধ্যে—সেগুলি হল বিজ্ঞান, নৈতিকতা, আইন, ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সামাজিক চেতনার এই সব রূপের আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে কি থেকে হয়েছে অথবা তাদের পরিবর্তন ও বিকাশের কারণ কি তার কোনও ব্যাখ্যা মেলে না।

সমাজের অগ্রগতির বহু প্রাক্-মার্কসবাদী ধারণার আর একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হল তাদের সমাজ-জীবন সম্পর্কে অদ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁরা সমাজের বিকাশকে মূলতঃ বিপ্লবী উল্লম্ফন ছাড়া, কোনও পশ্চাদগামী গতি ছাড়া মসৃণ বিবর্তনমূলক বিকাশ হিসাবে, সরল রেখায় ক্রমাগত অগ্রগমন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সমাজতত্ত্ববিদ অগাস্তে কমতে ও হার্বার্ট স্পেনসার তাঁদের কালের সমাজের প্রগতির পরস্পর-বিরোধী ও বৈরিতামূলক প্রকৃতি বস্তুত উপেক্ষা করেছেন এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামকে "অসুস্থ ব্যাপার" হিসাবে, সভ্যতার বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখিয়েছেন।

পরিশেষে, বুর্জোয়া চিন্তাধারা ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর মধ্যেই সমাজের অগ্রগতিকে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছিল। তা থেকে এই সীদ্ধান্তই টানা হয়েছিল যে এই সমাজের সীমার বাইরে বেরবার যে কোনও প্রচেষ্টা হবে পশ্চাদগমন এবং তা অপরিহার্যভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মার্কসবাদ ইতিহাসের অগ্রগতির প্রাক্-মার্কসবাদী ধারণাগুলির দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি দূর করে এবং তার প্রকৃত সারমর্ম ও পরিচালিকা শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যেমন সমাজকে সাধারণভাবে বিচার করতে রাজী হননি, ঠিক তেমনি তাঁরা ইতিহাসের অগ্রগতির প্রশ্নটিকে বিমূর্তভাবে বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছেন। মার্কস এই বলে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে "অগ্রগতির ধারণাটিকে মোটামুটি প্রচলিত বিমূর্ত রূপে বুঝলে চলবে না"(১) তার অন্তর্নিহিত অর্থ হল যে ঘটনা একটি

ঐতিহাসিক যুগে প্রগতিশীল (উদাহরণ স্বরূপ ধনতন্ত্র), অপর একটি যুগে তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনে অগ্রগতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বের করা।

নানা বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, সাময়িক জড়তা ও পশ্চাদগমন সত্ত্বেও মানবজাতির ইতিহাস শেষ পর্যন্ত উচ্চতর পর্যায়ে গমন; পুরাতন থেকে নূতনে, সরল থেকে জটিলে গমন। সমাজের বিকাশের সাথে সাথে মানবজাতি মানুষের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতার সীমাকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রসারিত ক'রে আরও শক্তিশালী উৎপাদিকা শক্তি, আরও কার্যকর অর্থনীতি, রাজনৈতিক প্রশাসনের আরও নিখুঁত ধরন সৃষ্টি করে।

সমাজ-জীবনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায় যে ইতিহাসের অগ্রগতির পরিচালিকা শক্তিগুলি সমাজের গর্ভেই রয়েছে। যে সব শক্তি সমাজের বিকাশ নির্ধারণ করে তারা একই সঙ্গে আবার ইতিহাসের অগ্রগতিরও পরিচালিকা শক্তি। ইতিহাসের অগ্রগতির মূল খুঁজতে হবে প্রথমত বৈষয়িক উৎপাদনের মধ্যে, অর্থনীতির মধ্যে অর্থাৎ সমাজ-জীবনের নিয়ামক ক্ষেত্রে। অচল উৎপাদন সম্পর্কগুলির বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগ্রাম ঐতিহাসিক বিকাশের অগ্রগমনের পথে এক শক্তিশালী শক্তিরূপে, কার্যত নিয়ামক শক্তিরূপে ছিল ও রয়েছে।

একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপের জায়গায় আর একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপের স্থান গ্রহণের মধ্যে ইতিহাসের অগ্রগতি বিশেষভাবে প্রতীয়মান। কমিউনিজমের আগেকার সকল সামাজিক রূপগুলি অপরিহার্যভাবে একের পর এক নিজেদের প্রয়াণের প্রস্তুতি করেছে। উৎপাদন সম্পর্কগুলির ইতিহাসগতভাবে সীমাবদ্ধ যে রূপ কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের সময়ে আধিপত্য করে তা তার বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতিকে বাধা দিতে শুরু করে এবং ফলত নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সদ্য আবির্ভূত নতুন গঠন উৎপাদিকা শক্তিগুলির আরও দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ক্রমাগত ত্বরান্বিত হচ্ছে। সোভিয়েত

যুগের পাথরের হাতিয়ারগুলি বিশেষ কোনও পরিবর্তন ছাড়াই প্রায় ৫ লক্ষ বছর বিদ্যমান ছিল। অপর দিকে বাষ্প শক্তি থেকে বিদ্যুৎচালিত মেশিন শক্তিতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ১০০ বছরেরও কম সময়। শিল্পে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের প্রারম্ভিক স্তরে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল আরও কম সময়। উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতির বিকাশ উৎপাদন সম্পর্ক-গুলির ক্ষেত্রে, সামাজিক সংস্কার ও সমাজের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে।

সমাজের প্রগতিশীল বিকাশ শুধু একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন থেকে অপর একটি গঠনে উত্তরণের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে না, ওই গঠনের সীমার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে। তার অর্থ কি এই যে বিশেষ বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন তাদের সমগ্র জীবনকালে ক্রমাগত উন্নতিলাভই করে? কমিউনিজমের আগেকার কোনও সমাজ সম্পর্কে একথা বলা যায় না, কারণ বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে সেগুলি পূর্বেকার প্রগতিশীলতা হারায় এবং ইতিহাসের গতিকে বাধা দিতে শুরু করে। দাস-মালিকানা সমাজে, সমাজতন্ত্রে ও ধনতন্ত্রে, বিশেষত ধনতন্ত্রের বিকাশের সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে তাই ঘটেছিল। সাম্রাজ্যবাদের যুগে অবশ্য উৎপাদিকা শক্তিগুলির, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটে। কিন্তু এই পর্যায়ে ধনতন্ত্র সামগ্রিকভাবে একটা প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদগামী শক্তি হিসাবে কাজ করে। মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করার মত বিধ্বংসী শক্তিসমূহের সৃষ্টি করে।

ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে অচল শাসন ব্যবস্থার সমর্থকরা আয়ত্তগত সমস্ত উপায়-উপকরণ দিয়ে ইতিহাসের প্রগতিকে বাধা দিয়েছে। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী মানবজাতির বিকাশের অগ্রগমন থামাতে সক্ষম হয়নি। এই সব চেষ্টা কেবল নতুন সমাজ ব্যবস্থার জয়কে কম-বেশি দেরি করিয়ে দিয়েছে।

শুধু সামাজিক সম্পর্কগুলি নয়, সংস্কৃতি ও জনগণের চেতনাও ক্রমোন্নতির ধারা অনুসরণ করে। মানব জাতির বিকাশ সামগ্রিকভাবে অচলের নিরাকরণের প্রক্রিয়াও বটে, আবার যে সব মূল্য (বৈষয়িক, নৈতিক সহ আত্মিক) আমাদের প্রকৃতির শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করতে এবং সমাজ-

বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত পথের উপর মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম করে সেগুলির সংস্করণের প্রক্রিয়াও বটে। এখানে আমরা পাই দ্বন্দ্বমূলক নিরাকরণ (negation)—পুরানো ব্যবস্থায় সকল ইতিবাচক লাভগুলি ধরে রাখা ও বাড়ান সহ ঐ ব্যবস্থার নিরাকরণ। তাই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের সরল অনুক্রম রূপে আবির্ভূত হয় না, হয় অগ্রগামী গতি হিসাবে, কারণ প্রত্যেকটি নতুন গঠন শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং মননগত সংস্কৃতির দিক থেকে, মানুষের বিকাশের জন্য আলোচ্য সমাজ যে পরিবেশ যোগায় তার দিক থেকে তার আগেকার গঠন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলিকে ছাড়িয়ে যায়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলির ধারাবাহিক পরিবর্তনকে এই অর্থে বুঝলে চলবে না যে যখন কোনও নতুন ও অধিকতর প্রগতিশীল গঠনের আবির্ভাব ঘটে, তখন পুরানো গঠনটি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া আরও জটিল এবং আরও দীর্ঘস্থায়ী। এটা জানা কথা যে ভিন্ন ভিন্ন গঠন একই ঐতিহাসিক পর্যায়ে সহাবস্থান করতে পারে। কিন্তু তাড়াতাড়িই হোক বা দেরিতেই হোক অচল সামাজিক কাঠামোটি উচ্চতর সামাজিক গঠনের জন্য পথ ক'রে দিয়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে ঐতিহাসিক দৃশ্যপট ছেড়ে চলে যাবে। সামাজিক গঠনগুলির একে অপরের স্থান অধিকার করার এই প্রক্রিয়া শ্রেণীগুলির সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে ঘটেছে ও এখনও ঘটছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধীরা সামাজিক অগ্রগতির সারমর্ম ও পরিচালিকা শক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে বিকৃত ক'রে থাকে। তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর এই ধারণা আরোপ করে যে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তর আপনা থেকেই মননগত সংস্কৃতির ক্ষেত্র সহ সমাজ-জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্তর নির্ধারণ ক'রে দেয়। এই অনুমান মার্কসবাদী তত্ত্বের সামাজিক রীতি ও নীতিগুলির বিরোধিতা করে। উদাহরণ স্বরূপ, একথা সুবিদিত যে উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়া উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের দিক থেকে ইউরোপের অনেকগুলি দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল, কিন্তু তা বড় বড় চিন্তাবিদ, লেখক, সুরকার ও শিল্পী তৈরি

করতে বাধা হয়নি। অপর পক্ষে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের পরিস্থিতির মধ্যে উৎপাদিকা শক্তিগুলির অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের পাশাপাশি শাসক শ্রেণীগুলির নৈতিক চেতনায় অবনতি এবং ফ্যাসিবাদ, বর্ণবৈষম্য, কোনও কোনও জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মত বর্বরতা বিরাজ করে।

উৎপাদন সম্পর্ক, সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিরোধ ও অন্যান্য নানা উপাদানের কথা বিবেচনা না ক'রে উৎপাদিকা শক্তির স্তর থেকে মননগত সংস্কৃতির (সাধারণ ভাবে সৌধসংক্রান্ত সকল ব্যাপারেরই) বিকাশকে সরাসরি টানা যায় না। একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সৌধগত ব্যাপার অর্থনীতি থেকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এবং কোনও কোনও সময়ে এই স্বাধীনতা অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মার্কস উল্লেখ করেছেন কলার বিকাশের কোনও কোনও শিখর কোনও মতেই সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ অনুযায়ী হয় না; কাজেই তার (সমাজের) সংগঠনের কঙ্কালের মত যে বৈষয়িক উপ-কাঠামো সে অনুযায়ীও হয় না।"(১)

সামগ্রিকভাবে পরবর্তী গঠন পূর্বেকার গঠন থেকে অধিকতর প্রগতিশীল একথা মনে রেখেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই প্রতিজ্ঞাটির অতি-সরলীকরণের বিরুদ্ধে সাবধান ক'রে দেয়। এই নতুন গঠন সংস্কৃতির সকল রূপের ক্ষেত্রে পুরানো গঠনকে অতিক্রম ক'রে যাবে এমন কোনও কথা নেই। মননগত সংস্কৃতির (উদাহরণ স্বরূপ দর্শনের) কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ দাস সমাজের তুলনায় নিকৃষ্টতর ছিল, কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সামগ্রিকভাবে দাস সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ সামাজিক বিকাশের দিক থেকে পশ্চাদগমন নয়, অগ্রগমনই সূচিত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বুর্জোয়া এনলাইটেনাররা মধ্যযুগকে এমন একটা সময় বলে গণ্য করত যখন ইতিহাস নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এঙ্গেলস তার নিন্দা ক'রে বলেছেন, "মধ্যযুগে যে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছিল—অর্থাৎ ইউরোপীয় সংস্কৃতির এলাকার প্রসার, টিকে থাকার যোগ্য বড় বড় জাতির পর পর আবির্ভাব,

১। কে. মার্কস, এ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি, পৃষ্ঠা ২১৫।

এবং পরিশেষে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বিপুল কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি— এসব দেখা হয় নি "(১)

অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে ধারাবাহিকতা ছাড়া ইতিহাসের অগ্রগতি কল্পনাই করা যায় না। ইতিহাসের রিলে দৌড়ে এক-একটা প্রজন্ম ও জনগণ অপরাপর প্রজন্ম ও জনগণের হাতে মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তুলে দিয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির সাধারণ প্রবাহে কি সকল সাংস্কৃতিক সম্পদ গৃহীত হয়? ইতিহাস এর নেতিবাচক উত্তর দেয়। বহু কারণের দরুন (যথা—এক জাতি থেকে অপর জাতির অতিরিক্ত দূরত্ব, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে চরম অসমতা ইত্যাদির দরুন) অতীতে কোনও কোনও সময়ে এমন ঘটেছে যে কোনও বিশেষ সভ্যতা দ্বারা সৃষ্ট সম্পদগুলি পরবর্তীকালে সঞ্চারিত হয়নি এবং সেই সভ্যতার সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

অগ্রগতিকে ইতিহাসের বিকাশের বিষয়গত বিধানরূপে বিবেচনা ক'রেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সামাজিক অগ্রগতিকে নিম্নতর থেকে উচ্চতরে সরল ও অটল আরোহণ হিসাবে অতি-সরল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সতর্ক ক'রে দেয়। নতুন সমাজের বিজয়লাভ কোনও বাঁধা-ধরা সময় নির্ঘণ্ট অনুসরণ করে না। কতকগুলি অবস্থার যোগাযোগের দরুন কখনও কখনও ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল শক্তিগুলির সাময়িক পরাজয় ঘটেছে এবং বিষয়গতভাবে পরিপক্ব ঐতিহাসিক কর্তব্যগুলি সম্পাদনের কাজে বিলম্ব ঘটিয়েছে। ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়া কতটা ঘোরাল ও বিরোধ-সংকুল ছিল।

অগ্রগতির অতি-সরলীকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রে লেনিন লিখেছেন: "……বিশ্ব ইতিহাসের গতিপথ মাঝে মাঝে বিরাট পশ্চাদপসরণ ছাড়াই সর্বদা মসৃণ ও আগুয়ান বলে বিবেচনা করা অ-দ্বন্দ্বমূলক, অ-বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্বের দিক থেকে ভুল।"(২) ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে উন্নতিশীল বিকাশকে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করার বিরুদ্ধে, ঐতিহাসিক দুর্ঘটনাগুলির ভূমিকা উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে সাবধান-

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৩৫০।

২। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ২২, পৃষ্ঠা ৩১০।

বাণীর এই বৈজ্ঞানিক সামান্যীকরণের বিপুল তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী অস্তিত্ব দেখিয়ে দিয়েছে যে নতুন সমাজকে ধ্বংস করার জন্য এবং ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য কি ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি একগুঁয়ে হয়ে যুদ্ধ সহ সর্বপ্রকার সম্ভাব্য পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদের প্রতি-আক্রমণকে পরাস্ত করার জন্য এবং সারা বিশ্ব-পরিসরে পুরাতন পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য বিষয়গতভাবে যা প্রয়োজন তা বিশ্ব সমাজতন্ত্রের রয়েছে। কিন্তু বিষয়গতভাবে পরিপক্ব এই লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে বিজড়িত হল কোটি কোটি লোকের জাগরণ এবং প্রগতিশীল দলগুলির আন্দোলন।

ইতর অর্থনৈতিক বস্তুবাদ ইতিহাসের গতিপথকে, সমাজ বিকাশের এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে আরোহণকে এইভাবে উপস্থিত করে যে তা হল নৈর্ব্যক্তিক ও একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া যাতে অভিপ্রায় ও চেতনা-সম্পন্ন জনগণের ওজন সামাজিক ঘটনাবলীর আবর্তে ঝড়ের মধ্যে বালুকণার চাইতে বেশি থাকবে না। বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা প্রায়শই এই ধারণাটিকে মার্কসবাদের উপর আরোপ ক'রে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ আলফ্রেড জি. মেয়ার লেনিনিজম নামক পুস্তকে অভিযোগ করেছেন যে মার্কস সব কিছুর মধ্যেই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিফলন খোঁজেন এবং নিজেকে তার যুগ-প্রবর্তক ও ভাষ্যকার হিসাবে গণ্য করেন। "অন্যরা যে ভূমিকা দৈবশক্তির উপর আরোপ করেছেন অর্থাৎ মানবজাতিকে নতুন ইডেন-এ (স্বর্গে) নিয়ে যাওয়া, মার্কসের মতে ইতিহাস সেই ভূমিকা পালন করে।"(১)

মার্কস ও এঙ্গেলস বরং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে জনগণ ও তাদের আচরণের উপর আধিপত্যকারী বাহ্যিক একটা কিছু হিসাবে অদৃষ্টবাদীদের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যানই করেছেন। এঙ্গেলস লিখেছেন: "ইতিহাস কিছুই করে না, তার 'বিপুল সম্পত্তি নেই', কোনও সংগ্রাম করে না। মানুষ, প্রকৃত জীবন্ত মানুষই ওসব কিছু করে, তাদেরই ঐশ্বর্য আছে ও তারাই সংগ্রাম করে, 'ইতিহাস' পৃথক এমন কোনও মানুষ নয় যে তার নিজস্ব

১। এ. জি. মেয়ার, লেনিনিজম, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ২৯১।

বিশেষ লক্ষ্যের জন্য মানুষকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে; নিজস্ব লক্ষ্য অনুসরণকারী মানুষের কার্যকলাপ ছাড়া ইতিহাস আর কিছু নয়।"(১)

অগ্রগতির অদৃষ্টবাদী ব্যাখ্যা মানুষকে বসে বসে ভাবা ও নিষ্ক্রিয়তায় নিয়ে ফেলে এবং স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভরতাকে ন্যায্য বলে মনে করে ও ঘটনাবলীকে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে দেয়। সমাজের বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারণায় সমৃদ্ধ হয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি বিশ্বের মৌলিক রূপান্তর ঘটাবার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক রণনীতি ও রণকৌশল রচনা করে।

সমাজের অগ্রগতির মার্কসবাদী ধারণাটি শুধু যে অদৃষ্টবাদী ধারণার বিরোধী তাই নয়, সেই সঙ্গে বিষয়ীবাদী-ভাববাদী, স্বেচ্ছাসেবকবাদী ব্যাখ্যারও বিরোধী। শেষোক্তরা ইতিহাসের বিষয়গত বিধানগুলিকে অস্বীকার করে এবং সেইজন্যই তারা মহা আনন্দে অগ্রগতির সারমর্মের খুশিমত মূল্যায়নের ভিত্তিতে অগ্রগতিকে অস্বীকার করে বা স্বীকার করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তুলনামূলক পার্থক্য হল যে তা ইতিহাসের অগ্রগতির একটি নির্ভুল বিষয়গত মানদণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. ইতিহাসের অগ্রগতির মানদণ্ড

অগ্রগতির মানদণ্ড কি? কোন্ অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইতিহাসের প্রগতিশীল ব্যাপারগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাপারগুলি থেকে পৃথক করা যায়?

শুরুতে সমাজের অগ্রগতির বহুমুখিনতার বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। কার্যত তা হল ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি মিশ্রণ। সমাজ-জীবনের প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের (উৎপাদিকা শক্তি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, কলা ইত্যাদির) বিকাশের নিজস্ব বিশিষ্ট মানদণ্ড আছে এবং একটিকে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যায় না, যদি না তার নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট মূল্যায়ন পরিহার করা হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই পরিস্থিতিতে সমাজের অগ্রগতির কোনও সাধারণ মানদণ্ডের কথা বলা সম্ভব কিনা। অনেক বুর্জোয়া দার্শনিক, বিশেষত উপাদানগুলির তত্ত্বের প্রবক্তা, যারা সামাজিক প্রক্রিয়ার ঐকিক ভিত্তিকে অস্বীকার করে এবং সমান সমান সামাজিক উপাদানগুলির যান্ত্রিক

১। কে মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দা হোলি ফ্যামিলি, পৃষ্ঠা ১২৫।

পারস্পরিক ক্রিয়াকেই শুধু স্বীকার করে, তারা এই প্রশ্নটির নেতিবাচক উত্তর দেয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলে। আমরা যাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন বলি তা হল একটি অখণ্ড, জীবন্ত সামাজিক জৈব কাঠামো, নিজস্ব বিশেষ কাঠামো এবং বিকাশের ও ক্রিয়ার বিধানসমূহসহ একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা। আমরা যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির একটি সমষ্টি হিসাবে বিচার না ক'রে অংশগুলির দ্বন্দ্বমূলক ঐক্যের দিক থেকে বিচার করি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে এইসব বিষয়গুলিকে তুলনা করার জন্য একটা সাধারণ মানদণ্ড পেয়ে যাব এবং সেগুলি প্রগতিশীল কি পশ্চাদগামী তা বের করতে পারব।

যেহেতু, অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি যে কোনও সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ভিত্তি তৈরি করে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজ-জীবনের সকল দিকগুলিকে নির্ধারণ করে, সেই কারণে অগ্রগতির সাধারণ মানদণ্ড খুঁজতে হবে সর্বোপরি অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

দা অ্যাগ্রেরিয়ান প্রোগ্রাম অব সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ইন দা ফার্স্ট রাশিয়ান রেভলিউশন, ১৯০৫-১৯০৭ গ্রন্থে লেনিন উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে "সামাজিক অগ্রগতির উচ্চতম মানদণ্ড…"(১) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সংজ্ঞা এই তথ্যের উপর নির্ভরশীল যে উৎপাদিকা শক্তিগুলির ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির ঐক্যের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি উৎপাদন পদ্ধতির আধেয় গঠন করে, তার সবচাইতে গতিময় উপাদান হয়, এবং উৎপাদনের ও সমগ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকাশে নিরবচ্ছিন্নতার উপাদানকে প্রকাশ করে উপরন্তু, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তর ও চরিত্রকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় ও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়।

আমরা যখন আদিম গোষ্ঠী-ব্যবস্থা, দাস-মালিকানা সমাজ, সামন্ততন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরস্পরের সংগে তুলনা করি, তখন দেখতে পাই যে এই সব সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলির ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতার মাত্র মূলত বোঝা যায় গঠনগুলি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ কি পরিমাণে নিশ্চিত করতেপারে তার দ্বারা।

১। ভি. আই. লেনিন কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৩, পৃষ্ঠা ২৪৩।

ধনতন্ত্রের উপর কমিউনিস্ট গঠনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত হয় তার উৎপাদিকা শক্তিগুলির আরও পরিকল্পনা মাফিক, দ্রুত ও সুসমঞ্জস বিকাশের সম্ভাবনা প্রকাশ করার মধ্যে। কমিউনিজমের আমলে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ও শ্রম উৎপাদন ক্ষমতার উচ্চতর বৈষয়িক ও আত্মিক সামগ্রীর প্রাচুর্য সৃষ্টি এবং জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী তা বণ্টন সম্ভবপর ক'রে তুলবে।

একটি সমাজ ব্যবস্থার প্রগতিশীলতা অথবা পশ্চাদ্গামিতার মূল্যায়ন করার জন্য উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের দরুন যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয় তা বিবেচনা না ক'রে, শ্রমজীবী জনগণের মানুষের স্বার্থকে বিবেচনা না ক'রে, কেবল উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্তর, চরিত্র ও বিকাশের হার উল্লেখ করা কোনও মতেই যথেষ্ট নয়। এটা আকস্মিক নয় যে অনেক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ বর্তমানে উৎপাদন সম্পর্কগুলি থেকে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিচ্ছেদ ঘটাতে সদাই প্রস্তুত, ফলত তারা মনগড়া ধারণা ও ভ্রান্ত মূল্যায়নে পৌঁছয়। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম রোস্তভ সমাজ-বিকাশের স্তরগুলিতে শ্রেণী-বিভাগ করতে গিয়ে উৎপাদন সম্পর্কগুলির থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে উৎপাদিকা শক্তিগুলির ব্যবহারকে বিশেষত কৃৎকৌশলগত সরঞ্জামের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কিন্তু যদি কোনও লোক উৎপাদন সম্পর্কগুলি থেকে, সমাজ কাঠামো থেকে উৎপাদকদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তরকেই শুধু ব্যবহার করে তবে আমেরিকান ধনতন্ত্র সমাজের অগ্রগতির একেবারে সামনের সারিতে চলেছে বলে প্রতীয়মান হবে। বাস্তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উচ্চতর স্তর একটি সেকেলে শ্রেণী-বিভক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। অধিকন্তু তথ্যকে গতিহীনভাবে বিচার করা যায় না। তথ্যগুলির বিকাশের গতিবিদ্যাকেও বিবেচনায় রাখতে হয়। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদিকা শক্তিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় নীচু স্তরে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, যাদের বেশির ভাগেরই পুরানো ব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর

করতে হয়েছিল, তারা এখন কমিউনিস্ট গঠনের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে। কোনও নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনই সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশের প্রথম পর্যায়ে পুরানো ব্যবস্থার তুলনায় নিজের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেখাতে পারে না। কিন্তু উৎপাদন-সম্পর্কগুলির ধরনের দিক থেকে কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়টিও ধনতন্ত্রের চাইতে উৎকৃষ্টতর। কারণ তা উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উচ্চতর ও সুস্থিত হার সুনিশ্চিত করে। সকল উৎপাদিকা শক্তি-গুলির মধ্যে যা সবচেয়ে জরুরী ও সকল সম্পদের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই শ্রমজীবী মানুষের বিকাশের জন্য ধনতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্র অধিকতর সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কগুলির অর্থাৎ সহযোগিতার ও পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্কগুলির ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা-ভিত্তিক সম্পর্কগুলির চরিত্র এমন সব বিষয়গত শর্তাদি সৃষ্টি করে যা যথা সময়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন থেকে সব দিক থেকে উৎকৃষ্টতর ক'রে তুলবে।

মার্কসবাদের দ্বারা প্রস্তাবিত অগ্রগতির মানদণ্ড কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক ও বিষয়গত এবং তা অগ্রগতির মৌলিক পরিমাপ হিসাবে এমন কোনও উপাদানকে উপস্থিত করার কোনও প্রচেষ্টাকে বাতিল করে যে উপাদান নিজেই আরও মৌলিক প্রাথমিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

কোনও কোনও সময়ে বলা হয় যে এই মানদণ্ড চরিত্রের দিক থেকে একেবারেই অর্থনৈতিক এবং মানুষ থেকে, সমাজের মানুষের স্থান ও সামাজিক পদমর্যাদা থেকে বিচ্ছিন্ন। এইসব ভিত্তিতে অগ্রগতির মানদণ্ড হিসাবে বিমূর্ত মানবিকতা, নৈতিক উৎকর্ষ ইত্যাদির বিভিন্ন ধরনের মূল্য হাজির করা হয়। কিন্তু আসলে মানুষ, মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, মানুষের মঙ্গল ও মুক্তি মার্কসবাদী বিজ্ঞান ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উভয়েরই কেন্দ্রীয় বিষয়। উৎপাদিকা শক্তিগুলির কাছে, সেগুলির চরিত্র ও বিকাশের শর্তাদির কাছে আবেদন ক'রে মার্কসবাদ মানবিক অস্তিত্বের প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করেছে, কারণ এখানেই লুকান রয়েছে সেইসব শক্তি যা মানুষের প্রকৃত অবস্থান, তাদের জীবনধারণের ও সংস্কৃতির মান, মুক্তির বাস্তবে পরিণত হবার মাত্রা, মননগত ও নৈতিক বিকাশ এবং উৎকর্ষের সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ ক'রে দেয়।

একথা কল্পনা করা অবশ্য ভুল হবে যে ইতিহাসের সমগ্র গতিপথে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৃদ্ধি মানুষের বিকাশের জন্য আরও অনুকূল অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে সরাসরি একই সঙ্গে ঘটে। যদিও সাধারণভাবে একটি শ্রেণী গঠন থেকে আর একটি শ্রেণী গঠনে যাওয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত নির্ভরতা থেকে, আইনের দাসত্ব থেকে জনগণের মুক্তির একটি প্রক্রিয়া একত্রেই চলে; তথাপি তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িত থেকে যায়। শ্রমজীবী জনগণের সহজাত গুণ ও কর্মক্ষমতাকে দমন করার ও সংকুচিত করার মূল্যেই ইতিহাসের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল। শ্রমিকদের উপর উৎপাদনের দাবি একপেশে ভাবে মেটানর কাছেই ওই সব সহজাত গুণ ও কর্মক্ষমতাকে বলি দেওয়া হয়েছিল। ধনতন্ত্রের আমলে সর্বপ্রথম অর্জিত উৎপাদিকা শক্তিগুলির এই উচ্চস্তরই কেবল এমন একটি পরিস্থিতির পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে যেখানে কিছু লোক ও কিছু শ্রেণীর বিকাশ অপরদের ক্ষতি ক'রে করার প্রয়োজন নেই, যেখানে উৎপাদনের বিকাশ মানুষের সর্বাত্মক বিকাশের দাবির সঙ্গে সম্পূর্ণ একত্র মিলতে পারে। সমাজের অগ্রগতির বিরোধমূলক চরিত্রকে দূর ক'রে সমাজতন্ত্র এই ঐতিহাসিক লক্ষ্য অর্জন করে।

৩. শোষক শ্রেণী সমন্বিত সমাজগুলিতে সমাজের অগ্রগতির বিরোধমূলক চরিত্র

ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক ও শোষণভিত্তিক সমাজগুলিতে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠকে, শ্রমজীবী জনগণকে পদানত করার এবং ব্যক্তিকে দমন করার মূল্যে সমাজের অগ্রগতি ক্রয় করতে হবে।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজগুলির বিকাশের উদ্ভবই হয় পরস্পর-বিরোধী সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে তীব্র সংগ্রামের ফলস্বরূপ। বিপুল সংখ্যক দাসকে পদানত ক'রে রাখাটা ছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমের এবং তাদের সংস্কৃতির অস্তিত্বের ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য শর্ত। অগ্রগতি এবং শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির মধ্যেকার অনতিক্রম্য বিরোধ সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের আমলে অব্যাহত থাকে। বুর্জোয়া সমাজের কথা মনে রেখে মার্কস লিখেছিলেন ঃ "যে গতিতে মানবজাতি প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনে, মনে হয় মানুষ সেই একই গতিতে অপর

মানুষের অথবা তার নিজের দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের দাস হয়ে পড়ে। অজ্ঞতার অন্ধকার পটভূমিকায় মনে হয় বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ আলো পর্যন্ত উদ্ভাসিত হতে অক্ষম। আমাদের সকল আবিষ্কার ও অগ্রগতির ফল যেন দাঁড়ায় বৈষয়িক শক্তিগুলি মননগত জীবনে ভূষিত করা এবং মানুষের জীবনকে একটা নির্বুদ্ধি বৈষয়িক শক্তিতে পরিণত করা।(১)

জনগণের সংগঠন ও বিরোধিতার কল্যাণে কয়েকটি যথেষ্ট উন্নত ধনতান্ত্রিক জনগণের সংগঠন ও বিরোধিতার কল্যাণে কয়েকটি যথেষ্ট উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অনপেক্ষ দারিদ্র্যে নেমে যাওয়ার প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত সংগ্রামের চাপে একচেটিয়ারা নিজেদের মৌলিক স্বার্থ, নিজেদের শ্রেণীগত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার জন্য আংশিক সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও সরঞ্জাম শ্রমিকদের জন্য শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট স্তর দাবি করছে।

তবুও এইসব পরিবর্তন ধনতন্ত্রের সারমর্মের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে না এবং ফলস্বরূপ বুর্জোয়া সমাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্ববিরোধী চরিত্র দূর করতে পারে না। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোটি কোটি মানুষ মানব সংস্কৃতির উচ্চতম ফলগুলি থেকে বঞ্চিত। বুর্জোয়া সংবাদপত্র স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে আমেরিকার তরুণদের এক বিরাট অংশ কোন গুরুতর বিষয় আদৌ অধ্যয়ন করে না এবং পাইকারী সংস্কৃতির ফলগুলি দিয়েই চালিয়ে নেয়। ধনতন্ত্রের আমলের নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনের ধারা (অ্যাসেম্বলি লাইন) মানুষকে নির্বুদ্ধি ক'রে ফেলে, কর্মপ্রক্রিয়ার একঘেয়েমি তাদের মননশক্তিকে ধ্বংস ক'রে দেয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে এই ধরনের কর্মচারী দেখেই হয়ত হেনরী ফোর্ড ওই অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্যটি করেছিলেন যে, আদর্শ কারখানা-শ্রমিক হবে একটি সুশিক্ষিত লাঙ্গুলবিহীন বানর। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রযুক্তি-বিদ্যাগত ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মানসিক রোগের বৃদ্ধি; জীবন সম্পর্কে আগ্রহ এবং এমনকি বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারান ও আত্ম-হত্যার অতিরিক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি।

১। কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৫০০।

সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বড় বড় আবিষ্কারগুলিকে সামরিক যন্ত্রের কাজে নিযুক্ত করছে এবং ধ্বংস ও নির্মূল করার উপকরণে রূপান্তরিত করছে। মার্কস লিখেছেন যে বুর্জোয়ারা ব্যক্তিবিশেষকে, এমনকি সমগ্র জাতিকে রক্ত ও ক্লেদ, দারিদ্র্য ও অপমানের কঠিন পথ পরিক্রমা করতে বাধ্য ক'রে অগ্রগতি অর্জন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুগে এই বিচার পুনরায় সত্য প্রমাণিত হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র তার বিকাশের শিখরে পেঁছয় এবং সেই সঙ্গেই আবার মানুষের প্রতি, মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমতার প্রতি, তার নৈতিক ও শৈল্পিক চেতনার প্রতি বৈরিতা উদ্ঘাটিত করে।

কোনও কোনও বুর্জোয়া মতাদর্শবিদের কাছে এই সত্য গোপন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন সাংবাদিক ও টফ্‌লার তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ শিরোনামায় লেখা পুস্তক ক্ল্যাশ উইথ্ দা ফিউচার এ লিখেছেন যে সমাজের বর্তমান ধনতান্ত্রিক সংগঠনে দ্রুত কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি দ্বারা মুক্ত শক্তিগুলি মানুষকে ধ্বংস করার বিপদ সৃষ্টি করে। ধনতন্ত্রের বদলে অপর কোনও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা টফ্‌লার অস্বীকার করেননি, কিন্তু একমাত্র সমাজতন্ত্রই যে এ-ধরনের ব্যবস্থা এনে দিতে পারে সেই উপলব্ধি থেকে তিনি অনেক দূরে। এরিখ কাহ্‌লার তাঁর দা মিনিং অব হিস্ট্রি নামক পুস্তকে লিখেছেন অতিযান্ত্রিবাদী সভ্যতা যান্ত্রিক বর্বরতায় অধঃপতিত হচ্ছে। কাহ্‌লার বলেছেন, মানুষ প্রকৃতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি ক'রে নিজের উপর ও নিজের চরিত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তবে কাহ্‌লার অযৌক্তিকভাবে ধনতন্ত্রের আমলে অগ্রগতির বিরোধমূলক চরিত্রকে সকল মানব ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যরূপে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন।

অনেক বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ একদিকে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি এবং অপরদিকে ক্রমবর্ধমান "নরখাদকীয় নৈতিকতা"র মধ্যেকার মীমাংসার অতীত সংঘাতের কথা লেখেন, কিন্তু তাঁরা এই বাস্তব সংঘাতকে ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ভুলে যান।

চার বা আরও বেশি শতাব্দীব্যাপী অস্তিত্বকালে ধনতন্ত্র অপরাপরদের

তুলনায় কিছু জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে বিরাট তফাত সৃষ্টি করেছে। উপনিবেশবাদ এক-একটা গোটা মহাদেশকে জড়তায় নিমজ্জিত করেছে। ধনতন্ত্রের আমলে অগ্রগতির বিরোধমূলক চরিত্রের দরুন অনেকগুলি দেশে জনগণের তিন-চতুর্থাংশের বেশি নিরক্ষর। এই সব দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির তুলনায় ১০ থেকে ১২ গুণ নীচে ছিল এবং এখনও আছে; আর কয়েকটি দেশে গড় আয়ু বড় জোর ৩০ বছর।

ধনতন্ত্র মানবজাতির আরও অগ্রগতিকে বাধা দিচ্ছে, সকল মানুষের স্বার্থে মানুষের প্রতিভার অলৌকিক সৃষ্টির, পরাক্রান্ত শক্তি উৎপাদক ক্ষমতার ব্যবহারে বাধা দিচ্ছে। যতদিন ধনতন্ত্র থাকবে ততদিন ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ বাস্তব আশঙ্কা হিসাবে থেকে যাবে।

ধনতন্ত্রের পরিবর্তিত চরিত্র, সমাজতন্ত্রে অথবা সমাজতন্ত্রের মত কিছুতে শান্তিপূর্ণভাবে "রূপান্তর" সম্পর্কে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী এবং শোধনবাদীদের দাবি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনের, বিকাশের একটি নতুন ও উচ্চতর পর্যায়ে মানুষের আরোহণে বাধাদানকারী সামাজিক শক্তিগুলির ও পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অবলোপ সাধনের প্রয়োজনের আবশ্যকতা দূর করতে পারে না।

আধুনিক ইতিহাসের অগ্রগতি কোনও "পরিশুদ্ধ" ধনতন্ত্রবাদে অথবা তাকে কেউ অন্য যে নামই দিক না কেন তাতে নিয়ে যায় না, "মিশ্র সমাজ যা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করতে পারে বলে অনুমান করা হয় তাতে নিয়ে যায় না, বরং ধনতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের সম্পূর্ণ বিলোপসাধনে নিয়ে যায়।

৪. সমাজতন্ত্রের আমলে ইতিহাসের অগ্রগতির পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ

মানুষের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ইতিহাসের অগ্রগতিকে বিরোধমূলক রূপ থেকে, সামাজিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত করে। মার্কস লিখেছেন: "সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অগ্রগতিকে সেই বিকট পৌত্তলিক দেবমূর্তি যা নিহতের মাথার খুলি ছাড়া অপর কিছুতে অমৃত পান করে না, তার

অনুরূপ আর দেখায় না।"(১) এই সময় থেকে অগ্রগতি কিছু কিছু শ্রেণী ও জাতির স্বার্থে অথবা অপরদের ক্ষতি ক'রে ঘটবে না। সমগ্র সমাজের জন্য তা ফলপ্রসূ হবে। উৎপাদিকা শক্তিগুলির, বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ, সামাজিক সম্পত্তির বৃদ্ধি সমাজের সকল সদস্যদের বৈষয়িক অবস্থার প্রতিনিয়ত উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক স্তরের উন্নয়ন সূচিত করে। এই ঘটনাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের সৃষ্টিশীল কাজকর্মকে বৈষয়িকভাবে ও নৈতিকভাবে উৎসাহিত করে। শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, সাংস্কৃতিক সৃজনে, আত্মিক জীবনে অগ্রগতি সমগ্র জনগণের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। এই আগ্রহই সমাজতন্ত্রের আমলে সমাজ বিকাশের বর্ধিত গতি সুনিশ্চিত করে।

সমাজতন্ত্র শুধু মানবজাতির ক্রমোচ্চ বিকাশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি নয়, সেই সঙ্গে তা এমন একটি যুগের শুরু যেখানে সমাজের অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন ও সর্বাত্মক হয়।…"জনজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠকে ও পরে সমগ্র জনগণকে ঘিরে একমাত্র সমাজতন্ত্রই হবে এক দ্রুত, খাঁটি ও প্রকৃত ব্যাপক অগ্রগমনের শুরু।"(২)

এই বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে সম্পূর্ণ রূপায়িত হয়েছে। পশ্চিমের কোনও চিন্তাশীল তত্ত্ববিদ আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের অতি দ্রুত বিকাশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। ১৯৫৯ সালে এমেট জে. হিউজেস লিখেছেন, "এক দশক আগেও কেউ ভাবতে পারত যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি এই নতুন যুগে আমেরিকার বিপুল পদক্ষেপের পেছনে পেছনে খুব কাছাকাছি ধেয়ে চলতে সক্ষম হয় তা হলেই একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ওরকম অল্পসল্প কিছু করেনি, …অতিকায় হয়ে সেই-ই গতিবেগ স্থির করে দিয়েছে, অন্যদের তাকে অনুসরণ করতে হচ্ছে।"(৩)

দ্রুত অগ্রগতির প্রকৃত সম্ভাবনার উৎস হল সমাজতান্ত্রিক বিকাশের

পরিকল্পিত ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক চরিত্র এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির নেতৃত্বে জনসাধারণের সচেতন ও উদ্দেশ্যময় কার্যকলাপ।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের আমলে সমাজের অগ্রগতির গতি ও স্থায়িত্ব চরিত্রের দিক থেকে স্বয়ংক্রিয় নয়। তখনও এমন অনেক বিষয় থাকে যা সম্পূর্ণভাবে সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের দ্রুত, সুসমঞ্জস ও সর্বাত্মক বিকাশ অর্জন করতে হলে সকল সামাজিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনব্যবস্থা নিখুঁত করার, স্বেচ্ছাসেবাবাদী অথবা অন্য কোনও ধরনের ভুল না করার, পশ্চাদপদ, রক্ষণশীল ও আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রচার চালানর এবং নতুন সমাজের নির্মাণ কার্যের বিভিন্ন বিভাগ থেকে অযোগ্য লোকদের তাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে।

অন্য যে কোনও সমাজের মতই সমাজতন্ত্রের বিকাশও কোনও বিরোধ ছাড়া, কতকগুলি গুরুতর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা ছাড়া ঘটতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের একটি জটিল সামাজিক কাঠামোর আবির্ভাব ও বিকাশ ব্যাপক জনগণের পক্ষ থেকে সংগঠিত প্রচেষ্টা দাবি করে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রামে বিপুল অন্তর্দৃষ্টি ও অধ্যবসায় দাবি করে।

অবশ্য সমাজতন্ত্রের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে বিরোধগুলির সমাধান তার বিকাশের অগ্রগতিতে অবদান করে। কিন্তু এ কোনও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়। সমাজতন্ত্রের বিকাশ, কমিউনিজমের দ্বিতীয় পর্যায়ে তার ক্রমশ উত্তরণের সঙ্গে জড়িত হল উদ্ভূত হওয়ার মত যে কোনও বিরোধকে সঠিকভাবে ও সময়মত বুঝতে পারা এবং সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা।

সমাজতন্ত্রের সমালোচকরা দাবি করেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রেই অগ্রগতি অর্জিত হয় এবং তা ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে না। বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রই কোটি কোটি মানুষকে সচেতন ঐতিহাসিক সৃজনশীলতায় উন্নীত করেছে, সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটিয়েছে এবং ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের উচ্চতম সাফল্য হল যৌথভাবে কাজ করার চেতনায় ও নতুন মানবিকতাবাদী ও নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ

এক নতুন ধরনের মানুষের আবির্ভাব, এমন মানুষের আবির্ভাব যারা কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি সক্রিয়ভাবে অনুরক্ত ও সবচাইতে অগ্রসর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের ও কমিউনিজমের বিজয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের অগ্রগতির গতি আরও বৃদ্ধি পাবে। সামরিক জিনিসপত্র ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে বর্তমানে যে বিপুল সম্পদের অপব্যয় হয় তাকে গোটা মানবজাতির স্বার্থে শান্তিপূর্ণ সৃজনশীল লক্ষ্যগুলি রূপায়ণের কাজে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ব্যক্তিগত উপরওয়ালাদের জন্য কাজ করার প্রথার অবসান, উৎপাদনে অরাজকতা ও অর্থনৈতিক সংকটের মূলোৎপাটন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত আবিষ্কারগুলির দ্রুত প্রয়োগ, বিশ্ব অর্থনীতির পরিকল্পিত ও সমানুপাতিক বিকাশ, বিশেষ জ্ঞান অর্জন ও সহযোগিতা ইতিহাসের বিকাশের জন্য ব্যাপকতম সম্ভাবনা খুলে দেবে।

সমাজতন্ত্রের জয়লাভ ঐতিহাসিক প্রগতির শেষ সীমা নয়। উৎপাদিকা শক্তিগুলির অবিরত ও ক্রমাগত বৃদ্ধি সমাজ-জীবনের ও মানবিক বিকাশের সকল দিকের আরও উন্নতির ভিত্তি হয়ে উঠবে। কমিউনিজম কোনও শেষ সীমা নয়, বরং প্রকৃত মানব ইতিহাসের শুরু।

৫. সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে ইতিহাসের অগ্রগতির সমস্যা

সমাজতন্ত্রের যুগ যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত আরও বেশি বেশি বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ অগ্রসরমান ঐতিহাসিক বিকাশের ধারণা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন। এমনকি বিগত শতাব্দীতেও পল লাফার্গ ন্যায়-সঙ্গতভাবেই ঘোষণা করেছিলেন: "ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক মঞ্চে সর্বহারাদের আবির্ভাব বুর্জোয়াদের মধ্যে এই সংশয় এনে দিয়েছে যে তাদের সামাজিক প্রাধান্য আর কতকাল চলবে। প্রগতিশীল অগ্রগতি তার মোহিনীশক্তি হারিয়েছে।"(১)

১। পি. লাফার্গ, লে দিতার্মিনিজমে ইকোনোমিক দ্য কার্ল মার্কস, প্যারী, ১৯২৮, পৃষ্ঠা ১৭।

আধুনিক বুর্জোয়া তত্ত্ববিদদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই ভয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধ্বংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধের কথা উল্লেখ করে, সেগুলিকে নিয়তির মত অনিবার্য হিসাবে দেখিয়ে, "বিপজ্জনক ঘটনাবলী" হিসাবে সামাজিক বিপ্লবগুলির মূল্যায়ন করে বহু বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ দাবি করে যে মানবজাতি উপরে উঠছে না, নীচে নামছে এবং এমনকি বিপর্যয়ের দিকে চলেছে। এই মিথ্যা ও হতাশাবাদী সিদ্ধান্তকে অবশ্যম্ভাবী জনসংখ্যাধিক্য এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লবের পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের জৈব অধঃপতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা হয়।

ভাববাদী সমাজতত্ত্বের কয়েকজন প্রবক্তা অগ্রগতির ধারণাটির জায়গায় "পরিবর্তনের" নিরপেক্ষ ধারণাটিকে বসাতে চেষ্টা করে। তারা একথা ধরে নেয় যে সমাজ-জীবনে যেহেতু প্রগতিশীল ও অবনতিশীল এই উভয় গতিই চলতে থাকে সে অবস্থায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কোনও সাধারণ অগ্রগমনের কথা বলা অসম্ভব।

ইতিহাসের অগ্রগতিকে অস্বীকার করা ইতিহাসের বিকাশের বিধিশাসিত চরিত্রকে অস্বীকার করার সঙ্গে যুক্ত। ইতিহাসের যদি কোনও বিষয়গত বিধান না থাকত (যা বহু পশ্চিমী সমাজতত্ত্ববিদ দাবি করেন), তাহলে ইতিহাসের অগ্রগতির বিধানের কথাটা বলা উদ্ভট।

সমাজ-জীবনের এই ব্যাখ্যা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আমেরিকান ঐতিহাসিক জর্জ জি. আইগারস সিদ্ধান্ত করেছেন: "অগ্রগতির ধারণাটিকে আমরা এখন কেবল কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন সহই মেনে নিতে পারি। অগ্রগতির এখনও পর্যন্ত একটি অনুমান মাত্র এবং তাও রীতিমত সংশয়াচ্ছন্ন।"(১) আইগারসের মতে—মানব জীবনের উন্নয়নের সম্ভাবনার উপরই কেবল আমরা ভরসা রাখতে পারি।

ঐতিহাসিক তথ্যগুলির খুশিমত ব্যাখ্যা এবং যা সর্বোচ্চ, প্রয়োজনীয় ও বিধিশাসিত সে সম্পর্কে সামাজিক বিকাশের পরম্পরাকে বাতিল করার প্রবণতাগুলির মধ্যেকার বিরোধের বাইরে আর কিছু দেখতে পাওয়ার অক্ষমতা বহু বুর্জোয়া তত্ত্ববিদকে এই ভুল ধারণায় নিয়ে যায় যে অগ্রগতি

১। জর্জ জি. আইগারস, দা আইডিয়া অব প্রগ্রেস: এ ক্রিটিকাল রিঅ্যাসেসমেন্ট, দা আমেরিকান হিস্টরিকাল রিভিউ, ১৯৬৫, ভল্যুম ৭১, নং ১ পৃষ্ঠা ১৬।

কোনও বৈজ্ঞানিক ধারণা নয়, তা কেবল তথ্যাবলীর একটা নীতিশাস্ত্রসিদ্ধ মূল্যায়ন, যা সমস্ত নীতিশাস্ত্রসিদ্ধ মূল্যায়নের মধ্যে তথাকথিতভাবে অন্তর্নিহিত বিষয়ীবাদ ও আপেক্ষিকবাদের দ্বারা কলুষিত।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিরোধ-সংকুলতাকে অস্বীকার করা দূরে থাক, মার্কসবাদ তাকে উদ্ঘাটিত করে এবং একথা মেনে নেয় যে সাধারণ অগ্রগমনের প্রক্রিয়ার মধ্যে পশ্চাদগমন এবং সেই সঙ্গে বৃত্তাকারে আবর্তনশীল বিকাশের কিছু উপাদানও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মানবজাতি তার প্রগতিশীল শক্তিগুলির রূপে শুধু উৎপাদনের উপকরণগুলিকে নিখুঁত করে না, সেই সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে, সমাজের আত্মিক সম্পদ ও নৈতিকতার মানকেও নিখুঁত ক'রে তোলে। কোনও দূর-পূর্বপুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক (Atavistic) ঘটনা প্রজন্মের বিবর্তনের তত্ত্ব উল্টে দেয় না। ওই একই নিদর্শন অনুযায়ী অবনতিশীল, পশ্চাদগামী গতি (ফ্যাশিবাদ, ধ্বংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধ) মানবজাতির সাধারণ প্রগতিশীল গতির সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না।

সামাজিক অগ্রগতির ধারণার বিরোধী কিছু ব্যক্তি বহির্বিশ্বকে তাদের যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে অবশ্য অগ্রগতির ধারণাটিকে প্রয়োগ করা যায় না। "অগ্রগমন", "পশ্চাদগমন", "প্রগতিশীল" ও "অবনতিশীল" ইত্যাদির মত ধারণাগুলি মহাশূন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে গোটা গোটা জগতের জন্ম হয় ও ধ্বংস হয়, যেখানে পদার্থের বিকাশ "আরোহণ" ও "অবরোহণ" এই উভয় ধারাই অনুসরণ করে এবং পদার্থের কাঠামোগুলি একীভবন ও খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া পাশাপাশিই ঘটে। সমাজ-জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে মহাশূন্যের বিকাশের চরিত্র ও গতিমুখকে এক ক'রে দেখা অসম্ভব।

সমসাময়িক ভাববাদী সমাজতত্ত্বের অপরাপর প্রবক্তারা সামাজিক অগ্রগতির জায়গায় শাশ্বত চক্রাকারে ঘূর্ণনের ধারণাটিকে বসাতে চেষ্টা করেন। এই ধারণার সমর্থকরা বলেন যে মানবজাতি কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায় এবং নতুন ক'রে যাত্রা শুরুর জন্য যেখান থেকে যাত্রা করেছিল সেখানে ফিরে যায়।

কোনও লোক যদি অবশ্য খুশিমত তথ্যের ব্যাখ্যা করে তবে সে ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট সমাজের সঙ্গে আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থাকে এক বলে মনে করতে পারে, প্রাচীন বিশ্বের "ধনতন্ত্র"কে খুঁড়ে বের করতে পারে। সমাজ-তান্ত্রিক সাম্যকে গোড়ার যুগের ক্রিশ্চিয়ান কমিউনের "সাম্যের" প্রত্যাবর্তন বলে উপস্থিত করতে পারে এবং তারপর ঘোষণা করতে পারে যে সবকিছুরই পুনরাবৃত্তি ঘটে, সবই ফিরে আসে এবং দুনিয়ায় নতুন কিছুই নেই। এই সব দাবির ভিত্তি হল ভাসাভাসা আনুষ্ঠানিক আংশিক সাদৃশ্য এবং এগুলি নিতান্তই বিষয়ীবাদী। পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিতে ক্রমাগত প্রত্যাবর্তনের ধারণা সব ইতিহাসের চক্রাকারে বিকাশের ধারণাটি প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে নেওয়া হয়নি, নেওয়া হয়েছে ধর্মীয় কল্পনা থেকে। মানুষের ইতিহাসকে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হিসাবে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা সমাজ বিকাশের যে পর্যায়গুলি অতীতে পর্যবসিত হয়েছে সেগুলিকেই চিরস্থায়ী করার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত।

আমরা যদি জ্যামিতি দিয়ে ইতিহাসের গতিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করি, তবে আমাদের চক্রের কথা বলা উচিত নয়, বলা উচিত শৃঙ্খলের (spiral) কথা, যা আরোহণ করার সময়ে শুধু দৃশ্যত প্রারম্ভিক অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করে। প্রত্যেকটি নতুন ঐতিহাসিক পর্যায় যা কিছু সেকেলে ও প্রতিক্রিয়াশীল সে সব বাদ দেবার সময় একই সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলির সকল সাফল্যকে রক্ষা করে ও উন্নত করে। এ শুধু পুরানো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়াই বাতিল করে না, সেই সঙ্গে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাল ঠোকাও বাতিল করে।

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, সব সাংস্কৃতিক সম্পদ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, এক জাতি থেকে আর এক জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। এমন সব সম্পদ আছে যা কেবল একটি সভ্যতার কাঠামোর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় এবং যে সমাজ সেগুলিকে সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গেই চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। মানবজাতির ইতিহাসে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন, অনন্য সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়েছে এবং পরবর্তী সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় কিছুই অথবা প্রায় কিছুই অবদান করেনি। এই ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ অনপেক্ষ ক'রে তুলে কয়েকজন বুর্জোয়া দার্শনিক কতকগুলো ভ্রান্ত

তত্ত্ব খাড়া ক'রে মানবজাতির ইতিহাসকে এমন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সভ্যতার সহ-অবস্থান হিসাবে উপস্থিত করে যেগুলি পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান, সম্পদ-বিনিময়, অপরাপর জাতির সাংস্কৃতিক, বৈষয়িক ও মননগত সাফল্যকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন ছাড়াই উদ্ভূত হয়, বিকশিত হয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এই ধরনের একজন তত্ত্ববিদ, জার্মানির অসওয়াল্ড স্পেংলার লিখেছেন: "সরলরেখায় বেষ্টিত বিশ্ব-ইতিহাসের একঘেঁয়ে ছবির বদলে···আমি বহু-সংখ্যক প্রবল সংস্কৃতি দেখি···এর প্রত্যেকটির নিজস্ব ভাবধারা, নিজস্ব ভাবাবেগ, নিজস্ব জীবন, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি আছে:এবং পরিশেষে নিজস্ব মৃত্যু আছে।"(১)

এইভাবে স্পেংলার সভ্যতাগুলির গুণগত পৃথকীভবনের উপর মনোনিবেশ করেছেন এবং যা কিছু ওই সভ্যতাগুলিকে সংযুক্ত করে ও একত্রিত করে সে সবকে তাচ্ছিল্য করেছেন। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলির ঐক্য ও ক্রমোচ্চ বিকাশকে অস্বীকার করার জন্য এই হল তাঁর বক্তব্য। সভ্যতার বিকাশে ধারাবাহিকতার ছেদকে অনপেক্ষ ক'রে তুলে স্পেংলার ধারাবাহিকতার উপাদানকে, সভ্যতাগুলির মধ্যেকার জন্মগত ধারাবাহিক সংযোগকে অস্বীকার করেন। স্পেংলারের ঠিক পরে পরে জার্মান দার্শনিক কার্ল জ্যাসপার ও বিশেষত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি নিজ নিজ কায়দায় সভ্যতা-গুলির গুণগত অনন্যতাকে অনপেক্ষ ব্যাপারে পরিণত করেছেন এবং সেগুলির মধ্যেকার ধারাবাহিক যোগসূত্রগুলিকে এবং এক সভ্যতা কর্তৃক অপর সভ্যতার সাফল্যগুলিকে নিজস্ব নির্দিষ্ট কায়দায় আত্মস্থ ক'রে নেওয়াকে মুছে দিয়েছেন।

ইতিহাসের দর্শনে এই প্রবণতাটি, যা সামাজিক ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়া-গুলির অনন্যতার উপর জোর দেয়; তার পাল্টা কিছু বুর্জোয়া তত্ত্ববিদ ও দার্শনিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিকে অনপেক্ষ ক'রে তোলেন। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ পিতিরিম সোরোকিন মানুষের বিকাশকে পর্যবসিত করেন কতকগুলি সামাজিক-সাংস্কৃতিক অত্যুচ্চ ব্যবস্থার জায়গায় অনুরূপ

১। অসওয়াল্ড স্পেংলার, ডেয়ার উনটেরগাং : ডেস আবেন্ড লান্ডেস, খণ্ড ১, মুয়েনশেন, বেক, ১৯২৪, পৃষ্ঠা ২৭-২৮।

অন্য ব্যবস্থার চক্রাকারে ক্রমাগত আবির্ভূত হওয়ার মধ্যে। এই রকম ঐতিহাসিক আবর্তনে "অগ্রগতি" ও "পশ্চাদগতি"র ধারণাগুলিকে যে প্রয়োগ করা যায় না তা তো স্বাভাবিক।

সমসাময়িক সব বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ সাধারণভাবে অগ্রগতিকে অস্বীকার করেন না। তাঁদের কয়েকজন সেইসব ক্ষেত্রে প্রগতিশীল পরিবর্তন মেনে নেন, যেখানে সেগুলিকে গুণগতভাবে প্রকাশ করা যায় এবং যেখানে মূল্যগুলির প্রশ্নাতীত ঐক্য থাকে। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ রেমঁদ আর' বিশ্বাস করেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এরূপই ঘটে। একই সঙ্গে আবার তিনি এই যুক্তিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারণাকে অস্বীকার করেন যে অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ অর্থনীতি যে অধিকতর ন্যায্যভাবে সংগঠিত হবেই এমন কোনও কথা নেই। এই শেষোক্ত দাবিতে কোনও প্রতিবাদ উঠত না যদি আর'-এর মনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অথবা আরও সঠিকভাবে বললে ধনতান্ত্রিক সমাজের কথা থাকত। এ-ঘটনা সত্য যে এ-ধরনের সমাজে বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যগুলির কোনও ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ধনতন্ত্রই ইতিহাসের শেষ নয়। ধনতন্ত্রের স্থান দখল করবে একটি শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ, যে সমাজ শুধু আরও উচ্চতর উৎপাদই অর্জন করবে না, সেই সঙ্গে তার ভিত্তিতে উচ্চতম ন্যায্যতা অনুযায়ী অর্থাৎ ব্যক্তির প্রয়োজনের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন সামগ্রী বণ্টন করবে। আর' রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রেও অগ্রগতিকে অস্বীকার করেন। তিনি ধরে নেন যে "বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থাকে একই সমস্যার বিভিন্ন সমাধান রূপে গণ্য করা যায়। এক শাসন থেকে অন্য শাসনে উত্তরণ, মন্দ থেকে ভালয় অথবা নিম্নতর থেকে উচ্চতরে উত্তরণ নয়। একটা সমাধান থেকে অপর একটা সমাধানে উত্তরণ, আর এর প্রত্যেকটিরই কিছু গুণ ও কিছু ত্রুটি থাকে।"(১) এই সব যুক্তি অনুসারে বলা যায় একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে একটি ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রে উত্তরণ এবং পাল্টাভাবে ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে উত্তরণ "ভাল থেকে মন্দে এবং মন্দ থেকে ভালয় উত্তরণ" নয়। দৃশ্যত, দুটি সমাধানেরই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এই ধরনের

১। রেমঁদ আর', দিক্স-হুইত লেকনস সুর লা সোসাইতে ইন্দুস্ত্রিয়েলে, প্যারী, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৮৬।

মুক্তি সেখানেই সম্ভব যেখানে ইতিহাসের অগ্রগতিকে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের পরিবেশের, জনগনের মৌলিক স্বার্থের, ব্যক্তির প্রকৃত অধিকার ও বিকাশের অপরাপর পরিবেশের, ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় না, এমন সব খেয়াল-খুশিমাফিক মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা হয় যা সব কিছুরই ন্যাযাতা প্রমাণ করায় ও সব কিছুকেই নিন্দা করায় ব্যবহৃত হতে পারে।

বর্তমান যুগে কোটি কোটি লোক সামাজিক ও জাতীয় মুক্তি অর্জন করছে বলে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদদের পক্ষে ইতিহাসের অগ্রগতির ধারণাটিকে অস্বীকার করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তাদের অনেকে এখন অগ্রগতিকে স্বীকার করে নিচ্ছে, কিন্তু অগ্রগতির সারমর্ম, গতিমুখ, পরিচালিকা শক্তি-সমূহ ও মানদণ্ডকে মৌলিকভাবে বিকৃত করছে। সামাজিক হতাশাবাদীদের বিপরীতে তারা প্রমান করার চেষ্টা করে যে ধনতন্ত্র তার বিকাশের পথে অগ্রসরমান এবং এখনও সামাজিক প্রগতির মূর্ত প্রতীক হয়ে রয়েছে।

এই সব ভুয়ো-আশাবাদীরা বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট সুগভীর দ্বন্দ্ব ও সামাজিক বিপর্যয়গুলিকে লুকোতে পারে না; কিন্তু তারা ধরে নেয় যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার গতিপথে ধনতন্ত্রের সব "অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি" অতিক্রম করা যাবে এবং তা আর শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ হিসাবে থাকবে না ও সর্বজনীন মঙ্গলের সমাজে পরিণত হবে। বাস্তব জীবন এই সামাজিক কল্পস্বর্গের মুখোশ নির্মমভাবে খুলে দেয়। ধনতন্ত্র অনেক দিন যাবৎ এমন একটি শক্তি হয়ে উঠেছে যা সামাজিক প্রগতিকে বাধা দেয়, সমগ্র সমাজের স্বার্থে উৎপাদিকা শক্তিগুলির সুসমঞ্জস বিকাশ হতে দেয় না।

বহু বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ যারা ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতিকে এক ক'রে দেখে এবং সমাজতন্ত্রকে অগ্রসরমান ঐতিহাসিক বিকাশের রাজপথ থেকে একটি বিচ্যুতি হিসাবে গণ্য করে, তারা ধনতান্ত্রিক সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য ও তাকে চিরস্থায়ী করার জন্য বলপ্রয়োগকে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য উপায় বলে মনে করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে অতীতের কোনও সেকেলে ব্যবস্থা কখনও বলপ্রয়োগ ক'রে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, সামাজিক প্রগতির নতুন স্তরে উত্তরণে ইচ্ছুক মানুষকে টেনে নামাতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী বলপ্রয়োগের চরম রূপগুলিও সোভিয়েত

ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভকে, অপরাপর বহু দেশের ধনতন্ত্র থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসাকে এবং বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবকে ব্যাহত করতে পারেনি।

যেসব শক্তি ধনতন্ত্রকে দুর্বল করেছে সেগুলি কাজ ক'রে চলেছে। আয়ত্তগত সর্বরকম পন্থা অবলম্বন ক'রে ধনতন্ত্র টিকে থাকতে চাইছে। ধনতন্ত্র সুবিধাদান, উপর থেকে সংস্কার এবং ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশনের সর্বাপেক্ষা চাতুর্যপূর্ণ রূপগুলির সঙ্গে বলপ্রয়োগকে সংযুক্ত করে। অর্থনৈতিক সংকটকে বিলম্বিত করার ও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টায় আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র অর্থনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপের, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে পরিকল্পনা ও পূর্বাভাসের কিছু কিছুর উপাদানকে প্রয়োগ করার পন্থা অবলম্বন করে। আত্ম-সংরক্ষণের এই সব ও অপরাপর ব্যবস্থা সাময়িক ফল দেয়; কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে অভিশপ্ত একটা ব্যবস্থার ভিতরকার গভীর অন্তর্বিরোধগুলিকে, বিশেষত উৎপাদনের ক্রম-বর্ধমান সামাজিক চরিত্র ও আত্মসাতের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের মধ্যেকার এবং শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার গভীর বিরোধগুলিকে দূর করতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক ও জাতীয় অসমতা বাড়িয়ে তোলে। সাম্রাজ্যবাদ সকল মানুষ ও সকল জাতির মধ্যে বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদগুলির ন্যায্য বণ্টনে বাধা দেয়, সমরবাদকে পরিপুষ্ট করে এবং ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক ও রক্তপিপাসু যুদ্ধ বাধায়। সামন্ততন্ত্রের শাসক শক্তিগুলির পক্ষ থেকে কোনও প্রচেষ্টাই নিজেদের পরাজয়কে ঠেকাতে পারেনি অথবা সমাজের একটি নতুন ও উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ আটকাতে পারেনি। একই অপরিবর্তনীয় ভাগ্য ধনতন্ত্রের জন্যও অপেক্ষা করছে। ঐতিহাসিক বিকাশের সমগ্র স্বাভাবিক গতিই মানবজাতিকে শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শন ও সমাজতন্ত্রের সমালোচনা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শন

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন বুর্জোয়া দার্শনিক চিন্তার নানাবিধ ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়েই বিকশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর দর্শনের ইতিহাস লেনিনের সেই সূত্রের নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে যে আধুনিক দর্শন ঠিক ২০০০ বছরের আগেকার দর্শনের মতই সমান পক্ষাবলম্বী এবং বিবদমান পক্ষগুলি হল বস্তুবাদ ও ভাববাদ।(১) যদিও এই শতাব্দীর গোড়ায় যে সব দার্শনিক চিন্তার ধারা ও প্রবণতা ফ্যাশানদুরস্ত ছিল নতুন সব ভাববাদী প্রবণতা তাদের জায়গা দখল করেছে, যদিও বুর্জোয়া দর্শন দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নগুলির অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে, তবু তার জ্ঞানের পদ্ধতি বিজ্ঞানগত ভিত্তি ও শ্রেণী সারমর্ম বরাবর যা ছিল তাই আছে। অপরপক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং পরবর্তী কালে অপরাপর দেশে বিজয় এবং সব নিয়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন বুর্জোয়া দর্শনের মতদর্শগত অঙ্গীকার অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে, সমাজতন্ত্রের দুনিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার যে অবিশ্রান্ত মতাদর্শগত যুদ্ধ চালাচ্ছে বুর্জোয়া দর্শন তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আধুনিক বুর্জোয়া দর্শন বিকাশের বর্তমান স্তরে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরোধগুলির অনন্য প্রতিফলন যোগায়। মার্কসবাদী সামাজিক বিজ্ঞানে এই বিরোধগুলির সার সংকলন করা হয়েছে ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের ধারণার মধ্যে। এই সংকট হল অর্থনীতি ও রাজনীতির, সংস্কৃতি ও মতাদর্শের, বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক ও বুর্জোয়া ব্যক্তির সংকট। দর্শন যা হল মতাদর্শের একটা প্রধান অংশ তার মধ্যে কোনও না কোনও ভাবে এর প্রতিফলন হতে বাধ্য।

১. ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট এবং সমসাময়িক ভাববাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সমস্ত বিরোধগুলির তীব্রতা তিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। তাদের চূড়ান্ত উৎস হল উৎপাদনের সামাজিক

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৩, পৃষ্ঠা ৩৫৮।

চরিত্র এবং আত্মসাতের ব্যক্তিগত পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ। এর সঙ্গে জড়িত থাকে সামাজিক বিরোধগুলির একটা গোটা ব্যবস্থা—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধ। ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগে এই সব বিরোধ এমন তুঙ্গে উঠেছে যে বুর্জোয়ারা কোনও একটি দেশেই হোক আর বিশ্ব পরিসরেই হোক সামাজিক প্রগতির পুরোভাগে থাকতে তাদের অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়া মতাদর্শের মৌলিক আপ্তবাক্য, বিশেষ ক'রে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার "চিরস্থায়িত্ব", "স্বাভাবিকত্ব", "যুক্তিযুক্ততা" ইত্যাদির ধারণাগুলি জনগণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দ্বারা অপদস্থ হয়ে গিয়েছে, এখন বুর্জোয়া মতাদর্শবিদদের চেষ্টা করতে হবে সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক সমাজের "রোগে"র লক্ষণগুলিকে ব্যাখ্যা করার এবং ধনতন্ত্রের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণের জন্য সেই ব্যাখ্যাগুলিকে যথাসম্ভব ব্যবহার করার।

মার্কসবাদী তত্ত্ব যেখানে ধনতন্ত্রের বিরোধগুলির তীব্রতাবৃদ্ধিকে আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানের যথাযথ ধারণার ভিতর দিয়ে উপস্থিত করে, সেখানে বুর্জোয়া দর্শন ধনতন্ত্রের সংকটকে "আধুনিক মানুষের সংকট", "এ-যুগে আত্মিক সংকট", "প্রযুক্তিবিদ্যাগত সভ্যতার সংকট" ইত্যাদি হিসাবে উপস্থিত করে। ভাষান্তরে বললে বুর্জোয়া দর্শন এই সব ব্যাপারের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রকে অগ্রাহ্য করে, ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎকে সমগ্র মানবজাতির ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের সঙ্গে এক ক'রে দেখায়। বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা ধনতান্ত্রিক গঠনের অবনতিকে (আর তাদের পক্ষে এই গঠনের জীবন তাদের নিজেদেরই জীবন) "বিশ্ব-সংস্কৃতির পতন", "সভ্যতার গোধূলি" ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা করেছে। নতুন সামাজিক সম্পর্কগুলির অনিবার্য বিজয় সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় অযৌক্তিক "সক্রিয়বাদ" (অ্যাকটিভিজম), যা নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধের ডাক দেয় তা থেকে নৈরাশ্যবাদী অদৃষ্টবাদ এবং ভগবানের উপর নির্ভরশীলতার ওজর পর্যন্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি বহুল পরিমাণে নির্ধারিত হয়েছিল ধনতন্ত্রের স্থায়ী ও সুদীর্ঘকালব্যাপী সামাজিক প্রগতি নিশ্চিত করার ক্ষমতা সংক্রান্ত মোহের দ্বারা। বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া মতাদর্শ-

দিগুদের এরকম মোহ মোটেই নেই। এখন তারা ধনতন্ত্রের মারাত্মক বিরোধগুলি সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন, এগুলির অপরিহার্য সংঘাত এতই সুস্পষ্ট যে আশাবাদ একটা বিরত ভাবে পরিণত হয়। কিন্তু এই সব সংঘাতের উৎস হিসাবে দেখান হয় "মানুষ"কে, মানুষের "আত্মা"কে, যা "নিজের ভিতর থেকেই" সামাজিক বাস্তবতার বিরোধগুলির জন্ম দেয়। আমেরিকান ধর্মীয় পার্সোন্যালিস্ট (সব কিছু ব্যক্তিগততে বিশ্বাসী) দার্শনিক এডগার এস. ব্রাইটম্যান লিখেছেন: "ব্যক্তিগত দুনিয়া হল সংঘাতের দুনিয়া—ভিতরকার ও বাইরেকার দুইয়েরই। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের সঙ্গে মারাত্মক সংঘাতে লিপ্ত, জানে না কি ক'রে থামতে হবে।···সবচেয়ে খারাপ হল প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তার ভিতরকার সংঘাত। আত্মার সংঘাতে দীর্ণ তার কামনা, তার জ্ঞান, তার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার; তার দুর্বলতা; তার সবলতা, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা; তার ভয়; তার নির্মমতা, তার বিবেকের দরুন।"(১) ব্রাইটম্যান কর্তৃক প্রস্তাবিত মুক্তির উপায় ধর্মের মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে; তাঁর মতে—তাতেই উৎপীড়িত আত্মার শান্তি আসতে পারে। আরও বেশি সংসারাভিজ্ঞ দার্শনিক ধারণাগুলি ভগবানের কাছে খোলাখুলি আবেদন এড়িয়ে ধনতান্ত্রিক বাস্তবতার সংঘাতগুলিকে ব্যাখ্যা করে সাধারণভাবে মানবিক সম্পর্কগুলির সারমর্মের প্রকাশ হিসাবে, ফলত তারা মুক্তির কোনও পথ দেখতে পায় না।

সামাজিক জীবনের নিয়ামক সত্য হিসাবে সংঘাতের অপরিহার্যতা স্বীকারই হল ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকট ও বুর্জোয়া দার্শনিকদের দ্বারা তার অপব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। বে-আক্কেল ব্যাখ্যার দিন চলে গিয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা সংকট থেকে বেরোনর পথ আবিষ্কার করতে, সংকট কাটিয়ে ওঠার বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী ও উপায়ের হদিশ দিতে অক্ষম।

বুর্জোয়া দর্শনের সংকটের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল বিজ্ঞান সম্বন্ধে এর মনোভাবে মৌলিক পরিবর্তন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর

১। এডগার শেফিল্ড ব্রাইটম্যান, নেচার অ্যান্ড ভ্যালুজ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৫. পৃষ্ঠা ৬৬।

বিপ্লবী বুর্জোয়াদের মতাদর্শবিদরা যেখানে বৈজ্ঞানিক দর্শন থেকে অগ্রসর হত এবং মানুষের যুক্তির শক্তিতে বিশ্বাস করত, সেখানে অনেক সমসাময়িক বুর্জোয়া দার্শনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিকে বর্জন করার প্রস্তাব দেয়। জার্মান দার্শনিক ম্যাক্স শেলার লিখেছিলেন: "বিজ্ঞান—যত বেশি গুরুত্ব দিয়ে, কঠোরভাবে ও বদ্ধ ধারণা ত্যাগ ক'রে তাকে সাধারণভাবে বোঝা হোক ও ব্যবহার করা হোক না কেন, একটা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা ও প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে মূলত তার আদৌ কোনও তাৎপর্য নেই।"(১) কিন্তু এর নিহিতার্থ কি? আর আমাদের "বিজ্ঞানের শতাব্দী"তে এ শিক্ষা কেন প্রচার করা হবে যে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই?

সর্বোপরি বুর্জোয়া দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে, বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিষয়গত সামাজিক পূর্বাভাসের একটা হাতিয়ার দেখতে পায় যা ধনতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসের ইঙ্গিত দেয় এবং মানবজাতির সামনে কমিউনিস্ট সম্ভাবনার নিশ্চয়তা ঘোষণা করে। সেই কারণেই তারা একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে এমন কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব "থাকতে পারে না" যা সামাজিক বিকাশের বিধান উদ্ঘাটিত করে। সমসাময়িক ব্রিটিশ দার্শনিক কার্ল পপার লিখেছেন: "তত্ত্বগত ইতিহাসের সম্ভাবনা অর্থাৎ এমন একটা ঐতিহাসিক সামাজিক বিজ্ঞান যা তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার মত হবে তার সম্ভাবনা আমাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে ঐতিহাসিক বিকাশের এমন কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থাকতে পারে না।"(২)

এখানে আমরা আর একটা প্রশ্নে আসছি যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতি আধুনিক ভাববাদের মনোভাব বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটেছিল তার ব্যাখ্যার দ্বারাও নির্ধারিত হয়। এই বিপ্লব ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগুলিতে একটা সংকট এনে দিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি মূলত যান্ত্রিক ধরনের ছিল এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বাস্তবতার প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘাটন করার মত নিখুঁত করতে হবে এই ধারণা থেকে অগ্রসর হত। একথা বিশ্বাস

১। ম্যাক্স শেলার, গেজামেলটে ভেরকে, খণ্ড ৬, বার্ন, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ১৭।
২। কার্ল আর, পপার, দা পভার্টি অব হিস্টোরিসিজম, বোস্টন, ১৯৫৭ পৃষ্ঠা

করা হত যে বিজ্ঞান বিশ্বের একটা সম্পূর্ণ বিরোধ-বিহীন চিত্র তৈরি করার পথে, আর সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের একমাত্র কর্তব্য হল নিখুঁত বিস্তারিত বিবরণ বসিয়ে যাওয়া। সাধারণভাবে পৃথিবী হল অবিভাজ্য ও অপরিবর্তনীয় অণুসমূহের সমাহার, মহাকাশে এই সব অণুর যান্ত্রিক গতি সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সারমর্ম। এই চিত্রের যথার্থতা, সর্বজনীনতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হত বিজ্ঞানের মর্যাদার দ্বারা।

অবশ্য নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সহ যে কোনও জ্ঞানই আপেক্ষিক সত্য, আর এ এমন একটা জিনিস যা আধিবিদ্যকভাবে চিন্তায় অভ্যস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে পারত না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে বিপ্লবের ফলস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর দুনিয়ার প্রাকৃতিক চেহারা আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি এক নতুন চেহারার জন্য জায়গা ছেড়ে দিল, তা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই সত্যকে সঠিক প্রমাণ করল। কিন্তু যে দ্রুততা ও অপ্রত্যাশা নিয়ে পৃথিবীর এক চেহারা অপর চেহারাকে স্থানচ্যুত করল তা কিছু গুরুত্বসম্পন্ন ও প্রভাবশালী বিজ্ঞানী সহ বহু বিজ্ঞানীকে বস্তুবাদী জ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করায় প্রবৃত্ত করল। বিষয়গত সত্যে বিজ্ঞানের অধিকার অস্বীকার করা এবং একটা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বিজ্ঞানের তাৎপর্য সম্বন্ধে সন্দেহবাদী অবমূল্যায়ন এখনও পর্যন্ত বুর্জোয়া দর্শনের উপর আধিপত্য করছে এবং তার প্রতিজ্ঞাগুলির চরিত্রকে নানা দিক থেকে নির্ধারিত করছে।

বিজ্ঞান যদি পৃথিবীর এমন একটা চিত্র উপস্থিত করতে না পারে যা বিষয়গত সত্য ও বাস্তবতার সঙ্গে সংগতির দাবি করতে পারে, তবে দর্শনও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিষয়গতভাবে অর্থপূর্ণ সামান্যীকরণের দাবি করতে পারে না। আধুনিক পজিটিভিস্টরা যুক্তি দেয় যে "বিশ্বতত্ত্ব হওয়ার বদলে দর্শনকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জ্ঞানের তত্ত্বে পরিণত হতে হবে। দর্শনকে শেষ পর্যন্ত কোনও তত্ত্ব বা মতবাদ হওয়া আদৌ চলবে না, পরিণত হতে হবে একটা ক্রিয়ায়, যার আধেয় হবে বিজ্ঞানের ভাষায় বিশ্লেষণ এবং চিরকালের জন্য তাকে নিজের "আধিবিদ্যক" (দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি) দাবি বর্জন করতে হবে।

অযৌক্তিকতাবাদীরা (ইররাশনালিস্ট) একটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নেয়।

বিজ্ঞান বিমূর্ততাগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট এবং যা কিছু ব্যক্তিগত ও জরুরী তাকে সচেতনভাবে বাদ দেয়, ফলত মানবিক অস্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করে না—এই ধারণা থেকে অযৌক্তিকতাবাদীরা বলে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে এগোতে হবে "জীবনের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণতা" থেকে। দর্শনকে বিজ্ঞান হলে চলবে না; হতে হবে "একটা পৃথক ধরনের চিন্তা, এমন চিন্তা যা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডেকে নেয়, আমাকে জাগ্রত করে, আমাকে আমার নিজের কাছে নিয়ে যায় ও আমাকে পরিবর্তিত করে",(১)—একথা লিখেছেন জার্মান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কার্ল জ্যাসপারস। বিজ্ঞান হল কেবল কতকগুলো প্রতীকের সংগ্রহ যা বাস্তব সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলতে পারে না। ভাববাদ ও অজ্ঞেয়তাদের দ্বারা প্রভাবিত কিছু বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এ স্বীকৃতি ধর্মীয় দার্শনিকদের কাছে কতখানি সৌভাগ্যের ব্যাপার! এই দার্শনিকেরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত টানল যে ধর্মীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির সামনেকার দিগন্ত অসীম। বিজ্ঞান যদি বিমূর্ত প্রতীকের বাইরে না যায় এবং সাধারণ সূত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তবে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ার কাজটা ধর্মের উপরই ছেড়ে দেওয়া যায় এবং ছেড়ে দেওয়া উচিত; হাজার হলেও ধর্মের পিছনে যুগযুগান্তের মানব-ইতিহাসের স্বীকৃতি রয়েছে।

সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনের মূল প্রবণতাগুলি যেগুলি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দার্শনিক তাৎপর্য অস্বীকার করে; যথা—আধুনিক পজিটিভিজম (নয়া-পজিটিভিজম), ইর‍্যাশনালিজম এবং ধর্মীয় দর্শন, সেগুলির উদ্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানকে তাচ্ছিল্যকারী অজ্ঞেয়বাদ ও ভাববাদ থেকে। অবশ্য একথা বলা যায় না যে বিংশ শতাব্দীর সব কটি ভাববাদী দার্শনিক চিন্তাই এগুলির মধ্যে সমাবিষ্ট। এই সব চিন্তার নানা বিভিন্নতাই আবার বুর্জোয়া দর্শনের সংকটকে প্রতিফলিত করে, এমনকি একটা আংশিকভাবে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতেও বুর্জোয়া দর্শনের অক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। তা সত্ত্বেও উপরোক্ত প্রবণতাগুলি সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনের সমস্ত প্রধান রূপকেও সেই সঙ্গে অগৌণ, অন্তবর্তী প্রবণতাগুলিকেও প্রতিভাত করে।

১। কার্ল জ্যাসপারস, এক্সিস্টেনৎস ফিলজফি, ৩ আউফলাগে, বার্লিন, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১০।

২. ভাববাদী "বিজ্ঞানের দর্শন" হিসাবে নয়া-পজিটিভিজম

১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে পজিটিভিজম দর্শন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের পর তাদের দ্বারা বিপ্লবী ক্রিয়ার বস্তুবাদী, জ্ঞানালোক-বিকিরণকারী ভাবধারাগুলিকে প্রত্যাখ্যানই হল পজিটিভিজমের সামাজিক উৎস। অনুমান-ভিত্তিক "বিজ্ঞানের বিজ্ঞান" হিসাবে দর্শনের সম্ভাবনা (জার্মান চিরায়ত দর্শনের মত) সম্বন্ধে মোহমুক্তি এর তাত্ত্বিক ভিত্তি যুগিয়েছিল। পজিটিভিজমের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসী দার্শনিক অগাস্তে কোমতে পজিটিভিজমকে দেখেছিলেন মানবিক চিন্তার বিবর্তনের শেষ পরিণতি হিসাবে। তাঁর মতে—এই চিন্তা "ধর্মতত্ত্বগত স্তর" থেকে "আধিবিদ্যক" ও তারপর "পজিটিভ" (ইতিবাচক) স্তরে পৌঁছেছে। তিনি মনে করেছিলেন, প্রথম স্তরে বাস্তবকে স্বর্গীয় সত্তাদের উপর নির্ভরশীল করা হয়, দ্বিতীয় স্তরে এই সব ধর্মীয় ভাবধারার জায়গা দখল করে ঘটনা ও ব্যাপারগুলির "সারমর্ম" ও "কারণগুলি" সংক্রান্ত একটা অনুমান-ভিত্তিক মতবাদ, এবং তৃতীয় স্তরে "মানব মন অনপেক্ষ জ্ঞান অর্জনের অসম্ভবতাকে স্বীকার করে,…ঘটনাবলীর বিধানসমূহ অর্থাৎ ঘটনাবলীর সঙ্গতি ও সাদৃশ্যের অপরিবর্তনীয় সম্পর্কগুলি আবিষ্কারে ব্যাপৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে মহাজগতের উৎস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তদন্তের ও ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কারণগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের চিন্তা বর্জন করে।" একেবারে গোড়া থেকেই পজিটিভিজম বিধানগুলিকে ঘটনাবলীর (phenomena) সারমর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করত না (ঘটনাবলীকে অজ্ঞেয় বলে গণ্য করা হত); মনে করত ঘটনাবলীর বাইরেকার সঙ্গতি ও সাদৃশ্যের পরিচায়ক হিসাবে। এই সঙ্গতি ও সাদৃশ্য পরে ব্যাখ্যাত হয়েছিল ঘটনাবলীর বিষয়গতভাবে বিরাজমান আন্তঃসম্পর্ক হিসাবে নয়, সেগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করার বিষয়ীগত উপায় হিসাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর পজিটিভিজম বিজ্ঞান সম্পর্কে আপাত শ্রদ্ধার সঙ্গে

১। কমতে'জ সোশিওলজি অ্যাজ ইণ্টারপ্রেটেড বাই রিগোলাগে, সেণ্ট পিতার্সবুর্গ, ১৮৯৮, পৃষ্ঠা ২-৩ (রুশ ভাষায়)।

জ্ঞানের একটা তত্ত্বের সমন্বয় ঘটাত, যে তত্ত্ব ইচ্ছা ক'রে জ্ঞানের সীমা বেঁধে দিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে এই পজিটিভিজম সম্পূর্ণ প্রমাণসিদ্ধ বলে মনে করত (যদিও সেগুলির স্থান দিত বাইরেকার ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে, সারমর্মের ক্ষেত্রে নয়); অনুমান-নির্ভর ক'রে দর্শনকে দাঁড় করানর এ ছিল বিপরীত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে অনপেক্ষ ক'রে ফেলাটাই ছিল পজিটিভিজম-এর প্রথম ঐতিহাসিক রূপের সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরবর্তী বিপ্লব একে মরণ আঘাত দিল।

পজিটিভিজম-এর দ্বিতীয় ঐতিহাসিক রূপ—রিচার্ড আভেনারিউস ও এনস্ট ম্যাখ-এর (ম্যাখিজম) অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক সমালোচনা (এম্পিরিও ক্রিটিসিজম) প্রকৃতি ও সমাজের সবচেয়ে সাধারণ বিধান আবিষ্কৃত হয়েছে বলে পূর্বসূরীদের যে দাবি ছিল তাকে অগ্রাহ্য করল এবং দর্শনকে জ্ঞানের একটা বিষয়ীগত-ভাববাদী তত্ত্বে পর্যবসিত করল। ম্যাখ বললেন—জ্ঞান হল অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতির, অনুভূতির সঙ্গে ভাবমূর্তির এবং ভাবমূর্তির সঙ্গে ভাবমূর্তির সংযোগ সাধন। অনুভূতিকে মনে করা হল মানুষের আয়ত্তের মধ্যেকার একমাত্র "বাস্তবতা" হিসাবে অথবা যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সে সবের "উপাদানসমূহ" হিসাবে। পজিটিভিজমের এই রূপের সংকট আসতে বেশি দেরি হল না, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই এসে গেল। এ ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিপ্লব গভীরতর হওয়ার অনিবার্য পরিণতি। এই বিপ্লবের দরুণ বস্তুর কণিকা আবিষ্কৃত হল যাকে অনুভূতি বলে ব্যাখ্যা করা গেল না, কারণ সেগুলির অস্তিত্ব যুক্তিভিত্তিক তাত্ত্বিক গবেষণার মারফত প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস—কালের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ম্যাখবাদের এই মতবাদকে স্থানচ্যুত করল যুক্তিসিদ্ধ (লজিকাল) পজিটিভিজম বা নয়া-পজিটিভিজম।

নয়া-পজিটিভিজম আবির্ভূত হল এই শতাব্দীর গোড়ায়, যখন গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার বিরাট সাফল্য দার্শনিক গবেষণায় তাকে প্রয়োগ করার ভাবনা জাগাল।

নয়া-পজিটিভিজম-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বললেন: "বিশুদ্ধ দর্শনের পক্ষে অতি নিকট ভবিষ্যৎ সেই রকমের একটা সময় হবে গণিতের নীতিসমূহের অধ্যয়নের পক্ষে সাম্প্রতিক দশকগুলি যে

রকমের হয়েছিল।"(১) এই ভিত্তিতে রাসেল প্রস্তাব করেছিলেন যে দর্শন তত্ত্বগত বিশ্বাসগুলির মোট যোগফল নয়, একটা মতবাদ নয়, এ হল ক্রিয়া—যা তৈরি হয় বিজ্ঞানের ভাষার বিশ্লেষণ দিয়ে ও যার উদ্দেশ্য থাকে দর্শনের মধ্যে থেকে সমস্ত "আধিভৌতিক বিবৃতি ও বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বাদ দেওয়া, অর্থাৎ সেই সমস্ত বিচার ও ধারণা বাদ দেওয়া যেগুলি মানবিক চেতনা থেকে স্বাধীনভাবে আপনাআপনি বিরাজমান জগৎ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান দাবি করে।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের, বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলির এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের কাঠামোর বিশ্লেষণ দর্শনের অত্যাবশ্যক কাজ। দর্শন চিরকালই বিজ্ঞানের কতকগুলি মৌলিক ধারণা (যথা—কারণতত্ত্ব, প্রয়োজনীয়তা, বিধান, বিষয় ইত্যাদি) সম্বন্ধে চিরকাল অনুশীলন ক'রে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা অসম্ভব। কিন্তু এই ধারণাগুলির কেবল আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রণালীবদ্ধ করার পক্ষে তাদের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে দর্শন নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যাপারগুলির মধ্যেকার সংযোগের প্রতিফলক চিন্তার রূপ হিসাবে ধারণাগুলির বিষয়গত তাৎপর্যকে আবিষ্কার করাই হল দর্শনের সর্বোপরি চেষ্টা।

নয়া-পজিটিভিজম কিন্তু বিজ্ঞানের প্রধান ধারণাগুলির বিষয়গত তাৎপর্য সম্পর্কে এই ধরনের তদন্তকে বর্জন করে "আধিভৌতিক" ব'লে, বিষয়ীগত অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে "মেকি-সমস্যা" ব'লে।

নয়া-পজিটিভিজম অর্ধ শতাব্দীর বেশী চালু হয়েছে। এর ইতিহাস হল বিভিন্ন রকমফেরের পরপর পরাজয় ও একের জায়গায় অপরের আসা। গোড়ায় এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এ ছিল "লজিকাল অ্যাটমিজম" যা বিশ্বের কাঠামোকে গাণিতিক যুক্তির কাঠামোর সঙ্গে এক ক'রে দেখত। রাসেল ও হোয়াইটহেড তাঁদের <u>প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামাটিকা</u> বইয়ে এই

১। [বি. রাসেল], দা লেটেস্ট ওয়ার্ক'স ইন দা ফাণ্ডামেণ্টালস অব ম্যাথেমাটিকস বইয়ের নিউ আইডিয়াজ ইন ম্যাথেমাটিকস, ভলুম ১, পেত্রোগ্রাদ ১৯১৭, পৃষ্ঠা ১০৩ (রুশভাষায়)।

কথাই বিস্তারিত লিখেছেন। তারপর এল ভিয়েনা সার্কল-এর যৌক্তিক (লজিকাল) পজিটিভিজম। বৈজ্ঞানিক বিবৃতিকে "আধিভৌতিক" (দার্শনিক) বিবৃতি থেকে পৃথকভাবে চেনার উপায় হিসাবে "অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই"-এর নীতির উপরই এরা দার্শনিক গবেষণাকে কেন্দ্রীভূত করল। পরে এর জায়গা নিল তাৎপর্যগত (সেমানটিক) পজিটিভিজম, তারা যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের জায়গায় বসাল তাৎপর্যগত বিশ্লেষণকে (শব্দের অর্থের বিশ্লেষণকে)। তারপর এল ভাষাগত দর্শন যা প্রাত্যহিক স্বাভাবিক ভাষার প্রকাশগুলিকে যাচাই করায় আত্মনিয়োগ করল।

নয়া-পজিটিভিজম সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা এখন ভিয়েনা সার্কল-এর মতামতকে বিচার করব। এদের মতামতই আধুনিক নয়া-পজিটিভিজম-এর চিরায়ত প্রকাশ। ভিয়েনা সার্কল বিশের দশকে আত্মপ্রকাশ করে; এর কেন্দ্র ছিলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরোহ-সিদ্ধান্তভিত্তিক বিজ্ঞানসমূহের দর্শন বিভাগের প্রধান। এই সার্কল-এর প্রধান ছিলেন মরিৎস শ্লিক, আর এর সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রুডলফ কারনাপ, অটো নয়েরাথ, ভিক্টর ক্রাফট প্রমুখ। বার্লিনের সোসাইটি অব এম্পিরিকাল ফিলজফির সদস্যরাও (হান্স রাইখেনবাখ, ভালটার ডুবিশ্লাভ) অনুরূপ মতে উপনীত হয়েছিলেন। লবভ-ওয়ারস গোষ্ঠীর লোকেরাও (কাজিমিয়েরজ, আইদুকিয়েউইজ, এল. ফিস্তেক) এই মতেরই শরিক ছিলেন। ব্রিটেনে ভিয়েনা সার্কল-এর মতের পরিপোষক হয়েছিলেন এ. জে. আইয়ার। ভিয়েনা সার্কল ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। নাৎসী জার্মানির অস্ট্রিয়া দখল করার পর এর সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনে আশ্রয় নিল। ফলত সে সব জায়গায় নয়া-পজিটিভিজম নতুন উৎসাহ পেল। যে যৌক্তিক বিশ্লেষণকে ভিয়েনা সার্কল-এর সদস্যরা তাদের মৌলিক দার্শনিক প্রক্রিয়া হিসাবে নিয়েছিল তার সারমর্মকে নিম্নোক্তরূপে সার-সংকলন করা যায়। বিজ্ঞান দু' ধরনের বিবৃতি নিয়ে তৈরি: যৌক্তিক-গাণিতিক (বিশ্লেষণমূলক, পুনরুক্তিমূলক) এবং অভিজ্ঞতাজনিত (তথ্যমূলক)। যেমন ২ × ২ = ৪ এই বিবৃতিটি পুনরুক্তিমূলক, অর্থাৎ একে ৪ = ৪ এই বিবৃতিতে পর্যবসিত করা যায়। "সমস্ত কুমাররা অবিবাহিত" এই বিবৃতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য, কারণ আমরা যদি অভিধান

থেকে কুমার শব্দের অর্থ খুঁজে ওই শব্দটির বদলে বসাই তা হলে দাঁড়ায় "সমস্ত অবিবাহিত পুরুষেরা অবিবাহিত"। বলতে গেলে এই ধরনের বিবৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যৌক্তিক কাঠামো হিসাবে কাজ করে। তাদের বিচারের মানদণ্ড হল আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যার বিধানসমূহ। পক্ষান্তরে "এই ঘরে চারটে চেয়ার আছে" বা "সমস্ত কুমারেরা খামখেয়ালি" এই বিবৃতিগুলি অভিজ্ঞতাজনিত, কারণ ঘরের চেয়ারগুলি সংখ্যা গুণে বা কুমারদের অভ্যাস অনুশীলন ক'রে এগুলিকে যাচাই করা যায়। আর সমস্ত বিবৃতি হল হয় ভ্রান্ত; বাক্যগঠনের নিয়মাবলী লঙ্ঘন ক'রে তৈরি, নয় (যদি সেগুলিকে হয় পুনরুক্তিমূলক নয় অভিজ্ঞতাজনিত বলে প্রমাণ করা না যায়) "আধিভৌতিক", অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকভাবে অর্থহীন।

কারনাপ এই ভাবটিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেন: "আমি সেই সব প্রতিজ্ঞাকে "আধিভৌতিক" আখ্যা দেব যেগুলি এমন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান দাবি করে যা সকল অভিজ্ঞতার বাইরে বা তার অতীত; অর্থাৎ জিনিসের প্রকৃত সারমর্ম সম্বন্ধে; আপনাতে আপনি জিনিস; অনপেক্ষ, অথবা সেই ধরনের কিছু সম্বন্ধে।...

"থেলস বলেছিলেন 'পৃথিবীর সারমর্ম ও নীতি হল জল'; হেরাক্লিটাস বলেছিলেন 'আগুন'।...

"একনীতিবাদীদের (মনিস্ট) কাছ থেকে আমরা শুনি: 'একটাই মাত্র নীতি আছে যার উপর যা কিছু আছে সব প্রতিষ্ঠিত', কিন্তু দ্বিনীতিবাদীরা (ডুয়ালিস্ট) বলে: 'দুটি নীতি আছে'। বস্তুবাদীর বলে: 'যা কিছু আছে সারমর্মের দিক থেকে সে সব হল বস্তু'; কিন্তু আধ্যাত্মবাদীরা বলে 'যা কিছু আছে সে সব হল আধ্যাত্মিক।'...'বিশ্বের নীতি হল জল'—এই প্রতিজ্ঞা থেকে আমরা এমন কোনও প্রতিজ্ঞায় পৌঁছতে পারি না যা ভবিষ্যতের পক্ষে আশা করা যায় এমন কোনও উপলব্ধি বা অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে জোর দিয়ে তুলে ধরে।"(১)

ভাষান্তরে বললে—নয়া-পজিটিভিজম সমস্ত দার্শনিক সমস্যাকে বিশেষ

১। রুডলফ কারনাপ, লজিক্যাল পজিটিভিজম—বোস্টনের মর্টন হোয়াইট কর্তৃক সংকলিত এজ অব অ্যানালিসিস বইয়ে, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ২১২-২১৩।

ক'রে দর্শনের মৌলিক প্রশ্নাবলীকে "আধিভৌতিক" আখ্যা দেয় এবং ফলত বিজ্ঞানের আওতা থেকে তাদের বাদ দিয়ে দেয়।

এ অবশ্যই একটা ভ্রান্ত মত। দর্শন হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামান্যীকরণ এবং সামাজিক ব্যবহারের উপাত্ত। যেমন—"…সমস্ত খাদ্য আর্দ্র এবং উত্তাপ নিজেও আর্দ্র থেকেই জন্মায় ও তার দ্বারাই জীবন্ত থাকে (আর জিনিস যা থেকে জন্মায় তাই সমস্ত কিছুর নীতি)"(১) এই ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে থেলস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে জিনিসের সারমর্ম হল জল। কাজেই এ ছিল আদিম বৈজ্ঞানিক অনুমান, 'আধিভৌতিক' উদ্ভট কল্পনা নয়। অনুরূপভাবে দ্বন্দ্বমূলক-বস্তুবাদী একনীতিবাদকেও নয়া-পজিটিভিজম "আধিভৌতিকে"র কোঠায় ঠেলে দিয়েছিল। যদিও এ একটা তত্ত্ব যা "দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য বিকাশ" (এঙ্গেলস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু নয়া-পজিটিভিস্টরা তাকে না সত্য, না মিথ্যা, কিন্তু "আধিভৌতিক", অর্থহীন আখ্যা দিয়ে এক ঝটকায় "উড়িয়ে" দিল।

অবশ্য যে সব বিবৃতি যাচাই করা যায় না তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দর্শনের কোনও মূল্য নেই। তবে এরকম কোনও দার্শনিক তত্ত্ব আদৌ ছিল না; এমনকি কিছু কিছু দার্শনিক যদি দাবি করেও থাকে যে তাদের প্রতিজ্ঞাগুলি অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। আসল কথা হল তারা তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সামাজিক অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ কিভাবে করেছিল। সেই কারণে যখন আমরা দার্শনিক মতগুলিকে বিচার করি তখন তাদের পৃথক পৃথক প্রতিজ্ঞা এবং গোটা ব্যবস্থাটা দুইয়ের যথার্থতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলতে পারি।

নয়া-পজিটিভিস্টরা অভিজ্ঞতাজনিত প্রতিজ্ঞাগুলিকে "আধিভৌতিক" বিবৃতিগুলি থেকে তফাত করে যাচাইয়ের ভিত্তিতে। নয়া-পজিটিভিস্টদের দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই হল বিবৃতিটিকে কতকগুলি সীমিত সংখ্যক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা ("অনুভূতি উপাত্ত", পর্যবেক্ষণ), অথবা সেই সব অভিজ্ঞতা যাতে বিধৃত হয়েছে এমন আর একটি বিবৃতির সঙ্গে তুলনা। অর্থাৎ কোনও বিবৃতিকে তুলনা করা হয় কতকগুলি অনুভূতি সম্পর্কিত বিবৃতির সঙ্গে।

কাজেই নয়া পজিটিভিস্টরা ইংরেজ দার্শনিক বার্কলে ও হিউম কর্তৃক সূত্রায়িত জ্ঞান সম্বন্ধে বিষয়ীগত-ভাববাদী তত্ত্বের মৌলিক ভাবকে পুনরুজ্জীবিত করে, যা হল : আমরা আমাদের চেতনায় অবস্থিত তথ্য অথবা সেই সব তথ্য সম্বন্ধে বিবৃতি ছাড়া কিছু জানিনে, জানতে পারিনে।

যাচাইয়ের নীতি একটি প্রাথমিক নীতি এবং তা বিজ্ঞানে বাস্তবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের যখন "বৃষ্টি পড়ছে" এই বিবৃতিটি যাচাইয়ের দরকার হয় তখন আমরা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি। কিন্তু নয়া-পজিটিভিস্টরা যেভাবে এই প্রাথমিক পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করে "মননশীল পুলিশে"র দর্শনগত নীতি হিসাবে যে স্থির করবে বিজ্ঞানের দ্বারা কিসের বিচার হতে পারে বা পারে না এ থেকে সঙ্গে সঙ্গেই তার ত্রুটি বোঝা যায়। যে কোনও সাধারণ বিবৃতি আমাদের ভাষায়, যেমন "আর্সেনিক বিষাক্ত" "উত্তপ্ত হলে জিনিসের আকার বাড়ে", "সিজার রুবিকন পার হয়ে গিয়েছিলেন" (অর্থাৎ এমন জায়গায় গিয়েছিলেন যে আর ফেরার উপায় ছিল না)—এই তিনটি বিবৃতির কোনওটিই কেবল পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাচাই করা যায় না। প্রথমটির জন্য পর্যবেক্ষণের একটা অসীম পরম্পরার দরকার হয়, আর তৃতীয় বিবৃতিটি আগেই ঘটে যাওয়া ঘটনা; কাজেই পর্যবেক্ষণ করার আর সুযোগ নেই। তার মানে কি এগুলি "আধিভৌতিক"? আর এই ধরনের বিবৃতিকে বিজ্ঞান থেকে বের ক'রে দেবার সাহস কার আছে?

উপরন্তু যাচাই করার এই নীতিটির যাচাই হবে কি করে? তা করার কোনও উপায় নেই, তার মানে এটা নিজেই একটা "আধিভৌতিক" নীতি এবং একে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে বের ক'রে দেওয়া উচিত; আর কঠোরভাবে চালু করলে বিজ্ঞানে এর প্রয়োগ একে কেবল "আধিভৌতিকের" সকল রেশ থেকেই মুক্ত করবে না, বিজ্ঞান থেকেই মুক্ত করবে। বৈজ্ঞানিক বিধানগুলি অনুভূতিজনিত যাচাইয়ের (অনুভূতির সাক্ষ্য দিয়ে তুলনার) প্রতি সাধারণ দার্শনিক বিবৃতিগুলির মতই সমান "অ-সংবেদনশীল।"

যাচাইয়ের নীতি এত সমালোচনার সম্মুখীন হল যে তার বদল করতে হল, সুর নামিয়ে দিতে হল। নয়া-পজিটিভিস্টরা এখন বলে যে কোনও বিবৃতি যদি নীতিগতভাবে যাচাইযোগ্য হয় তবে তা অভিজ্ঞতাজনিত, অর্থাৎ

বৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু যাচাইয়ের নীতির এই সুর নরম করায় পার পাওয়া যায় না। কতকগুলি জ্ঞান আজ পরীক্ষিত হতে পারে না, কিন্তু পর্যবেক্ষণের উন্নত শৈলীর দ্বারা আগামীকাল সেগুলিকে আমরা পরীক্ষা করতে পারি। যথা—অগাস্ত কোমতে মহাজাগতিক পদার্থ-গুলির রাসায়নিক গঠনকে "আধিভৌতিক" বলে মনে করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে "নীতিগতভাবে" তা প্রমাণ করা যায় না। তাঁর মৃত্যুর দু বছর পরে বর্ণালীগত বিশ্লেষণ আবিষ্কৃত হল।

এইভাবে যাচাইয়ের নীতির দার্শনিক তাৎপর্য ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হল, ফলত নয়া-পজিটিভিজমের মর্যাদাও কমে গেল। সংশ্লিষ্ট অসুবিধাগুলির সমাধান করতে না পেরে নয়া-পজিটিভিজম সঙ্গতিকে (coherence) সত্যের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করল, অর্থাৎ একটা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সংযুক্ততা ও বিরোধ-বিহীনতাকে মানদণ্ড স্থির করল। নয়া-পজিটিভিস্টদের মতে—সঙ্গতি ব্যবস্থাটির যুক্তিসিদ্ধ সত্য এবং ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অভিধা ও ধারণাগুলি উভয়কেই নিশ্চিন্ত করে।

অতএব জ্ঞান (cognition) ভাষাগত প্রকাশের একটি বদ্ধ চক্র হয়ে দাঁড়ায় এবং ক্রমশ তার বিষয়গত তাৎপর্য হারায়। আয়ার লিখেছেন: "যা আমরা কখনও করতে পারব না তা হল ভাষার কাঠামো থেকে বাইরে যাওয়ার এবং পৃথিবীকে কোন্ ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল ক'রে বর্ণনা করছে তা বোঝার জন্য সেই সুবিধাজনক অবস্থান থেকে বিচার করা।"(১) এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দর্শন হল কেবল ভাষার সঙ্গে জড়িত,হয় গাণিতিক যুক্তির প্রথাসিদ্ধভাবে খাড়া করা ও স্বীকৃত ভাষা, নয় দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত স্বাভাবিক ভাষা।

কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে ভাষার মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তবে দর্শন চারপাশের দুনিয়াকে বদল করার কোনও হাতিয়ার আর হতে পারে না। এমনকি ভাষাকেও বদল করার জন্য সে কিছু করতে পারে না। নয়া-পজিটিভিস্ট লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন লিখেছেন: "দর্শন কোনও অর্থেই ভাষার বাস্তব ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, চূড়ান্ত বিচারে সে কেবল এর

১। এ. জে আয়ার, ফিলজফি অ্যান্ড সায়েন্স, ভোপ্রাসি ফিলজফি, ১নং, ১৯৬২ পৃষ্ঠা ১০৩।

বর্ণনা দিতে পারে। কারণ সে একে কোনও ভিত্তি দিতে পারে না। যা যেমন আছে তাকে তেমনিই রেখে দেয়।"(১) এই শেষ বাক্যটি ইচ্ছাকৃত-ভাবেই হোক আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, নয়া-পজিটিভিজমের সামাজিক সারমর্মকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছে। এ সত্যিই এমন একটা দর্শন যা সবকিছুকে যেমন তেমনিই রেখে দেয়। কোনও একজন বিশেষ নয়া-পজিভিস্টের নির্দিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক মত যাই হোক না কেন (আর অটো নয়েরাথ-এর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক থেকে শুরু ক'রে কার্ল পপার-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী মতামত পর্যন্ত এর হেরফের হয়), নয়া-পজিটি-ভিজমের বিষয়গত সামাজিক ভূমিকা হল দার্শনিক হতাশাবাদ ও নৈরাজ্যবাদ রোপণ করা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা। বার্টরাণ্ড রাসেল লিখেছিলেন: "দর্শন মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে বা জগতের ভাগ্য সম্বন্ধে কোনও সমাধান দেয় না বা দিতে চেষ্টাও করে না।"(২) দর্শন হিসাবে নয়া-পজিটিভিজমের নিজেকে গজদন্ত মিনারে আবদ্ধ ক'রে রাখার চেষ্টার বিষয়ে এই বিবৃতিটি উপরে উল্লিখিত ভিটগেনস্টাইনের বিবৃতির চেয়ে কম স্পষ্ট সাক্ষ্য নয়।

কিন্তু চিন্তাবিদদের সামনে জীবন যে সমস্ত সমস্যা উপস্থিত করে এটি তার একটা উত্তরও বটে, আর এ এমন একটা উত্তর যা বস্তুগুলির বর্তমান অবস্থাই মূলত মেনে নেওয়া দিয়ে গঠিত। অতএব পজিটিভিস্টদের মধ্যেকার রাজনৈতিক পার্থক্য হল ধনতান্ত্রিক সমাজকে কোনও না কোনও ভাবে যারা স্বীকার ক'রে নিয়েছে, এমন লোকেদের সাধারণ চেতনার ক্ষেত্রে পার্থক্য।

ম্যাখবাদের সামাজিক ভূমিকার চরিত্রায়ণ ক'রে লেনিন লিখেছিলেন যে "অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক সমালোচনার (empiric-criticism) বিষয়গত শ্রেণী-ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে নিহিত আছে, সাধারণভাবে বস্তুবাদ ও বিশেষভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে ফিডিয়িস্টদের (যাদের বিশ্বাস জ্ঞান সত্যের

এক মৌলিক ক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—সম্পাদক) সংগ্রামে তাদের বিশ্বস্ত সেবার ভিতর।"(১) নয়া-পজিটিভিজমের সামাজিক ভূমিকাও ওই একই। বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি নীতিগতভাবে অসম্ভব এই বক্তব্য আঁকড়ে থেকে নয়া-পজিটিভিজম একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে ধর্ম ও নাস্তিকতা উভয়েই সমানভাবে "খতিয়ে দেখার অতীত", ফলত এদের ভিতরকার বিরোধে বিজ্ঞানের কিছু করার নেই। কিন্তু বর্তমানে এতে ধর্মের কোনও অসুবিধা নেই; অসুবিধা কেবল নাস্তিকতার। ধর্ম ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে পরাস্ত করার কোনও চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে, "কেবল" তার দার্শনিক তাৎপর্য অগ্রাহ্য করছে। আর এইটিই একটি বিষয় যার সম্বন্ধে ধর্ম ও নয়া-পজিটিভিজমের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে।

দুটি বিবৃতির—একটি নয়া-পজিটিভিস্ট এ. আয়ারের ও অপরটি নয়া-টমিস্ট এফ. কোপেলস্টোনের—তুলনা করা যাক। ভাবধারার যে অভিন্নতা তাঁরা প্রকাশ করেন তা সুস্পষ্ট, তফাত কেবল ধর্মের সঙ্গে তাঁদের বিষয়ীবাদী সম্পর্কে—একটিতে সন্দেহবাদ, অপরটিতে ভক্তি; ধর্মানুরাগ।

এ. আয়ার: একথা লক্ষ্য করা যাক…ধর্ম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও যুক্তিসিদ্ধ বিরোধের ভিত্তি নেই। সত্য বা মিথ্যার প্রশ্নে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও ধর্মবিশ্বাসীর মধ্যে, যে তুরীয় ভগবানে বিশ্বাসী তার মধ্যে, কোনও বিরোধ নেই।

এফ. কোপেলস্টোন: এখন আমরা দেখছি যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে অর্থে বিগত শতাব্দীতে বিরোধকে বোঝা হত সে অর্থে বর্তমানে কোনও বিরোধ নেই এবং থাকতেও পারে না; কারণ স্বরূপ প্রকাশের অন্ধবিশ্বাসকে কোন প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করা যায় না।

এই একইভাবে ইররাশনালিস্ট দর্শনে "অত্যাবশ্যক অনুভূতি"র প্রকাশ দেখে নয়া-পজিটিভিজম এই কথা ব'লে তার ন্যায্যতা ঘোষণা করে যে "বৈজ্ঞানিক প্রাসঙ্গিকতার" দাবি এক্ষেত্রে খাটে না। নয়া-পজিটিভিস্ট "পক্ষপাতহীনতা" এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবস্থানের মধ্যে এই-ই তফাত। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ধর্মীয় ও ইররাশনালিস্ট দর্শন উভয়কেই কেবল বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে না, চেতনার মিথ্যা

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যুম ১৪ পৃষ্ঠা ৩৫৮।

ও বিকৃত রূপ বলে মনে করে। বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক দর্শনের বিচারের সামনে এদের হাজির করা হয় এবং বিচারে এরা নিন্দিত হয়। নয়া-পজিটিভিস্টদের ভাষার যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ অ-বৈজ্ঞানিক "আধিভৌতিকতা"কে জয় করার দাবি করলেও আসলে তা ধর্ম ও ইররাশনালিজম-এর দার্শনিক মিথ্যা দাবি-দাওয়ার কাছে আত্ম-সমর্পণ করে।

৩. সমসাময়িক ইররাশনালিজম (অযৌক্তিকতাবাদ), এক্সিস্টেনশিয়ালিজম (অস্তিত্ববাদ)

"যুক্তি-উন্মত্ততা সদয় অত্যাচার হয়ে উঠেছে"—গ্যোটের এই মন্তব্যে বিধৃত বিচার ধনতন্ত্রের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, বোধহয় আর কোনও সামাজিক গঠনের পক্ষে তা নয়। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার অযৌক্তিকতা, অসম্ভাব্যতা ঘোষণা করে যে দর্শন, সেই ইররাশনালিজম শুধু শুধু সমসাময়িক বুর্জোয়া চিন্তার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবণতাগুলির অন্যতম হয়ে ওঠেনি। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার নিজের বিরোধগুলির সমাধান করার অক্ষমতা বুর্জোয়া মতাদর্শবিদদের মাথায় এই ভাবধারার রূপে প্রতিফলিত হয়েছে যে মানুষ ক্ষমতাহীন, অনতিক্রম্য, অযৌক্তিক শক্তির অধীন।

সমসাময়িক ইররাশনালিজমের জন্ম হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিরিশ বছরের মত সময়ে, যখন তথাকথিত "জীবনের দর্শন" (নিৎশে, ডিলথে ও সিমেল জার্মানিতে, বের্গস ফ্রান্সে) রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল। বিশের দশকে এই প্রবণতা ম্যাক্স শিলার ও অসওয়াল্ড স্পেংলারকে আকৃষ্ট করল, তারপর আরও বিরাট একদল নকলকারীকে আকৃষ্ট করল যারা ফ্যাশিস্তদের "বিংশ শতাব্দীর জাদু"র সমর্থক ও প্রবক্তা হল। ইররাশনালিজমের পরবর্তী রূপগুলি কর্তৃক উত্তরাধিকার হিসাবে যাকে নেওয়া হয়েছিল সেই "জীবনের দর্শনের" মূল ভাব ছিল এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টির ভিত্তি রচনা করেছিল যে বস্তুর ধারণা তাকে হটিয়ে সেখানে অযৌক্তিক ধারা অথবা "আর্তি" (urge) হিসাবে "জীবনের" ধারণাকে বসান হোক, অপর দিকে বস্তুকে বুঝতে বলা হল "জীবনের" নির্বাপিত অবশেষ হিসাবে (বের্গস) অথবা শিলীভূত রূপ হিসাবে (সিমেল)। এই সব দার্শনিকদের মতে শিলাভূত বিমূর্ত ধারণা নিয়ে ক্রিয়াশীল এবং কেবল অনড়

"পদার্থসমূহ" নিয়ে কারবার করতে সমর্থ যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান কখনও "জীবন" বলে অভীহিত সেই পরিবর্তনশীল, প্রবহমান, বাস্তব, বিশিষ্ট বস্তুটিকে বুঝতে পারে না। যুক্তি "জীবনকে হত্যা করে, ছেঁড়া-কাটা করে, তার অবিশ্রাম গতিকে প্রতিহত করে। কাজেই জীবনকে জানার জন্য; বরং তাকে "মুঠোর মধ্যে আনার" জন্য চাই স্বতঃলব্ধ জ্ঞান অর্থাৎ "জীবনের" প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যা যুক্তি থেকে মৌলিকভাবে পৃথক হবে।

এখানে ইররাশনালিজম নিম্নোক্ত তথ্য থেকে এগোয়ঃ চিন্তা আসলে বাস্তবের মধ্যে ও তার গতিতে স্থূলতা আনে। ক্রমাগত গতিশীল ও পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল বস্তুময় গঠনগুলির অপরিসীম জটিল চিত্রকে চিন্তা সরলীকৃত ক'রে ফেলে। কিন্তু এ বৈজ্ঞানিক চিন্তার অমোঘ সীমাবদ্ধতার সাক্ষ্য নয়; এ তার বিকাশের দাবি, চিন্তার নতুন, আরও সূক্ষ্ম ও কার্যকর উপায় উদ্ভাবনের দাবি, অর্থাৎ দ্বান্দ্বিকতার দাবি। কিন্তু ইররাশনালিজম চিন্তার সীমাবদ্ধতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকে, দ্বান্দ্বিকতা যেখানে ধারণার সাহায্যে সুনির্দিষ্ট বাস্তবতাকে গতিশীল ও বিকাশমান অবস্থায় প্রতিফলিত করার উপায় আবিষ্কার করে, ইররাশনালিজম সেখানে যুক্তি ও বিজ্ঞান উভয়কেই পরিহার করে।

সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যায় ইররাশনালিজম বিশ্বাস করে যে এগুলি বস্তুগত বৈষয়িক উপাদান—যা মানুষ জানতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—তার বিকাশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, হয় রহস্যময় সহজাতবোধের দ্বারা, "ক্ষমতা-লালসার" দ্বারা, রহস্যময় "জীবনের আর্তির" দ্বারা—সংক্ষেপে অজ্ঞেয় অযৌক্তিক শক্তিসমূহের দ্বারা। ইতিহাসের গতিপথে সামাজিক প্রগতি যুক্তিযুক্ত ও সুসমঞ্জসভাবে প্রসার লাভ করবে উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া উদার-নীতিবাদের এই মোহকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা ও বিপর্যয় সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে দিল। এই মোহের জায়গা নিল সামাজিক অস্তিত্বের অর্থহীনতার, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যর্থতার একটা সুগভীর ক্লৈব্যের অনুভূতি।

"আমার কাছে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রতীক মনে হয় ফ্লানডার্সের সোচেৎস-এর নিকটস্থ সেই চিনির কারখানাটিকে যেটি যুদ্ধের সময়ে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে জার্মানদের দ্বারা ফরাসীদের কাছ থেকে পঞ্চাশবার

অধিকৃত হয়েছিল, এবং ফরাসীদের দ্বারা ততবারই পুনরধিকৃত হয়েছিল; উপরন্তু, প্রত্যেকবার কয়েকশ লোক নিহত অথবা আহত হয়েছিল এবং প্রত্যেকবার যারা টিকে গেল, তারা কখনও এ-পক্ষে, কখনও ও-পক্ষে মস্ত জয়ের ভেরী বাজিয়েছিল; আর শেষ পর্যন্ত তারা আর একটা নতুন যুদ্ধ নিয়ে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে গিয়েছিল।...ক্ষমতার একটা পরিবর্তনের জন্য এই যুদ্ধের নিবোধ নরক, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের লড়াই যার জন্য এত বিপুল কর্মশক্তি ও প্রতিভা, শ্রম ও মূল্য ব্যয়িত হয়েছিল, যে তার এক-দশমাংশকেও আত্মার সেবায় নিয়োজিত করলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট হত—কখন এই সব যন্ত্রণার অবসান হবে? যুদ্ধক্ষেত্র ও যোদ্ধার, লুট ও লুটেরাদের সর্দার, খুনী ও শুয়োর, বঞ্চিত ও বঞ্চিত প্রবঞ্চক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বক্তৃতাবাজ ও সৌভাগ্যবান সৈনিক, যারা সকলে মিলে এই দুর্ভাগা পৃথিবীরই মত কেবল চিরস্থায়ী চক্রের মধ্যে ঘুরছে, তাদের এই বীভৎস, অবিশ্রান্ত শিকলির মধ্যে কোন দেবতা আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন?" জার্মান দার্শনিক টি. লেসার আরও প্রশ্ন ক'রে চলেন: "ইতিহাস"কে একটা বিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্নকারী অর্থহীন শক্তি হিসাবে ভাবলেই কি আরও ভাল হত না? হাজার হলেও আমাদের জীবিত ব্যক্তিবিশেষদের, স্মরণাতীত কাল থেকে একটা বিরাট মিথ্যার সাম্রাজ্যের মধ্যে কি ফেলা হয়নি: এখানে আমাদের রয়েছে সমাজ, প্রশাসন, রাষ্ট্র ও গীর্জা, জাত ও গোষ্ঠী, এবং যত সব নিষ্ঠুর ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিমূর্ততা: অধিকার, আইন, স্কুল, পুণ্য, মহত্ত্ব, মানুষ, সত্তা, সাধারণ কল্যাণ, শৃঙ্খলা, বিজ্ঞান, পরিবার, পিতৃভূমি, ইত্যাদি। এই সমস্ত কল্পিত শক্তির মধ্যে পড়ে জীবন্ত ব্যক্তি, এমনকি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোকও প্রত্যেকটি অন্য ব্যক্তির কাছে পুলিশের কুকুর ও শয়তানের মত একটা কিছুর নামে বেড়ে উঠেছে, যাতে এক-এক জন মানুষের জীবন যেন শেষ পর্যন্ত ভণ্ড আদর্শের জয়োৎসব উদযাপন করার জন্য এক-একটা অত্যন্ত বাস্তব ও সুস্পষ্ট নরক হয়ে ওঠে।"(১)

১। ভরিউ হাইজে, আউফরুথে ইন ডি ইলিউজন। জুর ক্রিটিক ডেয়ার বুর্গেরলিশেন ফিলজফি ইন ডয়েশলাণ্ড, বার্লিন ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৪০৭-৮।

এই অনুভূতি, যা বুর্জোয়া দুনিয়ার পক্ষে অত্যন্ত বাস্তব, তার কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সমস্ত ভাববাদী চিন্তাধারার মধ্যে এক্সিস্টেনশিয়ালিজম (অস্তিত্বের দর্শন) "নিরর্থক অস্তিত্বে"র এই বোধকে সবচেয়ে ভাল ক'রে ব্যাখ্যা করতে ও সেই সঙ্গে এর পক্ষে যুক্তি হাজির করতে সক্ষম হয়েছে। সেই কারণেই এই আধুনিক দার্শনিক ইররাশনালিজমের সবচেয়ে প্রধান রূপ হয়ে উঠেছে।

দর্শন হিসাবে এক্সিস্টেনশিয়ালিজমের আবির্ভাব ১৯২০ সালে। এর প্রধান প্রবক্তা হলেন জার্মানিতে মার্টিন হাইডেগার এবং কার্ল জ্যাসপারস, ফ্রান্সে গ্রেব্রিয়েল মার্সেল, জাঁ-পল সার্ত্রে এবং আলবেয়ার্ত কামু। এক্সিস্টেনশিয়ালিজম ইতালি, স্পেন ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ব্যাপক হয়ে ওঠে। দেশত্যাগী রুশ দার্শনিক নিকোলাই বেদ্রিয়ায়েভ ও এল. চেস্তভও এক্সিস্টেনশিয়ালিজমের সংগে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

এক্সিস্টেনশিয়ালিজম নামটি লাতিন শব্দ এক্সিস্তেনশিয়া (অস্তিত্ব) থেকে এসেছে। অস্তিত্বের এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট ধারণা অন্তত তিনটি উৎস থেকে উদ্ভূত।

এ প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীর ড্যানিশ ধর্মীয় দার্শনিক সোয়েরেন কিয়েরকেগার্ডে'র উপর নির্ভর করে। তিনিই অস্তিত্বের আসল ধারণা ও "অস্তিত্বশীল ভাবুক"-এর ধারণার পত্তন করেন। প্রচলিত দর্শনের "বিমূর্ত ভাবুকের" মত না হয়ে কিয়েরকেগার্ডে'র মতে—"অস্তিত্বশীল ভাবুককে বিষয়ীগতভাবে বাস্তবকে বিচার করতে হবে, অর্থাৎ কেবল সেইভাবে বিচার করতে হবে যেভাবে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ভিতর দিয়ে তার আবেগের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আসে। অসীম বিষয়ীবাদ হল মানব-অস্তিত্বের মূল সংজ্ঞা, কিয়েরকেগার্ড লিখেছিলেন: "বিষয়ীবাদ চিন্তা যেখানে ভাবুক বিষয়ী ও তার অস্তিত্বের সম্পর্কে উদাসীন, বিষয়ীবাদী ভাবুক…সেখানে তার চিন্তা সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহশীল, সে চিন্তার অস্তিত্ব তার মধ্যেই রয়েছে।(১)" কাজেই তাঁর দার্শনিক সূত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়গততা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক।

১। এস. কিয়েরকেগার্ড গেজামেলটে ভেরকে খণ্ড ৬, জেনা ১৯২৫ পৃষ্ঠা ১৫৫।

এক্সিস্টেনশিয়ালিজম জার্মান দার্শনিক এডমুন্ড হুসেরল্-এর শিক্ষা থেকেও উদ্ভূত। হুসেরল্-এর ব্যাপারতত্ত্ব (phenomenology) থেকে এ চেতনার "অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে স্থিরীকৃত" কাঠামোর, অর্থাৎ মানবিক অস্তিত্বের এক ধরনের "অস্তিত্বতত্ত্বগত" ("ontological") ভিত্তির শৈলী ধার করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই হুসেরল্ চেষ্টা করছিলেন মানবিক চেতনার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দর্শনকে একটা কড়াকড়ি বিজ্ঞান "হিসাবে গড়ে তুলতে, নয়া-পজিটিভিস্টরা "বৈজ্ঞানিক দর্শন" সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা যেখানে দর্শনকে গাণিতিক যুক্তির ভিত্তিতে বিজ্ঞানের ভাষার বিশ্লেষণে পর্যবসিত করেছিলেন, হুসেরল্ সেখানে কেবল "খাঁটি চেতনা"র ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত "ব্যাপারতত্ত্বগত" তদন্তের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের কাঠামো আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি একটা কাজ করেছিলেন যা "পর্যবসিতকরণ" ("reduction") অথবা বন্ধনীর মধ্যে রাখা বলে পরিচিত। এ কাজটি হল নিজেদের বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব থেকে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান থেকে, অন্তর্বর্তী মানসিক প্রতিক্রিয়া (যথা—ভাবাবেগ, নান্দনিক ও নৈতিক অনুভূতি ইত্যাদি) থেকে অনপেক্ষ ক'রে ফেলা। তারপর যা থাকল সেই হল "খাঁটি চেতনা", তা চরিত্রগতভাবে একটা বিশেষ বিষয়ের দিকে পরিচালিত, (যাকে হুসেরল্ বলেছেন "ইচ্ছাকৃততা") তার "বস্তু" (গ্যয়েল) এবং "রূপ" (মরফে) আছে এবং "সাধারণ অর্থ" ও "বিষয়গত অর্থের" উপাদান আছে। চেতনার এই অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে স্থিরীকৃত চেতনার কাঠামোই, হুসেরল্-এর মতে সমস্ত জ্ঞানের কাঠামো নির্ধারণ করে।

এই যুক্তি কিছুটা খেলো একটা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণা হল যে জ্ঞানের (উদাহরণ স্বরূপ একটা বিচারের মধ্যে যেভাবে প্রকাশিত তেমন জ্ঞানের) একটা বিষয় (object) থাকতেই হবে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যোগান একটা তথ্যগত আধেয় থাকতেই হবে, তাকে সাধারণভাবে বোধগম্য হতে হবে (বোধের অগম্যতা জ্ঞান নয়) এবং তার কিছু নির্দিষ্ট তাৎপর্য থাকতে হবে। যেমন, "গোলাপটি লাল" এই বিচারের বিষয় হিসাবে আছে একটা ফুল, যার রং লাল, এর যুক্তিযুক্ত রূপ হল "এস হ'ল পি

("S is P"), এটা বোধগম্য; আর এর একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে যা এই তথ্যের মধ্যে নিহিত যে ওই নির্দিষ্ট গোলাপ লাল বিষয়গুলির শ্রেণীতে পড়ে। এই সমস্তই সত্য এবং জ্ঞানের তত্ত্বের পক্ষে কতকগুলো দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার বিষয়গত ও মৌলিকভাবে ব্যবহারিক চরিত্র প্রকাশ করে। কিন্তু জ্ঞানীয় চেতনার এই সব উপাদানকে হুসেরল "অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে স্থিরীকৃত", অভিজ্ঞতার বাইরেকার এবং কাজেই মূল উপাদান বলে ঘোষণা করেন। "খাঁটি চেতনা" কাজেই প্রাথমিক উপাদান এবং জ্ঞান ও বিষয় উভয়েরই স্রষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। চেতনা তার নিজের কাঠামো অনুযায়ী বস্তুকে "তৈরি" করে।

চেতনার "ব্যাপারতত্ত্বগত বর্ণনার" এই শৈলীই এক্সিস্টেনশিয়ালিস্টরা নিয়েছিল কেবল জ্ঞানীয় চেতনার কাঠামোর বর্ণনা দেওয়ার জন্যই নয়, সক্রিয়, যন্ত্রণাগ্রস্ত; অনুভূতিময় চেতনারও অর্থাৎ সেই "অস্তিত্বের", যে বিশ্বকে কেবল সরলভাবে জানে না, নিজের ভাবাবেগগত অবস্থার সকল রকমফের দিয়ে তাকে রঙায়, তার ও কাঠামো বর্ণনার জন্যও। "চিরায়ত বিষয়ীবাদী ভাববাদে যেখানে "বিশ্ব" হল "জ্ঞানের" দ্বারা যেভাবে প্রতিভাত হত, এক্সিস্টেনশিয়ালিজমে সেখানে বিশ্ব হল যেভাবে আমাদের তার অভিজ্ঞতা হয়।

কিন্তু তার মানে হল এক্সিস্টেনশিয়ালিজম "জীবনের দর্শন" থেকে টানা, সেখান থেকে এ এই প্রত্যয় লাভ করে যে সাধারণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; যুক্তি, "জীবন্ত জীবন"কে হত্যা করে। অর্থাৎ এক্সিস্টেন-শিয়ালিস্টদের কাছে ব্যাপারটা এমনি "জীবন" নিয়ে নয়; ব্যক্তিবিশেষের (individual) জীবন নিয়ে। কাজেই "জীবনের দর্শন" কর্তৃক যে দুটো সমস্যাকে কেবল তোলা হয়েছিল এখানে সেগুলিকে সামনে নিয়ে আসা হল। প্রথম আসে "অপরদের" বিপরীতে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের অন্ত-র্লোকের তাৎপর্য। দ্বিতীয়ত, মানবজাতির গড় প্রতিনিধির বিপরীতে ব্যক্তিবিশেষের অনন্যতা।

এই সব সমস্যার দিক থেকে দেখেই এক্সিস্টেনশিয়ালিজম চেষ্টা করে একদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অপদস্থ করতে; অপর দিকে ইররাশনালিজম-এর পক্ষে ওকালতি করতে। এ প্রধানত স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক্সিস্টেনশিয়া-

লিজমের মূল ধারণায়—"অস্তিত্ব"; "মানবিক অস্তিত্ব"; যা হল "অনন্য সত্তা।"

যেখানে "চিরায়ত" বিষয়ীবাদী ভাববাদে বহির্বিশ্বের বিষয়গত অস্তিত্ব ও জ্ঞেয়তাকে অস্বীকার করাকে যুক্ত করা হয় বিষয়ীর জ্ঞেয়তায় বিশ্বাসের সঙ্গে এবং এই বিষয়ী থেকে এগিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রমাণ করার সম্ভাবনার সঙ্গে, সেখানে এক্সিস্টেনশিয়ালিজম দাবি করে যে এমনকি বিষয়ীকেও যুক্তিযুক্ত জ্ঞানের ভিতর দিয়ে জানা যায় না। কার্ল জ্যাসপারস লিখেছিলেন : "অস্তিত্ব সেই বস্তু যা কখনও বিষয় হয় না, এ হল প্রথম নীতি যা থেকে আমি ভাবি ও কাজ করি; যার সম্বন্ধে বিবৃতি দিই আমার চিন্তার ধারা বিকশিত করতে গিয়ে, সে (চিন্তা) কিছু জানে না।(১)

কিন্তু অস্তিত্ব বিষয় হতে পারে না কেন? যুক্তিসিদ্ধভাবে তা অজ্ঞেয় কেন? প্রথমত; এ ব্যক্তিগত এবং "কোনও সাধারণ তাৎপর্য দাবি করে না।(২)" অপরপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান সাধারণ তাৎপর্য দাবি করে। দ্বিতীয়ত, অস্তিত্ব হল আমরা নিজেরা; আমরা অস্তিত্বকে তেমনভাবে পাশ থেকে দেখতে পারি না যেমন বিজ্ঞান তার বিষয়গুলিকে বিষয়গতভাবে দেখে। এইখান থেকেই ওঠে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের "সমস্যা" ও এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট চিন্তার "রহস্যে"র মধ্যে এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট বিরোধ।

গেব্রিয়েল মার্সেল এই পার্থক্য টেনেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন "...... সমস্যা ও রহস্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে সমস্যা এমন জিনিস যার আমি মুখোমুখি হতে পারি, যাকে গোটাই সামনে পাই; কিন্তু যাকে পরে-পশ্চাতে আমি ধরতে পারি ও নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি; কিন্তু রহস্য এমন একটা জিনিস যার মধ্যে আমি নিজেই জড়িত; কাজেই সে ধারণা করা সম্ভব কেবল এমন একটা ক্ষেত্র হিসাবে যেখানে আমার মধ্যে যা আছে ও আমার সামনে যা আছে তার মধ্যেকার পার্থক্য তার তাৎপর্য ও প্রাথমিক মূল্য হারায়। একটা সত্যিকারের সমস্যা যেখানে একটা বিশেষ কায়দা মানে যার সাহায্যে তার স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়, রহস্য

১। কে. জ্যাসপারস, ফিলজফি, খণ্ড ১. বার্লিন গয়েটিঙ্গেন, হাইডেলবার্গ, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ১৫।

২। উপরোক্ত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯।

তার সংজ্ঞা অনুযায়ীই সম্ভাব্য সকল কায়দাকে পেরিয়ে যায়।"(১) ধরুন আমি যদি কোনও কায়দা ব্যবহার ক'রে একটা গাণিতিক সমীকরণের সমাধান করতে পারি তা হলে যে কেউ সে কায়দা জানে সেই আমার সঙ্গে একমত হবে ও সে সমাধান গ্রহণ করবে। কিন্তু সত্তার রহস্যগুলি—মৃত্যু ও অমরত্ব, ভগবানের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, ভালবাসা, সত্য—সে সত্য নয় যা মুখস্ত করা হয়, সেই সত্য যার জন্য মানুষেরা প্রাণ বলি দেয়—আমার নিজের থেকে, আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থেকে তাকে তফাত করা যায় না; তারা সাধারণ জ্ঞান হয়ে উঠতে পারে না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানব জীবন ও জ্ঞান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী এখানে তোলা হচ্ছে। কিন্তু এগুলির মোকাবিলা করার জন্য এক্সিস্টেন-শিয়ালিজম গোড়া থেকেই এই সব প্রশ্নের বিষয়গত ও সর্বোপরি সামাজিক অর্থকে নাকচ ক'রে দেয়। বৈজ্ঞানিক সমাধানের জায়গায় এ ধর্মীয় ভাববাদী সমাধান দেয়। মার্সেল লিখেছেন: "যে কেউ কথাটা গভীরভাবে চিন্তা করে তার প্রত্যেকের পক্ষেই কি জীবনটার মধ্যে, মানুষের জীবনের মধ্যে নিহিত নেই এক ধরনের আধিভৌতিক অ্যাটলান্টিসের অস্তিত্ব—সংজ্ঞা দিয়ে যার সন্ধান করা যায় না, কিন্তু বাস্তবে যার অস্তিত্ব আমাদের অভিজ্ঞতাকে তার পরিমাণ, তার মূল্য, তার রহস্যময় ঘনত্ব দেয়?"(২) এই "অ্যাটলান্টিস" হলেন ভগবান, মার্সেলের মতে যাঁর অস্তিত্ব মানুষ অবিরত অনুভব করে। "ভগবানের উপস্থিতির অভিজ্ঞতা যে কেউ লাভ করেছে প্রমাণের প্রয়োজন তার কেবল নেই তাই-ই নয়; সে বোধহয় এত দূর যাবে যে প্রমাণের কোনও চিন্তাকেই সে তার প্রতি অপমানজনক মনে করবে যা তার কাছে পবিত্র সাক্ষ্য। অস্তিত্বের দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সেই একই ধরনের সাক্ষ্য যা তার কেন্দ্রীয় ও হ্রাসের অতীত উপাত্ত।"(৩) এই একই ধরনের

১। গেব্রিয়েল মার্সেল. "এতরে এৎ আভোয়ার" ১. জুর্নাল মেতাফিজিক, (১৯২৮-১৯৩০), অবিয়ার-মন্তেন, পৃষ্ঠা ১৪৬।

২। গেব্রিয়েল মার্সেল, দ্যু রেফ্যুজ আ ল' ইনভোকাসির', প্যারী, ১৯৪০, পৃষ্ঠা ১২৪।

৩। গেব্রিয়েল মার্সেল, লে মিস্তিরে দ্য ল'এত্রে, ২, ফোয়া এৎ রিয়ালিতি, প্যারী, ১৯৫১।

"সাক্ষ্য" কিন্তু আধেয়ের দিক থেকে উল্টো, সার্ত্রেকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে "ভগবান নেই", যে সিদ্ধান্তকে তিনি নীতিগতভাবে প্রমাণের অতীত বলেই দাবি করেন।

এক্সিস্টেনশিয়ালিজম মানবিক অস্তিত্বের অযৌক্তিকতার সমর্থন এই তথ্য থেকেও পায় যে অস্তিত্বের "প্রকৃত গভীরতা" আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় কেবল একটি বিশেষ অবস্থায়, যাকে জ্যাসপারস বলেন "আইনে গ্রেনৎস-সিটুয়েশন" (একটা সীমান্ত পরিস্থিতি)। এ রকম পরিস্থিতি হল মৃত্যু, ক্লেশ, ভয়, সংগ্রাম, অপরাধ, ধর্মীয় তুরীয়ানন্দ, মানসিক অসুস্থতা, ইত্যাদি। একমাত্র এই সব মুহূর্তেই মানুষ তার "প্রকৃত অস্তিত্ব" (তার স্বাধীনতা) সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সচেতন হয়, যা সাধারণ অবস্থায় তার "দৈনন্দিন রুটিনে"র পিছনে, সাধারণ অস্তিত্বের "অবাস্তবতা"র পিছনে অথবা হাইডেগার যাকে "ডাস মান"-এর আধিপত্য বলেন তার পিছনে লুকিয়ে থাকে। লোকের সাধারণ, প্রাত্যহিক একত্র অস্তিত্ব প্রকৃত সত্তাকে "অপরদের" অস্তিত্বের পদ্ধতির মধ্যে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেয়। "তারা সাধারণত যেভাবে করে সেইভাবেই আমরা নিজেদের উপভোগ করি, আমরা পড়ি, আমরা তাকাই, এবং সাহিত্য ও কলা আলোচনা করি, যেমন তারা করে।……ডাস মান, যা হল একটা অনির্দিষ্ট কিছু; অথচ সেই সঙ্গে আবার দৈনন্দিন অস্তিত্বের পদ্ধতি কি হবে তার নির্ধারক সব কিছু যদিও মোট যোগফল নয়।"(১)

হাইডেগারের এই প্রায়ই উদ্ধৃত প্রতিজ্ঞাটি এক্সিস্টেনশিয়ালিজমের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য আমাদের পক্ষে শুরু করার জায়গা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। হাইডেগার নৈর্ব্যক্তিক সর্বনাম "ম্যান" (লোক) থেকে পাওয়া "ডাস মান" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, জার্মানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় নৈর্ব্যক্তিক বাক্য রচনার জন্য, যেমন "মান জাগট" (লোকে বলে); মান মুস (এটা প্রয়োজন), সমাজে মানবিক অস্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিকতা ও বর্ণহীনতা, বিশিষ্ট চেহারার অভাব; পরিবেশের সাধারণত্বে মিশে যাওয়া বোঝানর জন্য। অবশ্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত করে ফেলেই হাইডেগার তৎক্ষণাৎ তাকে ঢেকে ফেলেন এই ব'লে যে "নৈর্ব্যক্তিকতা" ও "সাধারণত্ব" সমাজমাত্রেরই, যে কোনও সমাজে ব্যক্তির

১। এম. হাইডেগার জাইন উন্ড ৎসাইট, টুবেংগেন ১৯৫৭ পৃষ্ঠা ১২৬-২৭।

অস্তিত্বের পদ্ধতিরই গুণ। অতএব এ থেকে দাঁড়াল যে এক্সিস্টেনশিয়ালিজম অনুযায়ী কোনও রূপান্তরই এই নৈর্ব্যক্তিক, বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে দূর করতে পারে না।

"অবাস্তব অস্তিত্বের" ধারনা; যার বিভিন্ন অভিধা আছে, তা এক্সিস্টেন-শিয়ালিজমের সকল চিন্তাধারার চরিত্রগত। এক-এক সময়ে তা সামাজিক জীবনের কিছু বেশ সুগভীর বৈশিষ্ট্যকে উদ্ঘাটিত করে। যেমন মার্সেল "সম্পত্তি"কে "অস্তিত্বে"র বিরুদ্ধে দাঁড় করান। তিনি বলেন : যে সব জিনিস আমার অধিকৃত (possession) সেগুলি আমাকেও অধিকার করে। কাজেই আমাদের সম্পত্তি "আমাদের খেয়ে ফেলে"। অতএব "অধিকৃত বস্তুর মধ্যে"; অর্থাৎ সম্পত্তির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জগতের অমানুষিকতাকে আবিষ্কার করেন। কিন্তু সম্পত্তির কাছে, জিনিসপত্রের কাছে দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করা যাবে কি ক'রে। মার্কসবাদ এর সমাধান দেখতে পায় উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার অবলোপের মধ্যে, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক-সামাজিক সম্পর্কের অবসানের মধ্যে। মার্সেল "সত্তা" (মানবজাতি) ও "অধিকৃত বস্তুর" (সম্পত্তির) মধ্যে বিরোধ দেখেন মানুষের নিজের মধ্যে, তার অস্তিত্বের দ্বৈত চরিত্রের মধ্যে এবং এ থেকে বাঁচার উপায় দেখেন প্রেম ও করুণার মধ্যে, "আত্মত্যাগের" মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত ধর্ম, কলা ও দর্শনের মধ্যে, তাঁর মতে যার ক্ষমতা আছে অধিকৃত বস্তুকে সত্তার স্তরে উন্নীত করার। কিন্তু এগুলি ধর্মীয় ও ভাববাদী সমাধানের একেবারে নমুনাস্বরূপ, সেগুলি হাজার হাজার বছর ধরে উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তারা বড় জোর সদিচ্ছার বেশি কিছুতে দাঁড়ায় না। আর প্রায়ই দাঁড়ায় যাদের আছে তাদের দ্বারা যাদের নেই তাদের উদ্দেশ্যে কপট উপদেশে।

হাইডেগার "অবাস্তব অস্তিত্ব" জয় করার সম্ভাবনা দেখেন "মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার" মধ্যে ; জ্যাসপারস দেখেন "সীমান্ত পরিস্থিতি" সম্পর্কে সচেতনতার মধ্যে। এটা কেবল সেই সুবিদিত মনস্তাত্ত্বিক তথ্যকে সমর্থন করে যে একটা সংকটজনক পরিস্থিতিতে মানুষ যা ঘটছে সে সম্বন্ধে ও তাতে তার ভূমিকা এবং তার কি করা উচিত সে সম্বন্ধে বাস্তবিকই গভীরতর উপলব্ধি অর্জন করে। যথা একটা ভয়ংকর বিপদের মুখে মানুষের সত্যিকারের

সারমর্ম উদ্ঘাটিত হয়, উদাহরণ স্বরূপ যুদ্ধের সময়ে সে বীর কি কাপুরুষ তা বোঝা যায়। স্পষ্টতই জ্যাসপারস এ-কথাটাকে হিসাবের মধ্যে ধরেননি যে ওই রকম সময়ে সফল ক্রিয়া নির্ভর করে সেই অবস্থার জন্য মানুষ কতটা প্রস্তুত থাকে তার উপর : যে বীর গুলি ছুঁড়তে জানে না তার সামান্যই মূল্য। কিন্তু একটা বাস্তব ও অনিবার্য সংকটের পরিস্থিতিতে যে সব সম্পর্ক দৈনন্দিন জীবনের দ্বারা ঢাকা ছিল সেগুলি উদ্ঘাটিত হয়। মৃত্যুর সম্মুখীন একটা লোকের অপরদের সম্পর্কে ও জীবন সম্পর্কে মনোভাব তলস্তয়ের গল্প দা ডেথ অব্ ইভান ইলিচ গল্পে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। এই গল্পের নায়ক যখন জানল যে সে মরতে চলেছে তখন সে উপলব্ধি করল যে অপর লোকদের প্রতি উদাসীন হওয়া কত অমানুষিক ও ব্যক্তি হিসাবে লোকেদের প্রতি যারা উদাসীন হয় তাদের কি হয়। কিন্তু আদালতে যখন লোকেদের ভাগ্য নির্ধারণ করত তখন তাদের প্রতি তার নিজের মনোভাবও ঠিক এই রকমই ছিল। কেবল এখনই সে ব্যক্তি হিসাবে কেবল নিজের সম্পর্কে নয়, অপরদের সম্বন্ধেও (যথা—সেই চাকর, মোসাহেব ও কৃষক) যারা তার কাছে বিচারের জন্য দাঁড়িয়েছিল তাদের সম্বন্ধেও সচেতন হয়। তলস্তয়ের এই গল্পকে নিজের ধারণার দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখে যে এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট, সে এই "সীমান্ত পরিস্থিতিকে" উল্টে মানুষের একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা, যথা প্রত্যেক মানুষ যে নিঃসঙ্গই মারা যায়, তা খুলে ধরার উপায় হিসাবেই দেখে। তবে অবশ্য অনপেক্ষ মানবতাবাদী তলস্তয় বা এক্সিস্টেনশিয়ালিস্টরা কেউই দেখেন না যে তাঁরা যে সব সমস্যা উদ্ঘাটিত করেছেন তার মূল হল প্রকৃত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে; আর তার সমাধানের পথ হল মানুষের মধ্যেকার বিষয়গত সম্পর্কের রূপান্তর সাধনের পথ।

এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট দর্শন হল বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটা স্পষ্ট প্রকাশ। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সেই প্রচলিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে পৃথক যা মানুষকে "সামাজিক অণু" ব'লে, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সামাজিক একক (unit) ব'লে মনে করে। বিংশ শতাব্দীতে এই ধারণা কাল-বিরুদ্ধ, কারণ বর্তমানের সমাজজীবন স্পষ্টতই এবং অনিবার্য-ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কক্ষপথে টেনে নেয়। এমনকি ব্যক্তির (অথবা সামাজিক পৃথক অস্তিত্বের, পরিবারের) আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন

অস্তিত্ব, বা উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক অণুবাদের (atomism) ভিত্তি রচনা করেছিল, তা বর্তমানে কল্পনাতীত। এই কারণে এক্সিস্টেনশিয়ালিজম সামাজিক সম্পর্কের (এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট দর্শনের ভাষায় "অপরদের") উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়। এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সারমর্ম হল এই যে সামাজিক সম্পর্কগুলিকে মনে করা হয় বিরোধের সম্পর্ক ব'লে, সেগুলি মানুষকে একত্র করে কেবল এই কারণে যে তাদের বিভক্ত করে। জ্যাসপারসের মত অনুযায়ী মানুষের মধ্যেকার যোগসূত্র ("অপরদের সঙ্গে জীবন" হিসাবে "আদানপ্রদান") হল "নিঃসঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে আদানপ্রদান"। আদানপ্রদান দিয়ে প্রত্যেকটি নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের সময়ে একটা নতুন নিঃসঙ্গতা জন্ম নেয় যা আদানপ্রদানের শর্ত হিসাবে অস্তিত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অদৃশ্য হতে পারে না।"(১) জ্যাসপারসের মতে আদানপ্রদানের প্রাথমিক রূপ হল আধিপত্য ও সেবার সম্পর্ক। এই পরিস্থিতিতে আদানপ্রদানের আকাঙ্ক্ষা অবধারিতভাবে জড়িত আদানপ্রদানের ভয়ের সঙ্গে, তার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ ইত্যাদির সঙ্গে।

কাজেই এক্সিস্টেনশিয়ালিজম আবার ধনতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রকৃত বিরোধ ও সংঘর্ষগুলিকে প্রকাশ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে এই বিরোধগুলিকে লুকোয় তাদের "মানবিক অস্তিত্বে"রই একটা সহজাত উপাদান বানিয়ে ও তার ফলে অবিনশ্বর ব'লে ঘোষণা ক'রে। শোষক সমাজে জাত বৈরিতাকে মনে করা হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সার্বজনিক সম্পর্ক।

বুর্জোয়া সাহিত্যে এক্সিস্টেনশিয়ালিজমকে প্রায়ই "স্বাধীনতার দর্শন" আখ্যা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার সমস্যাটি নিশ্চয়ই এক্সিস্টেনশিয়ালিজমে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কিন্তু এই স্বাধীনতার সারমর্ম কি? এক্সিস্টেনশিয়ালিস্টদের দ্বারা কিভাবে তা ব্যাখ্যাত হয়? জাঁ-পল সার্ত্রে লিখেছেন: মানুষ কখনও দাস, কখনও স্বাধীন হতে পারে না: হয় সে

১। কার্ল জ্যাসপারস, ফিলজফি, ২নং খণ্ড, বার্লিন, গয়েটিঞ্জেন, হাইডেলবার্গ, ১৯৪৮ পৃষ্ঠা ৩৪৮।

সর্বদাই সম্পূর্ণ স্বাধীন, নইলে তার আদৌ অস্তিত্ব নেই।"(১) তার মানে কি ? মার্কসবাদী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রকৃত স্বাধীনতা হল প্রয়োজনের জ্ঞানের ভিত্তিতে, "সে কি করছে তা জানার" ভিত্তিতে কাজ করার ক্ষমতা। এক্সিস্টেনশিয়ালিজমের পক্ষে এ একটা প্রেরণাগত, ভাবাবেগগত পছন্দ। উদ্বেগ, দুঃখ ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে পড়েছে যে মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা তার কাছেই আত্মপ্রকাশ করে। দুঃখ, নিঃসঙ্গতা, দায়িত্ব......এসব নিয়ে, বস্তুত, আমাদের চেতনার গুণ গঠিত হয় যেহেতু তা নিখাদ স্বাধীনতা।"(২) ফলত স্বাধীনতা হল একটা অচেতন, সহজাত প্রবৃত্তি প্রসূত ক্রিয়া, তার মধ্যে কোনও বিষয়গত আধেয় নেই। একথা সত্য যে এ স্বেচ্ছাচার নয়; সার্ত্রের মতে : একটা মানুষ একটা অস্তিত্ব এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজের ভিত্তিতে তাকে বিচার করা যায়, তা যতই স্বেচ্ছাচারী ব'লে মনে হোক না কেন। কিন্তু সার্ত্রের কাছে একটা মানুষের ও তার ব্যবহারের প্রকৃত আকার গড়ে ওঠাটা একটা সুগভীর রহস্য। সুতরাং তাকে প্রভাবিত করার, স্বাধীন মানুষ হিসাবে তার চেতনা ও ব্যবহারকে বদলানর পথটাও রহস্যই থেকে যায়।

সার্ত্রে স্বাধীনতাকে দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করেন। বস্তুত তিনি এ দুইকে অভিন্ন করেন। "......মানুষ যেহেতু স্বাধীন হতে অভিশপ্ত তাই সারা বিশ্বের ভার সে কাঁধে বয়; সে সমগ্র জগতের জন্য এবং সত্তার একটা ধরন হিসাবে নিজের জন্যও দায়িত্ব বহন করে।"(৩) এই ধারণাটি সূত্রায়িত করতে গিয়ে সার্ত্রে অগ্রসর হয়েছেন ফ্রান্সের ও সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য সম্পর্কে সেই দায়িত্ববোধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফরাসী প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের কাঁধে যা বর্তেছিল। এই বিবাদময় পরিস্থিতি সার্ত্রে ও অপরাপর ফরাসী এক্সিস্টেনশিয়ালিস্টদের কাজের উপর গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছিল; এ "দায়িত্বের সাহিত্যের" একটা গোটা প্রবণতার ভিত্তি রচনা করেছিল। কিন্তু এক্সিস্টেনশিয়ালিস্টের মধ্যে নিঃশর্ত দায়িত্ব দ্বান্দ্বিকভাবে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে; নিঃশর্ত দায়িত্বহীনতায়-রূপান্তরিত হয়। কারণ, প্রথমত,—

১। জাঁ-পল সার্ত্রে, ল'এত্রে লে নেয়াঁত, প্যারী, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৫১৬।

২। উপরোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪১-৪২।

৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩৯।

সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির এবং ব্যক্তিদের দায়িত্বকে "সাধারণভাবে দায়িত্বের" মধ্যে, "প্রত্যেকের" সমান দায়িত্বের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়; এবং দ্বিতীয়ত, সার্ত্রে ঠিক বা ভুল কাজের কোনও বিষয়গত মানদণ্ড, অর্থাৎ দায়িত্বের কোনও বিষয়গত মানদণ্ড স্বীকার করেন না। এ সমস্তর ফল এই হয় যে তাঁর স্বাধীনতার ধারণা শেষ পর্যন্ত এক অর্থহীন বিমূর্ততায় পর্যবসিত হয়।

৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সার্ত্রে তাঁর স্বাধীনতার ধারণার ত্রুটি স্বীকার করেছেন এবং এখন তাঁর প্রাথমিক অবস্থান থেকে কিছুটা সরে গিয়েছেন। কিন্তু উপরে যা বলা হয়েছে তা স্বাধীনতার এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট ব্যাখ্যার যুক্তিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে, এই ব্যাখ্যা স্বাধীনতা ও প্রয়োজনকে পরস্পর-বিরোধীভাবে দাঁড় করানয় এবং সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করায় নিয়ে যায়।

স্বাধীনতা সম্পর্কে সার্ত্রে মতবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর নাস্তিকতা, ভগবান নেই এই তথ্যের সাক্ষ্য হিসাবে স্বাধীনতা। সার্ত্রের মত অনুযায়ী এতে কেবল মানুষের অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, কারণ সাহায্যের জন্য সে কেবল নিজের দিকেই চাইতে পারে। ভগবান যদি না থাকেন তবে আমাদের পিছনে বা সামনে আর কোনও সমর্থন অথবা ওজর থাকে না। আমরা একলা ও ওজরহীন। যখন আমি বলি মানুষকে স্বাধীন হতে, তখন আমি এই কথাই বুঝি।"(১) সার্ত্রের নাস্তিকতা থেকে প্রধান সিদ্ধান্ত হল হতাশাবাদ, কারণ ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে তিনি অন্য কোনও আদর্শ গ্রহণ করা অসম্ভব বোধ করেন।

অপর পক্ষে তথাকথিত ধর্মীয় এক্সিস্টেনশিয়ালিজম মানুষের স্বাধীনতাকে ভগবানের অস্তিত্বের সাক্ষ্য হিসাবে দেখে। জ্যাসপারস ধরে নেন যে নিঃশর্ত স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। স্বাধীনতা হল স্বাধীনতা ও কর্তব্যের ঐক্য যা "একটা গভীরতর প্রয়োজন" অর্থাৎ ভগবান থেকে উদ্ভূত। কাজেই তিনি দৈব আদেশ মান্যকারী স্বাধীন ইচ্ছার ধর্মীয় প্রথাসিদ্ধ ধারণায় ফিরে যান। এমনকি আরও খোলাখুলি লির্য চেস্তভ ।স্বাধীনতাকে যুক্ত করেন একটা

পরমাশ্চর্যের সঙ্গে যা "যুক্তি ও জ্ঞানের অতীত।" কিন্তু "ভগবানের ইচ্ছা" হিসাবে পরমাশ্চর্যের আশা করা প্রকৃত অসহায়তা ও তাকেই চিরস্থায়ী করার প্রকাশ।

অতএব একথা বলা সম্ভব যে, "নাস্তিক" ও ধর্মীয় উভয় এক্সিস্টেনশিয়ালিজমই মানবিক স্বাধীনতার ঘোষণার চেয়ে বরং সেই সব মতাদর্শবিদদের হতাশারই সাক্ষ্য বহন করে যাঁরা তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সমস্ত আশা হারিয়েছেন।

এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট দর্শনের হতাশাবাদ এই তথ্য থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে এর মূল কোটীগুলিকে অর্থাৎ মৃত্যু ও ভয় অপরাধ ও উদ্বেগ; দুঃখ ও নিঃসঙ্গতা; মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্টকে দেখা হয় মানবিক অস্তিত্বের সর্বজনিক সঙ্গী হিসাবে। এই কোটীগুলি ধনতন্ত্রের প্রকৃত বিরোধগুলির প্রতিফলনে রঞ্জিত। কিন্তু যারাই হয় বর্তমান কাঠামোর মধ্যে দুনিয়াকে নিখুঁত করার আশা করে; নয় শোষণের পুরানো দুনিয়াকে ধ্বংস ক'রে নতুন দুনিয়া সৃষ্টির আশা করে তাদের সকলকেই দুনিয়া বদলের কোনও চেষ্টায় এক্সিস্টেনশিয়ালিজমের ক্লৈব্য ঘোষণা দূরে সরিয়ে দেয়। শেষোক্তরা মর্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়; আর প্রথমোক্তরা এক্সিস্টেনশিয়ালিজমকে "ইতিবাচক" মনোভাব নিয়ে পুনর্বিবেচনা ক'রে তাকে ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ওজরে পর্যবসিত করে এবং হতাশা ও ভয়ের দর্শনের জায়গায় "নতুন নিরাপত্তা"র এক দর্শনকে বসায়, যার রণধ্বনি হল "অস্তিত্বে বিশ্বাস" (এই হল জার্মান দার্শনিক অটো এফ. বোলনোফ এর মত)। শেষ পর্যন্ত রয়েছে ধর্ম; যে লোক পৃথিবীকে বদল করার সকল আশা হারিয়েছে তার পলায়নের একটা সুবিধাজনক আস্তানা হিসাবে যাকে কিছু বুর্জোয়া দার্শনিক এখনও দেখে। তাদের মধ্যে ধর্ম একটা বহু-ব্যবহৃত দাওয়াই যে আশা ও মানসিক শান্তি আনে এবং আকাঙ্ক্ষাপূরণ পরজন্মের জন্য স্থগিত রাখে।

৪. *বিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় দর্শন, নয়া-টমিজম*

সমসাময়িক ধর্মীয় দর্শন সমগ্র অখণ্ড একটা বিন্দু নয়। এ বহু ধরনের বিশ্বাস ও দার্শনিক চিন্তায় বিভক্ত; আর এর প্রবক্তারা বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক-

মতবাদের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করে। কাজেই আমরা ক্রিশ্চিয়ান, ইহুদি, মুসলিম ও বৌদ্ধ দর্শনের সম্মুখীন হই। ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট ও সনাতনী (অর্থোডক্স) দর্শন অবলম্বন করে; ক্যাথলিসিজমের কাঠামোর মধ্যে আছে বিভিন্ন নব্য-পণ্ডিতী চিন্তাধারা : নয়া-টমিজম, সুয়ারেজিয়ানিজম (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর স্প্যানিশ পণ্ডিতী দার্শনিক ফ্রান্সিসকো সুয়ারেজের অনুগামীরা); মেলিনিজম (ষোড়শ শতাব্দীর জেসুইট লুইস দে মোলিনার অনুগামীরা), স্কটিজম (ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্কটিশ পণ্ডিত ডুনস স্কটাস-এর অনুগামীরা), ও অন্যান্যরা। ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে বিভিন্ন ইররাশনালিস্ট প্রবণতাও আছে, প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মীয় দর্শনে কার্ল বার্থ, পলটিলিশ ও অন্যান্যদের ধর্মতত্ত্বগত এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, ইহুদি ধর্মে মার্টিন বুবারের এক্সিস্টেনশিয়ালিজম এবং ক্যাথলিক দর্শনে নয়া-অগাস্তিনিজম ("ফাদার অব দা চার্চ" অগাস্তিনের অনুগামীরা)। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটা ব্যাপক বিশ্বাস হল পারসনালিজম—এ হল এমন একটি ধর্মীয় দর্শন যা পৃথিবীকে দৈব ব্যক্তিত্বের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ বলে মনে করে।

সমসাময়িক ধর্মীয় দর্শনের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক ধারা হল নয়া-টমিজম, এ ত্রয়োদশ শতাব্দীর দার্শনিক টমাস অ্যাকুইনাস-এর পণ্ডিতী দর্শনকে পুনর্জাগ্রত করে। টমিজমের এই পুনর্জাগরণ ঘোষিত হয় পোপ ত্রয়োদশ লিওর ১৮৭৯ সালের প্রত্যাদেশে, একে আরও জোরদার করা হয় টমিস্ট দর্শনের কতকগুলি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি, লুভেনে (বেলজিয়াম) দর্শন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং ক্যাথলিক গীর্জার সমস্ত মতাদর্শগত এজেন্সিগুলি কর্তৃক টমিজমের প্রবল প্রচারের মারফত। বর্তমানে নয়া-টমিজমের ব্যাখ্যার প্রধান কেন্দ্রগুলি হল ভ্যাটিকানে রোমান অ্যাকাডেমি অব সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস, ফ্রিবুর্গ-এর (সুইজারল্যাণ্ড) ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি, কোলোনের আলবার্ট দা গ্রেট অ্যাকাডেমি, ওয়াশিংটন ও অটোয়ার ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি, প্যারী, ইনসব্রুক, মাদ্রিদ, টরোণ্টো ও অপরাপর জায়গার ক্যাথলিক ইনস্টিটিউটগুলি। দর্শনের ক্ষেত্রে তাদের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করে ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ক্যাথলিক ফিলজফিকাল সোসাইটিজ। নয়া-টমিস্ট দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা হলেন মার্টিন গ্রাবমান,

এম. দ্য উলফ, এতিয়েকে গিলসন ; পণ্ডিতী দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং নয়া-টমিজম্-এর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁদের রচনাবলীর জন্য তাঁরা সুবিদিত। জি. এম. মানসার, জোসেফ গেজার, জাক মারিত্যা ও অন্যান্যরা নয়া-টমিজমের ব্যবস্থাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। জি. গুণ্ডপাক, ও'নীল-ব্রেনিং ও অন্যান্যরা "ক্যাথলিসিজমের সামাজিক মতবাদ"-এর ব্যাখ্যা করেন এবং আই. বোখেনস্কি, গুস্তাভ ভেটার ও অন্যরা মার্কসবাদী দর্শনের সমালোচনায় ব্যাপৃত।

নয়া-টমিজমের মধ্যে দুটি প্রবণতাকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। একটি হল "প্যালিও-টমিজম", যার প্রবক্তারা নিজেদের "কড়া টমিস্ট" আখ্যা দেন। এ টমাস অ্যাকুইনাসের শিক্ষাকে একেবারে পুরোপুরি বজায় রাখে এবং বিশ্বাস করে যে তাঁর রচনাবলীতে সমস্ত দার্শনিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। অপর প্রবণতাটি, সেইটিরই নাম নয়া-টমিজম, পোপ ত্রয়োদশ লিও কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষা "নতুনের দ্বারা পুরাতনকে সমৃদ্ধ কর" অনুযায়ী চলে এবং সেই সব টমিস্ট থিসিসকে "উন্নত" করার চেষ্টা করে যেগুলি এমনকি নয়া-টমিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও অচল, আর তা করে আধুনিক কালের দর্শন থেকে (বিশেষত কাণ্ট-এর থেকে) অথবা বর্তমান দর্শন থেকে (ফেনমেনলজি, নয়া-পজিটিভিজম, প্রভৃতি) কিছু ভাবধারা ধার দিয়ে। কিন্তু টমিজমের প্রধান আধেয়—ভগবানের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞাগুলি এবং কিছু নিছক দার্শনিক প্রতিজ্ঞা (ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট বৈষয়িক দুনিয়ার বাস্তবতার তত্ত্ব, জ্ঞানাতীত [ট্রানসেনডেনটাল] পৃথিবীর তত্ত্ব, "র‍্যাশনালিজম", ইত্যাদি) অনড়ই থাকে। নয়া-টমিজম বস্তুবাদ, বিষয়ীবাদী ভাববাদ ও ইরর‍্যাশনালিজম-এর বিরুদ্ধে বিতর্ক চালায়, দাবি করে যে তা অন্য সব দার্শনিক প্রবণতার "চরমগুলিকে কাটিয়ে" দিচ্ছে। কিন্তু এই সব মত পার্থক্য—অবশ্য নয়া-টমিজম এবং বস্তুবাদ ও নাস্তিকতাবাদের মধ্যেকার মৌলিক বিরোধকে বাদ দিয়ে ভাববাদের ব্যবস্থার মধ্যেই চালু মত-ভেদের বাইরে যায় না।

টমিজম এমন একটা সুবিধাজনক দর্শন হয়ে উঠেছে কেন ? কি একে আধুনিক বুর্জোয়া মতাদর্শের চাহিদার সঙ্গে এত সহজে খাপ খাইয়ে দিল ? এই প্রশ্নগুলির জবাবের জন্য আমাদের টমাস অ্যাকুইনাসের ব্যবস্থাতেই

আবার ফিরে যেতে হবে। টমাস অ্যারিস্তোতল-এর দর্শনকে ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সমন্বিত করেছিলেন। বিশ্বাসের অনুকূলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ইররাশনালিস্টদের অস্বীকার করা (দ্বিতীয় শতাব্দীর ধর্মতত্ত্ববিদ তেরতুলিয়ানের "আমি বিশ্বাস করি কারণ এ অসম্ভব") এবং সত্যের দুটি স্বতন্ত্র উৎস হিসাবে যুক্তি ও বিশ্বাসকে পরস্পরের বিরোধী ক'রে র‍্যাশনালিস্টদের দাঁড় করান "দ্বৈত সত্যের তত্ত্ব"—এই সব চরম পন্থাকে এড়াতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। লক্ষ্যণীয় সাহসের সঙ্গে (সেটা ত্রয়োদশ শতাব্দী তা বিবেচনা করলে) টমাস অ্যাকুইনাস ঘোষণা করেছিলেন: "মানবিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের কাছ থেকে যুক্তিই দুর্বলতম।"(১) আবার সেই সঙ্গে, তাঁর মতে "মানবিক জ্ঞান" "দৈব জ্ঞানের" অধীন—দৈবজ্ঞান যুক্তির বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু যুক্তির উর্ধ্বে। টমাস লিখেছিলেন: ক্রিশ্চিয়ান ধর্মতত্ত্ব উদ্ভূত হয় আলোক থেকে, দর্শন—যুক্তির স্বাভাবিক আলোক থেকে। দার্শনিক সত্যগুলি বিশ্বাসের সত্যগুলিকে খণ্ডন করতে পারে না। এগুলি অবশ্যই যথেষ্ট নয়, কিন্তু এরা সাধারণ তুলনাও চলতে দেয়: উপরন্তু এদের কিছু কিছু [বিশ্বাসের সত্যগুলিকে] আগে থেকে ধরতে পারে। কারণ প্রকৃতি হল প্রশান্ত সুখের পূর্ব লক্ষণ।"(২)

টমাসের এই ভাবধারাগুলিই "বিশ্বাস ও যুক্তির সামঞ্জস্য" সম্বন্ধে নয়া-টমিস্ট থিসিসের ভিত্তি রচনা করে, এই থিসিস প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে যুক্তি (বৈজ্ঞানিক চিন্তা) যে বিন্দুতে বিশ্বাসকে খণ্ডন করে সেই বিন্দু পর্যন্ত নিজের বিচার প্রয়োগ করতে সে স্বাধীন। নয়া-টমিজম অনুযায়ী দর্শন বিজ্ঞান থেকে স্বাধীন, কিন্তু ধর্মীয় আপ্তবাক্যের অধীন। অপরপক্ষে বিজ্ঞানের কোনও অধিকার নেই দার্শনিক সমস্যাগুলি উপস্থাপন করার বা সমাধান করার ও সেইভাবে দর্শনের উপর প্যারস্পরিক প্রভাব ফেলার।

কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপারে দর্শনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার কি থেকে আসে? এই বিষয়ে নয়া-টমিজম বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিতরকার বাস্তব সম্পর্কগুলির সূক্ষ্ম ব্যবহার করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বাস্তবিকই

১। এস. থমে অ্যাকুইনাতিস, সুম্মা থিওলগে, লা ১, ৮, অ্যাড ২।

২। সাংকতি থমে দ্য অ্যাকুইনো, এক্সপোজিসিও সুপার জিত্রুম, বোয়েথি দ্য ত্রিনিতাতে, লাইদেন, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ১৪।

পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এক ক্ষেত্রে কর্মরত বিজ্ঞানীকে কোনও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান কি বলছে তার খেয়াল রাখতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, মলিকিউলের গুণ বিচারে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের মধ্যে কোনও বিরোধ চলে না, আর পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাণিতিক যন্ত্রপাতিকে গণিতের অধীনতা স্বীকার করতে হয়, ইত্যাদি। নয়া-টমিস্টরা বলে বিশ্বাস ও যুক্তির, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের, দর্শন (ধার্মিক!) ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্কের অবস্থাটাও একই রকম। দর্শন থেকে কিছু কিছু বিজ্ঞানের, এবং ধর্মতত্ত্ব থেকে দর্শনের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতাকে এইভাবে এই তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয় যে বৈষয়িকভাবে (অর্থাৎ আধেয়ের বিচারে) তারা পরস্পর নির্ভরশীল। এম. দ্য. উলফে লিখেছিলেন: ধর্মতত্ত্বের প্রামাণিক উপাত্তকে দর্শনের উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা সেই রকমই নিরর্থক যেমন নিরর্থক বিশেষীকৃত বিজ্ঞানগুলির প্রামাণিক সিদ্ধান্তগুলিকে তার উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের নানাবিধ রূপ তার শাখাগুলির আভ্যন্তরিক অধীনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত, এবং এই পারস্পরিক সীমা আরোপকে অস্বীকার করা বিরোধের নীতিকে অস্বীকার করা আপেক্ষিকতা-বাদের মধ্যে পড়ার শামিল, যা সমস্ত জ্ঞানের পক্ষে মারাত্মক।(১)

এ অবশ্য কুতর্ক ছাড়া কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রামাণিকত্ব এবং ধর্মীয় আপ্তবাক্যগুলির সঙ্গে কোনও তুলনা চলতেই পারে না, এই আপ্তবাক্য-গুলি সংগৃহীত হয়েছে আদিম ধর্মীয় রূপকথা থেকে যেগুলি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। রূপকথাগুলির ও ধর্মীয় আপ্তবাক্যগুলির বিজ্ঞানের দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা দূরে থাক, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-বস্তুবাদী দর্শন কর্তৃক এগুলি খণ্ডিত হওয়া উচিত।

সেই কারণেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়ানর চেষ্টায় বহু ধর্মীয় দার্শনিক নয়া-পজিটিভিস্টদের অনুসরণ ক'রে দাবি করতে চায় যে ধর্মীয় আপ্তবাক্যগুলি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিজ্ঞানগুলি থেকে জ্ঞানের সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রের জিনিস, কাজেই তার সঙ্গে বিরোধে আসতে পারে না।(২)

১। এম দ্য. উলফের অ্যান ইনট্রোডাকশান টু স্কলাসটিক ফিলজফি, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ১৯২ দেখুন।

২। "বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ ও জেনেসিসের মধ্যেকার আপাত গরমিল নিয়ে আর আমরা

একদিকে দর্শন ও সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানগুলির আধেয়কে ধর্মীয় তত্ত্বের অধীন করা ও অপর দিকে তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করান—এই দুটি ধারণার তফাত কেবল রূপে। তাদের উদ্দেশ্য একই, তা হল: ধর্মকে বাঁচান, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দর্শনের বিরুদ্ধে দার্শনিক তাৎপর্যের পক্ষ সমর্থন। সেই সঙ্গে এই দুই ধারণার মধ্যে পার্থক্য আবার বৈজ্ঞানিক প্রগতির গতিপথে উদ্ভূত অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে কিছু ধর্মীয় দার্শনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে "ভগবানে উত্তরণে"র জন্য। এই উদ্দেশ্যে যা কিছু আপ্তবাক্যকে খণ্ডন করে তা বর্জন করা হয়, এবং যা কিছু তার সঙ্গে একমত হয় তাকে আঁকড়ে ধরা হয় ও ব্যবহার করা হয়। যেমন ভগবানের অস্তিত্ব ও পৃথিবী সৃষ্টিকে "প্রমাণ" করার জন্য "মহাজগতের উত্তাপ মৃত্যুর তত্ত্ব"কে, মহাজগতের "সীমাবদ্ধতা" সম্পর্কিত অনুমানকে, জীবন, মন ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অসুবিধাগুলিকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বর্তমানকালের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি ভগবান কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির সাক্ষ্য দেয় না, বরং বস্তুর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-কলাপ, বস্তুর আপন গতির দ্বারা বিশ্ব-সৃষ্টির সাক্ষ্য দেয়, বাস্তব জগতের যে কোনও "স্রষ্টার" বা "চালকের"—অর্থাৎ ভগবানের দরকার নেই তারই সাক্ষ্য দেয়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে অনেক নয়া-টমিস্ট "উত্তাপ মৃত্যুর" মত ধারণার ভিত্তিতে মহাজগতের সীমাবদ্ধতার প্রমাণ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বোধ ক'রে বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে চায়, ধর্মতত্ত্বের অনড়ত্ব এড়াতে চায়। এই সমস্ত দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক অনুমান ও তথ্য-গুলির টমাস অ্যাকুইনাসের এবং ক্যাথলিসিজমের নীতি অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করতে চায়।

এই ব্যাখ্যার যোগান দেয় নয়া-টমিস্ট প্রাকৃতিক দর্শন, যা হাইলেমরফিজম (গ্রীক শব্দ হাইলে মানে বস্তু [ম্যাটার], মরফে মানে রূপ [ফর্ম])

বিরত নই; কারণ...প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকই বোঝেন যে বাইবেল জ্যোতির্বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের অন্য কোনও শাখার সারগ্রন্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি।" [এফ. কোপেলস্টন, কনটেম্পরারি ফিলজফি, লন্ডন ১৯২৬, পৃষ্ঠা ৩২] কিন্তু তা কি সত্য? প্রকৃত পক্ষে ঠিক ওই উদ্দেশ্যেই ওটি রচিত হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান ওকে সে ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করেছে।

এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তা এই কথা বলতে চায় যে প্রকৃতির সকল ব্যাপার বস্তু ও রূপ নিয়ে গঠিত এবং রূপ বস্তুকে নির্ধারণ করে। প্রাকৃতিক বস্তুগুলি তাদের রূপের নিখুঁতত্বের মাত্রা অনুযায়ী ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে সাজান থাকে, তলাকার ধাপগুলোতে থাকে অজৈব জিনিসগুলি, তার উপরে থাকে জৈব জিনিস, গাছপালা, জন্তু, ও শেষ ধাপে মানুষ। সমাজেও ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মীয় ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ থাকে, আর সর্বোপরি থাকে "স্বর্গীয়" ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ। টমাস অ্যাকুইনাসের মত অনুযায়ী এই ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের সর্বোচ্চ ধাপই হল নির্ধারক, কাজেই একে বিবর্তন-মূলকভাবে, অর্থাৎ নিম্নতর থেকে উচ্চতরের সৃষ্টি হিসাবে উপস্থিত করা যায় না। এই মত নয়া-টমিজম কর্তৃকও গৃহীত হয়েছে।

নয়া-টমিস্ট প্রাকৃতিক দর্শন তার ব্যাখ্যা যোগাড় করে একটা "অধিবিদ্যা" থেকে, যার কারবার হল "সত্তা", "ক্রিয়া ও সম্ভাব্য ক্ষমতা" এবং "সারমর্ম ও অস্তিত্ব" প্রভৃতির মত ধারণা নিয়ে। এই সব ধারণার বিশ্লেষণ নয়া-টমিস্ট তত্ত্বের নিষ্ফল পণ্ডিতী প্রকাশ ক'রে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ "সত্তার" টমপন্থী ধারণার কথা ধরা যাক।

নয়া-টমিস্ট অধিবিদ্যায় প্রারম্ভিক ধারণাটি হল "সত্তা", বিশ্বের সমগ্র মূর্ত আধেয় থেকে বিমূর্ত ক'রে একে তৈরি করা হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যা নিয়ে ব্যস্ত সেই গতি ও বিকাশের বিধানের সীমার বাইরে, গণিতের দ্বারা অনুশীলিত পরিমাণ, পরিসর ও স্থানের (space) সীমার বাইরে একটা অবশেষ থাকে। এই হল সত্তা, তার একেবারে গোড়ার নীতিগুলিই এমন যা সকল যুক্তিসংগত জ্ঞানের পক্ষে অভিন্ন। একেবারে অনির্দিষ্ট ধারণা হিসাবে সত্তাকে কেবল পুনরুক্তিমূলক ব্যাখ্যা করা যায়ঃ "সত্তা হল সত্তা", "সত্তা অ-সত্তা নয়", "সত্তা ও অ-সত্তার মধ্যে কোনও মধ্যবর্তী কথা নেই।" এইভাবেই আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যার বিধানগুলিকে (একাত্মতা, বিরোধ, বহির্ভূত মধ্য) সত্তার গুণ হিসাবে দাঁড় করান হয়। তারপর আসে ছ'টি "জ্ঞানাতীত" (ট্রানসেনডেনটালস): এনস (সারমর্ম), রেস (বস্তু), উনম্ (ঐক্য), আলিকুইদ (অন্য), ভেরুম (সত্য), বোনুম (শুভ)। কখনও কেবল চারটি জ্ঞানাতীত—ঐক্য, সত্য, শুভ ও সৌন্দর্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি যেহেতু বিরাজমান সকল কিছুরই গুণ, অতএব তুলনামূলকভাবে "সবচেয়ে বাস্তব

সত্তা"—ভগবানের উপরও আরোপ করা যেতে পারে। ভগবানের উপর যেহেতু কেবল তুলনীয়ভাবে আরোপ করা হয়েছে, অতএব আমরা জানি এগুলি ভগবানের মধ্যে সহজাত, কিন্তু জানি না কেমন করে তারা সহজাত। অতএব টমিজম একদিকে ভগবানের গুণগুলিকে জানা অসম্ভব মনে করে যে অজ্ঞেয়বাদ, তাকে এড়াল; অপরদিকে ভগবানের উপর মানবিক গুণ আরোপ করে যে অ্যানথ্রোপোমরফিজম্, তাকেও এড়াল।

এ সব যুক্তি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনও পণ্ডিতী রচনা থেকে নেওয়া হয়নি, নেওয়া হয়েছে ১৯১৪ সালে লুভ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন. বালথাজার কর্তৃক "নিউ আইডিয়াজ ইন ফিলজফি"(১) নামক একটি সংকলনের জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি প্রবন্ধ থেকে। এখানে আমরা এক নির্দিষ্টভাবে পণ্ডিতী দর্শনের সম্মুখীন যা বিভিন্ন "স্বয়ং-প্রতীয়মান" ধারণা থেকে এগোয়। যেগুলি থেকে আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নানা রকমের সিদ্ধান্ত টানা হয়। এই সব যুক্তিকে ফ্রান্সিস বেকন একবার যথা-যোগ্যভাবে বর্ণনা করেছিলেন মাকড়সার নিজের দেহ থেকে টানা সুতোর মত বলে। নয়া-টমিস্টরা এই সব যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা দেখতে অস্বীকার করে।

অ্যারিস্তোতলের সম্ভাবনা এবং ক্রিয়ার (বাস্তব) ধারণাকে ধার ক'রে এই সত্তার (সারমর্মের) ধারণাকে নির্দিষ্ট করা হয়। অ্যারিস্তোতল মনে করতেন যে এই সব ধারণাগুলি সম্ভাবনার বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার প্রকৃত প্রক্রিয়াগুলির প্রকাশ। কিন্তু তাঁর মত না হয়ে নয়া-টমিস্টরা সম্ভাবনাকে মনে করে প্রত্যেক সীমিত সত্তার খুঁতের প্রকাশ। ভগবান একটি "বিশুদ্ধ ক্রিয়া", ভগবান ছাড়া সমস্ত সত্তা ক্রিয়া ও সম্ভাবনার একটা সমন্বয়। যেমন একটা শিশু বাস্তবে শিশু, কিন্তু সম্ভাবনার দিক থেকে বয়স্ক। ক্রিয়া ও সম্ভাবনায় সম্পর্ক হল অপরাপর কোটীকে বিবেচনা করার প্রারম্ভিক বিন্দু, সে সব কোটী হল: সারমর্ম ও অস্তিত্ব (সারমর্ম হল সম্ভাবনা যা অস্তিত্বে বাস্তবায়িত হয়েছে), সারাংশ ও তার গুণাবলী—আকস্মিকতাসমূহ (সম্ভাবনা যেমন ক্রিয়ার সংগে সম্পর্কিত, আকস্মিকতাসমূহ তেমনি সারাংশের

১। নিউ আইডিয়াজ ইন ফিলজফি, ভল্যুম ১৭, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৯১৫ [রুশ ভাষায়] দেখুন।

সঙ্গে সম্পর্কিত), গঠন (সম্ভাবনার ক্রিয়ায় উত্তরণ ; কাজেই যে কোনও গঠনই খুঁত-ওয়ালা সত্তা)। এখানেও টমিস্ট ধারণার অন্তঃসারশূন্যতা দেখে অবাক হতে হয়। নয়া-টমিস্টদের সম্ভাবনা ও বাস্তবতার দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, তাদের কাছে এসব কোটী একটা ধর্মীয় দ্বৈততার ভিত্তি হয়ে ওঠে, যা দেবতা ও তার "নিখুঁতত্বগুলিকে" বৈষয়িক পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড় করায় পৃথিবীকে খুঁত-ওয়ালা কিছু একটা হিসাবে ধরে নিয়ে।

এই দ্বৈততা বিশেষত প্রতীয়মান হয় জ্ঞান সম্বন্ধীয় নয়া-টমিস্ট তত্ত্বের মধ্যে। জ্ঞানকে তারা সাধারণত দুটি ধারণা দিয়ে পরিচিত করে—"বাস্তবতা" ও "যুক্তিযুক্ততা"। প্রথমটি বোঝায় যে নয়া-টমিজম এমন একটা বাস্তবতা থেকে এগোয় যা মানবিক যুক্তি থেকে স্বাধীন। কিন্তু এই "বাস্তবতা"কে সঙ্গে সঙ্গে নিরর্থক করে তোলা হয় এই কথা বলে যে বাস্তব জগৎ দৈবী যুক্তির উপর নির্ভরশীল, কারণ তা ভগবানের সৃষ্টি অর্থাৎ এমন একটা গঠনের সৃষ্টি যা সারমর্মের দিক থেকে আদর্শ। নয়া-টমিস্টরা "বাস্তবতা"কেও স্বীকার করে, সে "বাস্তবতা" হল সর্বজনিকগুলির (ইউনিভার্সাল) অর্থাৎ সাধারণ ধারণাগুলির মানুষের মনের উপর নির্ভর না করা। তারা নরমপন্থী বাস্তবতার(১) অবস্থান নেয়, স্বীকার করে যে বস্তুর (ভগবানের মনে) আগে, বস্তুতে (তার সারমর্ম হিসাবে, মন যতটা ধারণা করতে পারে) এবং বস্তুর পরে (মানব মনের ধারণা হিসাবে) সর্বজনিকগুলির অস্তিত্ব আছে। কাজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান, যার নির্দিষ্ট ভূমিকা নয়া-টমিজমের দ্বারা স্বীকৃত, তা কেবল "বৈষয়িক মোড়ক" নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু বস্তুর সারমর্ম কেবল মনন দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই নয়া-টমিস্টদের "বাস্তববাদ" কেবল বিষয়গত ভাববাদ।

নয়া-টমিস্টদের "যুক্তিযুক্ততার" বা "যৌক্তিকতাবাদের" দাবিও আমাদের এর চেয়ে ভাল অবস্থায় নিয়ে যায় না। নয়া-টমিস্টরা বিশ্বাস করে যে তারা

১। সর্বজনিকগুলির (সাধারণ ধারণাগুলির) "বাস্তববাদী মতবাদ মধ্যযুগে আবির্ভূত হয়েছিল। জন স্কটাস এরিসেনা (নবম শতাব্দী), ক্যান্টারবারির আনসেলম এবং উইলিয়াম শ্যাম্পিউ (১১শ শতাব্দীর শুরু থেকে ১২শ শতাব্দী) প্রভৃতি বাস্তববাদীরা বলতেন সর্বজনিক-গুলি আসলে কেবল ভগবানের মনের মধ্যেই বিরাজ করে, আর বৈষয়িক দুনিয়া তার একটা খুঁত-ওয়ালা নকল।

অযৌক্তিকতাবাদ বর্জন করে এবং যুক্তি ও মননের কৃতিত্ব স্বীকার করে ; কিন্তু টমিস্ট "র‍্যাশনালিজম" বা "যৌক্তিকতাবাদ" মেকি-যৌক্তিকতাবাদ, কারণ তা মানবিক যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর "অতি-অযৌক্তিক সত্যের" আত্মপ্রকাশের প্রাধান্য স্বীকার করে। উপরন্তু টমাস অ্যাকুইনাস তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় যতটা সম্ভব ততটা পরিমাণে যুক্তিকেই-ভগবানের অস্তিত্ব "প্রমাণ" করার জন্য ব্যবহার করেছেন।(১) কাজেই টমিস্ট ও নয়া-টমিস্ট মেকি-যৌক্তিকতাবাদ সম্পূর্ণভাবে ধর্মের সেবাতেই নিয়োজিত হয়েছে। বিশ্বাসকে সমর্থন করতে যুক্তিকে বাধ্য ক'রে এ দর্শনকে জ্ঞানের উৎস হিসাবেও উড়িয়ে দিয়েছে। বার্টরান্ড রাসেল ব্যাপারটা ভালভাবেই তুলে ধরেছিলেন যখন লিখেছিলেন : "দার্শনিকতা করতে শুরু করার আগেই তিনি (অর্থাৎ টমাস অ্যাকুইনাস—সম্পাদক) সত্যকে জানেন ; তা ক্যাথলিক বিশ্বাসে ঘোষিত।…পূর্বপ্রদত্ত সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তি খুঁজে বের করা দর্শন নয়, বিশেষ ওকালতি।"(২)

১। টমাস অ্যাকুইনাস মনে করতেন ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের পাঁচ রকম উপায় আছে : (১) পৃথিবীতে গতির অস্তিত্ব আগে থেকে ধরে নেয় যে এর গতিহীন চালকের অস্তিত্ব আছে যিনি কোনও কিছুর দ্বারা গতিমান হননি ; (২) লোকে যেহেতু সীমাহীন সংখ্যক কারণ ধরে নিতে পারে না, কাজেই ভগবানকে প্রথম কারণ হিসাবে ধরতে হবে ; (৩) অস্তিত্বশীল বস্তুগুলি আকস্মিক, সেগুলির অস্তিত্ব থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, কিন্তু সমগ্র দুনিয়া ওরকম হতে পারে না, এবং একটা একান্ত প্রয়োজনীয় সারমর্ম আয়ত্ত করে। (৪) পৃথিবীতে যে নিখুঁতত্বের মাত্রা অনুযায়ী ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ আমরা দেখি তা একেবারে নিখুঁত এক সত্তার অস্তিত্ব দাবি করে ; [৫] যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সে সবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থেকেই ধরে নিতে হবে যে সেগুলি যুক্তিমান সত্তার দ্বারা সৃষ্ট। এই সব "প্রমাণ" একদিকে তুলনার উপর ভিত্তি করে আছে, এবং অপরপক্ষে বস্তুর আত্ম-গতি অসম্ভব—এই একটা অপ্রমাণিত অনুমান থেকে অগ্রসর হয়। কাজেই এগুলিকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না।

২। বার্টরান্ড রাসেল, হিস্ট্রি অব্ দ্য ওয়েস্টার্ন ফিলজফি, অ্যান্ড ইটস কানেকশন উইথ পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল সারকামস্টান্সেস ফ্রম দ্য আর্লিয়েস্ট টাইমস টু দ্য প্রেজেন্ট ডে. লন্ডন, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ৪৮৫।

মধ্যযুগীয় টমিজম ছিল সামন্ততন্ত্রের মতাদর্শগত সমর্থন। আমাদের কালে নয়া-টমিজম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে এক নতুন ভূমিকা পালন করে। যে ধর্মকে টমিজম "প্রমাণ" করে তারই মত আর একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে সে এই রূপান্তর ঘটিয়ে নিয়েছে, এই গঠন সামন্ততন্ত্র থেকে পৃথক, কিন্তু একটা অভিন্ন ভিত্তির দ্বারা তার সঙ্গে সম্পর্কিত। কাজেই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে নয়া-টমিজমের সামাজিক-দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবিনশ্বরতা এবং সমাজে শ্রেণীবিভাগের "স্বাভাবিকতা" থেকে উদ্ভূত। সেই ১৮৭৮ সালেই পোপ ত্রয়োদশ লিও ঘোষণা করেছিলেন যে সম্পত্তির অধিকার "মানুষের একেবারে সারমর্মের মধ্যে নিহিত।" ক্যাথলিক সামাজিক তত্ত্ববিদ গুস্তাভ গুন্ডলাখ লিখেছেন: "ক্যাথলিক সামাজিক তত্ত্ব···ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজ সংগঠনের সবচেয়ে জরুরী রূপকে দেখতে পায়।" (১) কাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্যাথলিসিজম্-এর নৈতিক সমর্থন ও মঞ্জুরি পেয়েছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরোধগুলি, যা আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেই উদ্ভূত, সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে না পেরে নয়া-টমিস্টরা সেগুলিকে ব্যক্তিদের পাপাচরণ, ধর্মীয় আদেশ অগ্রাহ্য করা এবং ক্রিশ্চিয়ান নৈতিকতা অমান্য করার ফল বলে ঘোষণা করে। ন্যায়বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের ব্যাপার। "বিবেক নিয়োগকারীকে বলে যে তার সহকারীদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া তার কর্তব্য এবং তাদের শোষণ করার তার কোনও অধিকার নেই। বিবেক নিযুক্ত লোকদের ও নিয়োগকারীর ক্ষতি করতে নিষেধ করে।"(২) একথা লিখেছেন পশ্চিম জার্মান নয়া-টমিস্ট হাইনরিখ ফাল্ক। কিন্তু পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করে এই কারণে নয় যে তাদের বিবেক নেই, কারণ এই যে শোষণ-ভিত্তিক একটা সমাজে এই সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনই চালু। কোনও এক বা অপর

১। জি. গুন্ডলাখ ডি অর্ডনুং ; ডেয়ার মেনশলিশেন গেজেলশাফট. খণ্ড ১, কলোন ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৩৫।

২। এইচ. ফাল্ক, ডি ইডিওলোগিশেন গুন্ডলাগেন ডেস কম্যুনিজমুস, মুয়েনশেন, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৯৯।

পুঁজিপতির হৃদয় যতই কোমল হোক না কেন, সে তার শ্রমিককে শোষণ করতে বাধ্য হয় নইলে দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে বলে। উপদেশ বিতরণকারী নয়া-টমিস্টরা এই বস্তুগত প্রয়োজনটিকেই ঢাকতে চায়।

তা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির সামনে পড়ে ক্যাথলিক গীর্জার মতাদর্শবিদরা বাধ্য হয় কূটচাল দিতে যাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকাশ্য ওকালতির দরুন জনগন বিরুদ্ধে না যায়। সেই কারণেই তাদের সামাজিক কর্মসূচী একটা "তৃতীয় পন্থা"র ভাবধারার প্রস্তাব করে, যা নাকি ধনতন্ত্র ও কমিউনিজমের "চরমগুলিকে" এড়িয়ে যাবে। এই হল রাজনীতিতে যাজকতন্ত্র, অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির বাকসর্বস্ব সমালোচনা এবং পেতি-বুর্জোয়া সম্পত্তির পক্ষ সমর্থন। গুস্তাভ গুন্ডলাখ লিখেছিলেন: "ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠানটি...তার সাংগাঠনিক ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না যদি না ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যাপকভাবে বণ্টিত হয়।"(১) কিন্তু বর্তমান কালের পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির কাছে আবেদন একদিকে পেতি-বুর্জোয়া মোহ সৃষ্টি করে, অপরদিকে "সম্পত্তির ব্যাপক বণ্টন" ছড়িয়ে দেওয়া এবং "আয়ে বিপ্লব" প্রভৃতি যে সব বুর্জোয়া প্রচার তাদেরই আর এক প্রচার "কল্যাণ রাষ্ট্রের" ভিত্তি, সেই সব কাল্পনিক প্রচারকে মদত দেয়।

নিও-টমিজম তার ইতিহাসের দর্শনে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে অদৃষ্টবাদের ও ভবিতব্যতার মনোভাব ব্যাখ্যা করে, ভগবানের "শাশ্বত" পরিকল্পনা রূপায়ণের লক্ষ্য-অভিমুখী একটা প্রক্রিয়া হিসাবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে দেখে। কাজেই জনগণের সচেতন ক্রিয়াকলাপকে "দেব মূল্যবোধের শৃঙ্খলার অধীন হতেই হবে, ওই শৃঙ্খলার আবার ভিত্তি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানুষ ভগবানের ভাবমূর্তি অনুযায়ী ও সাদৃশ্য অনুযায়ী সৃষ্ট হয়েছে। এসবের আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ব্যক্তির উপর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপান, এবং তার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বাজারের অর্থনীতি এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সংগঠনের তথাকথিত অপরিবর্তনীয় রূপ হিসাবে বজায় রাখা।

১। জি. গুন্ডলাখ, ডি অর্ডনুন; ডেরার মেনশলিশেন গেজেলশাফট, মুয়েনশেন, খণ্ড ১ঃ পৃষ্ঠা ৩৫।

সেই উনবিংশ শতাব্দীতেই ক্যাথলিসিজম সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে "ভয়ংকর অনিষ্ট এবং সভ্য সমাজের প্রায় মৃত্যু"(১) বলে নিন্দা করেছিল। নয়া-টমিজমই দর্শনে বস্তুবাদের ও বিশেষত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সুদৃঢ় বিরোধী, সে আসলে যুক্তির পূর্বোক্ত ধারাই নিয়েছে। সমসাময়িক আদর্শবাদের অন্য কোনও রকমফের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনের "সমালোচনা" ক'রে এত প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করে না। নয়া-টমিজম মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তা "নৈতিক বস্তুবাদ (বিষয়বাদ)", অর্থাৎ বিষয়বাদী আদর্শের কাছে সর্বোচ্চ আদর্শগুলিকে বিসর্জন দেয়, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাকে অচেতন পদার্থের গতির বিধানের অধীনস্থ ক'রে তোলে; যান্ত্রিকতাবাদ এবং চিন্তার তত্ত্বের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করে, বস্তুবাদের সংগে দ্বান্দ্বিকতাকে সমন্বয় করার জন্য দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের-যে চেষ্টা তা সমন্বয়ের অতীত দুই বস্তুকে সমন্বয়ের চেষ্টা করে, ইত্যাদি। অপর দিকে নয়া-টমিস্টদের পক্ষ থেকে মার্কসবাদের সঙ্গে একটা "বোঝাপড়ায় আসা", তার কিছু কিছু সিদ্ধান্ত "মেনে নেওয়ার" চেষ্টাও দেখা যায়—কিন্তু তার শর্ত হল যে সেগুলিকে নয়া-টমিজমের সাধারণ ধর্মীয়-দার্শনিক গতিমুখের অধীন হতে হবে। এই শর্ত থেকেই অবশ্য তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় যে নয়া-টমিস্টদের উদ্দেশ্য হল দর্শনকে তার বস্তুগত আধেয় থেকে বঞ্চিত করা এবং তাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের অধীন করা। নয়া-টমিজমের সামাজিক তত্ত্বেরও এই একই অবস্থা। এই সব তত্ত্বের মধ্যে নানান ধরনের মনোভাব দেখি, সমাজতন্ত্রকে "পৃথিবী সম্পর্কে শয়তানী দৃষ্টিভঙ্গি" বলে সরাসরি নিন্দা থেকে শুরু ক'রে জনগণের উপর কমিউনিস্ট বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং সমাজবিকাশের উপর বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে ছেনালি করা পর্যন্ত তার মধ্যে আছে।

* * *

আধুনিক ভাববাদের যে সব মৌলিক ধরনকে আমরা পরীক্ষা করলাম তা একে অপর থেকে পৃথক। তার মধ্যে নানান ধরনের দার্শনিক চিন্তা পড়ে—আনুষ্ঠানিকভাবে বৈজ্ঞানিক পজিটিভিস্ট থেকে ইররাশনালিস্ট ও

১। অ্যালিঘিয়েরো তোদ্দি, আই গেসুইতি, প্যারেন্তি এদিতোরে, ফিরেনজে, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ৯২।

ধর্মীয় চিন্তা পর্যন্ত। ভাববাদের সমর্থনে তারা নানা রকমের যুক্তির অবতারণা করে এবং তাদের বিভিন্ন তত্ত্বে ভাববাদ নিজেও নানা রূপ পরিগ্রহ করে। এই সমস্ত প্রবণতাই চরিত্রের দিক থেকে ভাববাদী, কিন্তু তাদের আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটা ঐক্য আছে, সে হল তাদের মতাদর্শগত লক্ষ্যের ও সামাজিক ভূমিকার ঐক্য। সেই কারণেই তাদের মধ্যে "মতৈক্য", "শ্রম বিভাগ" ও পরস্পরকে পুনর্বাসনের সম্ভাবনা থাকে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখছি যে বিজ্ঞানের দার্শনিক ভূমিকাকে নস্যাৎ করা আধুনিক ভাববাদের সমস্ত মূল ঝোঁকগুলির মধ্যেই আছে। এই ভিত্তিতে ধর্মীয় দর্শন ও অযৌক্তিকতাবাদ প্রায়ই নয়া-পজিটিভিস্ট বিজ্ঞান তত্ত্বের সঙ্গে একমত হয়; এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিজ্ঞানকে দেখা হয় বৈজ্ঞানিক ভাষার প্রথাসিদ্ধভাবে স্বীকৃত কাঠামোর দ্বারা ঐক্যবদ্ধ কতকগুলি প্রমাণিত বিবৃতির একটি ব্যবস্থা হিসাবে। আধুনিক নয়া-পজিটিভিস্টরা আবার ধর্মীয় বা ইররাশনালিস্ট দর্শনের ধারণাগুলির "জরুরী অর্থের" দরুন সেগুলিকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক নয়। যে সব দার্শনিক চিন্তা স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হয়েছিল অথবা কতকগুলি দিক থেকে পরস্পর-বিরোধী ধারণা সমন্বিতও ছিল তাদের মধ্যে "বোঝাপড়া" বা এমনকি মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অনেক সময়ে দেখা যায়। আর এ অবশ্য আকস্মিক নয় যে বর্তমানে সকল ভাববাদী প্রবণতাই মার্কসবাদী দর্শনের সমালোচনায় ঐক্যবদ্ধ।

তবে আধুনিক ভাববাদের কোনও একটি দার্শনিক ব্যবস্থাও, সে পৃথক পৃথক ভাবেই হোক আর সকলে একত্রেই হোক, সামাজিক বিকাশ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা উত্থাপিত কোনও প্রশ্নের প্রত্যয়জনক জবাব দেয় না। বর্তমান কালের বুর্জোয়া দর্শনের মূল প্রবণতাগুলির বিচার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব

সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব আমাদের সামনে বহুসংখ্যক মত ও ঝোঁক হাজির করে যেগুলি এক দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। একদিকে তারা ধনতন্ত্রের প্রতি মতাদর্শগত সমর্থন যোগায়, বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের কাঠামো, তার সারমর্ম এবং সমাজবিকাশের পরিচালিকা শক্তিসমূহ ও সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে; অপরদিকে এমন কিছু অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান সরবরাহ করার চেষ্টা করে যা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের বাস্তব পরিচালনার জন্য প্রয়োজন।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের অভিজ্ঞতাজনিত গবেষণা যথেষ্ট সংখ্যক তথ্য-সংক্রান্ত উপাদান যুগিয়েছে, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন বিভাগ ও দিক সম্বন্ধে অনুশীলনের প্রায়োগিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে এবং কিছু বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ-সম্পন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে সমাজের বুর্জোয়া তত্ত্বগুলি, তাদের মূল নীতিগুলি ও সাধারণ তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলির কোনও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আসল কথা হল যে বুর্জোয়ারা এখন আর সমাজ-জীবনের বিধানসমূহ ও মৌলিক পরিচালিকা শক্তিসমূহের বিষয়গত জ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী নয়, কারণ সমাজ বিকাশের প্রকৃত ঝোঁকগুলি দেখিয়ে দেয় যে শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক সমাজের অবলোপ সাধন প্রয়োজন।

বর্তমানে অ-মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বে এমন একদল বিজ্ঞানী রয়েছে যারা বিভিন্ন মাত্রায় বুর্জোয়া বাস্তবতার বিভিন্ন দিকের নীতিভ্রষ্টতা ও অমানুষিকতা সম্পর্কে সচেতন, তাকে অল্পবিস্তর তীক্ষ্ন সমালোচনা করে এবং সমাজের মার্কসবাদী বিজ্ঞান সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সমাজতত্ত্ববিদদের এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন আমেরিকান অধ্যাপক রাইট সি. মিলস ও তার সমর্থকদের মত যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি ও সততা সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকেরা যারা দর্শনগত

ও সমাজতত্ত্বগত নির্ধারিত সূত্র সহ ধনতান্ত্রিক সমাজের যুগব্যাপী ঐতিহ্যগুলির প্রভাবকে বিভিন্ন মাত্রায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন।

কিন্তু এইসব বিজ্ঞানীরা সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বগত তত্ত্বগুলির ভাবমূর্তি ঠিক করে না। এর আদর্শ প্রতিনিধিরা হল এমন সব সমাজতত্ত্ববিদ যারা কঠোর বস্তুনিষ্ঠতা, কোনও বিশেষ মতের সঙ্গে আবদ্ধ না থাকা ও আদর্শগত নিরপেক্ষতার দাবি করলেও এবং নিজেদের রাজনীতি থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করলেও তারা এমন সব মতবাদকে ব্যাখ্যা করে ও সমর্থন করে যা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের নীতির তত্ত্বগত ভিত্তি যোগায়।

বুর্জোয়া সমাজচিন্তাধারা এমন গভীর সংকটজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে, কারণ তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক সামান্যীকরণগুলিও ইতিহাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে না। তাই তা ক্রমাগত ছলাকলার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, একটির বদলে অপর একটি বসাচ্ছে, সেটিও আবার আগেরটির মতই অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী বলে জীবন কর্তৃক প্রমাণিত হচ্ছে।

তত্ত্বগত সামান্যীকরণের স্তর অনুযায়ী সমাজ সম্পর্কে সমসাময়িক বুর্জোয়া মতবাদকে তিনটি বড় বড় গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যদিও অবশ্য আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে তাদের মধ্যেকার সীমারেখাটি কিছু পরিমাণে আপেক্ষিক। প্রথম গোষ্ঠীর ধারণাটি সমাজ জীবনের সর্বজনিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণের চেষ্টা করে এবং ইতিহাসের সর্বাত্মক নীতি ও বিধানগুলি সূত্রাকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। সর্বাপেক্ষা বিমূর্ত সামাজিক মতবাদ হল ইতিহাসের আধুনিক বুর্জোয়া দর্শন। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল নিছক সমাজতত্ত্বগত তত্ত্বগুলি, বিশ্ব-ইতিহাসের ব্যবস্থা সৃষ্টির দিকে তাদের গতিমুখ নয়, বরং সেই সব সামাজিক ঘটনাই তারা বিচার করে যার বেশির ভাগই ধনতান্ত্রিক সমাজে সহজাত। তৃতীয় গোষ্ঠীতে আমরা দেখতে পাই এমন বহুসংখ্যক মত ও গোষ্ঠী যারা বুর্জোয়া সমাজের সংকীর্ণ ও স্থানীয় ক্ষেত্রগুলিতে ও সামাজিক ঘটনাগুলির বিবরণের প্রারম্ভিক শ্রেণীবিন্যাস নিয়েই উদ্বিগ্ন। এই সমস্ত অনুশীলনের অন্তর্ভুক্ত হল আধুনিক বুর্জোয়া অভিজ্ঞতাজনিত সমাজতত্ত্ব।

১. ইতিহাসের বুর্জোয়া দর্শন

অতীতের মতই বর্তমানেও ইতিহাসের বুর্জোয়া দর্শন সর্বজনিক নীতি-সমূহ এবং সমগ্র ইতিহাসে প্রযোজ্য পদ্ধতিগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সমাজ বিকাশের সর্বাপেক্ষা সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ও সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করার কর্তব্যটি অবশ্যই একটি বাস্তব সমস্যা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে মন্তেস্কু, ভলতেয়ার, কনডরসেট, হেরডের ও হেগেলের মত ইতিহাসের দর্শনের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা উদীয়মান বুর্জোয়াদের সেইসব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন করতেন যেগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে আগ্রহী ছিল। এই সব চিন্তাবিদদের কাল্পনিক ধারণা ও ব্যবস্থা তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, সমাজ বিকাশের বিধিশাসিত চরিত্র, সামাজিক প্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কিত চমৎকার ধ্যান-ধারণা ও অনুমানে সমৃদ্ধ।

১৮৩০-এর দশকে পজিটিভিস্ট সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের পুরানো দর্শনকে আক্রমণ করে। এই সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতারা (কমতে ও স্পেনসার) ও তাদের অনুসরণকারীরা সমাজের সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক জ্ঞানের পক্ষে একটি বক্তব্য দাঁড় করিয়েছিল এবং অভিজ্ঞতাজনিত তথ্যগুলি থেকে বিচ্যুত বিমূর্ত ঐতিহাসিক ব্যবস্থাগুলিকে বর্জন করেছিলেন। যদিও পজিটিভিস্ট সমাজ-তত্ত্বের পক্ষাবলম্বনকারীদের ভাববাদী সাধারণ সমাজতত্ত্বগত ধারণাগুলি পরিত্যাগ করার কোনও ইচ্ছা আদৌ ছিল না, তথাপি অভিজ্ঞতাজনিত সমাজ-তত্ত্বের দিকে বুর্জোয়া সামাজিক অনুশীলনগুলি যে মোড় নিয়েছিল তা ইতিহাসের দর্শনের অবস্থানগুলিকে দুর্বল করতে পেরেছিল।

ইতিহাসের বর্তমান সময়ের বুর্জোয়া দর্শন অতীতের যুক্তিসঙ্গত, প্রগতিশীল ধারণাগুলি পরিত্যাগ করেছে। এ সাধারণত প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলির সামান্যীকরণ এড়িয়ে যায় এবং বাস্তবের বিভিন্ন দিককে অতিরঞ্জিত ক'রে বা নিঃশর্ত ক'রে নিজের ধারনাগুলিকে তৈরি করে। এতে ক'রে সামাজিক বিকাশের, তার পরিচালিকা শক্তিসমূহের ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রকৃত ছবিকে বিকৃত করা হয়।

ইতিহাসের বুর্জোয়া দর্শনের বহু প্রবক্তা (তাদের মধ্যে সমাজতত্ত্ববিদরাও পড়ে) তাদের ভাববাদী বিশ্বাসকে খোলাখুলি দেখাতে পছন্দ করে না। তারা প্রস্তাব করে যে বস্তুবাদ ও ভাববাদ উভয়েরই "ঊর্ধ্বে" দাঁড়াতে হবে, তারা ইতিহাসের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজ জীবনের একটি নানা তত্ত্ববাদী (প্লুরালিস্টিক) দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে যেসব বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে সেগুলিকে তারা সমান ও স্বাধীন নীতি বলে গণ্য করে।

এই রকম একটা যুগে যখন অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভূমিকা এত প্রবল ও সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে তখন ইতিহাসের বুর্জোয়া দর্শন ও বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব সেগুলিকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ওই সব সম্পর্কগুলিকে তারা সমাজ-জীবনের বহু নিয়ন্ত্রক উপাদানের মধ্যেকার একটি মাত্র বলে মনে করে। একই সঙ্গে আবার ওই সব উপাদান স্বাধীন ও মূল্যের দিক থেকে সমান বলে তাদের যে যুক্তি তা বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদদের আত্মিক নীতিগুলির কাছে বিষয়গত অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির উদয় ও বিকাশকে কোনও না কোনও ভাবে অধীন করা থেকে বিরত করে না। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ রেমঁদ আরোঁর যুক্তিগুলি এই ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমূলক। উৎপাদিকা শক্তি ও কৃৎকৌশলের মত বৈষয়িক উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করতে তিনি রাজী। কিন্তু একথা বলার পর তিনি আমাদের বলেন যে ইতিহাসের বিকাশের পরিচালিকা শক্তি খুঁজতে হবে মানবমনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্ষমতাসমূহের মধ্যে।

জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে উচ্চে তুলে ধরা এবং জনগণের ভূমিকাকে খাটো ক'রে দেখান ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে ও এখনও করছে। ঐতিহাসিক ভাববাদের প্রবক্তারা ইতিহাসের গতির চূড়ান্ত ভিত্তিকে এবং সকল প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কারণগুলিকে জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবীদের গুণ অথবা ত্রুটি, ক্ষমতা অথবা দুর্বলতা, জ্ঞান অথবা ভুল, সাহস অথবা কাপুরুষতার মধ্যে দেখে।

বর্তমান কালে সমাজের বুর্জোয়া তত্ত্বগুলির ভাববাদ ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সমাজের বিকাশের বিধি-শাসিত চরিত্রটির

অস্বীকৃতি। একটি সামাজিক গঠন থেকে আর একটি সামাজিক গঠনে প্রয়োজনীয় ও বিধি-শাসিত উত্তরণ সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণাটির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজ চিন্তাধারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে অনিমিত্তবাদের (indeterminism) ধারণাটিকে দাঁড় করায়। তারা একে দেখে আলাদা আলাদা, অনন্য তথ্য ও পরিস্থিতিগুলির দৈবাৎ যোগাযোগ মাত্র হিসাবে। ইতিহাসের এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন ক'রে এ হিস্ট্রি অব ইউরোপ নামক পুস্তকে হার্বার্ট এ.এল.ফিশার লিখেছেন: "একটি ঢেউ-এর পর যেমন আর একটি ঢেউ আসে সেই রকমই আমি কেবল দেখি একটি জরুরী অবস্থার পর আর একটি জরুরী অবস্থা, দেখি একমাত্র একটা বিরাট তথ্য যে সম্পর্কে; যেহেতু তা অনন্য কোনও সামান্যীকরণ হতে পারে না; দেখি ইতিহাসবিদদের পক্ষে একটিমাত্র নিরাপদ নিয়ম: মানবের ভবিষ্যতের বিকাশে তাকে আকস্মিক ঘটনা ও অদৃষ্টের ভূমিকাকে স্বীকার করতে হবে।"(১)

পুরানো নয়া কান্টপন্থীরা প্রকৃতি ও সমাজকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। তারা প্রকৃতিকে অন্ধ আবশ্যকতার ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করে এবং সমাজকে করে মুক্তির ক্ষেত্র হিসাবে। বিষয়বাদী স্কুলের বহু সমসাময়িক দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদ ওই চিন্তাধারাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

ইতিহাসের বুর্জোয়া দর্শনের পদ্ধতিগত অবস্থানগুলি যথেষ্ট পরিমানে অযৌক্তিকতাবাদের (ইররাশনালিজম) দ্বারা প্রবাহিত হয়। জার্মান দার্শনিক উইলহেলম ডিলথের দৃষ্টিভঙ্গি এই ক্ষেত্রে কোনমতেই গুরুত্বহীন নয়। ডিলথে ইতিহাসকে কাঠামো ও বিধানসমূহ ব্যতিরেকে একটি অযৌক্তিক ঘটনাস্রোত রূপে গণ্য করেছেন। এইসব অবিদ্যমান সামাজিক বিধানগুলি খোঁজার এবং সেই সব বিধানের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা নিরর্থক। উপলব্ধির প্রক্রিয়াটি হল অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়া। ইতিহাসবিদদের কর্তব্য হল যে মানুষেরা ইতিহাস তৈরি করে তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব "যথাযথভাবে" যাওয়া এবং এই সব

১। এইচ. এ. এল. ফিশার, এ হিস্ট্রি অব ইউরোপ, লন্ডন ১৯৩৬, ভল্যুম ১ পৃষ্ঠা সপ্তম।

অভিজ্ঞতাগুলির বর্ণনা দেওয়া। বিষয়গত বিধানগুলি থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাস এইভাবে বহুলাংশে বর্ণনামূলক মনস্তত্ত্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

সমাজ বিকাশের বিধি-শাসিত চরিত্রের অস্বীকৃতি সামাজিক ঘটনাবলী জানার, তার সার সারমর্ম আবিষ্কার করার সম্ভাবনাকে অস্বীকার (অজ্ঞেয়বাদ) করার সঙ্গে যুক্ত। যদি ইতিহাসের সব কিছুই আলাদা আলাদা ও অনন্য হয় তবে ইতিহাসবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ অর্থনীতিবিদরা কোন্ পথ ধরে চলবে? কোনও ব্যাখ্যা নয়, শুধু অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্যাবলীর বর্ণনা, ক্রমবিন্যাস ও শ্রেণীবিভাগ, আত্মিক মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব তথ্যের মূল্যায়ন (নয়া-কান্টবাদ) অথবা ইতিহাসবিদের নিজের চিন্তা ও ধারণার ভিত্তিতে তথ্যগুলির মূল্যায়ন (উদাহরণ স্বরূপ, ফরাসী দার্শনিক মরিস মালো-পন্তি যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন)। যারা ইতিহাস লেখে ইতিহাস প্রধানত তাদেরই মন কল্পনার বিষয়বস্তু—এই ধারণাটি বুর্জোয়া ইতিহাস রচনায় খুবই প্রচলিত।

এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদী যুগে বুর্জোয়া বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির অযৌক্তিকতাবাদ, অসম্ভবতাবাদ ও সহজাতবোধতত্ত্বের মত বৈশিষ্টগুলির সঙ্গে সমাজতত্ত্বে অজ্ঞেয়বাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক আছে।

অনেক সমসাময়িক বুর্জোয়া দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বোধগম্য করার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি ও বাধাবিপত্তিগুলিকে নিঃশর্ত করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ, এইরকমই হল দ্য ল্য কনেসাঁস হিস্তরিক (ঐতিহাসিক জ্ঞান সম্পর্কে)-এর লেখক ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ আঁরি মারাউ-এর তত্ত্বগত জ্ঞানীয় ধারণা। তিনি বলেন যে প্রত্যেক ইতিহাসবিদ শুধু তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ করে না, সেই সঙ্গে সে যে সামাজিক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত তার অবস্থানগুলিও প্রকাশ ক'রে থাকে। কিন্তু এই সঠিক প্রতিজ্ঞা থেকে অগ্রসর হয়ে বিষয়গত এবং সাধারণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত টানা হয়। মারাউ এই সত্যকে পাশ কাটান যে শ্রমিকশ্রেণীর তো বটেই, প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির মতাদর্শবিদরা কিছু কিছু সীমার মধ্যে বিষয়গত ঐতিহাসিক সত্যকে পুনর্জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে।

বিষয়গত ঐতিহাসিক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে যথেষ্ট সংখ্যক

সমসাময়িক বুর্জোয়া মতাদর্শীবিদরা বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টির বিরুদ্ধে, বিশেষত মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়েছে। রেমঁদ আর' লিখেছেন: "...আমার মনে হয় ভবিষ্যৎকে দেখার চেষ্টা করা হল সময় নষ্ট করা...অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এমন বহুসংখ্যক উপাদানের উপর নির্ভরশীল যাতে একথা বলা অসম্ভব যে ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।" (১) এই কথা অবশ্য আর' ও অপরাপর সমাজতত্ত্ববিদদের ভবিষ্যতে তাঁরা কি দেখতে চান সে সম্পর্কে নিজেদের ভবিষ্যদ্বাণী করা থেকে বিরত করেনি। এইসব "ভবিষ্যদ্বাণীগুলির" অন্তর্ভুক্ত হল এই দাবি যে "শিল্পগত সমাজের" দুটি ধরন—ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—অবসম্ভাবীভাবে মিশে যাবে অথবা ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রকে গ্রাস করে ফেলবে।

সমসাময়িক বুর্জোয়া তত্ত্বগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তাদের সমাজবিকাশের আধিবিদ্যক ও দ্বান্দ্বিকতা-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাস হিসাবে উপস্থিত করার নীতিকে অস্বীকার করা। এইসব মতবাদের অনেকগুলিতে ঐতিহাসিক জ্ঞানকে নির্দিষ্ট সামাজিক দেহযন্ত্রটির কাঠামো ও কার্যকলাপের অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, আর এর উৎসের, বিকাশের ও এর জায়গায় আরও প্রগতিশীল সম্পর্কগুলির প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানের কাজ অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করা হয়। বুর্জোয়া সমাজচিন্তার ওই একই প্রতিনিধিরা যারা বিকাশের নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চায়, তারা একে কোনও অভ্যন্তরীণ বিরোধ, নিরবচ্ছিন্নতার কোনও ছেদ অথবা কোনও বিপ্লবী উল্লম্ফনশূন্য বিবর্তনের এক মসৃণ প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করে।

অবশ্য নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থাকে তার আপেক্ষিক অপরিবর্তনীয়তা ও স্থায়িত্বের দিক থেকে অনুশীলন করার মূল্যকে কেউ সন্দেহ করে না। কিন্তু যখন এই আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে অনপেক্ষে পরিণত করার কথা ওঠে, যখন কালস্রোত থেকে সমাজের দেহযন্ত্রটিকে বের ক'রে নেওয়া হয় এবং সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধগুলিকে, তার বিকাশকে, তার রূপান্তরকে ও অপরিহার্যভাবে অপর সমাজ ব্যবস্থা আসাকে বিবেচনার বাইরে রাখতে হয় তখন সামাজিক

১। রেমঁদ আর', দেমোক্রাতি এৎ তোতালিতারিজমে, প্যারী, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৩৬৯।

জ্ঞানের সব সত্য ও গভীরতা নষ্ট হয়। সামাজিক সম্পর্কগুলির কোনও জোটকে বিচ্ছিন্নভাবে, কিছু একটা নিশ্চল বলে বিবেচনা করলে স্বাভাবিকভাবেই এই সব সম্পর্কগুলির সারমর্মকে এবং তাদের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপের প্রকৃত বিধানগুলিকে বের করবার সকল সম্ভাবনাকে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়। বর্তমানে যখন সামাজিক বাস্তবতা সর্বহারাও বুর্জোয়াদের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গভীর ও মীমাংসার অতীত বিরোধ দ্বারা বিদীর্ণ তখন এই দৃষ্টিভঙ্গির দেউলিয়া অবস্থা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। বাস্তবকে দ্বান্দ্বিকতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে অস্বীকৃতি আধুনিক ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তিগুলিকে, মানব সমাজের বিকাশের সম্ভাবনাকে দেখা অসম্ভব ক'রে তোলে।

এ স্টাডি অব হিস্ট্রি-র লেখক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবির রচনাগুলি পশ্চিমে যথেষ্ট জনপ্রিয়। টয়েনবির প্রারম্ভিক প্রতিজ্ঞাগুলির একটি হল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ঐক্যকে অস্বীকার করা। তিনি তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে স্পেংলারের চিন্তাধারাকে বিকশিত করেছেন। স্পেংলার মধ্যযুগীয় সংজ্ঞাবাদের বোধ থেকে সাধারণ ধারণাগুলির বিষয়গত অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে বলেছেন যে "মানবজাতি" একটা ফাঁকা শব্দ এবং আসলে শুধু পৃথক পৃথক নরগোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে। টয়েনবির মতে—ইতিহাস হল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সভ্যতার ইতিহাস এবং এই সভ্যতাগুলি একে অপরের উপর কোন অনুভবনীয় প্রভাব ফেলা ছাড়াই জন্মেছে, বিকশিত হয়েছে ও অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু সভ্যতার গতি, উত্থান ও বিকাশ কোন্ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? এই শক্তি হল বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানী-গুণীক্ষুদ্র অংশ, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল সংখ্যালঘুরা, তাঁরাই নেতৃত্ব করছে স্বাধীন ঐতিহাসিক সৃজনশীলতায় রত হওয়ার বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি রহিত "নিষ্ক্রিয় অধিকাংশ" এর উপর। বুর্জোয়া সমাজচিন্তার অপরাপর বহু প্রবক্তাদের মত টয়েনবি সভ্যতার কোটী বিভাগকে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ধারণার জায়গায় বসান, যার অন্তঃসার হল আত্মিক নীতি, সৃজনশীল আগ্রহ ও নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক মূল্যগুলির সামগ্রিকতা। এই সব ভাববাদী ব্যবস্থায় বৈষয়িক উৎপাদন খুব বেশি হলে সমাজ জীবনের উপাদানগুলির কোনও একটা হিসাবে, সভ্যতার উপাংশগুলির কোনও একটা হিসাবে বিবেচিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতাগুলির নির্দিষ্ট গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধরতে পারার আকাঙ্ক্ষা খুবই সঙ্গত, কিন্তু টয়েনবি এইসব পার্থক্যগুলিকে নিরপেক্ষ করতে চেষ্টা করেন এবং তাদের ভিতরকার পারস্পরিক সম্পর্ককে মুছে দিতে চান। ইতিহাসে অবশ্য এমন সব আপেক্ষিকভাবে বিচ্ছিন্ন সভ্যতা ছিল যা বৈষয়িক ও মননগত সংস্কৃতিতে কোনও লক্ষ্যণীয় চিহ্ন না রেখেই অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু এইসব সারা পৃথিবীব্যাপী আভ্যন্তরীণ দিক থেকে পরস্পরে যুক্ত, প্রগতিশীলভাবে বিকাশমান মানবজাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রক্রিয়ার চরিত্র নিরূপণ করতে পারে না। টয়েনবির চিন্তাধারা এই সর্বজনীন ইতিহাসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, একে খণ্ডবিখণ্ড করার, আদান-প্রদান বিরহিত সভ্যতায় পর্যবসিত করার চেষ্টা করে এবং ইতিহাসের অগ্রগতিকে একটি সাধারণ সামাজিক বিধান হিসাবে দেখার ধারণাটিকে বাদ দেবার চেষ্টা করে।

টয়েনবির মতে—যা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, সকল সভ্যতাই উদিত হয়, বিকশিত হয়, শিখরে আরোহণ করে, তারপর পতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রতিজ্ঞাটি কি পশ্চিমী সভ্যতা অর্থাৎ ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? টয়েনবির যুক্তি দিয়ে বিচার করলে আশা করা যেতে পারে এর একটি ইতিবাচক জবাব মিলবে। কিন্তু খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা দেখতে পাই যে পশ্চিমী সভ্যতার পতন অস্বীকার না করলেও টয়েনবি এর ত্রুটিগুলিকে মারাত্মক বলে মনে করেন না। মনে হয় যেন নবরূপ প্রাপ্ত খ্রীষ্টধর্ম সামাজিক সংঘাতগুলিকে সুষম ক'রে তোলায়, শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলির মধ্যে মিলন ঘটান, পশ্চিমী সভ্যতাকে একটি পূর্ণ রূপ দেওয়া ও তার অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত করা সম্ভবপর ক'রে তুলবে। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক কাজ করার পর টয়েনবির ধ্যান-ধারণা তার প্রারম্ভিক নীতিগুলির সঙ্গে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান বিরোধে উপনীত হয়।

সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজ চিন্তাধারার অপর একজন প্রধান প্রবক্তা হলেন আমেরিকান সমাজতত্ত্বাবিদ পিতিরিম এ. সোরোকিন।

টয়েনবি যেখানে "সভ্যতার" ধারণাটিকে নিয়ে তাঁর বক্তব্য হাজির করেছেন, সেখানে সোরোকিনের মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলির তত্ত্ব। একে তিনি দেহযন্ত্রের ঊর্ধ্বের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যাপার বলে মনে করেন, যেগুলি শারীর-রাসায়নিক ও শারীর-

জৈবিক ব্যাপারের মত নয়, বিশেষ ইংগিতবহ এবং বিশেষ মূল্য বা মানসম্পন্ন। সোরোকিন লিখেছেন যে ভিনাস দ্য মেলোর ইঙ্গিতকে যদি অস্বীকার করি তবে তা বিশেষ একটি জ্যামিতিক আকারসম্পন্ন একখণ্ড মর্মর প্রস্তর ছাড়া আর কিছু নয়। যার মধ্যে আছে সাধারণ মতাদর্শগত নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অনেক গুলি সংস্কৃতি, সোরোকিন তাকেও ব্যবহার করেন। মানবজাতির ইতিহাস হল একটি অতি-ব্যবস্থার জায়গায় আর একটা অতি-ব্যবস্থা আসা। সোরোকিনের মতে—অতি-ব্যবস্থাগুলির মধ্যেকার পার্থক্য তারা মূল্য কাকে বলে, তার চরিত্র কি ভাবে নিরূপণ করে এবং সেই অনুযায়ী সে সবের ভিত্তি হিসাবে কি ধরনের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি (আত্মিক, অখণ্ড-ভাববাদী অথবা ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধিবাদী) গ্রহণ করে সে সব দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

অতি-ব্যবস্থা সম্পর্কে সোরোকিনের ধারণাটির উদ্দেশ্য হল সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ধারণাটিকে বাতিল করা। একথা অবশ্য বোঝা কিছু কঠিন নয় যে মানুষের জ্ঞানীয় কার্যকলাপের বিভিন্ন রূপের উপর তৈরি কৃত্রিম অতি-ব্যবস্থা দিয়ে প্রকৃত ইতিহাসকে পরিবৃত করার প্রচেষ্টা সমাজ-বিজ্ঞানকে বেশী দূরে নিয়ে যায় না। এ ব্যাখ্যা এ থেকে এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না যে কোন কোন প্রকৃত শক্তি অতি-ব্যবস্থার জন্ম দেয়, কি কারণে তার বদল হয় এবং মানব ইতিহাসের বিধানগুলি কি কি।

ভবিষ্যতের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার জন্য সোরোকিন তাঁর রচনায় যথেষ্ট স্থান রেখেছেন। তাঁর মতে—অনিমিত্তবাদের নীতি যা তাঁর মতে মাইক্রোকজমের পদার্থবিজ্ঞানে জয়লাভ করেছে, তাকে যদি ইতিহাসে স্থানান্তরিত করা যায় তাহলে ঐতিহাসিক বিকাশে বিষয়গত বিধানগুলির ধারণাটিকে এবং একই সঙ্গে সামাজিক ব্যাপার ও ঘটনাবলীর কারণগত সম্পর্কের স্বীকৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাবনাকেও বাতিল করা যায়। "মানব ইতিহাসের এই সৃষ্টিশীল সক্রিয় শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব ক'রে তোলে।"(১) অবশ্য অপেক্ষাকৃত নগণ্যসংখ্যক পদার্থবিজ্ঞানী অনিমিত্তবাদে বিশ্বাসী। ইলেকট্রনের "স্বাধীন ইচ্ছা" সম্পর্কিত চালু ধারণাটি এবং অনুরূপ

১। পিতিরিম এ. সোরোকিন, ফ্যাড্স্ অ্যান্ড ফয়বলস ইন মডার্ন সোশিওলজি অ্যান্ড রিলেটেড সায়েন্স, শিকাগো, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ২৫৮।

ধারণাগুলি মাইক্রোকজম সম্পর্কে বহু অনুসন্ধানকারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং সমাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী থেকে রেহাই পাবার জন্য কয়েক-জন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর ভাববাদী বিপথগমনকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা কোনও প্রত্যয় জাগায় না।

ইতিহাসের সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শন মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায় অথবা যুগগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়, কিন্তু এর প্রবক্তারা সমাজের বিকাশের সম্ভাবনাজনিত সমস্যাটিকে, বিশেষত শ্রেণীভিত্তিক সমাজের জায়গায় শ্রেণীবিহীন সমাজ আসার বিষয়টিকে উপেক্ষা করার আকাঙ্ক্ষায় ঐক্যমত। প্রকৃত ঐতিহাসিক বিকাশ, যা মানবজাতিকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা ওইসব বিমূর্ত অতি-ঐতিহাসিক ধ্যান-ধারণাকে অসার প্রমাণ করেছে—এই কারণেই ইতিহাসের সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনের সংকট।

২. সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বগত তত্ত্বসমূহ

ধনতন্ত্রের সপক্ষে কৈফিয়ত দেওয়াটা হল বহু সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজ-তত্ত্বগত তত্ত্বসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এমনকি যখন তারা ধনতান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক দিকগুলির কথা উল্লেখ করে, তখনও তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কগুলির "স্বাভাবিকতা" ও "টিকে থাকার ক্ষমতা" প্রমাণ করার লক্ষ্য অনুসরণ করে এবং এইভাবে সেগুলির ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টা করে। বহু বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রথম সারিতে রয়েছেন।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের প্রাচীন ঐতিহ্যগত ধারাগুলি অর্থাৎ জৈব, মনস্তত্ত্বগত ভৌগোলিক ইত্যাদি ধারাগুলি এখনও চালু রয়েছে। কিন্তু মতাদর্শগত সংগ্রামের নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানর জন্য নিজেদের যথেষ্ট বদলে নিয়েছে। নতুন নতুন ধারা ও ঝোঁক, প্রধানত নয়া-পজিটিভিস্ট ঝোঁক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে সব তত্ত্ব সমাজতত্ত্বকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত আচরণ অনুশীলনে পর্যবসিত করে সেগুলি একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। গঠনগত-কার্যকলাপগত বিশ্লেষণ বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে।

"শিল্পভিত্তিক সমাজ" ও "শিল্পোত্তর সমাজ", দুটি ব্যবস্থার "সমকেন্দ্রাভিমুখিনতা" ইত্যাদি তত্ত্ব এখন বুর্জোয়া সমাজে বহু বিস্তৃত। এই সব তত্ত্ব সাধারণত "প্রযুক্তিবিদ্যাগত নিমিত্তবাদ"-এর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

"প্রযুক্তিবিদ্যাগত নিমিত্তবাদ" এই বুর্জোয়া তত্ত্ব বোঝানর জন্য ব্যবহৃত হয় যা সমাজের বিকাশে অর্থনৈতিক ও উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে উপেক্ষা ক'রে উৎপাদিকা শক্তিগুলির ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকার উপর বিশেষভাবে জোর দেয়। দা স্টেজেস অব ইকনমিক গ্রোথ : এ নন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নামক পুস্তকে ওয়াল্টার রোস্তভ এই দৃষ্টিভঙ্গি জোরালভাবে সমর্থন করেছেন।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, তার প্রধান প্রধান পর্যায়গুলির উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উপর নির্ভরশীলতার কথা বিবেচনা করায় রোস্তভের প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষণমূলক। সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বগত চিন্তাধারায় সমাজ বিকাশ সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণার কিছু প্রতিফলনেরই সাক্ষ্য।(১)

কিন্তু মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বগত চিন্তাধারার, বিশেষত কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের সাফল্যগুলি সম্পর্কে কোনও কোনও বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদের এই আপাত দৃষ্টিতে বিষয়গত বিবেচনা সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদকে, তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে এবং তার মৌলিক মূল্যায়ণ ও সিদ্ধান্তগুলিকে অস্বীকার করার কথা গোপন করে। উদাহরণ স্বরূপ, রোস্তভ তাঁর পাঠকদের তাড়াতাড়ি এই কথা বলে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে মার্কসের মত তিনি সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে সামাজিক উৎপাদনকে দেখেন না। তিনি লিখেছেন : "...যদিও বৃদ্ধির পর্যায়গুলি এক-একটা গোটা সামাজিক দেখার একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে, তবে তা থেকে কোনও ভাবেই এই অর্থ বোঝায় না যে বিশ্ব-রাজনীতি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতি কেবল অর্থনীতির উপর নির্মিত সৌধ এবং একমাত্র অর্থনীতি থেকে পাওয়া।(২)

১। রেম'দ আর' ও "শিল্পভিত্তিক সমাজ" এবং "শিল্পোত্তর সমাজের"'র অপরাপর তত্ত্ববিদদের সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য, তাঁরা বিমূর্তভাবে বিবেচনা ক'রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবকে আধুনিক ইতিহাসের দানবিক শক্তিতে পরিণত করার চেষ্ট করে।

২। ডব্লিউ, ডব্লিউ, রোস্তভ দা স্টেজেস অব ইকনমিক গ্রোথ : এ নন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, কেমব্রিজ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ২।

অর্থনীতি ও সামাজিক-রাজনীতির মধ্যেকার কার্যকারণ সম্পর্কের জায়গায় রোস্তভ কেবল পারস্পরিক ক্রিয়া অথবা স্বাভাবিক ক্রিয়ামূলক সম্পর্ককে বসাবার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে আবার বৈষয়িক ও অবৈষয়িক উপাদানগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক ক্রিয়া ও তাদের সমমূল্য সম্পর্কে তাঁর যুক্তিগুলি এই স্বীকৃতির মধ্যে শেষ হয় যে অর্থনৈতিক বিকাশের উদ্দীপকগুলি হল জনগণের "আভ্যন্তরীণ চাহিদা", মানুষের জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ইত্যাদি। সুতরাং উৎপাদিকা শক্তিগুলির ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভাববাদী ব্যাখ্যার একটি ব্যর্থ ছদ্মবেশ।

উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে, উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানার রূপগুলিকে এবং শ্রেণী সম্পর্কগুলির প্রশ্নকে এড়িয়ে রোস্তভ সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনগুলির মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যগুলিকে মুছে দিতে সক্ষম হন এবং সাধারণভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ধারণাটির প্রতিই অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।

রোস্তভ সকল পূর্বতন ও সমসাময়িক সমাজগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন: "ঐতিহাসিক সমাজ", "উন্নয়নের জন্য পূর্বশতার্দি", "উন্নয়ন", "পরিপক্কতা লাভের দিকে অগ্রসর" এবং "উচ্চভোগের যুগ"।

রোস্তভের "ঐতিহ্যগত সমাজের" মধ্যে রয়েছে তিনটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন: আদিম গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা, দাস-মালিকানা ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্র। শিল্পভিত্তিক সমাজের বিপরীতে "ঐতিহ্যগত সমাজ"কে প্রাক্-নিউটনীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সীমাবদ্ধ উৎপাদন দ্বারা চরিত্রায়িত করা হয়, তার মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না; উৎপাদন বৃদ্ধি একেবারে হত না তা নয়, কিন্তু এই বৃদ্ধি খুবই ধীরে হত এবং এর নিজস্ব সীমা ছিল।

উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে যদি উপেক্ষা করা হয় তবে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে "একটি একক শিল্পভিত্তিক সমাজের" ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিসাবে উপস্থিত করা যায়। "প্রযুক্তিবিদ্যাগত নিমিত্তবাদে"র কৃত্রিম ও পলকা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে "সমকেন্দ্রাভিমুখিনতা"র তত্ত্বটি যা এখন বুর্জোয়া মহলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পবিকাশ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে

একই বিন্দুতে হাজির করে, তাদের একত্রে মিশিয়ে দেয় এবং পরস্পর বিরোধী মতাদর্শগুলির সংগ্রামকে নিরুৎসাহিত করে ও অদৃশ্য করে। উপরন্তু একথা ধরে নেওয়া হয় যে বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লব নিজে থেকেই, কোনও শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়াই সকলের জন্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য আনবে, ক্রমশ সকল সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান করবে এবং শ্রেণীগুলির ও শ্রেণীবিরোধগুলির অবলোপ ঘটবে।

"একক শিল্পভিত্তিক সমাজের" তত্ত্বের প্রবক্তারা এমন সব ঘটনাকে গ্রহণ ক'রে থাকে যেগুলি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে অভিন্ন—যেগুলি হল শিল্পোৎপাদন, একই ধরনের সাংগঠনিক পদ্ধতি, বিজ্ঞানের ভূমিকা, শহরীকরণ ইত্যাদি এইং ধনতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র থেকে যা পৃথক করে সেই সবচাইতে অপরিহার্য বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে—সেগুলি হল উৎপাদনের উপকরণ-গুলির সামাজিক মালিকানা, শোষণ না থাকা, এমন একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অস্তিত্ব যা সমগ্র জনগণের ক্ষমতা।

"একক শিল্পভিত্তিক সমাজ" ও "সমকেন্দ্রাভিমুখিনতা" তত্ত্বগুলির আরও ঘনিষ্ঠ অনুশীলন থেকে দেখা যায় যে ওই তত্ত্বগুলির সমর্থকরা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রকে কাছাকাছি নিয়ে আসায়, তাদের একই বিন্দুতে মেলানয় ততটা আগ্রহী নয়, যতটা আগ্রহী ধনতন্ত্র কর্তৃক ক্রমশ সমাজতন্ত্রকে গ্রাস করানয়।

বেশ কয়েকজন বুর্জোয়া সমাজ তত্ত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদ এখন এই মতের পক্ষে দাঁড়িয়েছে যে শিল্পভিত্তিক সমাজের পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী ভাষ্যের জায়গায় আসবে "শিল্পোত্তর সমাজ"। ভার্নাতে অনুষ্ঠিত সপ্তম আন্তর্জাতিক সমাজতত্ত্বের কংগ্রেসে পঠিত একটি রচনায় আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ দানিয়েল বেল "শিল্পোত্তর সমাজটিকে" ইতিমধ্যেই বিরাজমান কিছু একটা বলে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা যদি তাঁর আশ্বাসকে বিশ্বাস করি তাহলে বলতে হবে যে "শিল্পোত্তর সমাজ" যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকার গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ওই সমাজের তত্ত্ববিদদের মতে—সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে উৎপাদন থেকে মানুষের শ্রমের অবলোপ সাধন দ্বারা, অতি-শক্তিশালী শিল্প দ্বারা, 'মননগত প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা", এবং সম্ভাব্য উচ্চতম বেতন, সমাজের পরিচালন ভূমিকা ও বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকুশলী বুদ্ধিজীবী অথবা সমাজের উচ্চতর স্তরের লোক বা

জ্ঞানী-গুণী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনা দ্বারা এই সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যায়। ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে একথা স্পষ্ট হয় যে "শিল্পোত্তর সমাজ" আসলে ধনতন্ত্রের আর একটি ধরন, যেখানে রাষ্ট্র একচেটিয়া ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অপরাপর রূপ বজায় থাকবে এবং উন্নত ধরনের ধনতন্ত্রে অতি-শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক একচেটিয়াদের ও অপরাপর লক্ষণগুলির আধিপত্য থাকবে।

বহু বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বগত তত্ত্ব রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সারমর্মকে বিকৃত করে এবং পুঁজিবাদী সম্পত্তির "ব্যক্তিরূপ হারানর" প্রক্রিয়াকে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সম্পত্তির আবির্ভাব ও বিকাশকে পুঁজিপতির ও পুঁজিবাদেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া রূপে উপস্থিত করার চেষ্টা করে। বাস্তবে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া সম্পত্তি যা শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর সবাপেক্ষা শক্তিশালী স্তর ও তাদের রাষ্ট্রের যৌথ সম্পত্তি, পুরোপুরিভাবে তার শোষক চরিত্র বজায় রাখে, কারণ এও লক্ষ লক্ষ ভাড়া করা শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্যের ফলগুলি আত্মসাতের ভিত্তির উপরই তখনও প্রতিষ্ঠিত থাকে।

এইভাবে উৎপাদনের সম্পর্কগুলি থেকে উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে আলাদা করাটা সাধারণভাবে সমাজ বিকাশের ও বিশেষভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের চিত্রটিকে বিকৃত করার জন্য একটি পদ্ধতিগত কৌশল।

প্রযুক্তিবিদ-ভিত্তিক ঝোঁকের উদাহরণ থেকে তা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই ঝোঁকের প্রধান প্রবক্তারা হলেন ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড দা অ্যাবসেন্টি ওনার নামক পুস্তকের লেখক টি. ভেবলেন এবং দা ম্যানেজিরিয়াল রেভলিউশন নামক পুস্তকের লেখক জে. বার্নহাম। এঁরা ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি "শান্তিপূর্ণ বিপ্লব" সংঘটিত হয়েছে; এই তথ্যের মধ্যেই এই বিপ্লব প্রকাশ পেয়েছে যে পুঁজির মালিকেরা আর তা নিয়ন্ত্রণ করে না, এই কাজ তারা ম্যানেজারদের দিয়ে দিয়েছে। এই সব যুক্তির যদি কোন অর্থ থাকে, তবে তা সর্বোপরি দেখিয়ে দেয় সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজে শাসক শ্রেণীর পরগাছা চরিত্র, যারা বহুলাংশে উৎপাদন ও বিনিময় প্রক্রিয়ায় সামাজিকভাবে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ আর করে না। কিছু পরিমাণে সম্পত্তির বিভাজন ঘটেছে ও উৎপাদনের প্রত্যক্ষ পরিচালনার ভার ম্যানেজারদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে এই তথ্য কোন মতেই পুঁজিবাদী

সম্পত্তির, পুঁজিবাদীদের ও তাদের কর্পোরেশনগুলির ক্ষমতার এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপে এক যৌথ পুঁজিপতি আধিপত্যের অবসান হওয়া বোঝায় না।

এই সব তত্ত্ব, যেগুলি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে সমসাময়িক ধনতন্ত্র আর ধনতন্ত্র নয়, সেগুলির উদ্দেশ্য একটিই—তা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ন্যায্যতা ও ধনতান্ত্রিক সমাজের সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিপ্লবী রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা।

কিছু কিছু বুর্জোয়া তত্ত্ববিদ এই প্রতিজ্ঞাটির ভিত্তিতে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করা ছাড়াই প্রত্যেকেরই শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে, সামাজিক-গতিশীলতার কথা তুলে ধরে তারা বলে যে এক স্তরে প্রবেশ ক'রেই ব্যক্তিদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে। সামাজিক গতিশীলতার মত একই ধরনের একটি ব্যাখ্যা সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজকে একটি "খোলা সমাজ" বলে ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার কঠিন বেড়াগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে ওজর দেওয়া হয়। লক্ষ লক্ষ বংশ-পরম্পরাগত সর্বহারাদের, বেকারদের একটি সংরক্ষিত বাহিনীর, অনতিক্রম্য বর্ণবৈষম্যের, ঘোট পাকানর মনোভাবের এবং জাতিদাম্ভিক ও ধর্মগত কুসংস্কারগুলির অস্তিত্ব, যা সবচাইতে উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে টিকে থাকে তা ওই "খোলা সমাজের" ধারণা বর্জন করার পক্ষে মুখর সাক্ষ্য উপস্থিত করে।

খোলাখুলি আধুনিক ধনতন্ত্রের কৈফিয়তমূলক তত্ত্বগুলি ছাড়া বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব এমন সব তত্ত্ব খাড়া করে যেগুলি কৈফিয়তমূলক দিক এত সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু এই সব তত্ত্ব নির্দিষ্ট মতাদর্শগত কাজ করে থাকে। এই সব তত্ত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য হল সমাজের পরিচালিকা শক্তি ও গঠন সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা খাড়া করা।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে ঐতিহাসিক নিমিত্তবাদ ও ঐতিহাসিক বিকাশের বিধি-শাসিত চরিত্রের প্রত্যক্ষ অস্বীকৃতি ছাড়া আমরা দেখতে পাই সমাজ-জীবনের কয়েকটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সমাজ বিকাশের বিধানগুলির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান করা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ অ্যালেক্স ইনকেলেস বলেছেন

যে একটি বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্ত্বের সম্ভাবনা শুধু এই যুক্তির উপর নির্ভর করে না যে সামাজিক ঘটনাগুলি পুনঃসংঘটনশীল, সেই সঙ্গে এই বিশ্বাসের উপরও নির্ভর করে যে সেগুলি নিয়মিত অথবা "বিজ্ঞানসম্মত।"(১) আমেরিকান অর্থনীতিবিদ হানস্ মর্গেনথাউ একই ভঙ্গিতে লিখেছেন: সমাজকে উন্নত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন যে সব বিধান দ্বারা সমাজ চলছে সেগুলিকে উপলব্ধি করা। এই বিধানগুলির ক্রিয়া আমাদের পছন্দের কাছে দুর্ভেদ্য।"(২)

কিন্তু তাঁরা যে সব বিধানকে স্বীকার করেন সেগুলি সামাজিক ব্যাপারগুলির মাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিস্তৃত এবং বলতে গেলে গভীরভাবে পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উপর সেসবের কোনও প্রভাব নেই। উদাহরণ স্বরূপ ইনকেলেস ঝটিতি এই সব বিধানগুলির সংকীর্ণ পরিধি সম্পর্কে আমাদের সাবধান ক'রে দেন: "সমাজতত্ত্ববিদরা পরিবর্তনের একটি একক সর্ব-ব্যাপক তত্ত্বের জন্য অনুসন্ধানের কাজ পরিত্যাগ করেছেন—তার বদলে তাঁরা পরিবর্তনকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে, বলা যায় আরও বাস্তবভাবে বুঝতে চান।"(৩)

একই সঙ্গে আবার বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে এমন সব ধারণাও দেখা যায় যা অধিকতর সাধারণ বিধি-শাসিত যোগাযোগগুলিকে প্রকাশ করে ব'লে দাবি করে। অতএব আমরা ধনতন্ত্রের রূপান্তরের নানা রকম "বিধান" দেখতে পাই, যথা—পরস্পর-বিরোধী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির একই বিন্দুতে মেলার "বিধান", সামাজিক ক্রিয়াকলাপের বিধান, ইত্যাদি।

ব্রিটিশ বুর্জোয়া দার্শনিক কার্ল পপার এমনকি "সমাজতত্ত্বগত নিমিত্তবাদ" সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশেষ ধারণাটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এবং এই সংজ্ঞাটিকে তিনি মার্কসবাদী ঐতিহাসিক নিমিত্তবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। পপার যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে ইতিহাসের ভিত্তিতে সমাজ সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না এবং তাই ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট

১। দেখুন আলেক্স ইনকেলেস, হোয়াট ইজ সোসিওলজি ?, এঙ্গেলউড ক্লিফস্, নিউ জার্সি, ১৯৬৪ পৃষ্ঠা ৯৫।

২। হানস আই. মর্গেনথাউ, পলিটিকস অ্যামঙ নেশনস। দা স্ট্রাগল ফর পাওয়ার অ্যান্ড পিস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ৪।

৩। আলেক্স ইনকেলেস, হোয়াট ইজ সোসিওলজি ?, পৃষ্ঠা ৮৮।

কাজে বিশ্বাস একেবারেই অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস, কারণ কোনও লোকই আগে থেকে বলতে পারে না যে ইতিহাস কোন্‌ পথ গ্রহণ করবে। তিনি আরও বলেছেন যে অপরদিকে ইতিহাস নির্দিষ্ট সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির সূচকগুলিকে নথিভুক্ত করতে ও পরিমাপ করতে পারে এবং এই অর্থে একটি সমাজতত্ত্বগত নিমিত্তবাদ ও অনুরূপ এক "প্রযুক্তিবিদ্যাগত ভবিষ্যদ্বাণী" বিদ্যমান রয়েছে। শেষোক্তটি পরিকল্পিত "সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং"-এর অর্থাৎ সমাজ-জীবনের কতকগুলি দিকের উন্নয়ন অথবা নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি যোগায়।

এইভাবেই সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে নিমিত্তবাদের স্বীকৃতিকে এমন সব ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় যা বুর্জোয়াদের মৌলিক স্বার্থগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে বিপদাপন্ন করে না—সেগুলি হল প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি ও বুর্জোয়া ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কগুলির সামান্য পরিবর্তন ; একই সঙ্গে আবার তা নিমিত্তবাদকে এবং শ্রেণীগুলির মধ্যেকার যে বিপ্লবী সংগ্রাম একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের জায়গায় আর একটি বসায় তার বিষয়গত প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ব থেকেই বাধা দেয়।

তদনুসারে সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের একটি ঝোঁকের কথা ইতি-মধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি। সে ঝোঁকটি হল বিকাশের নীতিটিকে বাতিল করা এবং তার জায়গায় সামাজিক ব্যাপারগুলির ক্রিয়াকলাপের নীতিকে বসান। সামাজিক জৈব কাঠামোকে তার আবির্ভাব, বিকাশ ও অদৃশ্য হওয়ার দিক থেকে অনুশীলন করা সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় রূপে বিবেচিত হয় না, বরং সামাজিক সমগ্রের আলাদা আলাদা অংশগুলির ক্রিয়াকলাপগত যোগাযোগগুলির ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্যের ব্যবস্থাটির বিশ্লেষণের অনুশীলনকেই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে গণ্য করা হয়।

আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ ট্যালকট পারসনস ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা রচিত "সামাজিক ক্রিয়ার" তত্ত্বটি সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এই তত্ত্ব নিজেকে "সামাজিক আচরণের" একটি পূর্ণাঙ্গ সাধারণ তত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের একটি "সর্বব্যাপক" তত্ত্বগত ব্যবস্থার পথ প্রদর্শক বলে দাবি করে।

পারসনসের তত্ত্বে "ক্রিয়া" শব্দটি সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষের আচরণ ও তার কার্যকলাপকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। "পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এমন একটি মূল প্রক্রিয়া যা তার বহুবিধ বিশদীকরণ ও অভিযোজনের মারফত যাকে আমরা মানবিক স্তরে (ক্রিয়ার স্তরে—সম্পাদক) ব্যক্তিত্ব ও সমাজ ব্যবস্থা বলে থাকি তার বীজ যোগায়।"(১)

"সামাজিক ক্রিয়ার" তত্ত্বটি বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের প্রধান গতিমুখ প্রকাশ করে—তা হল এমন সব পদ্ধতি ও উপায় আবিষ্কার করা যায় যারা ব্যক্তি বাস্তবকে "স্বীকার করে নেবে", ভাষান্তরে বললে তার কাছে নতি স্বীকার করবে এবং ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলির সঙ্গে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেবে। এই তত্ত্ব সামাজিক সম্পর্কগুলির সমগ্র ব্যবস্থাটিকে চারিটি উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ঃ সেগুলি হল কর্মকর্তা, লক্ষ্য, উপায়সমূহ ও পরিস্থিতি। সাদাসিধেভাবে ধরলে এই উপাদানগুলি প্রথম ও সর্বশেষটি দ্বারা সীমাবদ্ধ।

কার্যত সমাজে জনগণের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্কগুলির ও এই সম্পর্কগুলির ব্যাপারে তাদের ধারণার পরিবর্তে এই তত্ত্বকে বসান হয়। একটি সমাজ ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপকে বলা হয় একজন লোকের আকাঙ্ক্ষাগুলির অপর একজনের আকাঙ্ক্ষাগুলির সঙ্গে মিলে যাবার বিষয়। সামাজিক সম্পর্কগুলিকে পর্যবসিত করা হয় এক ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির সম্পর্কে বিষয়ীগত মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক মনোভাবে।

অধিকন্তু ব্যক্তিকে বহুলাংশে কোনও শ্রেণী, যৌথ সংস্থা ইত্যাদির সঙ্গে বিষয়গত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তব সমাজের সহজাত মানব সম্পর্ককে। কিন্তু বৈষয়িক সামাজিক সম্পর্কগুলি প্রায়শই "নৈর্ব্যক্তিক" রূপ গ্রহণ করে; উদাহরণ স্বরূপ ধনতন্ত্রের আমলে পণ্য উৎপাদনের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি বা পণ্যের চলাচলের মারফত প্রকাশিত হয়।

এইভাবে "সামাজিক ক্রিয়ার" তত্ত্বটি কার্যত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যকে উপেক্ষা করে যে জনগণের ক্রিয়াকলাপ সামাজিক সম্পর্কগুলির

১। টোয়ার্ড এ জেনারাল থিয়োরি অব অ্যাকশন, ট্যালকট পারসনস এবং এডওয়ার্ড এ. শিলস কর্তৃক সম্পাদিত, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৫১. পৃষ্ঠা ১৭।

সমগ্রের মধ্যে ও সর্বোপরি উৎপাদন সম্পর্কগুলির ব্যবস্থার মধ্যে তার বিষয়গত স্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এই তত্ত্ব প্রধান প্রধান সমস্যাবলীর, পরিবর্তনশীল বিষয়গত বাস্তবতা অর্থাৎ অর্থনীতি, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন দ্বারা সমাধান করে না, করে বিষয়ীগত বিষয়গুলি অর্থাৎ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, ধারণা ও অনুভূতি দিয়ে। এই অর্থেই জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ও মনোতত্ত্ববিদ কার্ল লেভিন লিখেছেন ধারণাটি হল "···উপলব্ধিকে পরিবর্তন দ্বারা ক্রিয়ার পরিবর্তন"(১), এবং "ভারসাম্য", "স্থিতিশীলতা" ও "শৃঙ্খলা" সমাজ ব্যবস্থা'য় প্রধানতম ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়। পারসনস লিখেছেন যে প্রত্যেকটি সমাজ ব্যবস্থা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্রিয়ামূলক প্রয়োজনীয়তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সামাজিক সম্পর্কগুলিতে "শৃঙ্খলা" রক্ষা করতে হবে অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্যুতি ও অভ্যুত্থান থেকে সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রচিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে "সামাজিক ক্রিয়ার" তত্ত্বের বিকাশ কাঠামোগত-ক্রিয়াকলাপগত বিশ্লেষণকে জনপ্রিয় করেছে, এই বিশ্লেষণ সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে গবেষণার প্রায় অগ্রণী পদ্ধতি হয়ে উঠেছে।

কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপ প্রত্যেকটি সামাজিক ব্যবস্থার ও প্রত্যেকটি সামাজিক জৈব কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান। মার্কসের কথা উল্লেখ করে লেনিন বলেছেন যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি "···ক্রিয়াকলাপ ও বিকাশের ব্যাপারে সমাজকে একটি জীবন্ত জৈব কাঠামো রূপে গণ্য করতে"(২) আমাদের বাধ্য করে। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেকটি "উৎপাদন সম্পর্কগুলির ব্যবস্থা হল একটি নির্দিষ্ট সামাজিক জৈব কাঠামো, যার উদ্ভব, ক্রিয়াকলাপ ও উচ্চতর ধরনে উত্তরণ, অপর একটি সামাজিক জৈব কাঠামোকে রূপান্তর নির্দিষ্ট বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়।"(৩) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজের কাঠামোর প্রধান প্রধান কোটী হিসাবে উৎপাদিকা শক্তিগুলির ও উৎপাদন

১। কার্ল লেভিন, রিসলভি; সোস্যাল কমফিক্টস, নিউইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ১০৩।
২। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৮৯।
৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪১০।

সম্পর্কগুলির বৈষয়িক ও মতাদর্শগত সামাজিক সম্পর্কগুলির, ভিত্তি ও সৌধ ইত্যাদির ধারণাগুলিকে বেছে নেয়।

পারসনস, মেরটন ও অপরাপর বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সমাজ ব্যবস্থার মূল উপাদানগুলি হল মূল্য, মান, ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠান-সমূহ। এই সব কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ সমাজের বিকাশের আধেয় গঠন করে বলে বলা হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বললে তা দাঁড়ায় ব্যক্তির চেতনা ও সামাজিক চেতনার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক—অর্থাৎ মানদণ্ড, ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমগ্রের মধ্যে মূর্ত সংস্কৃতির ব্যবস্থা। অতএব বিদ্যমান নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও নিয়মগুলির সঙ্গে ব্যক্তিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত অর্থাৎ তার সামাজিকীকরণের বন্দোবস্তই বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

প্রথম ক্ষেত্রে আমরা পাই সমাজ-জীবনের প্রতি এক বস্তুবাদী কাঠামোগত-ক্রিয়াকলাপগত দৃষ্টিভঙ্গি; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটি বস্তুত ভাববাদী। পার্সনস নিজে যে কথা এক সময় বলেছিলেন যে এটা "অর্থনৈতিক অথবা স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বনাম ধারণা অথবা মূল্যবোধ অনুযায়ী ব্যাখ্যার" (১) মত মতপার্থক্যগুলির বিষয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কাঠামোগত-ক্রিয়াকলাপগত দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিদ্যাতে একটি অভ্রান্ত অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করে, কিন্তু তাকে নিঃশর্ত করে না ও সামাজিক ব্যাপারাদিকে বিশ্লেষণ করার জন্য একমাত্র পদ্ধতিতে পরিণত করে না। ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়াগুলি ছাড়াও তা উদ্ভব ও বিকাশের এবং একটি সমাজ ব্যবস্থাকে অপর একটিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াগুলিকে বেছে নেয়। বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে কাঠামোগত-ক্রিয়াকলাপগত পদ্ধতি কার্যত সামাজিক সমগ্রের এবং তাদের ভিতরকার উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এর শ্রেণী গতিমুখ হল ধনতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কগুলির ব্যবস্থার "অখণ্ডতা" ও "স্থায়িত্ব", ভারসাম্য ইত্যাদি প্রমান করা। এই সমাজতত্ত্ব যে মূল নীতি প্রচার করে নিম্নোক্ত সূত্রের মধ্যে তার সার সংকলন করা যায়: সমাজে যা কিছু ঘটছে তা ঘটবেই। এই কারনেই পারনস ও তার অনু-

১। ট্যালকট পারসনস, থিওরিজ অব সোসাইটি, ভল্যুম ১, গ্লেনকো রে, পৃষ্ঠা ৭২।

গামীরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সেই সব বন্দোবস্তের উপরই মনোনিবেশ করেন যা সমাজ ব্যবস্থাকে তার নির্দিষ্ট "স্বাভাবিক অবস্থায়" সমর্থন করতে পারে ও রক্ষা করতে পারে। অতএব এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই খুব সতর্ক ছদ্মবেশের আড়ালে ধনতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কগুলির পক্ষে দাঁড়াবার একটি ঝোঁক।

৩. বুর্জোয়া অভিজ্ঞতাজনিত সমাজতত্ত্ব

যে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বগুলি কাঠামোগত-ক্রিয়াকলাপগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে তা ব্যক্তিবিশেষের ও ছোট ছোট গোষ্ঠীর আচরণ উদ্ঘাটন করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাজনিত অনুশীলনের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

একই সঙ্গে আবার অভিজ্ঞতাজনিত সমাজতত্ত্বের বিকাশ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে চালু রাখার বাস্তব প্রয়োজন দ্বারা প্রধানত উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়েছে। উৎপাদনের একটি যুক্তিযুক্ত সংগঠন পাওয়ার এবং সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা বুর্জোয়াদের উৎপাদনের সংগঠন, শ্রম সম্পর্ক ইত্যাদি সমস্যাবলী অনুশীলন করার জন্য সমাজতত্ত্ববিদদের এক বিরাট বাহিনীকে নিয়োগ করতে বাধ্য করেছে। সর্বপ্রকার সমাজ-জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ারা জনগণের আচরণকে প্রভাবিত করার, বিপ্লবী বিস্ফোরণ ও অভ্যুত্থান নিরোধ করার উপায়সমূহ সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদদের প্রদত্ত তথ্য ও বাস্তব উপদেশের ভিত্তিতে চলতে শুরু করেছে।

এই সব ফলিত বিশেষীকৃত শৃঙ্খলাগুলি আমেরিকান সমাজতত্ত্বে সর্বপ্রথম ১৯৩২-র দশকের গোড়ায় দেখা দেয়। সামান্যীকৃত সমাজতত্ত্বগত ব্যবস্থার প্রবর্তক এই সমাজতত্ত্ববিদ-দার্শনিকদের স্থান গ্রহণ করলেন অভিজ্ঞতাজনিত সমাজতত্ত্ববিদরা। তাদের আগ্রহ ও দিগন্ত সমাজতত্ত্বের কঠোরভাবে সূত্রায়িত ও সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ধনতান্ত্রিক সরকারগুলি কর্তৃক নিয়োজিত সমাজতত্ত্ববিদদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে এবং এরা তাদের নির্দেশ পালন করে। একই সঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও সমাজতাত্ত্বিক বিভাগের সংখ্যা বাড়ছে।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে বিশেষীকরণ বেড়েছে পজিটিভিজমের পদ্ধতিগত-বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর অভিজ্ঞতাজনিত পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট পরিমাণগত পদ্ধতির উদ্ভবের দরুন। এই সব পদ্ধতি হল বিভিন্ন মানদণ্ড ও টেবল-এর সাহায্যে ভোটগ্রহণ, সাক্ষাৎকার, জরিপ, তুলনা, বিশেষ প্রক্রিয়া মারফত উপাত্ত তৈরি, তথ্য নির্বাচন।

অভিজ্ঞতাজনিত সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কিত চর্চারও আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে। এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হল সমাজতত্ত্ববিদ ফ্লোরিয়ান জ্নানিয়েৎস্কি ও সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম টমাস-এর যৌথ অনুশীলন, <u>দা পোলিশ পেজান্ট ইন ইউরোপ এণ্ড আমেরিকা</u> (১৯১৮ থেকে ১৯২০)। এই অনুশীলন ব্যক্তিগত কাগজপত্র, নির্বাচিত ঘটনাবলী ও অনুরূপ অভিজ্ঞতাজনিত প্রণালীসমূহ অনুশীলনের পদ্ধতি-সমূহের বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। ১৯২০-র দশকে লেখা রবার্ট পার্ক ও আর্নেস্ট বার্গেস-এর পুস্তকগুলি কতকগুলি গবেষণা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে যা পরবর্তী-কালে সুনির্দিষ্ট সমাজতত্ত্বগত চর্চার একটি আদর্শ হিসাবে বুর্জোয়া সমাজ-তত্ত্ববিদদের কাজে লেগেছে। আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ পল লাজারসফেল্ড "প্রচ্ছন্ন কাঠামোর" অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদান রূপে উপস্থাপিত পরিমাণগত উপাত্ত বাছাই করার কৌশল নিরূপণ করেছেন। সমাজতত্ত্ববিদ জে. ই. ল্যাণ্ডবার্গ বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ, পরিসংখ্যান ইত্যাদির সাহায্যে পরিমাণগত উপাত্ত যাচাইয়ের পদ্ধতিগুলিকে সঠিক বলে প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনোনিবেশ করেছেন।

সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের কয়েক ডজন বিশেষীকৃত শাখা রয়েছে। এই সব শাখার প্রধান-প্রধানগুলি হল সামাজিক পরিবর্তনের সমাজতত্ত্ব, সামাজিক রোগবিদ্যা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক স্তর-বিন্যাস, সামাজিক গতিময়তা, জ্ঞানী-গুণী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, সামাজিক যৌথ-সংস্থা, গোষ্ঠী-জীবন, সমাজমিতি (sociometry), শহুরে সমাজতত্ত্ব, গ্রামীন সমাজতত্ত্ব, কর্মসংস্থানের ও মানবিক সম্পর্কের সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, শিল্পগত সমাজতত্ত্ব, জনমত, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমের সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, বাস্তব্য-বিদ্যা (ecology), ধর্মের সমাজতত্ত্ব, পরিবার, বিবাহ, অবকাশ, ক্রীড়া, ব্যক্তিত্বের সমাজতত্ত্ব, অপরাধ, অপরাধ-

বিজ্ঞান, জনসংখ্যায় সমাজতত্ত্ব, সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা বিশ্লেষণার্থে জন্ম, মৃত্যু, রোগ প্রভৃতির পরিসংখ্যান (Demography), বর্ণ ও বর্ণগত সম্পর্কগুলির সমাজতত্ত্ব, নরগোষ্ঠীগত গোষ্ঠীসমূহ ও নরগোষ্ঠীগত সম্পর্কাদির, উন্নয়নশীল দেশগুলির এবং যুদ্ধ ও শান্তির সমাজতত্ত্ব।

এই সব শাখাগুলির আরও অনেক উপশাখা আছে। উদাহরণ স্বরূপ, শহরে সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হল নগর পরিকল্পনা, শহুরীকরণ ও পরিকল্পনা এবং শহুরে বাস্তব্য-বিদ্যা। ব্যক্তিত্বের সমাজতত্ত্ব ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতির, ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও সংঘাতগুলিতে সামাজিক উপাদানসমূহের, ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে এমন সব সমাজতত্ত্বগত উপাদানগুলির এবং ব্যক্তিত্বের সামাজিক মনস্তত্ত্বের মত প্রশ্নাবলী নিয়ে অনুশীলন করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল সামাজিক সমস্যাবলীর সমাজতত্ত্ব। এই শাখাটি শিল্পগত ও বাস্তব্য-বিদ্যাগত সম্পর্কসমূহ, শিক্ষা, সামাজিক পরিকল্পনা এবং যুদ্ধ ও শান্তির মত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের গবেষণার উদ্দেশ্য হল পরিস্থিতির "উন্নতি-বিধান" কি ভাবে করা যায় সে সম্পর্কে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক বাস্তবতার বিরোধ-সমূহকে নিবারণ করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে ব্যবহারিক উপদেশ দেওয়া।

শিল্পগত ও কারখানাগত সমাজতত্ত্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবসাকে সাহায্যদানের বাস্তব কর্তব্য সম্পাদন করে। শিল্পগত সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক অনুশীলনগুলি ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়, কিন্তু এর বিপুল অগ্রগতি ঘটে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংকটের পর জনগণের কার্যকলাপ, ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের সম্পর্কগুলির রূপ, বিশেষত কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক এবং কারখানাগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্থান ও ভূমিকা নিয়ে অনুশীলন শুরু করেছেন। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে শত-শত সমাজতত্ত্ববিদ নিযুক্ত রয়েছেন এবং তাঁদের অনেকে "পরামর্শদাতা", "বিশেষজ্ঞ" ও "উপদেষ্টা" হিসাবে উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন। এঁদের উদ্দেশ্য হল উৎপাদন বাড়াবার ও অনুরূপভাবে পুঁজি-পতিদের মুনাফা বাড়াবার জন্য একদিকে শ্রমিক, অপরদিকে কর্তৃপক্ষ বা ম্যানেজারের মধ্যেকার সম্পর্কগুলির "সমন্বয় সাধন" ও "নিয়ন্ত্রণ" করা। তাঁরা শ্রমিকদের উদ্দীপক ও মনস্তত্ত্ব, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে শ্রমিকদের দক্ষতার বিকাশের সম্ভাবনা, শ্রমিক ও সুপারভাইজারদের মধ্যেকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক, বেকার সমস্যা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর এই সমস্যার প্রভাব ইত্যাদি প্রশ্নাবলী নিয়ে অনুশীলন করেন। শিল্পগত সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে একটি হল কারখানা সমাজতত্ত্ব (এলটন মেয়ো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত)।

শিল্পগত ও কারখানা সংক্রান্ত সমাজতত্ত্ববিদরা যে সব অনুসন্ধান চালিয়েছেন সেগুলি "মানবিক সম্পর্কগুলির" সমাজতত্ত্বের সমস্যাবলীর সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে মিলে যায়। যদিও শেষোক্তটি শুধু শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই তত্ত্ব সামাজিক সম্পর্কগুলির ব্যাপকতর ক্ষেত্রের সঙ্গে বিজড়িত করে শ্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের অনুশীলন করে।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে গোষ্ঠী-জীবনের সমস্যাবলী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদরা এই তথ্যের উল্লেখ করেন যে সমস্ত মনুষ্য জীবনই গোষ্ঠী-জীবন, সর্বত্রই মানুষ অপরাপর মানুষের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে। কিন্তু কি কারণে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয় সে কথা উদ্ঘাটিত করার বদলে, নানাবিধ মানবিক সম্পর্কের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কগুলি যে চূড়ান্ত তা বেছে বের করার বদলে বুর্জোয়া সমাজ-তত্ত্ববিদরা গোষ্ঠী-জীবনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন। জনগণের ছোট ছোট গোষ্ঠগুলির (পরস্পরের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে) সমস্যাবলী সমাজমিতি দ্বারা অনুশীলিত হয়। এই শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা হলেন জে. এল. মোরেনো। তিনি তাঁর লেখা সোশিওমেট্রি নামক পুস্তকে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কর্মসূচী তিনি নিম্নোক্ত-ভাবে সূত্রায়িত করেছেন: "লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে গঠিত সামাজিক শ্রেণীগুলির বিশ্লেষণ করার বদলে আমরা মানুষের ছোট ছোট গোষ্ঠীর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করছি। এ হল সামাজিক বিশ্ব থেকে তার আণবিক কাঠামোকে পশ্চাদপসরণ।(১) সমাজমিতি হল ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির

১। জে. এল. মোরেনো, সোশিওমেট্রি, এক্সপেরিমেন্টাল মেথড অ্যান্ড দ্য সায়েন্স অব সোসাইটি, বেকন, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫১, পৃষ্ঠা ২৫।

মধ্যেকার মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কগুলির উন্নতিবিধান করে এবং যে মানুষেরা পরস্পরের প্রতি "সহানভূতিশীল" তাদের এই ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে বসিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী-সংঘাতগুলিকে "অতিক্রম" করার অসফল প্রচেষ্টার এক উদাহরণ।

বুর্জোয়া অভিজ্ঞতাজনিত অনুশীলনগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমত, চরিত্রের দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, কারণ সাধারণত সেগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠীর মতামত সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়ত, সাধারণত এগুলি ভাসা-ভাসা এবং বিষয়বস্তুগুলির সারমর্মে প্রবেশ করার ক্ষমতা বর্জিত। সমাজতত্ত্বের বিশেষীকৃত ক্ষেত্রগুলিকে ব্যাখ্যার বদলে বর্ণনা হল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ আর্থার ডেভিস সঠিকভাবেই বলেছেন: "সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে পেশাদারী সাহিত্য থেকে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারি কি ভাবে জ্যাক ডোয়ে তার তরুণ বয়সে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠল, কিন্তু সমগ্র সমাজ কাঠামোর সঙ্গে অল্প বয়স্কদের অপরাধপ্রবণতার গভীরতর সম্পর্কগুলির ব্যাপারে অনেক কম জানতে পারি। আমাদের সমাজে এই অপরাধপ্রবণতা কেন টিকে থাকে, কোন্ স্বার্থ রক্ষা করে, কোন্ ব্যর্থতার উপশম করে? সামাজিক সমস্যাবলীর কেতাবী আলোচনায় এসব প্রশ্ন এড়ানোর প্রবণতা দেখা যায়…(১)।

অভিজ্ঞতাজনিত অনুশীলনগুলি প্রায়শই অতিশয় বিষয়ীগত। এতে একদিকে বিবেচনাধীন তথ্যগুলির চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। মানুষের সামাজিক আচরণের ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারগুলির মধ্যে দেখা হয়; অপর দিকে "অর্থনৈতিক" ব্যাখ্যা সহ যে কোনও ব্যাখ্যাই প্রধানত ভোটগ্রহণ থেকে পাওয়া মতামতের ভিত্তিতে করা হয়।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাজনিত

১। আর্থার কে. ডেভিস, "সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল প্রবলেমস", ফিলজফি অ্যান্ড ফেনোমেনোলজিকাল রিসার্চ বইতে, ডিসেম্বর ১৯৫৭, ভল্যুম ১৮, ২নং, পৃষ্ঠা ১৯৭।

জ্ঞানবাদ গবেষণার লক্ষ্যগুলির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিভাজন, ভাসা-ভাসা তথ্যমূলক বর্ণনা ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করেছেন, এমনকি পিতিরিম সোরোকিন, রবার্ট মার্টন, পল লাজারস্ফেল্ড ও অপরাপর বুর্জোয়া তাত্ত্বিক সমাজ-তত্ত্ববিদরাও। চতুর্থ আন্তর্জাতিক সমাজতত্ত্বগত কংগ্রেসে রবার্ট মার্টন বলেছেন: "সমাজতত্ত্ববিদরা তুচ্ছ সমস্যাবলী অনুশীলন নিয়েই খুব ব্যস্ত, এদিকে মানব সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের সব কিছুই অনুশীলনের বাইরে রাখা হয়েছে…। যুদ্ধ ও শোষণ, দারিদ্র্য, অবিচার ও অনিশ্চয়তা মানুষের জীবন ও সমাজ-জীবনকে বিষিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও অথবা তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা সত্ত্বেও বহু সমাজতত্ত্ববিদ সেই সব সমস্যাবলী নিয়ে মগ্ন রয়েছেন বা এই সব সর্বনাশা ঘটনাবলী থেকে এত দূরবর্তী যে দায়িত্বহীন তুচ্ছতার পর্যায়ভুক্ত।"(১)

কিন্তু তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণের অঙ্গাঙ্গী সমন্বয় সঠিক ও ফলত সামাজিক জীবনের, তার প্রধান স্তরগুলির এবং উন্নয়নের সম্ভাবনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের আবেদন কার্যকর হয় না বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের শ্রেণী অবস্থান, তার সীমাবদ্ধ পদ্ধতিবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গির দরুন।

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব তত্ত্বগত ও অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান এই উভয় দিক থেকেই কোনও অবস্থাতেই সমাজের ও সমাজ বিকাশের একটি অখণ্ড বৈজ্ঞানিক চিত্র অথবা ধনতান্ত্রিক বাস্তবতার আলাদা আলাদা দিকগুলির সঙ্গতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যোগায় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের সংকট এই তথ্যের মধ্যেও ধরা পড়ে যে তা নতুন পরিস্থিতির মধ্যে পুঁজিবাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিভিন্ন রূপগুলির প্রতিফলন করতে, সামাজিক বাগাড়ম্বর প্রয়োগ করতে এবং "আধুনিকীকরণ", "বৃদ্ধি" ও "বিকাশ"—এর ধারণাগুলিকে প্রচার করতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু আধুনিক কালের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান সমাজ ও সমাজ-

১। কমিউনিস্ট পত্রিকার ১৭ নং, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ৯৬ তে পি. ফেদোসিয়েভ ও গ্লাই ক্রুঅসেভ কর্তৃক লিখিত "বুর্জোয়া সোশিওলজি আট এ ডেড-এন্ড" প্রবন্ধে মূল উদ্ধৃতি থেকে অনূদিত।

বিকাশের যথাযথ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন ও সমাজতত্ত্ব এই ধরনের জ্ঞান যুগিয়েছে।

একই সঙ্গে আবার মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ববিদরা ধনতান্ত্রিক সমাজের আলাদা আলাদা দিক ও ঘটনাবলী চর্চা করতে গিয়ে বুর্জোয়া অভিজ্ঞতাজনিত সমাজতত্ত্ব কর্তৃক তথ্যগত বিষয়ের সম্পদকে উপেক্ষা করেন না; বরং তাঁরা তা বিবেচনার মধ্যে রাখেন এবং তার সযত্নে বিস্তারিত কৌশল ও পদ্ধতিগুলিকে কাজে লাগান।

লেনিন লিখেছেন যে যখন বিষয়টি হবে রাজনৈতিক অর্থনীতির সাধারণ তত্ত্ব তখন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের লেখা একটা শব্দও বিশ্বাস করা চলবে না, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক জীবনের তথ্যগত দিক নিয়ে যখন মাথা ঘামাতে হবে তখন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের অনুশীলনগুলি ছাড়া মার্কসবাদীদের চলবে না। লেনিনের এই কথা কয়টি বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব ও তার ফলাফল সম্পর্কে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিতেও সমভাবে প্রযোজ্য।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সামাজিক অনুশীলনগুলির বিকাশ হল মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ববিদদেরসামনেকার কর্তব্যগুলির অন্যতম। এইসব নির্দিষ্ট সামাজিক (এবং সমাজতত্ত্বগত) গবেষণাগুলির কাজ হল মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সমৃদ্ধ করা এবং তা থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলি দিয়ে কমিউনিস্ট সমাজের বাস্তব নির্মাণে সাহায্য করা।

সিদ্ধান্ত

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক সমস্যাগুলি আমরা বিবেচনা করেছি। এবার কতকগুলি সিদ্ধান্ত টানা যাক।

১. শ্রমিকশ্রেণী যার উদ্দেশ্য হল ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলির ব্যবস্থায় অবসান ঘটান এবং শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ গঠন, তার বিপ্লবী সংগ্রাম-গুলির প্রয়োজনেই মার্কসবাদী দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই দর্শন পৃথিবী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ ও পৃথিবীর রূপান্তর সাধনের এক শক্তিশালী তাত্ত্বিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

মার্কসবাদ হল প্রগতিশীল সামাজিক চিন্তাগুলির সমস্ত পূর্ববর্তী বিকাশের স্বাভাবিক ফল। দর্শন ও সামাজিক চেতনার দু হাজার বৎসরের অধিককাল-ব্যাপী বিকাশে মূল্যবান যা কিছু সৃষ্টি হয়েছিল মার্কসবাদী দর্শন তাকে সমালোচনামূলকভাবে আত্মস্থ করেছে।

২. নতুন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন সাফল্যের ভিত্তিতে লেনিনের দ্বারা বিকাশিত ও সমৃদ্ধ মার্কসবাদী দর্শন রাশিয়ায় ও অপরাপর দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত প্রস্তুতিতে এবং তার বিজয়ে অতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতা; যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের মনপ্রাণ, তা সামাজিক বিকাশের বিশ্লেষণের জন্য সুপরীক্ষিত হাতিয়ার ছিল ও এখনও রয়েছে। বর্তমান যুগের আভ্যন্তরিক বিরোধগুলিকে এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও মননগত প্রক্রিয়াগুলিকে উদ্ঘাটিত করতে এই বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতা সাহায্য করে, সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের নেতৃত্বকারী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির :জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রণনীতি ও রণকৌশল রচনা করতে সাহায্য করে।

বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতায় সজ্জিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে সামাজিক বিকাশের সাধারণ বিধানগুলিকে ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে, বন্ধুভাবাপন্ন শ্রেণী ও জাতিগুলির

ভিতরকার নির্দিষ্ট চরিত্রকে, সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের প্রকৃত দ্বান্দ্বিকতাকে যথাযথভাবে চিত্রিত করে। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণের বিধানগুলির জ্ঞান ঐতিহাসিক বিকাশের শিকলিতে নির্ধারক গ্রন্থিটিকে উদ্ঘাটিত করতে, জনগণকে সক্রিয়ভাবে জড়ো করতে এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিচালনা করার সর্বাপেক্ষা নমনীয় ও ফলপ্রসূ রূপ ও পদ্ধতি সময়মত বেছে নিতে সাহায্য করছে।

সমসাময়িক মতাদর্শগত সংগ্রামে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে মানবিকতার, মানবজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতে এবং প্রগতিশীল মানবিক চিন্তার মহান সৃজনশীল সম্ভাবনায় সুগভীর বিশ্বাসের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

৩. মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জানার একটা সুনির্দিষ্ট রূপ। বিজ্ঞানের সাফল্যগুলির উপর নির্ভরশীল ক'রে এবং মানবজাতির বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিকাশের সার সংকলন ক'রে এই দর্শন বিশ্বের এক গতিশীল বিকাশের ছবি উপস্থিত করে এবং সামান্যীকৃত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে নিজের ভূমিকা পালন করে। বিশেষীকৃত বিজ্ঞানগুলির বহু নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলিকে একটি সাধারণ দর্শনগত পদ্ধতি দিয়ে সম্পূরণ করে, যা জ্ঞানের সমস্ত শাখার পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য ও প্রয়োজন, এবং তাদের গবেষণার মৌলিক পদ্ধতিগত নীতিসমূহে সজ্জিত করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন বিজ্ঞানের পক্ষে বিশ্ব সম্বন্ধে আরও সুগভীর জ্ঞানের পথ সুগম করে, এ মানবিক জ্ঞানের উপর কোনও সীমা আরোপ করে না, জ্ঞানের কোন সাফল্যকে অনপেক্ষ করে তোলে না, এবং পারিপার্শ্বিক জগতের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ও বিধান আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করে।

শেষত মার্কসবাদী দর্শন ও সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বর্তমান বিপ্লবের সারমর্ম ও অর্থে গভীরভাবে প্রবেশ করার সুযোগ যোগায় এবং ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে তার বিভিন্ন সামাজিক ফলাফলকে প্রকাশ করে।

৪. মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের পক্ষাবলম্বনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়

কঠোর বস্তুনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতা। যে বৈপ্লবিক প্রগতিশীল লক্ষ্যগুলিকে এই দর্শন তুলে ধরে তা একে সক্ষম করে সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শন, যা "পক্ষপাতহীন" এবং "শ্রেণীর ঊর্ধ্বে" বলে নিজেকে জাহির করতে বাধ্য হয়, তার বিপরীতে নিজের শ্রেণী-চরিত্র, নিজের পক্ষাবলম্বনকে উদ্ঘাটিত করতে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন সকল রকম বদ্ধ ধারণার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু জঙ্গী বস্তুবাদের ঐতিহ্য বহন করে। বিশ্ব-চিত্রের সকল রকম ধর্মীয়-ভাববাদী, আধিভৌতিক বিকৃতির বিরুদ্ধে, অচল সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে সমর্থন ও টিকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে এই দর্শন প্রকাশ্যে ও ক্রমাগত সংগ্রাম করে। ধনতান্ত্রিক দেশের যে সব অগ্রসর চিন্তাবিদরা সকল জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির ভাগ্য সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ বোধ করেন এই দর্শন তাঁদের সকলকে সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করে।

৫. মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল তত্ত্ব ও ব্যবহারকে একত্রে গ্রথিত করা, ব্যবহার দ্বারা তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞাগুলিকে পরীক্ষা করা, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ভিত্তিতে তত্ত্বকে বিকশিত করা। এ নীতি মার্কসবাদকে চিন্তার কোনও বদ্ধতার বিরুদ্ধে, মননগত রক্ষণশীলতা বা মতান্ধতার সুদৃঢ় বিরোধী এক জীবন্ত, সৃজনশীল শিক্ষায় পরিণত করে। "যেখানে একটা শিক্ষার সর্বোচ্চ ও একমাত্র মানদণ্ড হয় আর্থিক ও সামাজিক বিকাশের বাস্তব প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সঙ্গতি, তখন কোনও মতান্ধতা থাকতে পারে না।…"(১) মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের সত্যগুলি সমগ্রভাবে সামাজিক ব্যবহার বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কোনও পৃথক শাখা কারও জন্যই কোনও তৈরি-সমাধান যোগায় না। এই দর্শন চায় যার তদন্ত করা হচ্ছে তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করে নিজের প্রতিজ্ঞাগুলির সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ।

মতান্ধতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসমঞ্জস মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন শোধনবাদকেও বর্জন করে। মার্কসবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশ হিসাবে নিজেকে জাহির করে শোধনবাদ ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের মৌলিক বিধানগুলি সম্পর্কে

১। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১ পৃষ্ঠা ২০৮।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার মূল সত্যগুলিকে অগ্রাহ্য করে এবং সামাজিক ব্যাপারগুলির দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী-বিষয়বাদী বিশ্লেষণের জায়গায় বিষয়ীবাদ অথবা বুর্জোয়া বিষয়বাদকে বসায়।

"বিশ্ব দৃশ্যপটে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রাম এবং বিপ্লবী শিক্ষাকে ক্লীব ক'রে দেওয়ার এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের ব্যবহারকে বিকৃত করার জন্য সকল রকম শোধনবাদীদের প্রয়াসের দরুণ তত্ত্বের সমস্যাগুলির ও সৃজনশীল বিকাশের প্রতি আমাদের অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে যাওয়া দরকার।…আমাদের তত্ত্বের উপর বুর্জোয়া ও শোধনবাদী আক্রমণ সম্বন্ধে সমালোচনা অনেক বেশি প্রত্যয়জনক হয়ে ওঠে যখন তা সামাজিক বিজ্ঞানগুলির, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সক্রিয় ও সৃজনশীল বিকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।"(১)

৬. মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশ এই তত্ত্বকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার দাবি করে। এঙ্গেলস লিখেছিলেন ঃ সমাজতন্ত্র যেহেতু একটা বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে কাজেই তা বিজ্ঞান হিসাবেই অনুসৃত হওয়ার দাবি করে, অর্থাৎ চায় যে তা অধীত হোক।"(২) মার্কসবাদী দর্শন অধ্যয়ন না করে কেউ পূর্ণ সচেতন, প্রত্যয়শীল কমিউনিস্ট হতে পারে না। লেনিন এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

মার্কসবাদী দর্শনের নীতিগুলিকে ব্যবহারে সফলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হতে গেলে তা গভীরভাবে এবং প্রণালীবদ্ধভাবে অধ্যয়ন করতেই হবে, এবং তা করতে হবে প্রধানত এর উৎস থেকে, অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত রচনাগুলি থেকে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন সমসাময়িক বিশ্ব-সংস্কৃতিতে অন্যতম প্রধান উপাদান। বাহুল্যের ভয় না করেই একথা বলা যেতে পারে যে বর্তমানে কোনও লোকের ব্যক্তিগত মননশীলতার মাত্রা নির্ধারিত হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনে ও সমাজতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান কতটা গভীর, নতুন পৃথিবী গড়ায় তাকে প্রয়োগের কতটা ক্ষমতা তার দ্বারা।